সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
গৌরবময় পথ চলার ৮৪ বছর

JUBILEE 2025
PILGRIMS OF HOPE

বড়দিন সংখ্যা
২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
Christmas 2024

শান্তিরাজের অন্বেষায় আশার তীর্থযাত্রী

সারা দিবা ম্যান্ডেজের কৃতিত্ব

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের আদরের মেয়ে সারা দিবা ম্যান্ডেজ ১০ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে কানাডার Brock University থেকে Bachelors of Business Administration (Honours) - Concentration in Human Resource (HR) Management (co-op option) এ ৮০% মার্ক নিয়ে গ্রাজুয়েশন করেছে। আমাদের আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়েছে কারণ এর সাথে সারার ছিল Brock Returning Scholars Award! আমরা আরো গর্বিত যে, সারা সংসার সামলানোর পাশাপাশি পাঁচ বছরের ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামে co-op সহ চার বছরে সম্পন্ন করেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে summer break এ ছুটি না নিয়ে course নেয়া, co-op job এর পাশাপাশি course নেয়া আর ইডেন মহিলা কলেজ থেকে five credits পাওয়ার কারণে। এছাড়া সারা university তে co-op status রাখার মতো রেজাল্ট বজায় রাখার কারণে ইন্টারভিউতে নির্বাচিত হয়ে কানাডা সরকারের Ministry of Transportation (MTO) এ চাকুরী পায় এবং পরবর্তীতে সারাকে Special Highway Operations Initiatives Office এ প্রমোশনসহ internally hire করা হয়।

সারার convocation ceremony YouTube channel - Delightful Highlights এ দেখা যাবে।

সারা শৈশবে ডন বস্কো স্কুলে শিক্ষা জীবন আরম্ভ করে। ৫ম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি এবং ৮ম শ্রেণীতে সাধারণ বৃত্তি লাভ করে। সেন্ট ইউফ্রেজীস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে Science এ S.S.C. এবং হলিক্রস কলেজ থেকে Humanities এ H.S.C. পাশ করে। তারপর ইডেন মহিলা কলেজে English Literature এ Honours চলাকালীন সময়ে ৩০ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এলেক্স ম্যান্ডেজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কানাডায় Brock University তে পুনরায় সম্পূর্ণ নতুন discipline এ পড়া আরম্ভ করে। বিবাহের পর নতুন পরিবেশে, নতুন সংস্কৃতিতে সারার দৃঢ় প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জিত এই কৃতিত্বে আমরা গর্বিত। এই দীর্ঘ যাত্রা পথে ঈশ্বর প্রতিনিয়ত সঙ্গে ছিলেন। আমাদের সকলের প্রার্থনা এবং এলেক্সের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতায় আজকের এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে সারা এবং এলেক্স Niagara Falls এর নিকটবর্তী St. Catharines, Ontario, Canada তে অবস্থানরত। আমরা তাদের সুন্দর জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সকলের আশীর্বাদ কামনা করি।

পিতা - প্রদীপ রোজারিও
মাতা - তিলোত্তমা রোজারিও
স্বামী - এলেক্স ম্যান্ডেজ

বড় ভাই - গ্রেনার দীপ রোজারিও
মামা - ব্রাদার যোয়াকিম রতন গমেজ C.S.C.
শ্বশুর - ম্যাথিও ম্যান্ডেজ
শাশুড়ি - অঞ্জলি ম্যান্ডেজ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সূচীপত্র

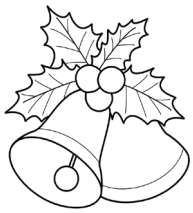

প্রবন্ধ

- বাক্যের দেহধারণ উৎসবে শান্তির বারতা - *ফাদার শিপন পিটার রিবেরু* ◆৮
- বড়দিন: খ্রিস্ট জুবিলি বর্ষে আশার তীর্থ - *ফাদার সুনীল রোজারিও* ◆১০
- বড়দিন কেন খ্রিস্টানদের 'বড় উৎসব' - *যোগেন জুলিয়ান বেসরা* ◆১২
- জগৎজ্যোতি প্রভু যিশুর আত্মকথা - *নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি* ◆১৪
- বড়দিন : বিশ্বে এবং আমরা - *স্যামুয়েল পালমা* ◆১৭
- যিশুর আগমন, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও অস্থির পৃথিবী - *তেরেজা সোমা ডি' কস্তা* ◆২০
- বড়দিন কী সত্যিই বড়? - *ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি* ◆২১
- বড়দিন- পাওয়া নয়, দেওয়াতেই আনন্দ - *ড. সিস্টার মেরী হেনরিয়েটা এসএমআরএ* ◆২৩
- যিশু কেন্দ্রিক এক উৎসব বড়দিন - *সিস্টার মেরী আলো পালমা আরএনডিএম* ◆২৪
- বর্তমান বাস্তবতায় বড়দিন উদ্‌যাপন - *মিথুশিলাক মুরমু* ◆২৬
- শ্রী যিশুর জন্মদিন সকলের বড়দিন - *ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা* ◆২৮
- বড়দিনকে ঘিরে পুরনো কিছু কথা - *ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং* ◆২৯
- বড়দিন : বড় হয়ে ওঠার দিন - *ফাদার প্যাট্রিক গমেজ* ◆৩২
- বড়দিন : আশার পূর্ণতা - *ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী* ◆৩৪
- বাংলাদেশ হতে বেথলেহেম কত দূরে - *ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি* ◆৩৬
- বড়দিন - *ফাদার আলবার্ট রোজারিও* ◆৩৭
- শিশু যিশুর জন্মোৎসব : পৃথিবীর জন্য আহ্বান ও আধ্যাত্মিক মহামিলনযাত্রা - *জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ* ◆৩৮
- বড়দিনের আনন্দ পূর্ণতা দানে ঐশবাণী - *ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ* ◆৩৯

বিশেষ প্রতিবেদন

- ভালোবাসা ও সেবা কাজে কারিতাস বাংলাদেশ - *কারিতাস প্রোগ্রাম ডেস্ক* ◆৪০

সিনড - জুবিলি বর্ষ

- বিশপদের সিনড : শেষ পর্ব - অক্টোবর ২০২৪ - *আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই* ◆৪৩
- সিনোডাল সংস্থার বৈশিষ্ট্য, নীতি ও বাস্তবানুগ পদক্ষেপ - *ড. আলো ডি' রোজারিও* ◆৪৮

খোলা জানালা

- খ্রিস্টীয় মনোভাব গড়ে তোলা - *ফাদার গৌরব জি.পাথাং সিএসসি* ◆৫০
- ২য় ভাটিকান মহাসভার আলোকে স্থানীয় সংস্কৃত্যায়ন ও উপাসনা সংগীত - *ডা: নেভেল ডি রোজারিও* ◆৫১
- নব দম্পতিদের বলছি - *শিউলী রোজলিন পালমা* ◆৫৫
- ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সংস্কৃত্যায়ন - *ইউজিন জাসটিন আনজুস সিএসসি* ◆৫৭
- পরিবারে সিনোডালিটি চর্চা - *প্যানক্রাসিয়াস দীপু কোড়াইয়া এবং রীতা রোজলীন কস্তা* ◆৬২
- জীবন দর্শন গন্তব্য সম্মুখে - *দোলন যোসেফ গমেজ* ◆৬৪
- ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স (EI) - *চয়ন এইচ রিবেরু* ◆৬৫
- একজন নবীন লেখক বরাবর খোলা চিঠি - *খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন* ◆৬৭
- ভাওয়াল এবং বাংলা সাহিত্য - *জেরী মার্টিন গমেজ* ◆৭১
- কাউন্সেলিং - *সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম* ◆৭৩
- মোবাইল আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে যা কেড়ে নিয়েছে - *জেমস্ গমেজ (আদি)* ◆৭৫
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ - *পেট্রিক গনসালভেস্* ◆৭৬

সাহিত্যমঞ্জুরী

- বাংলা গদ্যের লেখক ও যিশুসংঘের যাজক..., *পল দ্যতিয়েন: ফাদার প্রদীপ পেরেজ এসজে* ◆৭৭
- প্রেমতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, পাপতত্ত্ব ও স্বর্গতত্ত্ব - *ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি* ◆৮০
- সংস্কৃতিবান ব্যক্তি মাত্রই শিক্ষিত, শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃতিবান নন - *জাসিন্তা আরেং* ◆৮২

নাটক

- অনুশোচনা - *কবিতা কস্তা* ◆৮৪

মহিলাঙ্গণ

- পরিবার : সেকাল- একাল - *মারলিন ক্রারা* ◆৮৬
- বড়দিন সান্নিধ্য - *সুইটি পিরীজ* ◆৮৭
- নারীর ক্ষমতায়ন বিবর্তনে দৃশ্যমান - *অসীম বেনেডিক্ট পামার* ◆৮৮
- বিশ্বাসে মিলায় বস্তু! - *চিত্রা রোজারিও* ◆৯০

যুবতরঙ্গ

- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে তারুণ্যের স্মার্টনেস হোক... : - *উজ্জ্বল এ গমেজ* ◆৯২
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম : কেমন আছি কেমন থাকব - *ফাদার শিশির কোড়াইয়া* ◆৯৬
- ডেটা সুরক্ষা - *ড্যানিয়েল দীপ পেরেরা* ◆৯৮

ভ্রমণ কাহিনী

- আমার দেখা আমেরিকা ও কানাডা - *প্যাট্রিক রবিন গমেজ* ◆৯৯
- ঘুরে এলাম কলকাতায় মাদার তেরেসা হাউজ - *মালা রিবেরু* ◆১০৩
- আমার মুম্বাই ভ্রমনের অভিজ্ঞতা - *বাতিস্তা এনসন হেমব্রম* ◆১০৪

আলোকিত ব্যক্তিত্ব

- একজন 'লবদিদি' হয়ে ওঠার কথা - *ফাদার সঞ্জয় ইগ্নাসিউস চিসিম* ◆১০৫
- সময়ের আলোকিত ব্যক্তিত্ব গাব্রিয়েল কস্তা - *সুমন কোড়াইয়া* ◆১০৮

স্বাস্থ্য কথা

- স্বাস্থ্যে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা - *ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও* ◆১১০

কলাম

- সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সংস্কার এবং রূপান্তরমূলক পরিবর্তন - *ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি* ◆১১১
- কাটাকুম্ভ : খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাক্ষ্যভূমি - *ফাদার দিলীপ এস. কস্তা* ◆১১৩

গল্প

- সামাজিকতা - *প্রদীপ মার্সেল রোজারিও* ◆১১৫
- অপূর্ণ আনন্দ - *সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই* ◆১১৭
- পলু শিকারী ও আঙ্গুরফল - *সাগর কোড়াইয়া* ◆১১৮
- সাতাশের রাতে - *সুনীল পেরেরা* ◆১১৯
- স্বরূপকাঠির কান্না - *ষ্টিফেন কোড়াইয়া* ◆১২১
- লোকটি - *খোকন কোড়ায়া* ◆১২৫
- মন পরিবর্তন - *মিল্টন রোজারিও* ◆১২৬
- জানালার মোমবাতি - *জেরী জুলিয়াস রোজারিও* ◆১২৮
- আমরা একলা আকাশ - *রাখী রীটা রোজারিও* ◆১২৯
- তিন বৃক্ষের গল্প - *এলয়সিয়াস মিলন খান* ◆১৩০
- ছটু বড্ড একা - *মেরী তেরেজা বিশ্বাস* ◆১৩১
- সময়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে - *ব্রাদার জয় আন্তনী রোজারিও সিএসসি* ◆১৩২

ছোটদের আসর

- বড়দিনের উপহার - *জেসিকা লরেটো ডি'রোজারিও* ◆১৩৬
- হাসপাতালের মর্গে এক রাত - *অন্নয় খ্রীষ্টফার কস্তা* ◆১৩৭

বিশ্বমণ্ডলীর সংবাদ

- পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের এশিয়া মহাদেশ সফর - *ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু* ◆১৩৮

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫** খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার **সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব** মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা এবং খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে চান, অনুদান দিতে চান ও মানত পূরণ করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা তীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

বি.দ্র.

১। পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্যদিয়ে দিতে পারবেন।
২। আগাম যোগাযোগের ভিত্তিতে ৫০ টাকা রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে পর্বদিনে দুপুরের প্যাকেট লাঞ্চ সংগ্রহ করার সুবিধা রয়েছে। তবে অবশ্যই ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ এর মধ্যে স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমে জানাতে হবে।
৩। পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছাদান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র। খ্রিস্টযাগের জন্য উদ্দেশ্য দান ২০০ টাকা।

তীর্থভূমিতে যেসকল উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে

১। চ্যাপেলের পুনঃসংস্কার করা হয়েছে।
২। প্রধান বেদী মঞ্চের উপরের শেড বা টিনের চাল বড় ও পরিবর্তন করা হয়েছে।
৩। প্রধান বেদী আরও বেশি প্রশস্থ করা হয়েছে এবং বেদীর সামনের অংশ পাকা করা হয়েছে।
৪। তীর্থভূমির প্রধান গেইট নির্মাণ ও রাস্তার কাজ করা হয়েছে।
৫। প্রধান বেদীর দক্ষিণ পাশের জমি ভরাটের কাজ করা হয়েছে।

তীর্থভূমিতে যেসকল উন্নয়ন কাজ চলমান আছে বা করা হবে।

১। উত্তরদিকের বাউণ্ডারী করা অতীব জরুরী প্রয়োজন।
২। এছাড়াও তীর্থভূমির পরিবেশ আরোও প্রার্থনাময়, আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ করার জন্য অনেক কাজ করা প্রয়োজন। এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।
৩। তীর্থস্থানের উন্নয়ন কাজের জন্য এ পর্যন্ত যারা উদারভাবে দান করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

নভেনা খ্রিস্টযাগ
২৯ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টবষ
সকাল ৬:৩০ মিনিট এবং বিকাল ৪:০০

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭:০০
২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০:০০

যোগাযোগের ঠিকানা
ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ
পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল: ০১৭১২১৫৩৮৩৯

ধন্যবাদান্তে,
পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ : ৮৪ : বড়দিন সংখ্যা
ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় আশার আলো: বড়দিন

২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব মুক্তিদাতা যিশুর জন্মদিন সারা বিশ্বেই অতীব জাঁকজমকতার সাথে ও অর্থবহভাবে পালন করা হয়। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাবাসীরা যিশুর জন্মদিনকে বড়দিন আখ্যায়িত করে পবিত্র আনন্দ উল্লাসে তা পালন করেন উপাসনা ও সামাজিকতার মধ্যদিয়ে। যিশুর জন্ম বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের প্রবক্তা ইসাইয়া গ্রন্থের ৭:১৪ পদে বর্ণিত আছে, শোন, কুমারী কন্যাটি গর্ভবতী হবে এবং একটি পুত্র জন্ম দেবে এবং তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল। দীন শিশুটি ঐশ শক্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই বড়দিনের আনন্দের উৎস একটি দীন শিশু। কেননা এ শিশুই যে ইম্মানুয়েল অর্থাৎ আমাদের সাথে ঈশ্বর। তিনি সব সময় আমাদের সাথে থাকেন এবং ভালোবাসেন। আমরা যেমন ঠিক তেমনটি করে ভালোবাসেন আর তাইতো তিনি আমাদের মাঝে বাস করেন। বড়দিন হলো মানুষের মাঝে মানুষের মতো হয়ে ঈশ্বরের আগমন। ঈশ্বর আজ আমাদের বেছে নিলেন। যিশুর দেহ ধারণ নিচে নেমে আসা কোন পরাজয় বা অপমান নয় বরং তা হলো মানুষকে উন্নতি ও তাকে ভগবৎ করার উপায়। ঈশ্বর তনয় যিশু দেহধারণ করে আমাদের একজন হলেন। সবার অন্তরে তিনি জন্ম নিলেন। যাতে আমরা তার মত হতে পারি। তিনি গরীব বেশধারী হলেন, আমরা যেন তার দারিদ্রে ধনী হতে পারি।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র ব্যাপক ও তীব্রতর হচ্ছে। লাখ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষ, অনাহার, এবং বাস্তুচ্যুতির শিকার। সাম্প্রতিক জগৎ ও মানবসমাজের দিকে তাকালে কত গভীরভাবে উপলব্ধি হয় যিশুর আগমন কতই না প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের মানবজাতি এবং আমাদের দেশের পরিস্থিতির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই আমাদের মানবজীবনের শ্রী কমে, 'বিশ্রী' গুলো; নানা বৈষম্য ও বিরোধিতা, বিদ্রোহ-বিপ্লব, বিশৃঙ্খলতা ও বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ-বিদ্রুপ, বিয়োগ ও বিড়ম্বনা ও বাক-বিতণ্ডা-বিষোদগার, অপ্রেম-অশ্রদ্ধা, অবিচার ও অপরাধ, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। এমনতর পরিস্থিতিতে সকল বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে, সকল সীমানা ছাড়িয়ে, প্রভু যিশুর আগমন যে একান্ত প্রয়োজন। এই বিশ্বাসই আমাদের সকল কিছুর ভিত্তি, ভালোবাসাই আমাদের সকল শক্তি আর বড়দিনের চিরন্তন বার্তা আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা।

এখনকার পৃথিবী, যেখানে প্রতিদিন নতুন সংকট মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সেখানে বড়দিনের বার্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানবজাতির জন্য শান্তি ও ভালোবাসা সবচেয়ে বড় উপহার হতে পারে। ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা সংকট, আফ্রিকার অনাহার, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত- এই সবই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, আমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য, সহমর্মিতা এবং আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতেই বড়দিনের প্রকৃত বার্তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যিশু, যিনি দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশে একাত্ম হয়েছেন, তিনি আমাদের শেখান যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ কখনো শেষ হয় না। আজকের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বড়দিন আমাদের আশার আলো দেখাতে পারে।

আমাদের মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর, আমাদের জাতীয় গৌরবের চূড়ান্ত স্মারক। এই দিনটি কেবল স্বাধীনতার ইতিহাস নয়, এটি আমাদের আত্মত্যাগ, ঐক্য এবং স্বপ্নের প্রতীক। বিজয়ের এই আনন্দঘন মুহূর্তে নতুন করে উদ্দীপ্ত হই শ্রদ্ধা-সম্মানের সংস্কৃতি গড়ার ও একসাথে পথচলার।

খ্রিস্টীয় পরম আনন্দের দিন বড়দিন, আশার, ভালোবাসার এবং পরিত্রাণের এক মহিমান্বিত বার্তা নিয়ে আমাদের মাঝে আসে। তাই বড়দিন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি একটি মানবিক বার্তা। যিশুর জন্মের মাধ্যমে যে শান্তি, ভালোবাসা, এবং মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা আমরা পেয়েছি, তা আজকের পৃথিবীতে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। এই কঠিন সময়ে, যখন বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান, বড়দিনের বার্তা আমাদের উজ্জীবিত করুক। আসুন, আমরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেই এবং একে অপরকে সাহায্য করে একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ার প্রয়াস চালাই। এটি যে শুধুমাত্র একটি দিন নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনে আমাদের কর্তব্য। বড়দিনের উজ্জ্বল আলোকমালায়, আমরা যেন মানবতার আলো খুঁজে পাই এবং নতুন করে আশার বীজ বুনে, একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠক, লেখক, সমালোচক, শুভাকাঙ্খী, উপকারি বন্ধু-বান্ধব; সকলের প্রতি রইল বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। †

কিন্তু সেই দূত তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কেননা দেখ আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দায়ূদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন-তিনি খ্রিস্ট প্রভু। *(লুক ২: ১০- ১১)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

বড়দিনের শুভেচ্ছা

যিশুখ্রিস্টের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে সকলকে জানাই বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল বিশপ, পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ জেমস রমেন বৈরাগীসহ সকল সদস্য-সদস্যা, 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী, লেখক-লেখিকা, উপকারী বন্ধু-বান্ধব ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি রইল কৃতাঞ্জলি। বাণীদীপ্তি, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ, জ্যোতি কমিউনিকেশন, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জেরী প্রিন্টিং প্রেস-এর সকল সম্মানিত ক্রেতা, গ্রাহক ও শ্রোতাদের প্রতি রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং সফল আরেকটি বছর কামনা করছি। খ্রিস্টবর্ষ ২০২৫ সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও আনন্দ।

ছুটির নোটিশ

শুভ বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে ২ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। প্রতিবেশীর পরবর্তী সাধারণ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে আগামী ১২ জানুয়ারি, রবিবার ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

বিশেষ ঘোষণা

২০২৫ খ্রিস্টাব্দেও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নির্ধারিত ৪০০ টাকাই থাকবে। -বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিনের অনুষ্ঠানমালা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সরাসরি প্রযোজনা ও সহযোগিতায় রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানগুলো দেখা ও শোনার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিটিভি'র অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"ইম্মানুয়েল"**
মূলভাবনা : **ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**
রচনা : **সুনীল পেরেরা**
সম্প্রচারের সময় : রাত ১০টার সংবাদের পর (ব্যতিক্রম হলে প্রতিবেশী'র ফেইসবুক পেইজে ও স্থানীয় পুরোহিতের মাধ্যমে পরিবর্তিত সম্প্রচার সময় জানিয়ে দেয়া হবে)।
সহযোগিতা : বাণীদীপ্তি
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

অনুষ্ঠান : **"জ্যোতির্ময় ছেলেটি"**
গ্রন্থণা ও প্রযোজনা : **ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**
উপস্থাপনা : **রেনেতা মিস্ত্রি ও জুয়েল কস্তা**
সার্বিক সহযোগিতা : **বাণীদীপ্তি স্টুডিও**

বড়দিনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখুন ও শুনুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ফেইসবুক পেইজ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ইউটিউব চ্যানেল
বাণীদীপ্তি মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেল

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসের বিশেষ অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"আনন্দধ্বনি শোন পরিত্রাতা আসে"**
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা : **চন্দনা রোজারিও**
সম্প্রচারের সময় : সকাল ৮:০০ মিনিট
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

www.veritasbangla.org
www.facebook.com/veritasbangla1

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

ইমেইল : wklypratibeshi@gmail.com
ওয়েবসাইট : https://weekly.pratibeshi.org/

ব্যবহার করুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো

ফেইসবুক : www.facebook.com/weeklypratibeshi
ইউটিউব:https://www.youtube.comBanideeptiMedia

পরিশোধ করুন গ্রাহক চাঁদা বিকাশে

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮৫১৩০৪২

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

বড়দিন
পাপময় জগৎ - মুক্তিদাতার আগমন – আনন্দময় প্রত্যাশা

বড়দিন আসছে। অনেক বিশ্বাস ও ভালোবাসা এবং তার সাথে আনন্দময় প্রত্যাশা নিয়ে শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে। শুভ বড়দিন!

পাপময় জগতে প্রভু যিশুর আগমন, মানুষ রূপে তাঁর জন্ম, ইম্মানুয়েল রূপে জগতে তাঁর প্রবেশ, পাপাসক্ত মানুষের জন্য বড়ই প্রয়োজন ছিল। তিনি যদি না আসতেন তাহলে কী করে মানুষ সোয়া দু'হাজার বছর কাটিয়ে বর্তমান কালে উপনীত হতে পারত! দুই-সহস্রাব্দ-পঁচিশ-বছর কাল ধরে বড়দিন পাপ-কলুষিত জগত ও মানবসমাজে দিয়েছে ঐশ-সান্নিধ্য, সৃষ্টি করেছে হাজার-হাজার সন্তজন, উদ্ভাবন করেছে নতুন ভাবধারা ও দর্শন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, মনোভাব, মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতা। এগুলো তো বড়দিনের প্রকাশ।

সাম্প্রতিক জগৎ ও মানবসমাজের দিকে তাকালে কত গভীরভাবে উপলব্ধি হয় যিশুর আগমন কতোই-না প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের মানবজাতি এবং আমাদের দেশের পরিস্থিতির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মানবজীবনের "শ্রী" হারিয়ে গেছে, কত "বিশ্রী" হয়ে গেছে; নানা বৈষম্য ও বিরোধিতা, বিদ্রোহ ও বিপ্লব, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ ও বিদ্রুপ, বিয়োগ ও বিড়ম্বনা ও বাক-বিতণ্ডা ও বিষোদগার, ইত্যাদির বিজয়; সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে অপ্রেম ও অশ্রদ্ধা, অবিচার ও অপরাধ, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ। সকল বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে, সকল সীমানা ছাড়িয়ে, প্রভু যিশুর আগমন যে একান্ত প্রয়োজন। এই বিশ্বাসই আমাদের সকল কিছুর ভিত্তি, ভালোবাসাই আমাদের সকল শক্তি আর বড়দিনের চিরন্তন বার্তা আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা।

যিশুর আগমনের দুই হাজার বছর অর্থাৎ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, আমাদের জন্য মহান জুবিলী বর্ষ, পুণ্য পবিত্র বর্ষ। এই পুণ্যবর্ষের উদ্বোধন হবে আসছে ২৪ ডিসেম্বর বড়দিনের রাতে বিশ্ব কাথলিক মণ্ডলীজুড়ে। ঐ সময়ে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় প্রতীকী অর্থে সাধু পিতরের গির্জার পুণ্যদ্বার উন্মুক্ত করবেন যেন প্রভু যিশুর আগমনের জন্য সকলের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। পুণ্যবর্ষের মূলবাণী হচ্ছে: "আশার তীর্থযাত্রী আমরা"। সকল নিরাশার মাঝে, হতাশার মাঝে, অন্ধকারের মাঝে জ্যোতির্ময় প্রভু যিশুর আলোর রশ্মি সকল বন্ধ-দ্বার উন্মুক্ত করে প্রবেশ করতে পারে জগৎ-সৃষ্টি ও মানব সমাজে। পুণ্যবর্ষে এই প্রত্যাশায় আমরা তীর্থযাত্রী।

আজ থেকে ১৭০০ বছর পূর্বে, ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বজনীন মণ্ডলীর নিসীয় সার্বজনীন মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিসীয় মহাসভায় সংজ্ঞায়িত হয়েছিল মণ্ডলীর সার্বজনীন খ্রিস্টবিশ্বাস। পবিত্র ত্রিত্বে আমাদের বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছিল দ্বাদশ বিশ্বাসমন্ত্র গোটা খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য। অতএব, এক ও অভিন্ন খ্রিস্টমণ্ডলীর চেতনায় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ পালন খ্রিস্টীয় ঐক্যসাধনায় প্রেরণা যোগাবে সেই প্রত্যাশাও মণ্ডলী তার অন্তরে ধারণ করছে।

আমার নিজস্ব প্যারিশ পাদ্রীশিবপুরের ইতিহাস ও জীবন-সংস্কৃতির ওপর প্রায় আটশত পৃষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে যার শিরোনাম: "শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর: ঐতিহ্যবাহী একটা খ্রিস্টান জনপদ"। মণ্ডলীর পুণ্যবর্ষ ও প্যারিশের ২৬০তম প্রতিষ্ঠা-বর্ষতে উক্ত গ্রন্থটির উন্মোচন (২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.) স্মরণীয় করে রাখবে। পাদ্রীশিবপুর-নিবাসী ও পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসী সকলের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

In the midst of all uncertainty and hopelessness in the world society and in our national community, it is most certain that Jesus Christ is to be born a new to live among us. His birth then be manifested in every aspect of our life. The Holy Door marking the Holy and Jubilee Year will be opened by Pope Francis on the Vigil night of Christmas. Let the coming of Jesus to the humanity as commemorated in Christmas, change the dark clouds of the world and of our beloved nation of Bangladesh. With strong Faith in Jesus Chirst, let us live the Holy Year as PILGRIMS OF HOPE embracing our neighbors with love. Let this vision and mission mark your Christmas Celebration and remain throughout the Holy Year 2025. God bless you all.

Merry Christmas and Holy Year to all the members of the Organization and the Readers.

+ Patrick D'Rozario, csc

Cardinal Patrick D'Rozario, csc
Archbishop Emeritus of Dhaka.
Moreau House, Plot-B, House 28, Road 3,
Banashree, Rampura, Dhaka 1219. Bangladesh

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

আমরা, সারা বিশ্বের খ্রিস্টানগণ মহাসমারহে প্রভু যিশুর জন্মতিথি পালন করছি। সবাইকে বড়দিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আগামী বছর আমরা যিশু খ্রিস্টের জন্মের ২০২৫ বছরের জুবিলী পালন করতে যাচ্ছি। বিষয় বস্তু হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে: **আশার তীর্থযাত্রী**। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা হলাম আশার মানুষ। আশা কখনও মানুষকে হতাশ করে না। হতাশা-নিরাশার মধ্যে আমরা হয়ে উঠতে চাই আশায় অনন্দিত জনগণ এবং সবার কাছে আশার বাণী শোনাতে চাই।

পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় সেবা দানের সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তিনি বিশ্ব মণ্ডলীকে সিনডে আহ্বান জানিয়েছেন। যা ২০২১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে শেষ হয়েছে। সিনড হলো দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার একটি ফসল। সিনডের দিকে যাত্রা হলো পবিত্র আত্মায় অভিজ্ঞতা করা যে: তিনি আমাদের মধ্যে অবধারণ করতে সর্বদা কাজ করেন যখন আমরা আমাদের জীবনের ভিত্তি করি প্রভুর বাণী শোনা, প্রার্থনা এবং একতার উপর। সিনোডালিটি হলো সংলাপ, অন্যের সাথে সাক্ষাৎ এবং ভ্রাতৃত্বের একটা অভিজ্ঞতা যা আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে উন্মুক্ত করে। "আমি" থেকে "আমরা-তে" রূপান্তরিত হয়ে একটা পরিবার গঠন করা। এই সিনডের প্রধান বিষয়বস্তু হলো: মণ্ডলী হলো একটি পারস্পারিক সম্পর্কে আবদ্ধ একটি মিলন সমাজ, একই বিশ্বাস ও ভালোবাসায় একটা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ। দ্বিতীয়টি: মণ্ডলী হলো অংশগ্রহণমূলক একটা সত্তা। তৃতীয়টি হলো: মণ্ডলীর একটা মিশন দায়িত্ব রয়েছে। মণ্ডলীর অস্তিত্বের কারণই হলো প্রভুর মঙ্গলবাণী প্রচার করা এবং ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করা। এ জগতে মণ্ডলী হলো তীর্থযাত্রী। সিনোডালিটি হলো সব খ্রিস্টানদের নিয়ে একত্রে স্বর্গরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা এবং সমগ্র মানব জাতিকে নিয়েই এই পথ চলা। এই পথ চলায় রয়েছে একে অপরের কথা শোনা, সংলাপ এবং অবধারণ করা। এ যাত্রায় পবিত্র আত্মা আমাদের পথ প্রদর্শক। মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের আবাস, তাঁরই নিজস্ব পরিবার, অতিথিপরায়ণ একটা গৃহ, ভালোবাসা ও সেবার একাটি স্থান, যেখানে থাকবে না কোন বৈষম্য। যেখানে রয়েছে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। বাপ্তিস্মের মর্যাদার উপর ভিত্তি করে এখানে নারী-পুরুষ হয়ে ওঠে সম-মর্যাদা ও দায়িত্বের অংশীদার। যুবাদের অংশগ্রহণে মণ্ডলী হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত। সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে ওঠার জন্য ভক্তজনগণ, পুরোহিত, ব্রতধারী নর-নারী ও বিশপদের গঠন-প্রশিক্ষণ জরুরী যেন সিনোডাল ভাবধারায় সবার মন পরিবর্তন হয়। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তার শিষ্যদের মুক্তিদায়ী শান্তি-উপহার দান করেন এবং তাঁর মিশনে আমাদের সহভাগী করেন। এই শান্তি হলো পূর্ণ জীবনের প্রতীক, ঈশ্বর ও মানুষ এবং প্রকৃতির সাথে সম্প্রীতি ও পুনর্মিলন। তাঁর মিশন হলো স্বর্গরাজ্যের বিস্তার করা, ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা সবাইকে দান করা। পবিত্র আত্মাকে লাভ করার মধ্য দিয়ে মিশনারী শিষ্যত্বের জন্মগ্রহণ হয়। দীক্ষা, খ্রিস্টযাগ, খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমরা ধাপে ধাপে গঠন লাভের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ খ্রিস্টান হয়ে উঠি যিশুর মিশনারী শিষ্য হিসেবে।

• •

We celebrate Christmas with a great joy! Next year, the Whole Church will celebrate the 2025 years of Jesus' birth, a year of Jubilee for the Christian world. The theme of this Jubilee is: **Pilgrims of Hope.** We Christians are the people of hope. Pope Francis reminds us that hope does not disappoint. We rejoice in the hope offered us by Christ, and we are called to spread the good news of hope to the world.

During the Petrine ministry of Pope Francis, the convocation of a Synod of Bishops is one of the most significant events. The Synod began in October 2021, and concluded in October 2024. The theme of the Synod is this: the Church is the **communion of the faithful, and a participation of the people of God in the mission of Jesus Christ.** The Synod of Bishops is the fruit of the Second Vatican Council. As a constitutive dimension of the Church's very nature, synodality must shape the whole life and mission of the Church in all its dimensions. The ecclesiology of synodality is a call to understand, and to experience, the Church as the People of God, united together in faith, hope, and love.

Synodality also means walking with Christ towards the Kingdom of God. This is a pilgrimage that the Church does in union with all humanity. When we journey together, we, the Church, become a "sacrament of unity" among all people. As the Church, we are a People with a purpose. We have mission, expressed in synodality, to gather all levels of the Church into mutual listening, dialogue, and community discernment. The Church is God's dwelling place, and the family of God. God calls us to be a welcoming home for all - place of love and service, without discrimination. Synodality is a path of spiritual renewal and structural reform that enables the Church to be more participatory and missionary, so that it can walk with every man, woman and child, radiating the light of Christ, in a communion of love.

Synodality is not an end in itself. Synodality serves the mission Christ entrusted to the Church in the Spirit. To evangelize is "the essential mission of the Church.... it is the grace and vocation proper to the Church, her deepest identity (EN 14). By being close to all without distinction of persons, preaching and teaching, baptizing, celebrating the Eucharist and the Sacrament of Reconciliation, all the local Churches and the entire Church respond concretely to the Lord's Command "to proclaim the Gospel to all nations" (Cf Mt 28:19-20)

Dear friends: The birth of Jesus heralds communion and fraternity among all people. This Christmas I ask you to join with me, in a spirit of synodality, to participate more actively in the life of the Church, and to join more fully in the mission of Christ to bring love, hope and joy to the world. Filled with joy of the newborn Christ, I wish you, your families, and your loved one a very Merry Christmas, and a joyous, happy New Year!

+ বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই
আর্চবিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
সভাপতি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

আজ সারা বিশ্বের খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব শুভ বড়দিন মহা আনন্দের সাথে উদযাপন করছে। তাঁর আগমন জগতের জন্য একটা আনন্দের সংবাদ। যে আনন্দ হল মুক্তির, ভালোবাসার, শান্তির, মিলনের ও কল্যাণের। তাই রাখালদের কাছে স্বর্গদূত বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি, আর এই আনন্দে সমগ্র জাতির মানুষ আনন্দিত হবে। প্রভু যিশুর আগমনে দূর হোক জগতের সকল দুঃখ কষ্ট ও বেদনা, সারা জগত ভরে উঠুক আনন্দে ও শান্তিতে।

ঈশ্বর মানুষ হলেন, রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন এই জগতের মাঝে। মানব দেহ ধারণের মাধ্যমে মানুষের সাথে এক হলেন এবং মানুষের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন। মানব সত্তার ও ঐশসত্তার মিলন হল। ঈশ্বর মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করলেন এবং মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। তিনি নিজেকে শূণ্য করলেন ও বিলিয়ে দিলেন। যা ছিল তার ভালোবাসা ও আনন্দের চিহ্ন। নিজেকে শূণ্য করে এবং দান করে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। অন্যের কাছে নিজেকে দান করার মধ্যে রয়েছে ভালোবাসা ও ত্যাগ। যিশুর অসহায় অবস্থায় জন্ম তার শূণ্যতার ও নিজেকে দান করার চিহ্ন বহন করে। বড়দিন যিশুর এই ভালোবাসা ও নিজেকে দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের আহ্বান করে যেন আমরাও ঈশ্বরকে ও পরস্পরকে ভালোবাসি এবং তাদের জন্য নিজেদের দান করি।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে জুবিলী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। এই জুবিলী বর্ষ হচ্ছে "আশার তীর্থযাত্রার" বর্ষ। মহামান্য পোপ খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন যে, আমরা অবশ্যই আশার আলো প্রজ্জলিত করব যা আমাদের দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেককে সাহায্য করতে হবে নতুন শক্তি এবং নিশ্চয়তা অর্জন করতে যার দ্বারা একটি উন্মুক্ত আত্মা, একটি বিশ্বস্ত হৃদয় এবং দুরদৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর জন্য লাভ করতে পারে। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই হতাশার আর্তনাদ। চারিদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ, সংঘাত, জীবন ধ্বংস, দরিদ্র অসহায় মানুষের জীবন সংগ্রাম ও অভিবাসন যা মানুষকে হতাশ করে দিচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের সবাইকে আশা রাখতে বলা হচ্ছে। আশা হচ্ছে ঐশতাত্ত্বিক গুন যা ঈশ্বর প্রদত্ত। সুতরাং ঈশ্বর আমাদের ডাকেন আশা রাখতে। পবিত্র বাইবেলে প্রবক্তাদের মাধ্যমে ঈশ্বর আশার বাণী শুনিয়েছেন। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করব কারণ প্রভু যিশু পুনরুত্থানের মাধ্যমে আশার আলো দেখিয়েছেন। প্রভু যিশুর আগমন হচ্ছে আমাদের জন্য আশার চিহ্ন কারণ তার মধ্য দিয়ে মানব মুক্তি সাধিত হবে।

মণ্ডলীর একটি দায়িত্ব দীন দরিদ্রদের প্রতি আমাদের সবাইকে আরো বেশী সহানুভুতিশীল ও যত্নশীল করে তোলা। প্রভু যিশু দীন দরিদ্র বেশে জন্ম নিয়ে দরিদ্রদের সাথে একাত্ব হয়েছিলেন এবং তাঁর পালকীয় কাজে দরিদ্রদের প্রতি তার সেবা ও ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি দরিদ্র, অসহায়, নির্যাতিত ও অসুস্থ মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ও তাদের অধিকার পেতে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজও পৃথিবীতে হাজারও মানুষ দরিদ্র অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব মানুষের জীবনকে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিও আর্ত চিৎকার করছে তার প্রতি কঠিন ব্যবহার করার জন্য। প্রভু যিশু এই জগতে আগমনের মাধ্যমে প্রকৃতিকেও ভালোবেসেছেন। তাই আমাদেরও প্রকৃতির প্রতি আরও যত্নশীল হতে হবে। প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে এবং ভালোবাসতে হবে দরিদ্র অসহায় মানুষকে।

মানুষের পাপময় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে, মানুষের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে প্রভু যিশু মানুষ রূপে জন্ম নিয়ে এই জগতের মাঝে এলেন এবং মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। তিনি জগতের মানুষের পরিবর্তনের মাধ্যমে মিলন, শান্তি ও একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তিনি তার আগমনের মাধ্যমে জগতের কাছে পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করলেন যেন জগতের মধ্যে হিংসা, সন্ত্রাস, শিশু নির্যাতন বন্ধ হয়ে ভালোবাসা ও মিলনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সবাই যেন পরস্পরের সাথে এক হয়ে পথ চলি ও মিলন সমাজ গড়ে তুলি

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠকদের জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা। প্রভু যিশুর জন্মদিন শুভ বড়দিন আপনাদের জন্য আনন্দময় হোক এবং নববর্ষ সবার জীবনে সফলতা বয়ে আনুক।

খ্রিস্টেতে বিনীত,

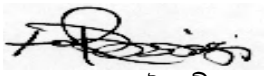

+ জেমস্ রমেন বৈরাগী
খুলনা ধর্মপ্রদেশ।
সভাপতি, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, সিবিসিবি

খ্রিস্ট

বাক্যের দেহধারণ উৎসবে শান্তির বারতা

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

একবার আমার এক পরিচিত ব্যক্তি তার জীবন সহভাগিতায় আমাকে বলছিলেন যে, তিনি দিন-রাত অনেক পরিশ্রম করেন। তার ত্যাগস্বীকার, পরিশ্রম সব কিছুর উদ্দেশ্য একটিই- 'পরিবার-পরিজন সবাইকে নিয়ে একটু শান্তিতে থাকা'। শান্তি! সবাই শান্তি চায়। শান্তির ধারণা ও লাভের উপায় একেকজনের কাছে একেক রকম হলেও প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে গভীরতম আকাঙ্খা হচ্ছে শান্তি লাভ করা, শান্তিতে জীবন-যাপন করা। মানুষের কাজ, অধ্যবসায়, মান-সম্মান, অর্থ-কড়ি লাভ, ক্যারিয়ার গঠন, অন্যের জন্য কিছু করা বা স্বার্থপর হয়ে শুধু নিজের কথা ভাবা ও কাজ করা প্রভৃতি সবই কিন্তু একটি অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, আর তা হলো জীবনে শান্তি লাভ করা।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও খ্রিস্টের দেহধারণের স্মরণোৎসব বড়দিন উদ্‌যাপন করছি। এই উৎসবেরও অন্যতম প্রধান বার্তা হচ্ছে 'শান্তি'। শান্তির বরপুত্র জগতে এসেছেন, মানবদেহ ধারণ করেছেন। তিনি জগতে শান্তি হয়ে এসেছেন। প্রবক্তা ইসাইয়া শান্তিরাজ জন্মের যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তাঁরই জন্মের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণতা লাভ করেছে:

"কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,

এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,

তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার,

তাঁর নাম রাখা হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ" *(ইসা ৯:৫)*।

ঐতিহ্যগতভাবে বড়দিনের মাহাত্ম শান্তি ও নীরবতার সাথে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। এই মূলভাবকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল এই বিখ্যাত গান, 'Silent night, holy night'. প্রকৃতপক্ষে, নীরবতা, পবিত্রতা, শান্তি এসমস্ত ধারণাগুলো একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। প্রাথমিকভাবে, প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল গ্রীকভাষায় প্রকৃতির গভীর নীরবতাকে, যেমন- সমুদ্র, মন বা আত্মার শান্তভাবকে শান্তি হিসাবে বিবেচনা করা হতো। যিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে এই ভাবটি বাতিল হয় নি বরং তা আরো সুদৃঢ় হয়েছে। এই বিষয়টি শান্তি শব্দটির বাইবেলীয় পরিভাষার শব্দগুলো, বিশেষভাবে পবিত্র বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধিতে 'শালোম'-এর বহুবিদ ব্যবহার পর্যালোচনা করলে তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, প্রাক্তন সন্ধিতে 'শালোম' শব্দটি ২৩৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং শান্তির গ্রীক প্রতিশব্দ 'এইরেনে' নবসন্ধিতে প্রায় ৯২ বার পাওয়া যায়।

১) পবিত্র বাইবেলে 'শালোম' শব্দটি প্রধানত শান্তি ও বন্ধুত্বকে নির্দেশ করে, যা যুদ্ধ ও শত্রুতার অনুপস্থিতি অবস্থাকে বুঝায়: "বাস্তবিকই তাঁর কর্তৃত্ব তিপসাহ থেকে গাজা পর্যন্ত (ইউফ্রেটিস) নদীর এপারে অবস্থিত সমস্ত দেশের, অর্থাৎ (ইউফ্রেটিস) নদীর এপারের সকল রাজার উপর ব্যপ্ত ছিল; আর তাঁর চতুঃসীমানায় শান্তি-সম্পর্ক বিরাজ করত" *(১ রাজা ৫:৪; দ্র. ১ বংশা ২২:৯; সাম ৮৫:১১; প্রবচন ৩:২; যোশুয়া ১০:১.৪)*।

২) 'শালোম' শব্দটি আবার নিখুঁত ও সম্পূর্ণতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বিশেষভাবে, কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য, সুন্দর জীবন ও উন্নতির সাথে শান্তির বিষয়টিকে যুক্ত করা হয়- যার উৎস ও দাতা হিসাবে ঈশ্বরকে তুলে ধরা হয়, "আমি দেশে শান্তি মঞ্জুর করব; তোমরা ঘুমাতে যাবে আর কেউই তোমাদের ভয় দেখাবে না; এবং আমি তোমাদের দেশ থেকে বন্য জন্তুগুলোকে দূর করে দেব, ও তোমাদের দেশে খড়্গ এসে দেখা দেবে না" *(লেবীয় ২৬:৬; সাম ২৯:১১; ৩৮:৩; ইসা ২৬:১২; জেরে ৮:১৫; জাখা ৮:১২)*।

৩) এই শব্দটি ব্যাপকভাবে শান্তি শুভেচ্ছা বিনিময় করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত কারো সাথে প্রথম দেখা ও বিদায়ের সময় এই শব্দটি উচ্চারণ করা হয়, "তোমাতেই শান্তি বিরাজ করুক" *(সাম ১২২:৮; দ্র. আদি ৪৩:২৭; যাত্রা ৪:১৮; বিচারক ১৮:৬)*।

৪) আশীর্বাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হিসাবে শান্তিকে বিবেচনা করা হতো। সেই কারণে এটি কারো প্রতি আশীর্বাদ বাণী উচ্চারণের সময় ব্যবহৃত হতো, "প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমাকে রক্ষা করুন। প্রভু তোমার উপর আপন শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তুলুন, তোমার প্রতি সদয় হোন। প্রভু তোমার প্রতি মুখ তুলে চান, তোমাকে শান্তি মঞ্জুর করা" *(গণনা ৬:২৪-২৬; দ্র. ২ সামু ১৫:২৭)*।

৫) 'সন্ধি' ধারণাটিও অনেক সময় পবিত্র বাইবেলে 'শালোম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়- যা একটি চিরস্থায়ী ও দৃঢ় বন্দোবস্ত হিসাবে গণ্য করা হয়, "পর্বতমালা সরে যাক, উপপর্বতও টলে যাক, কিন্তু আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না, আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না" *(৫৪:১০; গণনা ২৫:১২; জেরে ১৬:৫)*।

৬) 'ব্রত' পালনের ক্ষেত্রেও 'শালোম' শব্দটি ব্যবহার কর। সেমেটিক বা বাইবেলীয় পরিমণ্ডল সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা, দাবী ও প্রতিজ্ঞা পূরণের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য ছিল *(দ্র. ২৩:২২; ২ সামু ১৫:৭; যোনা ২:১০)*।

৭) প্রাক্তনসন্ধির বিভিন্ন স্থানে বার বার 'শালোম' শব্দটি ন্যায্যতার মাপকাঠি হিসাবেও দেখা হয়। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি ও ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তি-মানুষের সুষম সম্পর্কে এর মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়, "নির্দোষকে দেখ, ন্যায়নিষ্ঠকে লক্ষ্য কর: শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য ভাবী বংশ আছে" *(সাম ৩৭:৩৭; দ্র. সাম ৮৫:১০; ইসা ৬০:১৭)*।

৮) সর্বোপরি, শেষ সময়ের প্রত্যাশা, অর্থাৎ মসীহ- দাউদের সন্তানকে শান্তির রাজপুত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়- যিনি জগতে সমস্ত কিছুর পূর্ণতা ও ধর্মিষ্ঠতা নিয়ে আসবেন *(দ্র. ইসা ৯:৬-৭; ৬১:১)*।

শান্তি সম্পর্কিত প্রাক্তনসন্ধির ধারণাগুলো যিশুর মধ্য দিয়ে এই জগতে বাস্তবরূপ লাভ করে। এই জগতে তাঁর জন্ম, অবস্থান,

প্রচারকাজ, শিক্ষা, আত্মত্যাগ, ও সর্বোপরি, মানবজাতির মুক্তিসাধনের মধ্য দিয়ে শান্তির একটি চূড়ান্তরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

১) এই জগতে যিশুর আসার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে জগতের সেই আদি শান্তি ও বাস্তবতা ফিরিয়ে আনা। জগত সৃষ্টির পর মানুষের সাথে ঈশ্বরের, মানুষে মানুষে, এবং মানুষের সাথে অন্যান্য সৃষ্টি প্রাণী ও বস্তুর সাথে সুসম্পর্ক ও সহাবস্থান বিদ্যমান ছিল। সেখানে কোন ধরণের ভয়ভীতি, লজ্জা, অসহযোগিতা ছিল না *(দ্র. আদি ২:১৮-১৯.২৫)*। বাক্য দেহধারণের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সাথে জগতের নতুন সম্পর্কের যাত্রা শুরু হয়, "বাণী হলেন রক্তমাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে" *(যোহন ১:১৪)*। শেষে তার যাতনাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহনের মধ্য দিয়ে তার পরিপূর্ণতা লাভ করে। এভাবে তিনি ঈশ্বর ও তার সৃষ্টি সব কিছুর মধ্যে পুনর্মিলন সাধন করেছিলেন।

২) ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন মানে হচ্ছে পতিত মানবজাতিকে মুক্ত করা। সেই জন্যই সাধু পল 'শান্তি' ও মুক্তিকে একসাথে যুক্ত করেছেন, "তবে ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন যিশুখ্রিস্টেতে রক্ষা করবে" *(ফিলি ৪:৭)*।

৩) ব্যক্তি হিসাবে যিশু নিজে অহিংস নীতি অনুসরণ করেছেন। তার জীবনের উপর আঘাত আসলেও তিনি প্রতিঘাত কখনো করেননি। এমনকি তার অনুসারীদেরও তা থেকে বিরত রাখেন। সামারিয়ার পথে যখন যিশু চলছেন তখন সেখানকার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করেন নি; তাই শিষ্যরা রেগে গিয়ে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে আনার কথা বলেছিলেন, তিনি কিন্তু তাদের উল্টো ধমক দিয়েছিলেন, "'প্রভু, আপনি কি চান, এলিয় যেমন করেছিলেন, তেমনি আমরাও বলি যেন আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে এদের ছাই করে ফেলে?' কিন্তু তিনি তাঁদের দিকে ফিরে তাঁদের ধমক দিলেন" *(লুক ৯: ৫৪)*। তিনি সামারীয় তথা অন্যান্য সকল বিজাতির মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

৪) যিশু নিজেও শালোম শব্দটি শুভেচ্ছা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। পুনরুত্থানের পর তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়ে প্রথমেই বলেছিলেন, "তোমাদের শান্তি হোক" *(যোহন ২০:১৯.২৬)*। আবার তিনি যখন তার শিষ্যদের বাণীপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, তিনি তাদেরই একই নির্দেশনা দিয়েছিলেন, "যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক" *(লুক ১০:৫)*।

৫) জগতের শান্তির ধারণা থেকে যিশুর শান্তির ধারণা অনেক আলাদা। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতিকে শান্তির মানদণ্ড হিসাবে দেখা হয়। যিশু এক্ষেত্রে নিজের শান্তি তাঁর শিষ্যদের দিতে চেয়েছেন। আর সেটি হলো পিতার সাথে তার গভীর সম্পর্ক। এটাই ছিল যিশুর ধৈর্যশীলতা ও স্থির থাকার মূলশক্তি। এই শান্তিই শিষ্যদের দান করেন, "তোমাদের জন্য আমি শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি- জগৎ যেভাবে তা দান করে থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না" *(যোহন ১৪:২৭)*।

৬) আবার আরেক জায়গায় যিশু বলেছেন, "এমনটি মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি আনবার জন্য এসেছি; শান্তি নয়, খড়্গই আনবার জন্য এসেছি" *(মথি ১০:৩৪)*। এই পদটি নিয়ে অনেকক্ষেত্রে ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টি হয়। আসলে এখানে যিশুর আপোসহীন অবস্থানকে নির্দেশ করে। তিনি শান্তি বলতে সত্য ও মিথ্যার, প্রজ্ঞা ও মূর্খতার, ভাল ও মন্দের, ন্যায্যতা ও অন্যায্যতার, মানবতা ও হিংস্রতার, ঈশ্বর ও পার্থিব ধনসম্পদের প্রভৃতির মধ্যে সমঝোতাকে স্বীকার করেন নি। বরং সত্যিকার শান্তি স্থাপনে তিনি কঠোর হতে দ্বিধান্বিত হন নি *(দ্র. মার্ক ১১:১৫-১৮)*। এজন্যই তিনি খড়্গ বা তলোয়ারের কথা বলেছেন যাতে এটি দ্বারা অন্যায়-অসত্য ও অন্যায্যতা থেকে উত্তমতাকে- যার শান্তির প্রতীক- বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।

৭) সর্বোপরি, যিশু তাঁর শিক্ষায় শান্তি ও এর সাধককে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। শান্তির যিনি বাহক ও স্থাপন করেছেন, তাদেরকে তিনি বিশেষ মর্যাদাও দান করেন, "শান্তির সাধক যারা, তারাই ধন্য, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে" *(মথি ৫:৯)*। অন্যকথায়, যিশু যেভাবে শান্তির রাজপুত্র হিসাবে ঈশ্বরের পুত্র, তেমনি যারা শান্তির জন্য কাজ করেন তারাও ঈশ্বরের কাছ থেকে সন্তানত্বের মর্যাদা লাভ করবে।

আগমনকালীন চারটি সপ্তাহ প্রস্তুতির পর আমরা বড়দিন উৎসব করছি। প্রস্তুতির একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজ জীবনের নবায়ন ঘটানো। প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী অনুসারে 'রাস্তা সমতল' করা, অর্থাৎ জীবনের অমসৃণ, অসংলগ্ন অবস্থা ও বিচ্ছিন্ন সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসই এই সময় চালানো হয়েছে। যখন কেউ তার এই অবস্থাকে সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন আনতে সমর্থ হন, তখনই তার অন্তরে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ দেখা দেয়। সেই সময় শান্তি শুধুমাত্র একটি চিন্তক বা ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেটি হয়ে ওঠে আমাদের জীবনে বাস্তব ও সক্রিয় একজন। আর সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন দেহধারণকৃত বাণী, তিনিই হচ্ছেন শান্তিরাজ, ও গোশালায় যাবপাত্রে শায়িত আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট। ৯

যিশু বাউলের কবিতা

আনন্দ রথে খ্রিস্ট জয়ন্তী আসে

জয়-জয়ন্তীর আনন্দ রথে
ঐ আসে খ্রিস্ট জয়ন্তী খ্রিস্ট মণ্ডলীতে
আনন্দের দোলা দিয়ে,
পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে
পাপী-তাপীর অন্তর জমিনে
আশার বাণী বীজ বিকশিত হয় হৃদয় কোণে।

জয়-জয়ন্তীর আনন্দ রথে
খ্রিস্ট জয়ন্তী আহ্বান জানায়
মন পরিবর্তনের; ক্ষমার বাসরে জীবন আরম্ভে
দেয়া-নেয়ার পারস্পারিক বিনিময়ে
জয়-জয়ন্তী সবাকার হৃদয় মন্দিরে।

জয়-জয়ন্তীর আনন্দ রথে
অনুগ্রহের 'বর্ষাকাল' শুরু প্রভু যিশুর অনুগ্রহে
বিরান ভূমিতে, নতুন শষ্যকণা
উৎপাদনের তাগিদে
দিকে দিকে রব উঠে,
জীবন স্রষ্টার প্রশংসা গানে
আধ্যাত্মিক জীবন নবায়নের অকৃত্রিম
প্রচেষ্টাতে।

জয়-জয়ন্তীর আনন্দ রথে
শত-সহস্র তীর্থযাত্রী রোম অভিমুখে
পুণ্যভূমি, গির্জা-বাসিলিকা, কাটাকুম্ভে
খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাক্ষ্য বাণী পাথর,
মাটি ও গুহাতে
দেওয়াল লিখন, বাণী-কথা, চিত্র-প্রতীক
সাক্ষ্যবহন করে খ্রিস্টধর্ম
অনুরাগের স্বাক্ষরে।

জয়-জয়ন্তীর আনন্দ রথে
ভক্ত-বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক নবায়ন,
অনুতাপ কৃচ্ছতা
ত্যাগ-তিতীক্ষা, উপবাস-দানকর্মের অনুশীলনে
জীবন স্রষ্টার আশিষ লাভে ধন্য তব
মোদের জীবন
ঐশ সান্নিধ্য লাভের ধ্যান-জ্ঞানে
জয়-জয়ন্তী উৎসব সমগ্র বিশ্বের খ্রিস্ট
ভক্তদের অন্তর মন্দিরে।

বড়দিন: খ্রিস্ট জুবিলি বর্ষে আশার তীর্থ

ফাদার সুনীল রোজারিও

ভূমিকা: পোপ ফ্রান্সিস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দকে "প্রার্থনা বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এ প্রার্থনা বর্ষ হবে খ্রিস্টজন্মের ২০২৫ বছরের জুবিলি বর্ষের প্রস্তুতিসরূপ। পোপ, খ্রিস্টের সমীপে আমাদের প্রার্থনার আবেদনকে এ প্রার্থনা বর্ষে ঐকতানসঙ্গীতরূপে সমর্পণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, সবকিছুর উর্ধ্বে প্রার্থনা হলো পিতাকে তাঁর সমস্ত দানের জন্য, সুন্দর সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন। প্রার্থনা হলো, তাঁর দেওয়া দান ও সৃষ্টিকে রক্ষা করার অঙ্গীকার। প্রার্থনা হলো, "একমন একপ্রাণ" *(শিষ্য ৪:৩২)*, যার অর্থ হলো সংহতি এবং দৈনন্দিন জীবনে ভাগ করে গ্রহণ করা। একমাত্র প্রার্থনাই সম্ভব করে তোলে বিশ্বের নর-নারীকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে। প্রার্থনা হলো নিজেকে পবিত্রকরণের লক্ষ্যে একটি রাজকীয় পথ। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের খ্রিস্ট জুবিলি বর্ষের মূল বার্তা হলো "আশার তীর্থ"। দূতসংবাদ লাভের পর মারীয়া আশান্বিত হয়ে ত্বরিত গতিতে হেঁটে চললেন যুদেয়ার পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন সামনে একটা আলোকিত পথ, আত্মায় মিলনলাভের একটা হাতছানি। তাঁর কণ্ঠে ছিলো প্রার্থনার এক ঐকতানসঙ্গীত। আসন্ন জুবিলি আমাদের জীবন ও মণ্ডলীকে যেনো আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধশালী ক'রে তোলে- সেজন্যে চলুন আমরাও ত্বরিত গতিতে উঠে রাজকীয় পথে এগিয়ে চলি এবং বড়দিনের মধ্যদিয়ে জীবনে ধারণ করি খ্রিস্ট জুবিলিবর্ষের অঙ্গীকারসমূহ।

বড়দিনের শপথসমূহ: আবারো এলো বড়দিন। ক্রিস্টমাস ট্রি, সান্তাক্লজ, নানা রংয়ের বাতির ঝলক, সাজগোজ, কেনাকাটা, হরেক রকমের কেক্- পানীয়, গিফট- আরো কতো কী বড়দিনকে ঘিরে আয়োজন করা হয়। এতো কিছুর অনর্থক জোগার করতে গিয়ে চাপা পড়ে যায় বড়দিনের গভীর অর্থ। আসুন ধ্যান করি- "খ্রিস্ট জুবিলি" বর্ষে আমাদের জন্য যুগ লক্ষণের আহ্বান ও উপহারগুলো হয়ে ওঠতে পারে আশার তীর্থ। আমরা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পালন করবো "খ্রিস্ট জুবিলি" বর্ষ হিসেবে। এই খ্রিস্ট জুবিলি বর্ষ এবং আগামী দিনগুলোতে পালকীয় কাজ কী হবে- আসুন সেসবের শপথ করি।

বড়দিন ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা: খ্রিস্টের জন্ম অতর্কিতে ঘটে যাওয়া কোনো কল্প-কাহিনী নয়। তাঁর জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহন সবই শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পযর্ন্ত ঈশ্বরের যথাযথ পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত। এই পরিকল্পনা মানুষের জন্য কিন্তু মানুষ কর্তৃক নয়। আজকের বড়দিন উৎসব ঈশ্বরের সে মহত্বকেই স্মরণ করে থাকে। স্মরণ করে- সন্তানদের জন্য পিতার ভালোবাসা।

বড়দিন ঈশ্বরের বড় দান: খ্রিস্ট হলেন পৃথিবীতে মানুষের জন্য ঈশ্বরের বড় দান। খ্রিস্ট স্বর্গনিবাস ছেড়ে পৃথিবীতে এলেন জীবনের বিনিময়ে মানুষের জীবন উদ্ধার করতে। বড়দিনে আমরা মুক্তিদাতাকে স্মরণ করি, যিনি তাঁর জীবনদানের মধ্যদিয়ে মানুষকে পিতার সান্নিধ্যে স্থান করে দিয়েছেন। আজকের বড়দিন হলো খ্রিস্টের জন্মতিথি উদ্‌যাপন। প্রকৃত ঘটনা হলো, খ্রিস্ট পিতার বক্ষদেশ থেকে অনন্তকালের জন্য প্রেরিত একমাত্র ব্যক্তি। এ জন্ম অনন্তকালব্যাপী মাত্র একবার- তিনি হলেন খ্রিস্ট, ঈশ্বরের বড় দান।

বড়দিন ঈশ্বরের ভবিষ্যতবাণীর পরিপূর্ণদান: প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন, "তোমরা প্রান্তরে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত করো। মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সরল করো। প্রত্যেক উপত্যকা উচ্চীকৃত হবে, প্রত্যেক পর্বত ও উপ-পর্বত, অসমতল ভূমি হোক সমতল, সমভূমি। তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, সমস্ত মর্ত একসঙ্গে দেখবে, সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলেছেন।" বাইবেলের প্রাচীন নিয়মে ঈশ্বর তাঁর প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে বহুবার তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেছেন। ঈশ্বরই কেবলমাত্র "এক ঈশ্বর" যিনি তাঁর অঙ্গীকার লংঘন করেন না। খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী, প্রতিশ্রুতি এবং পরিপূর্ণতাদানকারি।

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন বন্ধন: ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে মানুষের এ মিলন বন্ধন গড়ে দিয়েছেন খ্রিস্টের মধ্যদিয়ে। খ্রিস্ট হলেন ইহজগত এবং পরজগতের মাঝখানের সেতুবন্ধন। যার মধ্যদিয়ে না গেলে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবো না। আমরা হলাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে "ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারি।" পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মধ্যদিয়ে আমাদের সৃষ্টির মধ্যে মিলন বন্ধনের আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক এবং শিল্পী এক- এক মিলন বন্ধন।

বড়দিন ঈশ্বরের ভালোবাসা উদ্‌যাপন: বড়দিনের প্রকৃত অর্থ হলো মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা। ঈশ্বরের মধ্যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা না থাকলে তিনি কখনোই তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার জন্য মর্তে পাঠাতেন না। তাই বড়দিন বিশ্বকে স্মরণ ক'রে দেয় যে, খ্রিস্ট সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন। সুতরাং, আমাদের তাঁর শিষ্য হিসেবে মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসতে হবে। মানুষকে ভালো না বেসে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায় না, সৃষ্টিকে ভালো না বেসে স্রষ্টাকে ভালোবাসা যায় না।।

বড়দিন- আমাকে সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ: প্রতিদিন সৃষ্টি শেষে ঈশ্বর বলেছেন, "আর দেখো সবই উত্তম হইয়াছে।" সৃষ্টি যতোই উত্তম হোক, মানুষ কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। ঈশ্বর অন্য কিছুর মতো আমাকে মুখের কথায় নয়- নিজের হাতে গড়েছেন, তাঁর প্রাণবায়ু দিয়েছেন। তারপর খ্রিস্টের আগমন মানুষকে আরো উত্তম করে পিতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আমাকে সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

বড়দিন অন্যের কাছে নিজেকে প্রকাশ: সাধু লুক, দয়ালু সামারীয়কে প্রতিবেশি প্রেমের এক উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আধমরা লোকটিকে দেখে একজন যাজক ও লেবীয় পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু জাত-পাত ভুলে এগিয়ে এলেন সামারীয় গোষ্ঠীর লোকটি। গল্পে সামারীয় লোকটি কী খ্রিস্টের প্রতীক? যিনি অন্ধ, খোড়া, পঙ্গু, পাপী লোকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আজকে বড়দিনের বার্তা- অনর্থক আয়োজন, মহামারি, অভাবী, শরণার্থী ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করছে।

বড়দিন ক্ষমাদানের আহ্বান: যিশু বলেছেন, "সাতবার নয়, সত্তরগুণ সাতবার" ক্ষমা করতে হবে। ক্রুশবিদ্ধ যিশু বলেছিলেন, "হে পিতা ওদের ক্ষমা করে দাও, ওরা কী করছে তা জানে না।" আমি ক্ষমা করলে ঈশ্বরও আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বেঁধে রাখলে ঈশ্বরও বেঁধে রাখবেন। খ্রিস্টধর্ম হলো ক্ষমার ধর্ম। আমাদের ক্ষমার

অনুশীলন শুরু হোক পরিবার থেকে।

বড়দিন শান্তি স্থাপনের আহ্বান: পোপ ৬ষ্ঠ পোপ বলেছিলেন, "শান্তি আপনার উপরও নির্ভর করে।" আমরা প্রত্যেকে শান্তির দূত হয়ে প্রেরিত হয়েছি। দুই একজনের পক্ষে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। তাই সবাই যদি যার যার অবস্থান থেকে শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসি- তাহলেই শান্তি স্থাপন সম্ভব। যিশু বলেছেন, "তোমাদের জন্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি" *(যোহন ১৪:২৭)*। এভাবে খ্রিস্ট আমাদেরও আহ্বান করেছেন- শান্তি স্থাপনের জন্যে।

বড়দিন আশার বার্তা: এ আশার বার্তা হলো- রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ-সংঘাত, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শরণার্থী সমস্যা থেকে উত্তরণের আহ্বান। যুগের লক্ষণে বড়দিনের প্রকৃত অর্থ মানুষকে আশান্বিত করে তুলবে। মানুষ খুঁজে পাবে দূতগণের কণ্ঠে আশার বাণী, "জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়। ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে।" মানুষ আশান্বিত হবে এ ভেবে যে, খ্রিস্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরি করতে এবং যারা তাঁর মুক্তি বাণীতে বিশ্বাস করবে, তাদের জন্য অনন্তকালের আশা পূরণ করতে।

বড়দিন ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার আহ্বান: জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণের মানুষ এক ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সন্তান। যিশু বলেছেন, "তুমি যদি শুধু তোমার ভাইয়ের প্রতিই করলে, তাহলে আর কীই-বা করলে।" যিশু পৃথিবীতে এসেছিলেন সব মানুষের জন্যে। আমরাও আহূত হয়েছি সবার জন্যে। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হলে আগে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে হবে। মানুষের মধ্যদিয়েই আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছাতে পারি। "ঈশ্বর সব মানুষের জন্য দিনের আলো ফুটিয়ে তোলেন।" কোনো জাতিই ছোটো নয়। কবি বলেছেন, "গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।" যিশু বলেছেন, "অন্যকে নিজের মতো ভালোবাস।" ঈশ্বর মানুষকে, মানুষ করেই সৃষ্টি করেছে- জাতি হিসেবে নয়। শুধু ধর্মের কারণে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরেছে। আজো দেখছি সেই প্রাচীন দৃশ্য, ধর্মের নামে কতো অধর্ম। ধর্মের ধ্বজা হাতে কতো রাজত্ব, কতো সাম্রাজ্য জয়। কিন্তু আজ সবই গেছে। শুধু টিকে আছে ধর্ম। কবি আরো বলেছেন, "গাহি সাম্যের গান, যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাঁধা-ব্যবধান, যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রীশ্চান।" সবাই মিলে এক মানবজাতি। ধর্ম যারা যার, শ্রদ্ধা থাকবে সবার। ধর্মের অনুসারী হওয়া আর ধর্মনিষ্ঠ হওয়া এক নয়। ধর্মকে ধারণ করতে হয় অন্তর দিয়ে। "ঈশ্বর এই সমস্ত গোপন রেখেছেন জ্ঞানীজনের কাছে আর প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষের কাছে।" ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে বুদ্ধি-যুক্তি-তর্ক দিয়ে সম্ভব নয়। লাভ করতে হবে ধর্মনিষ্ঠ

অন্তর দিয়ে। অন্তর বাহির এক করতে হবে। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। বড়দিনের প্রকৃত অর্থ হলো- মানব জগতে ঈশ্বরের ঐশরিক সম্পৃক্ততা। ঈশ্বর তাঁর পুত্র খ্রিস্টকে পৃথিবীতে শুধু কিছু আশ্চর্য কাজ করতে পাঠাননি। একজন প্রকৃত মানুষ করেই পাঠিয়েছেন- মানুষের সঙ্গে বেড়ে ওঠার জন্য, বসবাস করার জন্য। যেনো মানুষও তাঁর মধ্যে নিজেদেরে প্রতিচ্ছবি দেখতে পারে এবং তাঁর সমস্ত কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐশজনগণ হয়ে উঠতে পারে। খ্রিস্ট ছিলেন মানুষের মধ্যে মানুষেরই একজন। আমাদেরও হতে হবে সব মানুষের জন্য- সবার একজন।

বড়দিন প্রকৃতিবান্ধব হওয়ার আহ্বান: আদি পুস্তকে ঈশ্বর বলেছেন, "তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, সমুদ্রের জলরাশি ভরিয়ে তোল, পাখিরা স্থলভূমিতে বংশবৃদ্ধি করুক।" ঈশ্বরের এ নির্দেশ মানুষের প্রতি। সৃষ্টির প্রতি মানুষ সদয় না হলে ধ্বংস অনিবার্য। ঈশ্বর সৃষ্টির উপর আমাদের "প্রভুত্ব" করার দায়িত্ব দিয়েছেন। এ প্রভুত্ব হলো সৃষ্টিকে "লালন-পালন" করা। প্রকৃতির মধ্যে আরো সৃষ্টির আহ্বান, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আরো এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান। এবারের বড়দিন উৎসব হোক প্রকৃতিকে ঘিরে, প্রকৃতিকে রক্ষার অঙ্গীকার।

বড়দিন মুক্তির উপহার স্মরণ: খ্রিস্টমাস ট্রির নিচে কতো উপহার। কতো আগ্রহ এগুলো খোলার জন্য। কিন্তু আমরা কী আমাদের অন্তরের ঢাকনা খুলে দেখার চেষ্টা করেছি, ওখানে ঈশ্বরের বড় উপহার খ্রিস্ট জন্ম নিয়েছেন কী না? খ্রিস্ট যদি আমার অন্তরে জন্ম নিয়ে না থাকে তবে বৃথাই এতোসব উপহার, এতোসব আয়োজন।

বড়দিন একত্রে যাত্রা: খ্রিস্ট জুবিলি বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হোক- মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণের মধ্যদিয়ে একত্রে যাত্রা। ঈশ্বর জগতের আংশিক মুক্তি চান না। তিনি চান সবার মুক্তি- এই মুক্তিপথে একত্রে সবার যাত্রা- সহযাত্রী হওয়া।

বড়দিন খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন: আজকের বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন শুধু যিশুর জন্মতিথি পালন নয়। আমরা স্মরণ করি খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা। তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন মানুষের বিচার করার জন্য। তিনি যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন- সেই শিক্ষার আলোকেই মানুষকে বিচার করবেন। আমরা অপেক্ষায় আছি পৃথিবীর সমস্ত বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবো- সেই আশায়।

উপসংহার: পোপ ফ্রান্সিস গত ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তাঁর প্রকাশিত সর্বজনীন পত্র "Dilexit Nos" He Loved us "তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন" পত্রে বলেছেন, খ্রিস্ট মণ্ডলীতে এখন ভালোবাসার অতি প্রয়োজন। ভেঙ্গে গেছে পৃথিবীর হৃদয়। ভালোবাসা দিয়ে জোড়া লাগাতে হবে বিশ্বের ভেঙ্গে যাওয়া হৃদয়। আমাদের বাদ দিতে হবে সমাজের প্রতি মেয়াদোত্তীর্ণ ধারণা, বাদ দিতে হবে নিজের বলে সব আয়ত্বে রাখা, বেরিয়ে আসতে হবে নিজের মতামত বহাল রাখা থেকে, নানা রকমের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে হৃদয়ে আনতে হবে আনন্দ এবং তৈরি করতে হবে নবীন সমাজ- আর সবাইকে ভালোবাসতে হবে, "ভালোবাসা-সর্বজনীন ভালোবাসা"- কারণ তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা।

বড়দিন কেন খ্রিস্টানদের 'বড় উৎসব'

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

যিশুর আগমনের উদ্দেশ্য

পঁচিশে ডিসেম্বর প্রভু যিশুর জন্মদিন উপলক্ষে সারা বিশ্বজুড়ে বড়দিন উৎসব পালিত হয়। এটি খ্রিস্টানদের উৎসব হলেও পৃথিবীর সকল মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এতে সামিল হয়। খ্রিস্টের অনুসারীরা এ দিনটি মহা ধুমধাম করে উদ্‌যাপন করে থাকেন। দিনটি উপলক্ষে গির্জায় উপাসনা, খ্রিস্টমাস ট্রি সাজানো, আলোকসজ্জা, গোশালা এর মাধ্যমে যিশুর জন্মদৃশ্য প্রদর্শন, উপহার প্রদান, গান-বাজনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে আয়োজন করা হয়। তবে এ সকলই বাহ্যিক দিক। বড়দিনের আসল উদ্‌যাপন হওয়া উচিত অন্তরে, আত্মার গভীরে। তাই বড়দিন এর মানে কী এবং বড়দিনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমাদের বুঝতে হয়। বড়দিনের মূল শিক্ষা দু'টি- প্রথমত: এটি একটি মতবাদ বা বিশ্বাসের ঘটনা; এবং দ্বিতীয়ত: এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যিশু এসেছিলেন এদেন উদ্যানে আদি পিতা-মাতার মাধ্যমে আমাদের যে মৃত্যু হয়েছিল, তা পুনরুদ্ধার করতে; তিনি এসেছিলেন ঈশ্বরের দয়া, প্রজ্ঞা, ন্যায্যতা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দিতে, তাঁর জীবন অনুকরণ করতে ও তাঁকে অনুসরণ করতে। মানবজাতির মুক্তির কাজটি যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। তাঁর পবিত্র আত্মত্যাগের গুণে, তাঁর জখমগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের পাপের জখম থেকে সুস্থতা লাভ করেছি।

সাধু যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচার অনুসারে খ্রিস্ট ছিলেন ঈশ্বরের বাণী যিনি মানুষের দেহ ধারণ করলেন। তিনি পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি হলেন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, পিতার কাছে যাওয়ার পথ হওয়ার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা জানাতে এসেছিলেন। সুসমাচারগুলো হলো খ্রিস্টের শিক্ষা এবং সেগুলো আমাদেরকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। আমাদের পাপের কারণে যিশু অসহ্য যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেছেন। তিনি আমাদের পাপের কারণে এই শাস্তি মেনে নিয়েছেন, কারণ তিনি আমাদের এমন ভালোবাসেন যে আমাদের পক্ষে সেই ভালোবাসা বোঝা খুবই কঠিন। যিশু এসেছিলেন আমাদের জন্য উত্তম মেষপালক হতে। পিতার মহিমার জন্য স্বর্গ, পৃথিবী ও পৃথিবীর নীচে অবস্থিত সকল হাঁটু নতজানু হবে, সকল জিহ্বা খ্রিস্টকে প্রভু বলে স্বীকার করবে।

প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে মানবজাতির ত্রাণকর্তা যিশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। পৃথিবীতে তাঁর আগমন এমনই মহাগুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল যে, আধুনিক যুগের মানুষ তাঁর জন্মবছর থেকে দিন-পঞ্জিকা শুরু করেছিল। বড়দিন হচ্ছে একটি holy day অর্থাৎ 'পবিত্র দিন', কিন্তু কালক্রমে তা হয়ে উঠেছে holiday অর্থাৎ 'ছুটির দিন', অর্থাৎ অবসর যাপনের দিন। বড়দিন মৌসুমে বিশেষভাবে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন উপহার হিসাবে। আমরা দয়াময় ঈশ্বরকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে এবং অন্যদের ভালোবাসা ও সেবা করার মাধ্যমে বড়দিন উদ্‌যাপন করতে পারি। আমাদের জীবনে যিশু যেন প্রতিদিন জন্ম নিতে পারেন সেই প্রস্তুতি আমাদের মন-অন্তরে নেয়া দরকার; তবেই আমরা অর্থপূর্ণভাবে যিশুর জন্মতিথি পালন করতে পারব।

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় গত বড়দিনের বাণীতে বলেছিলেন- এ জগতের সম্রাট যখন দেশের অধিবাসী গণনা করেন, ঈশ্বর সেখানে অতি সঙ্গোপনে প্রবেশ করেন। যারা ক্ষমতাবান তারা ইতিহাসে বিখ্যাত একজন হওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইতিহাসের রাজা খ্রিস্ট ক্ষুদ্র হওয়ার পথ বেছে নিলেন। কোন ক্ষমতাবান তাঁর আগমন লক্ষ্য করল না বা তাঁর আবির্ভাব টেরই পেল না, মাত্র কয়েকজন রাখাল ছাড়া যারা সমাজের প্রান্তিক মানুষ হিসাবে গণ্য। এ পৃথিবীর লোকগণনা অতিমাত্রায় মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, যেমন- জাগতিক ক্ষমতা, শক্তি, নাম, যশ, খ্যাতি যার সব কিছুই সংখ্যা, ফলাফল, সাফল্য ইত্যাদির দ্বারা পরিমাপ করা হয়; একটি পৃথিবী যা কৃতিত্ব অর্জনের ভিতরেই আবিষ্ট থাকে। তথাপি এই লোকগণনা যিশুর আগমনের পথনির্দেশও করে, যিনি রক্তমাংসে পরিণত হয়ে আমাদের খোঁজ করেন। তিনি সংসাধনের 'দেবতা/ঈশ্বর' নন্, তিনি দেহধারণের ঈশ্বর। তিনি উপর থেকে ক্ষমতা দেখিয়ে অন্যায্যতা দূর করেন না, কিন্তু নীচের থেকে ভালোবাসা দেখিয়ে তা করেন। তিনি অসীম ক্ষমতাধর হিসাবে নিজেকে দেখিয়ে দৃশ্যে অবতীর্ণ হন না, কিন্তু নিজেকে নীচু করে আমাদের জীবনে বাস করতে আসেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা ভঙ্গুরতাগুলো এড়িয়ে যান না, কিন্তু সেগুলি তিনি নিজের করে নেন। যিশুর জন্মতিথিতে আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি- আমরা কোন্ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, দেহধারণের ঈশ্বরকে নাকি কৃতিত্ব অর্জনের দেবতা/ঈশ্বরকে? কারণ আমাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের মত করে বড়দিন উদ্‌যাপনের একটি ঝুঁকি থেকে যায়, যেখানে ঈশ্বরকে আকাশের মধ্যে একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি মনে করা হয়, এমন একটি শক্তি যার মধ্যে রয়েছে ক্ষমতা, জাগতিক সাফল্য এবং ভোগবাদের পৌত্তলিকতা। পক্ষান্তরে আমাদের ঈশ্বর কোন যাদুদণ্ড ব্যবহার করেন না যার দ্বারা নিমেষেই সমস্যার সমাধান করে দিবেন; বা একটি বোতাম চেপে আমাদের রক্ষা করবেন। বরং তিনি আমাদেরকে ভালোবেসে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেন, তাঁর কাছে টেনে নেন এবং আমাদের মাধ্যমে জগতের পরিত্রাণ সাধন করতে চান।

পোপ মহোদয় আরো বলেছেন- সর্বশক্তিমান

ঈশ্বর হিসাবে বা গণনাকার্যের উর্ধ্বে, তথাপি তিনি মানবদেহ ধারণ করে আমাদের ইতিহাসের অংশ হলেন। তিনি মানুষকে এমন সম্মানিত করলেন যে, তাঁকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা পর্যন্ত দিলেন। তিনি এমন এক ঈশ্বর যিনি আমাদের ব্যথা-বেদনা এক নিমিষে নাই করে দেন না, কিন্তু তিনি তাঁর রূপান্তর ঘটান; তিনি আমাদের জীবনের সমস্যাবলী নিমিষেই অপসারণ করেন না, কিন্তু তিনি এমন এক আশা দেন যা সমস্যার চেয়ে অনেক বড়। আমাদের জীবনকে সুন্দর করার জন্য অসীম ঈশ্বর সসীম হলেন মানবের মাঝে জন্ম নিয়ে। সাধু যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারে ১ম অধ্যায় ১৪ পদে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি রক্তমাংসের মানুষ হলেন, মানুষের ভঙ্গুর দেহ গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেন? কারণ তিনি আমাদের ভালোবাসেন, তিনি আমাদের যত্ন নেন, তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে আমাদেরকে মূল্যবান মনে করেন। তিনি লোকগণনার ইতিহাস পরিবর্তন করেছেন, তোমরা কোন সংখ্যা নও, তোমরা এক এক জন উজ্জ্বল উপস্থিতি, এক একটি মুখমণ্ডল। তোমাদের নাম তাঁর হৃদয়ে লেখা রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই তবে দেখি আমাদের অপূর্ণতা, জগতের বিচার করা ও ক্ষমা না করার প্রবণতা, তাহলে আমরা বড়দিন উদ্‌যাপন করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। তবে একটি কথা-ই মনে রাখতে হবে যা আমাদের জন্য মহা সান্ত্বনার বাণী, তা হলো- তিনি স্বর্গ থেকে মর্তে এলেন শুধু আমাদের জন্য, আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য। তিনি জন্ম নিলেন আমাদের জীবনকে আলোকিত করার জন্য। এটা বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হয়, তবে এটা সত্যি যে ঈশ্বরের চোখ আমাদের জন্য ভালোবাসায় সর্বদা উদ্ভাসিত থাকে। আসুন আমরা শিশু যিশুর সাথে চুপচাপ কথা বলি, যেমনভাবে বেথলেহেমের গোশালায় মারীয়া, যোসেফ, রাখালগণ ও পণ্ডিতগণ চুপচাপ শিশু যিশুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছিলেন এবং আরাধনা করেছিলেন।

তাহলে বড়দিনের আসল মানে কী?

যিশুর জন্ম ইতিহাসের এক মহাঘটনা যা পৃথিবীর ইতিহাসে একবারই ঘটেছে; এবং আর কখনো ঘটবে না। তিনি স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে আসলেন, কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে মানুষের রূপ ধারণ করলেন, মানব জাতির মুক্তির কাজ শুরু করার জন্য। তিনি নিজের লোকদের মাঝে আবির্ভূত হলেন, কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করলেন না। কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করলেন, ত্রাণকর্তা হিসাবে স্বীকার করলেন, তাদেরকে তিনি পরম পিতার সন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন। যিশুর জন্মের হাজার বছর পূর্বে প্রবক্তা ইসাইয়া যিশুর জন্মের বিষয়ে এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। "দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিবে ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল *(আমাদের সহিত ঈশ্বর)* রাখিবে।" *(যিশাইয় ৭ঃ১৪)*।

আমরা যারা খ্রিস্টের নামে দীক্ষস্নাত হয়ে তাঁকে ত্রাণকর্তা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছি, তারা স্বয়ং ঈশ্বর যে দেহধারণ করেছেন, তা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ ঈশ্বর নিরাকার হলেও তিনি পুত্র-ঈশ্বরকে এ পৃথিবীতে পাঠালেন মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে, যাতে তিনি পাপী মানুষকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারেন। এই বিশ্বাসই আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই আমরা বেঁচে থাকি। অন্যদিকে যিশুর জন্ম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সাধু যোহন যেমন বলেন- আমরা নিজ চোখে দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি। যেমন- যিশু পানির উপর দিয়ে হেঁটে আসছেন, পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছেন, পর্বতে যিশুর উপদেশ, বা মারা যাওয়ার পর যিশু আবার বেঁচে উঠেছেন ইত্যাদি শিষ্যদের সামনে বাস্তবে ঘটেছে। সেজন্যই তাঁরা এভাবে সাক্ষ্য দিতে পেরেছেন। মঙ্গলসমাচার হলো সেই বাণী যা প্রমাণ করে যে, যিশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, এমনভাবে জীবন-যাপন করেছেন যেভাবে আমাদের করা উচিত, এমনভাবে মারা গেলেন যেভাবে আমাদের মৃত্যুবরণ করা উচিত। তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন। এক কথায় এটা বলা যায় যে, দেহধারণের বিশ্বাস ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

বড়দিন উৎসব আমরা অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে উদ্‌যাপন করে থাকি। তবে শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান করেই যেন আমরা নিশ্চিন্ত না থাকি; আমরা যেন আত্মিকভাবে নতুন জন্ম নিতে পারি সেই চেষ্টা অবিরাম করতে হবে। যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়, তাদেরকে ঈশ্বর সর্বদা ক্ষমা করেন। আপনি যদি কারো প্রতি অন্যায় করে থাকেন এবং তা আপনি উপলব্ধি করতে পারেন, তবে ঈশ্বর অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করবেন। নতুন মানুষ হওয়ার জন্য এই বড়দিনে আমরা আমাদের খারাপ আচরণ পরিবর্তন করব। আমাদের মুখের ভাষা আমাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বেশীরভাগ দিক প্রকাশ করে। তাই খারাপ ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস থাকলে তা ত্যাগ করে ভাল ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস করব। খ্রিস্টের শিষ্য হিসাবে আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ খুবই দরকার; আর তা করতে হলে গরীব, দুঃখী, অভাবী বা সমস্যাগ্রস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের সেবা করার চেষ্টা করতে হবে। শুধু টাকার পিছনে না দৌড়ে সহজ-সরল জীবনযাপন করার অভ্যাস করতে হবে। জীবনের জন্য সৎভাবে টাকা অর্জন করা দরকার, তবে তা যেন আসক্তিতে পরিণত না হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখুন এবং তাঁর কাছে আপনার প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রার্থনা করুন। যারা তাঁর উপর নির্ভর করে ও প্রার্থনা করে, তাদের উপর ঈশ্বরের কৃপা-আশীর্বাদ সর্বদা বর্ষিত হয়।

'বড়দিন' ভালোবাসার উৎসব

বড়দিন আসলে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অবিশ্বাস্য ভালোবাসার উদ্‌যাপন। যিশুর জন্ম মানুষের জন্য একটি 'শুভ সংবাদ' যা আমরা উদ্‌যাপন করি। তাই সারা বিশ্বব্যাপী এ উপলক্ষে আনন্দপূর্ণ উদ্‌যাপন লক্ষ্য করা যায়। কারণ খ্রিস্ট ঈশ্বরের এক অনন্য উপহার মানবজাতির জন্য। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই অসীম দয়া ও ভালোবাসা উপলব্ধি করা-ই আমাদের আসল বড়দিন উদ্‌যাপন। আর ভালোবাসার উদ্‌যাপন তো সবচেয়ে বড় উৎসবই বটে।

শুভ বড়দিন

নোয়েল গমেজ

এলো এলো বড়দিন,
যিশু জন্ম নিলো ছোট্ট গোশালায়,
দলে দলে মিলে পুঁজিবো তাহারে।
ধনী-গরীবের নেই ভেদাভেদ,
গরীবের বেশে রাজারূপে জন্ম নিলে যিনি,
এসো সবাই তাঁহার চরণতলে,
জয়ধ্বনি করি।
রাখালের বাঁশির সুরে,
আজ চারিদিক সুমধুর রবে।
আকাশের সেই তারাটিও,
মিট্‌মিট্ করে জ্বলবে।
খুশীর জোয়ার আজ,
সমগ্র খ্রিস্টভক্তজনের।
সকলে মিলে একসাথে বলো-
শুভ বড়দিন, শুভ বড়দিন ॥

জগৎজ্যোতি প্রভু যিশুর আত্মকথা

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

আমি জগতের আলো। কেননা আমি তো আলো হয়েই এই জগতে এসেছি। পরম পিতার দয়ায় ঊষার সেই আলো ঊর্ধ্ব থেকে তোমাদের সামনে এসে দেখা দিয়েছি। আমি এসেছি তাদেরই আলো দিতে, যারা পড়ে আছে অন্ধকারে, আছে মৃত্যুর ছায়ায়; আর তোমাদের প্রত্যেকের পদক্ষেপ চালিত করতে প্রতিশ্রুত মহাশান্তির পথে। আদিতে আমি ছিলাম বাণী। আমি ছিলাম ঈশ্বরের সঙ্গে। আমিই ছিলাম ঈশ্বর। আমার দ্বারাই সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব পেয়েছিল এবং যা কিছু অস্তিত্ব পেয়েছিল, তার কোন কিছুই আমাকে ছাড়া অস্তিত্ব পায়নি। আমার মধ্যে ছিল জীবন। আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো; অন্ধকারেই সেই আলোর উদ্ভাস; আর অন্ধকার আমাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। জগত সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে পরম পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমি অভিন্ন স্বরূপ। এই আমার সম্বন্ধেই প্রাক্তন সন্ধিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবক্তাগণ ভবিষ্যৎবাণী ক'রে গেছেন। সময় পূর্ণ হলে মানব মুক্তি পরিকল্পনায় পরম পিতা আমাকে এই জগতে প্রেরণ করেন।

আমি মানব মুক্তির ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি সবকিছু বেশ ভালো মতোই জানি। আমি শৈশবে আমার প্রিয় মা-বাবার কাছ থেকে আমার মানব জীবনের গল্প বারংবার শুনেছি। তারা দু'জন খুব আনন্দ সহকারে আমার কাছে তাদের জীবনের সমস্ত গল্প ব'লে গেছেন। আমার মা বাবা খুবই ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। যাইহোক মূল কথায় আসি- বলছিলাম সময় পূর্ণ হলে আমার পরম পিতা এই জগতে আমাকে প্রেরণ করেন এক কুমারী মেয়ের মধ্যস্থতায়। কেননা পরম পিতা চেয়েছেন মানুষের মাঝে আমাকে যেতে হলে, আকারে প্রকারে তোমাদের মতো মানুষ হয়েই যেতে হবে। যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, তোমাদের আপন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই। যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো যে, ঈশ্বর অতি দূরের ঈশ্বর নয় বরং তিনি তোমাদের অতি কাছের ঈশ্বর। আমি এক নতুন সন্ধি হয়ে এই জগতে মানুষের মধ্যে এসেছি। আমার আগমনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে প্রাক্তন সন্ধি; আর সত্যও সার্থক হয়ে উঠেছে মহাপ্রাণ প্রবক্তাদের সকল ভবিষ্যৎ বাণী।

একদিন আমার পরম পিতা গালিলেয়া প্রদেশের নাজারেথ গ্রামের এক কুমারী মেয়ের কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলকে পাঠান আমার জন্ম ও দেহধারণের সংবাদ অবহিত করার জন্য। সেই কুমারী মেয়েটির নাম ছিল মারীয়া। তিনিই আমার গর্ভধারিণী ও প্রেমময়ী মা। তিনি ছিলেন নাজারেথ গ্রামের এক সাধারণ ধর্মনিষ্ঠ ইহুদি পরিবারের মেয়ে। আমার মা খুব ছোট থেকেই সবকিছুতে পরম পিতার ইচ্ছা মেনে জীবন যাপন করতেন। সবসময় ভাবতেন কিভাবে তাঁর আপন ঈশ্বর প্রভুকে প্রীত করা যায়। তিনি তাঁর প্রার্থনা, ধর্মপালন ও পবিত্রতার প্রতি সর্বদা এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। মা সর্বদা পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করে প্রার্থনা করতেন। সারা গ্রামে এক সাধারণ ও ধর্মব্রতী মেয়ে হিসেবে আমার মায়ের বেশ সুনাম ছিলো। আর তাছাড়া শৈশব থেকেই তিনি গ্রামের মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। প্রয়োজনের সময়ে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিতেন। সর্বোপরি, আমার মা তাঁর কথা, কাজ ও ব্যবহার দ্বারা অতি সহজেই অন্যের মন জয় ক'রে নিতে পারতেন।

নাজারেথ গ্রামেরই যোসেফ নামের এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাথে আমার মায়ের তখন বাগ্‌বিবাহ হয়েছিল। আমার পরম পিতার পরে এই ধর্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বরভীরু মানুষটিই আমার বাবা। এই জগতে আমার দেহধারণে তার কোন জৈবিক ভূমিকা ছিল না ঠিকই কিন্তু তিনি তার বাগদত্তা বধু অর্থাৎ আমার মাকে বিয়ে করে এবং আমার সম্পূর্ণ ভার নিয়ে তিনি ইহুদি আইনের চোখে আমাকে আপন বংশের ছেলের মতোই মানুষ করেছেন। আর তাই সবাই জানতো তিনিই আমার বাবা আর আমি তার আপন সন্তান। মানুষ আমাকে চিনতো দাউদ-সন্তান, ছুঁতোরের ছেলে, যোসেফের ছেলে ইত্যাদি পরিচয়ে। তবে মানুষ যাই জানুক বা ভাবুক না কেন, আমার এই বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভক্তি ও ভালোবাসা আমার কোন অংশে কম ছিল না। এই জগতে আমার মা বাবা আমার পরম পিতার অনুগ্রহে আমাকে মানুষ করেছেন। একজন ধর্মনিষ্ঠ,কর্মঠ, প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল মানুষ হওয়ার সকল গুণাবলী আমি আমার পরিবার তথা মা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি।

বলছিলাম আমার মায়ের কাছে স্বর্গের মহাদূত কর্তৃক আমার জন্ম-সংবাদ দানের কথা। মা বাবার বাগ-বিবাহের নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়ায় আমার মা তখনও বাবার ঘরে যাননি। এমনই এক সময়ে মহাদূত গাব্রিয়েল আমার মায়ের কাছে আবির্ভূত হয়ে পরম পিতার সমস্ত পরিকল্পনা তাকে জানিয়েছিলেন। মায়ের মুখে শুনেছি, মা তখন সবেমাত্র সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় মনোনিবেশ করেছেন। নিজের ঘরে মায়ের সামনে ছোট্ট বেদীতে উন্মুক্ত পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ, পাশেই জ্বলছিল টিমটিমে তেলের প্রদীপ। মা হাত-জোড় ক'রে নতজানু হয়ে মন স্থির করছিলেন। মায়ের দু'চোখ ছিল বন্ধ। ঠিক এমন সময়ে মায়ের কাছে মহাদূত গাব্রিয়েল আবির্ভূত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলেছিলেন, প্রণাম মারীয়া! নিজের নামের সাথে এমন সম্বোধন শুনে মা যারপর নাই অবাক হয়ে সামনে তাকিয়ে দেখলেন পুরো ঘরটি এক উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোয় ঝলমল করছে। আর বিচ্ছুরিত হচ্ছে সম্মোহিত গোলাপ ফুলের অপূর্ব ঘ্রাণ। সামনে যাকে ঘিরে সেই আলো ও সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, তিনি স্বর্গদূত গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের আপন বার্তাবাহক আর তিনি সর্বদা ঈশ্বরের কাছে কাছেই থাকেন। মহাদূত গাব্রিয়েলের এমনতর কথা শুনে আমার মা বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। তখন মহাদূত মাকে অভয় দিয়ে একে একে সবকিছু অবহিত করলেন।

তিনি আমার মাকে বলেছিলেন, ভয় করো না বরং আনন্দ করো! কেননা তুমি পরম আশিসধন্যা! ঈশ্বর তোমাকে তাঁর পুত্রের জননীরূপেই মনোনীত করেছেন। আর সেই জন্য তিনি তোমার অন্তরকে অম্লান পবিত্রতায় মণ্ডিত করে রেখেছেন। আর শোন, প্রভুর আত্মিক শক্তি ও প্রেরণা সর্বদা তোমার সঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকবে। মহাদূতের কথা শুনে মা আরো গভীরভাবে বিচলিত হলেন। তিনি তখন তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন, স্বর্গদূতের এমন কথাবার্তার অর্থই বা কি? কেননা তিনি তো নাজারেথ গ্রামের সাধারণ একটি মেয়ে। গর্ববোধ করার মতো তেমন কিছুই নেই তার। মাকে বিচলিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত দেখে মহাদূত তখন বলেছিলেন, তবে শোন, তুমি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছো। মারীয়া, তুমি পরম পবিত্র আত্মার শক্তিতে গর্ভধারণ ক'রে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। তার নাম রাখবে যিশু। তিনি মহান ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন। সেই সাথে তিনি হবেন সকল জাতির সকল মানুষেরই রাজা; অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব। এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য আমার মা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলেন। কেননা তিনি ভাবতেও পারেননি যে তার

জীবনেই এমনটা ঘটবে। তবে মহাদূতের কথা শুনে মা যখন উপলব্ধি করলেন, ঈশ্বর হয়তো এমনই চান; তখন তিনি সর্বান্তকরণে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন, আমি প্রভুর সাধারণ এক সেবিকা। তাই তিনি যা চান, আমার জীবনে তাই হোক।

মহাদূতকে সম্মতি দেবার পরও নানা অজানা ভীতি আমার মায়ের অন্তরকে বারবার ঘিরে ধরছিল। কেননা মা বাবার বাগ-বিবাহের সময়কাল তখনও তো পূর্ণ হয়নি। একজন স্ত্রী যেভাবে তার স্বামীর সংস্পর্শে যান, মা তো তখনও সেভাবে আমার বাবার সংস্পর্শে যাননি। আর তাছাড়া মায়ের মনে ভয় ছিল; আমার বাবা হয়তো মাকে পরিত্যাগ করবে। তখন সমাজের মানুষেরা আমার মাকে অভিযুক্ত করবে; সমাজ ও ধর্মের বিধান অনুযায়ী হয়তোবা পাথর ছুঁড়ে মারবে। নয়তো আমার মাকে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে হবে। আমার বাবা যোসেফ ছিলেন ইস্রায়েলের দাউদ বংশের একজন মানুষ। পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রী। অতি সাধারণ ও সাদামাটা জীবন তিনি যাপন করতেন। তিনি তখন আমার মাকে ঘরে নিয়ে রীতিমত সংসারী হওয়ার চিন্তা করছিলেন। আর এর-ই মধ্যে তিনি জানতে পারলেন তার বাগদত্তা বধু সন্তান-সম্ভবা অর্থাৎ আমি আমার মায়ের গর্ভে। এই সংবাদটি আমার বাবার কাছে ছিল একটি অঘটনের মতো। কেননা বাবা আমার মাকে একজন ধার্মিকা ও পবিত্রা মেয়ে বলেই জানতেন, ভালোবাসতেন। আসলে আমার মা তো তেমনই একজন মেয়ে।

আমার বাবা তখন কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তবে শেষমেষ বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি আমার মায়ের গর্ভবতী হওয়ার দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে মাকে ত্যাগ করবেন। তাতে আমার বাবার অসম্মান হবে ঠিকই কিন্তু আমার মা কলঙ্কিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং সমাজের মানুষ তখন আমার মায়ের প্রতি সমব্যথী হবে। এর মধ্য দিয়ে রক্ষা পাবো আমার মা এবং আমি। এমনই ছিলো আমার বাবার পরিকল্পনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বাবা যখন এই সিদ্ধান্তে অনড়, ঠিক তখনই রাতে মহাদূত গাব্রিয়েল আমার বাবাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে আমার মায়ের সাথে ঘটে যাওয়া সমস্ত সত্য ঘটনা অভিহিত করলেন। তাতে আমার বাবাও রীতিমতো বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, তিনি যৎসামান্য একজন কাঠমিস্ত্রী আর তার জীবনেই কিনা এমন সব অভিনব ঘটনা ঘটতে চলেছে! তবে বাবা এই ভেবে খুশি হলেন যে, পরম পিতার মহা পরিকল্পনায় তিনিও সরাসরি যুক্ত। অবশেষে পরম পিতার ইচ্ছা মেনে নিয়ে বাবা আমার মাকে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনলেন। আমি সেই সময়টাতে যেহেতু মায়ের গর্ভে, তাই বাবা সারাক্ষণ মায়ের সেবাতেই ব্যস্ত থাকতেন।

এরই মাঝে একদিন রোম-সম্রাট অগাস্টাসের আদেশ জারি হলো, সারা দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো লোকগণনা করা হবে। আর এই লোকগণনায় অংশ নেবার জন্য নিজ নিজ জন্মস্থানে যেতে হবে। আমার বাবা ছিলেন তার পূর্বপুরুষ রাজা দাউদের জন্মস্থান যুদেয়ার বেথলেহেম নগরের মানুষ। তখন মাতৃগর্ভ থেকে আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়টা খুবই কাছাকাছি। এমতাবস্থায় বাবা আমার মাকে নিয়ে চললেন বেথলেহেমে। মায়ের ঐ অবস্থায় তার পক্ষে পাহাড়ি রাস্তা হাঁটা কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। তাই বাবা একটা গাধা জোগাড় করে ওর পিঠে মাকে বসিয়ে বেথলেহেমের পথে রওনা হলেন কিন্তু তাতেও মায়ের খুব বেশি কষ্ট হচ্ছিল। বেথলেহেম শহরটি নাজারেথ শহর থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে! অনেক কষ্টে বেথলেহেম পৌঁছে মা বাবা রাত্রি যাপনের জন্য কোথাও কোন ঘর পেলেন না। কারণ ইতোমধ্যে পুরো বেথলেহেম নগর লোকে লোকারণ্য। আর তাছাড়া আমার বাবার পরিচিতও কেউ সেখানে ছিল না। থাকলে মা বাবার জন্য বেশ উপকার হতো।

এমনই সময় সেখানে আমার মায়ের প্রসব বেদনা উঠলো। চরম প্রসব বেদনায় মা তখন কাঁদতে লাগলেন। বুঝলাম মা অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। মা তিলে তিলে যেন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছেন। একজন মানুষ একসঙ্গে ৪৫ ইউনিট ব্যথা সহ্য করতে পারে। আর একজন মা সন্তান প্রসবের সময় ৫৭ ইউনিটের বেশি ব্যথা সহ্য করেন। এই ব্যথা ২০টি হাড় একসাথে ভেঙে যাওয়ার সমান। সেই সংগ্রামের মুহূর্তে মা মরণযন্ত্রণা ভোগ করলেও আমার কিছুই করার ছিল না। আমাকে যে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হতেই হবে। এইতো পরম পিতার বিধান! এইতো প্রকৃতির বিধান! সেই বিধান অমোঘ সত্য। আমি সেই বিধানের কাছে সম্পূর্ণ পরাধীন। ঐদিকে রাত্রি যাপনের জন্য কোন ঘর আমার মা বাবার কপালে জুটছিল না! শেষমেষ অনেক হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয়ের পর আমার বাবা এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়াল ঘরের এক কোণায় ঠাঁই পেলেন। সেই গোয়াল ঘরেই গরু ও ঘোড়ার ঘাস ও খড়-বিচালি খাবার যাবপাত্রে আমার মা আমাকে প্রসব করলেন। যাবপাত্রটি ছিলো বড্ড খসখসে ও উস্কু-খস্কু। তাই আমার বাবা সেখানে নিজের গায়ের মোটা চাদরটি বিছিয়ে দিয়েছিলেন। গোয়াল ঘরের বাইরের জ্বলন্ত মশালটি বাবা এনে মা ও আমার পাশে রেখেছিলেন।

বাবা যখন আমাকে ও মাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখনই একদল রাখাল ছেলে আমাদের সেই গোয়াল ঘরে এসে উপস্থিত হলো। তাদের পরনে ছিলো ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়। রাখাল ছেলেগুলো ঘরে ঢুকেই জোরে জোরে বলতে লাগলো, জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহিত মানবের অন্তরে!! হঠাৎ এমনতর কথার অর্থ জানতে চাইলে তারা অতি আনন্দের সাথে বাবাকে জানালো, তারা স্বর্গের দূত বাহিনীর কণ্ঠে এই কথা শুনেছে। তাছাড়া একজন স্বর্গদূত তাদের এই কথাও বলেছে যে, দাউদের নগর বেথলেহেমে নাকি তাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছে। তিনি সেই প্রতিশ্রুত খ্রিস্ট; স্বয়ং প্রভু! স্বর্গদূতের কথায় বেথলেহেমের লোকালয়ে এসে তারা আমাদের খুঁজে বের করলো। আমাকে দেখে সেই হত-দরিদ্র ও সমাজের উপেক্ষিত রাখাল ছেলেগুলোর চোখে-মুখে ছিলো মহা আনন্দের ঝিলিক। তারা প্রত্যেকেই আমাকে উপহার দিলো তাদের মেষের পাল হতে আনা উত্তম মেষ ও কয়েকটি মেষশাবক। তারা সঙ্গে ক'রে কয়েকটি রুটিও এনেছিলো। তারা অতিশয় আগ্রহ নিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। আমাকে স্পর্শ করে প্রণাম করলো। কয়েকজন আমার পাশে বসে রইলো। কয়েকজন আবার বাবা মাকে টুকিটাকি সাহায্যও করছিল। সকাল অবধি তারা আমাদের সাথেই সেই গোয়াল ঘরে ছিলো।

সকাল হতে না হতেই তারা দৌঁড়ে বেরিয়ে গেল আর আনন্দে গান করতে করতে এবাড়ি ওবাড়ি আমার জন্মের কথা বলছিলো। কিছুদিন পর দামী পোশাক ও দামী দামী অলংকার পরিহিত তিনজন ব্যক্তি আমাদের দেখতে এসেছিলেন। তারা তিনজনও আমাদের খুঁজে বের করেছিলেন। অবশ্য তাদের বেলায় আমাকে খুঁজে পেতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। কেননা তারা তিনজন ছিলেন প্রাচ্যদেশ থেকে আমার সন্ধানে আসা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। তারা তিনজন ছিলেন অনিহুদী। আসলে আকাশে একটি নতুন ও রহস্যময় তারকা দেখে আমার বিষয়ে এই তিনজন পণ্ডিত জানতে পেরেছিলেন। এই নতুন ও রহস্যময় তারকাটি তাদের তিনজনের আগে আগে এসে আমরা যে বাড়িতে তখন ছিলাম সেই বাড়ির উপর এসে থেমেছিলো। তখন তারা তিনজন এসে আমাকে নবজাতক রাজা হিসেবে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে রাজার মত প্রাপ্য উপহারই আমাকে দিয়েছিলেন। আমার প্রতি তাদের উপহারের মধ্যে ছিল স্বর্ণ, ধূপ-ধুনো ও গন্ধ নির্যাস। সেই সাথে তারা আমার বাবাকে জানালেন যে, রাজা হেরোদও নাকি আমার সন্ধান করছেন। আমার মা বাবা কিন্তু তাতে বেশ রোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন।

কেননা আমাদের তেমন কিছুই নেই; অতি সাধারণ মানুষ আমরা। অথচ সেই আমাদেরই কাছে আমাকেই কিনা দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে নানা ধরণের মানুষ ছুটে আসছে! এমনকি পণ্ডিত ও রাজা-বাদশাও আমাদের দেখার জন্য ব্যাকুল প্রায়! বিষয়টি সত্যিই আমার মা বাবার কাছে উপভোগ্য ছিল।

এদিকে এই যা কিছু ঘটছে তা সবই আমার মা তার হৃদয়ে গেঁথে রাখছিলেন। আমি আমার জীবনের এই গল্পগুলো মায়ের মুখেই বেশি শুনেছি। এরপর আমাকে কেন্দ্র করে আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তবে সেই সবগুলোর মধ্যেই আমার মা বাবা পরম পিতার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা উপলব্ধি করেছিলেন। আমি আমার মা বাবার পরিবারে এসেছিলাম ব'লে যে সবকিছুই তাদের জন্য খুব সহজ ছিল তা কিন্তু নয়! অনেক চড়াই-উৎরাই তাদেরকে পাড়ি দিতে হয়েছে! আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তাদেরকে বারবার স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে হয়েছে। তবে এই যা কিছু মা বাবা ও আমার জীবনে ঘটেছে, সবই কিন্তু তোমাদের কথা ভেবে। পরম পিতার মানব মুক্তি পরিকল্পনায় আমি তোমাদেরই মতো মানুষ হয়ে এই জগতে এসেছি; যাতে তোমরা আমার কাছে যেতে পারো। আমি মর্তে নেমে এসেছি, যাতে তোমরা স্বর্গে উন্নীত হতে পারো। আমি স্বর্গ-মর্তের সৃষ্টিকর্তা ও রাজা হওয়া সত্ত্বেও একবারে সর্বনিম্ন দীনতা গ্রহণ করেছি, যাতে তোমরা ধনী হতে পারো। আমি আকারে-প্রকারে ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও মানবদেহ ধারণ করেছি, যাতে তোমরা খুব কাছ থেকে ঈশ্বরকে চিনতে ও বুঝতে পারো। তাই জীবনে সবকিছুর পরে তোমরা আমার নামে আনন্দ করো, গৌবান্বিত হও! আমি আবার বলছি, তোমরা আমাকে নিয়ে, আমার জীবন ও বাণী নিয়ে অবিরাম আনন্দ করো! কেননা আমি এসেছি যাতে তোমরা জীবন পাও এবং পুরোপুরি ভাবেই তা পাও। তোমরা একে অন্যকে অকৃত্রিম ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধে রাখো। আর সবর্দা আমার দেখানো পথেই চলো। তোমাদের শান্তি হোক!!!

শোক সংবাদ

প্রয়াত ডঃ এলিয়াস করুন বড়ুয়া

**"আঁখির আড়ালে চলে গেছো তবু,
রয়েছো হৃদয় জুড়ে"**

প্রিয় বাবা, তুমি হঠাৎ করে এভাবে আমাদের মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছো, আমি সেই ক্ষণ বা মুহূর্ত উপলব্ধি করার বা কোনকিছু বুঝে উঠার কোন সুযোগও পেলাম না। প্রায় ৮ বছর পূর্বে এক শীতের ভোরে আমার মা, মারীয়া মায়া গমেজ আমাকে ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে পরলোকে চলে গেছে। এখন তুমিও আমাকে একা রেখে এই পৃথিবী থেকে চলে গেলে, এই কষ্ট আমি কিভাবে সইবো। গত বৃহস্পতিবার ১২/১২/২০২৪ ইং তারিখে রাত ২:০৫ মি: আমার বাবা হঠাৎ করেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে ন্যাশনাল হাসপাতালে I.C.U তে মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর । আমার বাবার অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার খ্রীষ্টযাগে ও নিরামিষ ভাঙ্গার সময় খ্রীষ্টযাগে উপস্থিত সকল পরমশ্রদ্ধেয় ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও খ্রিষ্টভক্তগণ প্রত্যেকে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাবা তোমার আত্মার কল্যাণ ও শান্তি কামনায় পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আমার বাবা ও মায়ের জন্য সবাই প্রার্থনা করবেন।

তোমারই আদরের কন্যা,
রমনা তেরেজা ক্যাথি বড়ুয়া

তোমাদেরই স্মরণে

**পৃথিবীতে সব কিছু শেষ হয়, বসন্ত গান মুকুলিত প্রাণ ক্ষনকাল রয়,
তারপর স্মৃতিটুকু ব্যথাময়।**

প্রয়াত জেরাল্ড হিপু গমেজ
জন্ম: ৭ জুন, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত মারীয়া মায়া গমেজ
জন্ম: ৩১ জানুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত পিউস গমেজ ও প্রয়াত রমনা প্রীতি গমেজ

জন্ম: ২০ জুলাই ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ

জন্ম: ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রভু যিশুর জন্মোৎসবে তাঁর চরণে এই নিবেদন রাখি তিনি যেন তোমাদের আত্মার চিরশান্তি প্রদান করেন

পরিবারের পক্ষে
এলেন, এলিথিয়া, এঞ্জেলা, এনথিয়া, ক্যাথি ও পিউস এলড্রিন

বড়দিন : বিশ্বে এবং আমরা

স্যামুয়েল পালমা

ভূমিকার পূর্বেই স্পেনের ক্যাটালনিয়া অঞ্চলের ছোট্ট শিশুদের একটা ক্রিসমাস উদ্‌যাপনের কথা বলি যা বহির্বিশ্বের অন্যান্য সব বয়সী শিশুদের অনেক মজার মজার উদ্‌যাপনের মধ্যে একটি মাত্র। প্রায় সব উন্নত খ্রিস্টান দেশগুলোতেই বড়দিনের জাঁকজমক শুরু হয় ৮ ডিসেম্বর মা-মারীয়ার পবিত্র গর্ভধারণ বা অমলোদ্ভবা পর্ব থেকে। ঐদিনই 'ক্যাগা টিও' (Caga Tio বা Tio de Nadal) নামে ছোট শিশুদের উদ্‌যাপনের জন্য একটা অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। শুরুটা এমন, একটা দেড়-দুই ফুট গাছের গুঁড়ির সামনে দু'টো পা লাগিয়ে একটু উঁচু করা হয় এবং গুঁড়ির মুখে হাসি মুখের ছবি এঁকে পিছনের অর্ধেকটা একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয় গাঁ গরম রাখার জন্য এবং এই দিনেই মুখের সামনে ২/১ গ্রাস খাবার দেয়া হয়। এভাবে সাজানো থাকে আর ঠিক বড়দিনের পূর্বের সন্ধ্যায় বা একটু বিকেলে বা বড়দিন এর সকালে সেই গুঁড়ি শিশুদের জন্য উপহার বা বকশিস ছাড়ে। শিশুরা সেখানে বিশেষ গান গায় 'Caga Tio Song' (ইন্টারনেটে দেখা যাবে) এবং গুঁড়ির গায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করে যেন গুঁড়িটার তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং মিষ্টি, বাদাম এবং শুকনা ফল ফেলে। শিশুরা যে গানটি গায়-

"ছাড় ছাড়, এবার বের কর

কাঠ-বাদাম আর চিনা বাদামের মিষ্টি বাইর কর।

পোনা মাছ ছাইরো না

ঐগুলো এতো বেশী সল্টি-টেষ্টি না।

গুড়-বাদাম ছাড়, চিনি বাদাম ছাড় ওগুলোই ভাল।

উদ্‌যাপনের দিক থেকে সাড়া বিশ্বে বড়দিন অনেক বড়, অনেক জাঁকজমকপূর্ণ, অনেক আনন্দের এটা সবারই জানা। প্রতিটি মহাদেশেই কাথলিক ধর্মাবলম্বী দেশগুলো বড়দিনকে ঘিরে যেমন ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের চর্চা করে যাচ্ছে, তেমনি আবার ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরী করছে নতুন ইভেন্ট, অনুষ্ঠান ও আয়োজন। কিন্তু অপর দিকে আমার দৃষ্টিতে বড়দিনের আয়োজন, আনন্দ, সজ্জা ও আড়ম্বরতা এর সবই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্রমেই ম্লান হয়েছে এবং হচ্ছে। সেইসাথে বড়দিন চর্চা পালনের ভিন্নতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড়দিনের পুরানো রীতিগুলো কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাবে স্বাভাবিক, যাচ্ছেও কিন্তু ক্রমে আধুনিক রীতি বা চর্চাগুলোতে প্রবেশ করানোর জন্য কোন দিক নির্দেশক দায়িত্ব নিচ্ছে না। সেই প্রেক্ষিতে নতুন প্রজন্ম যেমন একটা অন্ধকারে পতিত হচ্ছে তেমনি ফল হিসাবে আসছে তাদের নিজস্ব বদলানো পথে আনন্দ উপভোগের পদ্ধতি। তারপর যা হবার তা-ই। মিশনারিজ বিদেশী ফাদারগণ আগে বেশ কিছু কাথলিক চর্চার পরিচিতি ঘটালেও কিন্তু এ কাজে দেশী ফাদারগণ বা বর্তমান মণ্ডলী আজ নীরব প্রায়।

ছোটবেলা থেকে আমি বরাবরই বড়দিনে করণীয় সম্পর্কে একটা অন্ধকারে ছিলাম, এখনও আছি। আজকের প্রজন্মকে কি জানানো হচ্ছে? বড়দিনের এতবড় জাঁকজমক অনুষ্ঠানকে ঘিরে কাথলিকদের ধারাবাহিক চর্চাগুলো কি বা কেমন! আমি তো এটাই জানি না যে বড়দিনের মূল ভোজ বা পার্টিটা কখন! এই অজানা এবং চর্চা না করা আমাদের ঠেলে দিচ্ছে পিছনে বা অন্য পথে। বড়দিনের ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার উপলব্ধি, সামাজিক আনন্দ যেমন ম্লান হচ্ছে, তেমনি এর আনন্দ সম্পর্কে দিন দিন আমরা হতাশাগ্রস্থ হচ্ছি। তাহলে আমরা কি করবো, বড়দিনের মূল চর্চাগুলো কি, কিভাবে জানবো! আসুন তাহলে ঘুরে আসি মহাদেশ থেকে মহাদেশে বিশ্বের শতবর্ষের কাথলিক দেশগুলো থেকে। কি চর্চা করছে তারা, কি আনুষ্ঠানিকতায় তারা অভ্যস্ত সেগুলো একটু দেখে আসি।

একটু জেনে নেয়া ভাল, শিশু যিশুর এ জন্ম উৎসবকে ঘিরে কোন শব্দ, বিষয় বা আয়োজনগুলো বিশ্বমণ্ডলীতে অধিক গুরুত্ব পায়;

ক) শিশুরা- বড়দিন উদ্‌যাপনের মধ্যমনি থাকে শিশুরা। নানাভাবে তাদের নানারকম উপহার, চকলেট, খেলনা, তাদের জন্য মার্কেটিং, প্রমোদ ভ্রমণ সবই থাকে শিশুদের জন্য, তাদের কেন্দ্র করে।

খ) ক্রিসমাস ট্রি- বিশ্বের সকল দেশেই ক্রিসমাস ট্রি স্থাপন, সাজানো এবং একে ঘিরে নানাবিধ আনন্দপূর্ণ ঘটনা এই ক্রিসমাস ট্রি'কে অনেক সম্মানিত স্থানে রাখে। প্রতি বাড়িতে তো বটেই, রাস্তাঘাট, মার্কেট, পার্ক সকল স্থানের সকল ক্রিসমাস ট্রি-ই এই উৎসবে থাকে সজ্জিত। এর নিচেই শিশুরা পায় তাদের প্রিয় উপহারগুলো।

গ) ক্রিসমাস ইভ- (বড়দিনের পূর্বের সন্ধ্যা যা ঢাকাইয়া ভাষায় কচুদার সন্ধ্যা) এই ক্রিসমাস ইভ- এ থাকে সকলের জন্য অনেক অনেক আনন্দ, অনেক অনুষ্ঠানের সমাহার। ক্রিসমাস ট্রি'র নিচে শিশু যিশুকে স্থাপন, শিশুদের জুতা বা মোজায় উপহার রাখা, সান্তা-ক্লজের উপহার বিতরণ, পরিবারের সবাইকে নিয়ে বড়দিনের প্রধান ভোজ/পার্টি, শিশুসহ সবাইকে নিয়ে রাতের খ্রিস্টযাগে যোগদানসহ অনেক অনেক অনুষ্ঠান এ সন্ধ্যার জন্য সাজানো।

ঘ) সান্তা ক্লজ- উত্তর গোলার্ধ থেকে বরফের উপর টানা গাড়ি, বল্গা হরিণদের মাধ্যমে টেনে আনা, সাদা দাড়ি আর লাল টুপিওয়ালা, সেই সান্তা ক্লজ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই 'বড়দিন পূর্ব সন্ধ্যায়' শিশুদের অনেক অনেক উপহার প্রদান করে। তাই শিশুদের কাছে সান্তা ক্লজ চরিত্রটি অনেক পছন্দের ও আনন্দের।

ঙ) সাজানো বা ডেকোরেশন- পরিবারে গোশালা, ক্রিসমাস ট্রি, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, রেষ্টুরেন্ট, পর্যটন, মোমবাতি সাজানো, বৈদ্যুতিক বাতির সজ্জা-নানাবিধ সজ্জা মূলত ডিসেম্বরের শুরুতেই কাথলিক দেশ তথা খ্রিস্টান দেশগুলোতে খুবই প্রাধান্য পায়। উৎসবের পাশাপাশি ব্যবসায়িক দিকটিও এখানে জড়িত থাকে।

চ) জুতা-মোজা- ক্রিসমাসকে ঘিরে জুতা-মোজা বিশেষত শিশুদের জুতা-মোজা অনেক সম্মানের স্থান পায়। এই জুতা-মোজার মাধ্যমে তারা সান্তা ক্লজের কাছ থেকে বা শিশু যিশুর কাছ থেকে উপহার পায়। কখনও কখনও তা বিশেষ মোজাও থাকে। তাই শিশুরা 'বড়দিন পূর্ব সন্ধ্যায়' ঘুমানোর পূর্বে তাদের জুতা ভাল করে পরিষ্কার করে ক্রিসমাস ট্রি'র নিচে বা কোন কোন দেশে বারান্দায় রাখে যেন রাতে সান্তা ক্লজ তাতে উপহারগুলো দিয়ে যায়।

ছ) অগ্নি প্রজ্বলন- 'বড়দিন পূর্ব সন্ধ্যায়' প্রায় প্রতিটি কাথলিক দেশেই পাড়ায় পাড়ায় শুকনো গাছ, লতা-পাতা পুড়িয়ে বড় আগুন জ্বালিয়ে একসাথে আনন্দ করা হয়। কখনও তা হয় গির্জার আশেপাশে। অগ্নি প্রজ্বলন অনুষ্ঠান শেষ করে মিশার কাজ শুরু করা হয়।

জ) ইপিফানি ডে- Epiphany Day বা তিন রাজার সাক্ষাতের দিনই হচ্ছে খ্রিস্টান দেশগুলোর বড়দিনের দীর্ঘ অনুষ্ঠান সূচির শেষ অনুষ্ঠান। এই ইপিফানি ডে পালিত হয় জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখ। যেদিন স্মরণ ও পালন করা হয় পূর্ব দেশের তিন রাজার

আগমনের ইতিহাস। এদিনই শিশু যিশুর কাছে এসেছিলেন ১) ইথিওপিয়ার রাজা গেসপার যিনি দিয়েছিলেন ধূপ, ২) আরব দেশের রাজা মেলখিয়র যিনি দিয়েছিলেন সোনা আর ৩) মিশরের রাজা বেলথেজার, যিনি উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন গন্ধ রস। সেদিন সকল খ্রিস্টান দেশে তিন রাজাকে নিয়ে অবিকল আমাদের ১ বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার মত হয় শহর থেকে শহরে। এরই মাধ্যমে শেষ হয় বড়দিন সিজনের/মৌসুমের।

এছাড়া কীর্তন বা তারা উত্তোলন, কেক ও মিষ্টি উৎসব, উপহার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ব্যান্ড শো, বিভিন্ন ধরণের খেলা, ইত্যাদি বিষয়গুলো বড়দিনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

২য় অংশ

মূলত আমরা যেমনটি জানি, সুদূর ইউরোপ মহাদেশের পর্তুগাল দেশ থেকে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা আমাদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন সেই ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে। বর্তমান সময়ে দেখা যায় তারা আজ কিভাবে বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করছে। শুভ বড়দিন'কে পর্তুগালে বলে 'ফেলিস নাতাল' (Feliz Natal)। তাঁরা ক্রিসমাস ইভ'কে খুবই গুরুত্ব দেয়। এই সন্ধ্যায়ই সান্তা ক্লজ ক্রিসমাস ট্রি'র নিচে শিশুদের জুতার ভিতর উপহার রেখে যায়। সন্ধ্যায় সবাই ক্রিসমাস পার্টি করে রাতের মিশা যায়। বলিষ্ঠ যুবকেরা আগেই লাকড়ির বোঝা জোগার করে চার্চের পাশে রাখে যাতে তা দিয়ে মিসার পূর্বে বড় আগুন জ্বালায় যা বড়দিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। তবে এটা আজ এলাকাতে প্রচলিত আছে। শীতে যিশুর পা গরম রাখাই এই আগুন জ্বালানোর কৃষ্টি। মিশা থেকে এসেই সান্তা ক্লজ এর দেয়া উপহার সকালে খোলা হয়। খাবারের মধ্যে থাকে ক্রিসমাস্-এর কমন খাবার টারকি এছাড়া থাকে আরো দামি দামি খাবার। 'বলো রাই' বা 'রাজ পিঠা' মাঝখানে রেখে শোবার রুমে সাজানো হয় বড় খাবারের টেবিল, অন্যান্য উন্নত দেশের মতই, সেখানে থাকে ঐতিহ্যবাহী খাবারসহ পিঠা, কেক, কুকিজ, কেন্ডি, বাদাম আর দামি দামি শুকনা খাবার। প্রতি বাড়িতেই ক্রিসমাস ট্রি সাজানো কমন রেওয়াজ। 'বলো রাই'-এর ভিতর থাকে ছোট দামি উপহার। যার ভাগে সেটা পরে সে সেইবার সৌভাগ্যবান। আরও থাকে একটা বড় শিম। যে প্রথমে সেই শিম দেখে পরবর্তী বছরে 'বলো রাই' তৈরীর দায়িত্ব তার। দুপুরের খাওয়ার পূর্বে শোবার ঘরের টেবিল কেউ ধরে না। সবাই দুপুরে একসাথে বসে আর বড়দিন লাঞ্চ খায়।

ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেমন ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সে দেখা যায় বড়দিনের চর্চাগুলো কী। এসকল দেশে সাজানো শুরু হয়ে যায় ডিসেম্বরের একেবারে শুরুতেই। তবে ৮ ডিসেম্বর মা-মারীয়ার অমলোদ্ভবা বা পবিত্র গর্ভধারণ পর্ব থেকেই বড়দিনের জাঁক্‌জমকতা শুরু হয়ে যায়। চারিদিকে থাকে সাজ-সাজ রব আর উৎসব-উৎসব আমেজ। আবার ফ্রান্সসহ অনেক দেশে শিশুভক্ত সাধু নিকোলাসের পর্ব ৬ ডিসেম্বর থেকেই বড়দিনের আমেজ শুরু হয়। এই সাধু নিকোলাসই বড়দিনের সান্তা ক্লজ।

বড়দিনকে ইউরোপের দেশগুলো দেখে মূলত পরিবারের মধ্যে সুখ, আনন্দ, পারিবারিক ঐক্য এসবের সুবর্ণ সময় হিসাবে। বিনোদনে তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। স্পেন, ফ্রান্সসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে যদিও ছেলে-মেয়েরা রেওয়াজ অনুসারে সান্তা ক্লজকে চিঠি লেখে, কিন্তু ইতালিতে ছেলে-মেয়েরা চিঠি লেখে তাদের বাবা-মাকে, তাদের ভালোবাসাকে, তাদের কাজকে সমর্থন করে এবং সাধুবাদ জানিয়ে। সব চিঠিই তারা পূর্ব সন্ধ্যায় ক্রিসমাস ট্রি'র নিচে রাখে। মিশার পূর্বে খাবার খেয়ে তারা সেই চিঠিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ে।

খাবারের রেওয়াজে অর্থাৎ ক্রিসমাসের মূল যে পার্টি তা সকল দেশই করে রাতের মিশার পূর্বে, ব্যতিক্রম শুধু ফ্রান্স। তারা এই পার্টি করে রাতের মিশা থেকে এসে, গভীর রাতে। পার্টিতে থাকে টারকি, মোরগ রোষ্ট, থাকে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিশেষ খাবারগুলো যেমন কেক এবং মিষ্টি থাকে ডেজার্ট হিসাবে।

স্পেনে জাতীয় পর্যায়ে 'স্পেনিস ক্রিসমাস লটারী' উৎসবের মাধ্যমে বড়দিনের উদ্‌যাপনের আনন্দ যা শুরু হয় ২২ ডিসেম্বর। টিভিতে লাইভ, বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লটারী প্রচারিত হয় তারকা খচিত জমজমাট গান বাজনার মাধ্যমে। আর প্রতিটি পরিবার তথা ব্যক্তি লটারী ধ'রে টিভির সামনে বসে, দেখতে কে বা কারা নির্বাচিত হবে সে বছরের ভাগ্যবান ব্যক্তি হিসাবে পুরষ্কার প্রাপ্ত হয়।

এখানকার শিশুরা অনেক অনেক উপহার পায়। বড়দিন পূর্ব সন্ধ্যায়, যে সন্ধ্যায় তারা শোবার পূর্বে তাদের জুতা পরিষ্কার করে ক্রিসমাস ট্রি'র নীচে রাখে এবং সকালে তারা লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠে দেখার জন্য যে সান্তা ক্লজ তাদের জন্য কি উপহার দিয়েছে। তবে বড়দিনের চেয়ে বেশী উপহার পায় তারা ইপিফানি ডে'তে। জানুয়ারি ৬ তারিখ, যে দিনটিতে পালিত হয় তিন পণ্ডিতের সাক্ষাতের দিন হিসাবে, যা তারা দেখে তিন রাজার আগমন হিসাবে, যেমনটি আগে বলেছি। ৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায়ও ছেলে-মেয়েরা তাদের জুতা পরিষ্কার করে খোলা বারান্দায় রাখে। ছেলে-মেয়েরা সেই রাজাদের কাছে তাদের উপহারের কথা চিঠির মাধ্যমে লিখে তাদের জুতার ভিতর রাখে। রাজাদের আহারের জন্য রেখে দেয় এক গ্লাস দুধ, কিছু বাদাম ও ১টা কমলা। সাথে রাজার বহনকারী উটের জন্য রাখে ১ বালতি পানি।

ফ্রান্স ও ইতালিতে বড়দিনের দিনটা কাটে খুবই নীরবতায়, পরিবারকে নিয়ে কোন প্রার্থনায়, লম্বা সময় দুপুরের আহারে এভাবেই। ক্যারল বা কীর্তন হয় রাতের মিসার পর আর বড়দিনের পরদিন থেকে নতুন বছর পর্যন্ত। নতুন বছরটি তারা বিশেষত যুবক-যুবতীরা পালন করে অনেক আনন্দে যা গুরুত্ব পায় বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে, এবার পরিবারের সঙ্গে নয়।

বড়দিন উৎসবের আনন্দের মধ্যে থাকে ২৮ ডিসেম্বরও। এটা তাদের কাছে 'হলি ইনোসেন্টস্ ডে' বাংলা বললে 'পবিত্র / নিরীহ বা সরলদের দিবস' যা তারা পালন করে 'এপ্রিল ফুল' বা 'ঠকানোর দিন' হিসাবে। যিশুকে মারতে গিয়ে নিষ্ঠুর হেরোদের শিশু হত্যা স্মরণে এই দিনটি উৎপত্তি।

এবার দেখা যাক উত্তর আমেরিকার কাথলিকগণ কি রেওয়াজে পালন করছেন বড়দিন উৎসব। কানাডাতে ক্রিসমাস ইভ হিসাবে ২৪ তারিখ, বড়দিন হিসাবে ২৫ ও বড়দিনকে কেন্দ্র করে 'বক্সি ডে' হিসাবে ২৬ তারিখ, এই ৩দিন সরকারি ছুটি। রাস্তা, ব্যবসা কেন্দ্র থাকে প্রচণ্ড রকমের সাজে। ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও এখানে উপহার বিনিময় করে; কাপড়, বাদ্যযন্ত্র, ব্যবহার্য দ্রব্য বা মদও থাকে উপহার বিনিময়ে। পার্টি হয় পূর্ব রাত্রিতে মিসার আগে। টারকি ছাড়াও স্পেশাল সস, সবজি সালাদ, পুডিং থাকে প্রধান আইটেম হিসাবে। সান্তা ক্লজই শিশুদের উপহার বিতরণ করে। বড়দিনে ঐতিহ্যবাহী সান্তা ক্লজ শোভাযাত্রা হয় যেখানে শিশুদের প্রাধান্য থাকে। তবে ২৬ ডিসেম্বর থাকে বছরের সবচেয়ে বড় শপিং দিবস। মূলত ইপিফানি ডে, ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলতে থাকে বড়দিন উৎসব। আর আমেরিকাতে সবচে' বেশী আলোকসজ্জা হয় নিউইয়র্ক শহরে। তবে বিভিন্ন শহরে সান্তা ক্লজের সাজ এবং বিশেষত বড়দিন পূর্ব সন্ধ্যায় কাগজের ঠোঙ্গার ভিতর মোমবাতি দিয়ে আলোক সজ্জাও বেশ প্রচলিত। এই সন্ধ্যায়ই মিসিসিপি নদীর পাড়ে আগুন জ্বালানো হয়। অর্থাৎ অগ্নি উৎসব বেশ প্রচলিত। এখানে তুষারে সান্তা ক্লজ, বল্গা হরিণ সাজানোরও রেওয়াজ আছে।

খাওয়ার মধ্যে টারকি, শূকর, হাঁস রোষ্টসহ কডিফিস (একজাতীয় চিংড়ি) ও সাত মাছের তরকারি খাদ্য তালিকায় বেশ প্রচলিত। মঙ্গল শোভাযাত্রার মত বাঁশ-বেতের মুখোশ পরিহিত বিশাল শোভাযাত্রারও রেওয়াজ

আছে। ক্রিসমাসে সাজানো, রাতের মিশা, সান্তা ক্লজ, শিশুদের উপহার প্রদান- সবই প্রচলিত ও জাঁকজমক অনুষ্ঠানের অংশ। মেক্সিকোতে ৯ রাতে দলবেঁধে লোকেরা বাড়ি বাড়ির দরজায় আঘাত করে এবং কিছু সময় কাটায়, এই স্মরণে, যে যোসেফ-মেরী যিশুর জন্মস্থান খুঁজতে রাতের বেলা দরজায় দরজায় ঘুরেছিল।

৩য় অংশ

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও পেরুতে দেখে আসি, কি রেওয়াজ পালন করছে তারা; 'পাপাই নোয়েলই' (সান্তা ক্লজ) ব্রাজিলের শিশুদের জন্য উপহার নিয়ে আসে। এছাড়া সন্ধ্যায় ফ্যামিলি পার্টি, রাতে মিশা 'মিশা ডো গালো' বা মধ্যরাতের মিশা, ক্রিসমাস ট্রি'র সাজ, বাহিরে সজ্জা, সবই এই মহাদেশেও ইউরোপীয় ধাঁচে চলে। খাওয়ায়ও টারকি, শূকর, সবজি, পানীয়, বড়দিনে বিশেষ আয়োজন থাকে। তবে অধিকতর কাথলিক দেশ আর্জেন্টিনাতে ক্রিসমাস-এ অধিকতর সাজানো থাকে, সাদা-নীল-সবুজ রঙের ক্রিসমাস ট্রি সাজানো, আকাশে মধ্য রাতে প্রচুর ফানুষ উড়ানোসহ অধিকতর আনন্দ ও খাওয়া-দাওয়ায় বড়দিন পালিত হয়। আর অগ্নি উৎসবও বেশ প্রচলিত।

আফ্রিকা মহাদেশ দেখতে গিয়ে যদি দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলি তবে ইউরোপিয়ান ধাচে প্রায় একই কৃষ্টি তারা পালন করে। ক্রিসমাস ট্রি সাজানো, শিশুদের জুতা পরিষ্কার করে ক্রিসমাস ট্রি'র নিচে রেখে রাতে ঘুমিয়ে পরা আর জুতার মধ্যে সান্তা ক্লজের উপহার প্রদান, রাতের মিশার পূর্বে ক্রিসমাস পার্টি সবই একই নিয়মেই চলে। তাছাড়া বড়দিনের দিন কীর্তন, ঘুরে বেড়ানো, আত্মীয় বাড়ি যাতায়াত সবই হয় একই ধাচে। নতুন বছর পালন আর ৬ জানুয়ারি ইপিফানি ডে পালনও তাদের রেওয়াজ। তবে জেনে রাখা যায়, নামিবিয়াতে কাঁটা গাছের ঝোপা দিয়ে ক্রিসমাস ট্রি সাজানো হয়। ৬ ডিসেম্বরের আগেই চারিদিকে সাজানো শেষ হয়ে যায়। একটা রেওয়াজ আছে, ৬ ডিসেম্বর সব বাতির সুইচ অন রাখতে হবে এবং সেদিন সব শিশুদের শহরের চারদিকে ঘুরিয়ে 'সাজ' দেখিয়ে আনতে হবে। তবে জাম্বিয়াতে বড়দিন'টা পুরোই চার্চকে ঘিরে। বড়দিনের দু'তিন দিন পূর্বে যুবক-যুবতিরা সেবামূলক কাজের জন্য কীর্তন গায় আর কাছের রাস্তা-ঘাট, দোকানগুলোতে যায়। বড়দিনের দিন শিশুরা উপহার নিয়ে গির্জায় যায় সুবিধা বঞ্চিত ও পথ-শিশুদের দিতে। প্রচলিত আছে, সব শিশুরা বড়দিনের মিশার পর একটা বাড়িতে আর সব বড়রা আর একটা বাড়িতে যাবে, সেখানে দুপুরের আহার করবে আর আনন্দ করবে।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে বড়দিন পালিত হয় ইউরোপের ধাচেই। তবে একটু ব্যতিক্রম হলো, তাদের দেশে সান্তা ক্লজকে বহন করে তাদের দেশের জাতীয় প্রাণী ক্যাঙ্গারু।

এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশ ফিলিপিন্সে ক্রিসমাস পালন হয় একটু ব্যতিক্রমভাবেই। সেখানে ক্রিসমাস ক্যারল শুরু হয়ে যায় সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকেই। আর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য শুরু হয় ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ আট দিনের নভেনা শুরুর দিন থেকে। সাজানোতে তারাও অনেক এগিয়ে। ক্রিসমাস ট্রি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট বাতি সজ্জা, রাস্তায় সান্তা ক্লজ সাজানো, সবই হয়। ২৪ তারিখটা পালিত হয় মধ্যরাতের মিশাকে গুরুত্ব দিয়ে। সন্ধ্যারাতের ভোজে থাকে টারকি, মুরগী, শূকর, পাস্তা, সালাদ আর বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন। নতুন বছরও পালন করে খুবই জাঁকজমকের সাথে। ৩১ ডিসেম্বর শেষ ১২ সেকেন্ডে ১২টি আঙ্গুর খেয়ে পরবর্তী বছরের ১২ মাসের সুখ-সৌভাগ্য নিশ্চিত করে যা ইউরোপের সব দেশেই বিশ্বাস করে। আর বড়দিনের আমেজ শেষ হয় ইপিফানি ডে' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে। তবে বড়দিনকে কেন্দ্র করে ফিলিপিন্সে মানুষ সবচেয়ে বড় ছুটি উপভোগ করে।

এবার দেখা যাক, প্রচুর খ্রিস্টান পর্যটক শহর যিশুর জন্মস্থান পবিত্র নগরী বেথলেহেমে বড়দিন পালনে কি প্রথা বা রীতি প্রচলিত। সব মতের-পথের খ্রিস্টানদের কেন্দ্রই পবিত্র নগরী বেথলেহেম, আর কাথলিক, প্রটেষ্টান্ট, গ্রীক, অর্থডক্স, ইথিওপিয়ানস্, আর্মেনিয়ানস্ এবং অন্যান্য মতের খ্রিস্টানগণ প্রত্যেকে নিজেদের মত করে বিভিন্ন দিনে বড়দিন পালন করে, তাই বড়দিন মৌসুম হয় অনেক লম্বা। সবাই কিন্তু একই দিন ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন করে না। আবার পুণ্য নগরী, তাই এসময় পুণ্য দ্রব্যের মার্কেটগুলো হয় বেশ জম-জমাট। তবে সব কিছুর উপরে মানুষের মধ্যে যে পবিত্র ভাব বা সৃষ্ট পরিবেশ, তাতে সত্যিই পবিত্র নগরীর মর্যাদা বিদ্যমান থাকে এবং তা প্রমাণিত হয়। আর সব মতের খ্রিস্টানগণ সেই সম্মান রক্ষা করে।

ইস্রায়েলে একটা কথা প্রচলিত আছে, "জেরুশালেম হচ্ছে তিন বড়দিনের শহর" (the city of Three Christmases) কারণ রোমান কাথলিক এবং প্রটেষ্টান্টগণ এখানে বড়দিন পালন করে ২৫ ডিসেম্বর, অর্থডক্সগণ পালন করে ৬ জানুয়ারি আর আর্মেনিয়ানগণ বড়দিন পালন করে ১৮ জানুয়ারি। নাজারেথে ২৪ ডিসেম্বর পালিত হয় এক জনাকীর্ণ শোভাযাত্রা যেখানে প্রায় ৩০ হাজার খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত থাকেন। অগ্নি অনুষ্ঠান এখানে একটা জাঁকজমক ও রাষ্ট্রীয় রীতি। সান্তা, ক্রিসমাস ট্রি খুবই একটা প্রচলিত প্রথা। আনন্দের সংবাদ এটাই, ইস্রায়েলের পবিত্র স্থানগুলোতে ব্যাপকভাবে মুসলিমদের উপস্থিতি থাকলেও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষায় তারা সর্বদাই সহযোগীতা পূর্ণ।

এবার যদি আমার দেশের চর্চায় যাই, তাতে আমি ক্রমেই হতাশা অনুভব করি। আমার নিজ গ্রামগুলোতে আগের অর্থাৎ ৯০-এর দশকের চেয়ে সাজ-সজ্জা ৯০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে বলে আমার ধারণা। বড়দিনকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক কোন চর্চা বা অনুষ্ঠানও লক্ষণীয় নয়। আমাদের সন্তানদের চর্চার জন্য কোন রেওয়াজ কি আমরা রেখে যেতে পারছি? তাদের সুস্থ বিনোদনের জন্য, জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্মল আনন্দের জন্য কিছু বিষয় নির্ধারণের এখনই সময়। শিশুদের কাছে বড়দিনের গল্পগুলো বলার রেওয়াজ জীবিত করা দরকার। মাণ্ডলীকভাবে বা সামাজিকভাবে হলেও শিশু-যুবক তথা খ্রিস্টভক্তদের জন্য বেছে নেয়া দরকার খ্রিস্টান বিশ্বে চলমান আনন্দ ও বিনোদনপূর্ণ চর্চাগুলো। চর্চাগুলো এমন হতে পারে কিনা, একটা প্রস্তাবনা;

- আগমনকালের / ডিসেম্বরের শুরু থেকেই বাড়ি-ঘর সজ্জিত করণ
- আগমনকাল থেকেই বাড়িতে ক্রিসমাস তারা উত্তোলন এবং ক্রিসমাস ট্রি সাজানো
- বড়দিন পূর্ব নয় দিন প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে রাতে সমবেতভাবে মিলিত হওয়া
- ক্রিসমাস ইভ-এ শিশুদের জুতার ভিতর উপহার এবং প্রচুর উপহার বিতরণের রেওয়াজ তৈরী করা
- ক্রিসমাস ইভ এ মিশার পূর্বে জাঁকজমক বড়দিনের ভোজ / পার্টিতে পারিবারিকভাবে একত্র হওয়া
- গ্রাম বা পাড়া ভিত্তিক বড় অগ্নি প্রজ্বলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- সবাইকে নিয়ে রাতের খ্রিস্টযাগে যোগদান করা
- রাতে মিশার পর কীর্তনের নির্মল আনন্দে সমবেত অংশগ্রহণ করা
- বড়দিনে সকলে একসাথে বাড়ি বাড়ি কীর্তনে অংশগ্রহণ করা
- জাঁকজমকের সঙ্গে নতুন বছর পালন করা এবং
- বড়দিনের মৌসুমের শেষ উৎসব হিসাবে শোভাযাত্রার মাধ্যমে ইপিফানি ডে' উদ্‌যাপন করা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ফাদার অরুন রোজারিও, ও.এম.আই

যিশুর আগমন, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও অস্থির পৃথিবী

তেরেজা সোমা ডি' কস্তা (শ্রীলঙ্কা)

ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে, নিজের নিঃশ্বাস দিয়ে বহু যত্নে যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, সেই মানুষ শয়তানের প্রলোভনে পড়ল। আদম হবার পাপের ফলে মানুষের মৃত্যু যখন অবধারিত, ঈশ্বর সেই মৃত্যু থেকে মানুষকে জীবন দিতে তার একমাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন। ক্রুশে লজ্জাজনক মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে যিশু মৃত্যুকে পরাজিত করে আমাদের নব জীবনের দ্বার খুলে দিলেন। আমাদের মুক্ত করলেন পাপের দাসত্ব থেকে।

যিশুর আগমনের ২০২৪ বছর পরও কি আমরা পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছি?

বর্তমান বিশ্বের দিকে যদি তাকাই সমগ্র পৃথিবী আজ অশান্ত, অস্থির। শুধুমাত্র দেশে দেশে কিংবা রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের যুদ্ধই নয়, এখন যুদ্ধ হয় এক পরিবারে সাথে আরেক পরিবারের, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের, বাবার সাথে মায়ের, সন্তানের সাথে পিতা-মাতার। টিভি, রেডিও কিংবা যে কোন সোশ্যাল মিডিয়াতে খবর মানেই হচ্ছে যুদ্ধ, ধ্বংস, মৃত্যু, খুন, অশান্তি, হানাহানি, মারামারি, পরকীয়া, বিচ্ছেদ, নোংরামি যা সমাজকে দিনদিন কুলষিত করছে, অশান্ত করে তুলছে।

কেন এই অশান্তি, এই যুদ্ধ?

সভ্যতার আঁচ যখন মানুষের গায়ে লাগেনি, মানুষ যখন গরু বা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বিভিন্নস্থানে ঘুরে বেড়াতো, শিশুরা মাঠে-ঘাটে হেসেখেলে বেড়াত, তখন জ্বালানী নিয়ে এক দেশের সাথে আরেক দেশের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব ছিল না, মহাকাশ জয়ের নেশা ছিল না, ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করে দেশে দেশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল না, ক্ষমতার অপব্যবহার ছিল না। ছিল না মৃত্যুর মিছিল, ধ্বংসযজ্ঞ, এতো হাহাকার।

মানব সমাজ যতই সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে অপরাধ প্রবণতা এবং অপরাধের ধরণ ততই বেড়ে চলছে। অনেক বিশেষজ্ঞগণ এই পরিস্থিতির জন্য বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির লড়াইকে দায়ী করছেন। বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ ও উন্নত করার জন্য সৃষ্টি হলেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সমগ্র মানব সমাজের উপর।

ভিজুয়্যাল ক্যাপিটালিস্ট নামের একটি সংস্থা ভয়াবহ এক তথ্য জানিয়েছে, বিশ্বে প্রতিদিন এমন অনেক প্রজন্ম বেড়ে উঠছে যাদের জন্ম হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে। এসব শিশুরা যে মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে তা আগামী বিশ্বকেও শান্তি দেবে না।

গত ১৬ অক্টোবর আরটিভি তাদের অনলাইন সংস্করণে প্রকাশ করছে যে, সম্প্রতি সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন শিশু তাদের শৈশব হারিয়ে ফেলেছে। যার প্রধান কারণ প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও এর অপব্যবহার। প্রযুক্তির দৌলতে শিশুরা অল্প বয়সে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, শিশুসুলভ খেলাধুলা না করে চার দেয়ালে বন্দি হচ্ছে। তাদের আচরণের ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে গেছে, শিশুরা হারিয়ে ফেলেছে চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা।

অনেক গবেষকের মতে, ইন্টারনেট আবিষ্কারের আগে মানুষের মধ্যে পরকীয়ার মাত্রা এত বেশি ছিল না। এই পরকীয়ার কারণে পরিবারে বাড়ছে সন্দেহ, মনোমালিন্য, কমছে একতা, পারিবারিক বন্ধন। কত সাজানো সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, কত সন্তান হচ্ছে অভিভাবক হারা। অনলাইনে প্রতারিত হয়ে নিজের সর্বস্ব হারিয়ে অকালে কত মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির লড়াই আমাদের এমন এক অস্থির প্রতিযোগিতার মধ্যে এনে ফেলেছে যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কথাবার্তা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদের উপর প্রভাব পড়ছে। মানুষ ধারন করতে চেষ্টা করছে বহুজাতিক বৈশিষ্ট্য। ফলে মানুষের আচরণে বিকৃত পরিবর্তন ঘটছে। মানুষ অল্পতে রেগে যাচ্ছে, মানুষের সহনশীলতা ও ধৈর্য কমে যাচ্ছে। কাকে পায়ে দলিয়ে কে আগে যাবে, কে কার চাইতে বেশি (ভাইরাল) পরিচিতি পাবে এমন একটা অস্থির প্রতিযোগিতা চলছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ঘুম কমিয়ে দিয়ে মানুষকে করে তুলছে আরো বেশি আগ্রাসী। একই সাথে আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নৈতিক শিক্ষার অভাব, সম্পর্কের টানাপোড়ন, হতাশা, অপ্রাপ্তি, পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ুর পরিবর্তনকেও অনেকে দায়ী মনে করছেন।

সম্প্রতি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠসহ বিভিন্নস্থানে বেশ কিছু নিষ্ঠুর, অমানবিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যেসব ঘটনাগুলো বিবেকবান মানুষের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে, কাঁদিয়েছে। যখন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে লেখাপড়া করা ছাত্ররা জীবন্ত মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলে সেটা কিসের ইঙ্গিত দেয়? তাহলে প্রযুক্তির উন্নয়ন কি আমাদের মনুষ্যত্বকে বিকল করে দিচ্ছে? আমাদের বিবেকবোধ কি লোপ পাচ্ছে? ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা শব্দগুলো দুনিয়া থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে? সাধারণ মানুষ হিসেবে মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমরা কি হিংস্র জাতিতে পরিণত হচ্ছি?

আসলে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। প্রযুক্তি হাতে পেয়ে আমরা রংচটা দুনিয়াতেই সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং সে দুনিয়াকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি, সত্যি বলে মনে করছি। সন্ধ্যায় এখন আর প্রতিদিনের পারিবারিক প্রার্থনা হয় না। পরিবারের ছোটবড় প্রত্যেক সদস্যের আলাদা আলাদা মোবাইল রয়েছে এবং প্রত্যেকে নিজের মত করে সময় অতিবাহিত করছে। অনেক পরিবারে একসাথে খাওয়া পর্যন্ত হয়ে উঠে না। ধর্মীয় মূল্যবোধ, পারিবারিক শিক্ষা, নৈতিকতা, সামাজিকতা এসব থেকে আমরা এখন বিচ্ছিন্ন।

আমাদের পরিবারগুলো এখন চরম এক সংকটের সম্মুখীন। এই সংকট মোকাবেলা করতে আমাদের সবচেয়ে আগে প্রয়োজন পারিবারিক বন্ধন মজবুত করার। বাবা মা এবং সন্তানেরা যদি নিজেদের জায়গায় বিশ্বস্ত থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে তবে এ পরিস্থিতি থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে প্রতিদিনের পারিবারিক প্রার্থনার উপর। বিশ্বের এই সংকটময় মুহূর্তে প্রার্থনার খুব প্রয়োজন। ধন্যা কুমারী মারীয়া এ পর্যন্ত যতবার দর্শন দিয়েছেন, ততবার জপমালা প্রার্থনা করার অনুরোধ করেছেন, বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করার উপর জোর দিয়েছেন।

আসুন যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা আমাদের পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করি। প্রত্যেকটি পরিবারের ও বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। আমরা নিজেরা পাপ থেকে মন ফেরাই, যারা ব্যক্তি স্বার্থে এই বিশ্বটাকে অশান্ত করে তুলছে তাদের মন পরিবর্তনের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করি।

বড়দিন কী সত্যিই বড়?

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"আজ এলো সে বড়দিন, প্রাণে আজ বাজে বীণ,
রঙ্গীন স্বপ্ন উঠে জাগিয়া, ছন্দে ছন্দে উঠে মাতিয়া" *(গীতাবলী ৬৫৬)*।

বড়দিন বা খ্রিস্টমাস, একটি বাৎসরিক খ্রিস্টীয় উৎসব। ২৫ ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই উৎসব পালিত হয়। আদিযুগীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে, এই তারিখের ঠিক নয় মাস পূর্বে মা মারীয়া যিশুকে গর্ভধারণ করেন। ২৫ ডিসেম্বর আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন বলে ঐ দিনটিকে বড়দিন হিসেবে পালন করা হয়। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন হিসেবে পালন করার প্রধান কারণ হলো, যিশুর জন্মদিন, এ পৃথিবীতে মুক্তিদাতার আগমন, ঈশ্বর মানুষের মুক্তির জন্য মানবরুপে এ জগতে নেমে এসেছেন, বিশ্বাসের পূর্ণতা পেয়েছে যিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে, নতুন জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে, ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, যিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে প্রাক্তন সন্ধির পূর্ণতা পেয়েছে, স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয়েছে যিশুর মধ্য দিয়ে, মানব জাতির প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। তাই ২৫ ডিসেম্বর মানব জাতির জন্য অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আনন্দময় ও বড় দিন। সময়ের দিক থেকে বিবেচনা করা হলে এ দিনটি যদিও অন্যান্য দিনের চেয়ে বড় নয়, কিন্তু যিশুর জন্ম উৎসব ২৫ ডিসেম্বর পালন করা হয় বলে, এ দিনটি আমাদের নিকট অনেক অনেক বড়।

খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ ২৫ ডিসেম্বরকে 'বড়দিন' হিসেবে পালন করেন, কারণ ঐদিন ঈশ্বর পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। যিশু জন্মেছেন বলে ২৫ ডিসেম্বর দিনটি অনেক বড়। কারণ ২৫ ডিসেম্বর শিশু যিশুকে কেন্দ্রকরে অনেক কিছু করা হয়ে থাকে যেমন, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা আমাদের অনেক আনন্দ ও উৎফুল্লতা দান করে থাকে। তাই ২৫ ডিসেম্বর আমাদের জন্য অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনটি স্মরণীয় ও বরণীয় দিন।

খ্রিস্টীয় জীবনে বড়দিনের গুরুত্ব: খ্রিস্টানদের নিকট বড়দিনের তাৎপর্য যেমন, হিন্দুদের জন্য দীপাবলি এবং মুসলমানদের ঈদের মতোই। ২৫ ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়েছিল ও তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই এই দিনটি বিশ্বে বড়দিন হিসেবে পরিচিত। বড়দিন মূলত আনন্দ ভাগাভাগি করার উৎসব এবং এর আসল উদ্দেশ্য হলো একে অপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যিশু খ্রিস্টের ভালোবাসার ও ভ্রাতৃত্বের সাথে বসবাস এবং সুখে-দুঃখে একে অপরকে সাহায্য করার বার্তা দিয়েছেন। তাই এদিনটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের দিন।

২৫ ডিসেম্বরের কিছু আনন্দময় ঘটনাসমূহ:

০১. উপহার আদান প্রদান করা: 'ঈশ্বর পুত্র যিশু' নিজেই আমাদের জন্য এক বড় উপহার। মানব জাতিকে ঈশ্বর ভালোবেসে নিজের পুত্রকে দান কারেছেন, তাই যিশু হলেন মানব জাতির আনন্দের ও উল্লাসের ঘটনা ও বিশেষ উপহার, যা আমরা ২৫ ডিসেম্বর স্মরণ করে থাকি। "বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন

আমাদেরই মাঝখানে। আর আমরা তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করলাম, একমাত্র পুত্র হিসাবে পিতার কাছ থেকে পাওয়া সেই মহিমা-ঐশ অনুগ্রহ ও সত্যের সেই যে পূর্ণতা" *(যোহন ১: ১৪ পদ)*। এই উপহার আমাদের জন্য মুক্তি এনে দিয়েছে, এ উপহার আমাদের পূর্ণতা দিয়েছে, এই উপহার ঈশ্বরের ঐশ অনুগ্রহ ও কৃপা এনে দিয়েছে, যা সবই ঘটেছে আজ ২৫ ডিসেম্বর। তাই এই দিনটি আমাদের নিকট বিশেষ আনন্দের ও উল্লাসের দিন।

০২. খ্রিসমাস ট্রি ও গৃহসজ্জায় বড়দিন: বড়দিনের বিশেষ আনন্দের দিকগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ঘরে সুন্দর ক্রিসমাস ট্রি সাজানো। খ্রিসমাস ট্রি ও ঘর নিজেদের পছন্দ মতো জরি, ঝালট, রংবেরঙের কাগজ ও কাপড় এবং আলো দিয়ে মনের মতো করে সাজানো হয়ে থাকে। মনে হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কোন মহান ব্যক্তির আগমন ঘটবে। তিনি হলেন বহু প্রতীক্ষিত মুক্তিদাতা ঈশ্বর পুত্র প্রভু শিশু যিশু।

০৩. মুক্তিদাতার আগমন ২৫ ডিসেম্বর: আমরা বিশ্বাস করি যে, মানব জাতির মুক্তির জন্য যিশু এ জগতে এসেছেন। যিশুর জন্মের ফলে স্বর্গের দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে ও স্বর্গের যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্য ২৫ ডিসেম্বর অনেক বড়, গৌরবের ও আনন্দের দিন। মুক্তিদাতা যিশুর আগমনের ফলে এই দিনটি অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক অনেক বড়।

০৪. ঈশ্বর মানবরূপে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন মানব মুক্তির জন্য: ২৫ ডিসেম্বর ঈশ্বর মানবরুপ ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন মানব মুক্তির জন্য, এর চেয়ে আনন্দ ও গৌরবের বিষয় মানব ইতিহাসে আর কিছুই হতে পারে না। ঈশ্বর মানুষকে এতোই ভালোবেসেছেন যে, তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে মানুষের মুক্তির জন্য, মানবরুপ ধারণ করে এ জগতে পাঠিয়েছেন। এ ঘটনাটি ঈশ্বরের ভালোবাসার বড় প্রমাণ। ঈশ্বরের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। সৃষ্টিকর্তা কখনও চাননি তাঁর সৃষ্টির অতি উত্তম ও প্রিয় মানুষ জাতি পাপের মধ্যে বাস করুক। তিনি তাই নিজে মানুষের মতন হয়ে এ জগতে নেমে এসেছেন। তাই এই দিনটি ছোট হলেও অতি বড় ও আনন্দের বিষয় ও আনন্দের দিন। ২৫ ডিসেম্বর মানব জাতির জন্য একটি ঐতিহ্যাসিক ঘটনাও অতি আনন্দের বিষয়। ঈশ্বর মানুষকে এত ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়েছেন। মানব জাতির জন্য এটি একটি অতি আনন্দের সুসংবাদ ছিল। "জন্ম নিলে তুমি মানুষ বেশে, মানুষের মুক্তিদাতা হয়ে, ধন্য হলো আজ পুণ্য হলো, হৃদয় দুয়ার সব খুলে গেল, আজ বড়দিন যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন" *(গীতাবলী ৭৮৩)*।

০৫. বিশ্বাসের পূর্ণতা লাভের দিন ২৫ ডিসেম্বর: "বিশ্বাসে মুক্তি" মানব জাতি বহু বছর ধরে অপেক্ষায় ছিল, কবে ও কখন তাদের মুক্তিদাতা আসবেন। মানুষ গভীর আগ্রহ, বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় জেগে থাকে এই দিনটির জন্য। যেমন আমরা গান গেয়ে থাকি, "আমরা আছি বিপুল আশায়,

আসিবেন মহারাজা মহা মহিমায়" *(গীতাবলী ৫৯)*। আমরা বিশ্বাস করি যে, যিশুর জন্মের ফলে পৃথিবীতে পূর্ণতার পথ সুগম হয়েছে। "বিশ্বাসে ভরো মন তবে পাবে দরশন জীবিত যিশুর পরিত্রাণ" *(গীতাবলী ১০২৯)*। "যাতে যে-কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে যেন শাশ্বত জীবন লাভ করে। পরমেশ্বর জগৎতকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে যে- কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শ্বাশত জীবন" *(যোহন ৩: ১৫-১৬ পদ)*।

০৬. নতুন জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে: যিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে মানুষের স্বর্গে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। নতুন পথ, সত্য ও জীবনের সন্ধান পেয়েছ মানুষ। যিশু বললেন, "আমিই পথ,আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না" (যোহন ১৪: ৪ পদ)। যিশুর আগমনের ফলে মানব জাতি এই এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে, যেখানে গিয়ে অনন্ত সুখে আজীবন পিতা ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করতে পারবে। তাই বড়দিন আমাদের নিকট একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন।

০৭. ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে: বড়দিন হল সকল স্তরের মানুষের প্রত্যাশা পুরণের দিন, যা প্রায় ৭৫০ বছর খ্রিস্টপূর্বে বিভিন্ন প্রবক্তাগণ ভবিষ্যত বাণীতে বলে গেছেন। যিশু খ্রিস্ট এ জগতে এসে বা জন্মগ্রহণ করে প্রমাণ করেছেন প্রবক্তাদের বাণী এবং পুরণ করেছেন মানুষের প্রত্যাশা। যিশু খ্রিস্ট সকল মানুষের জন্য এ জগতে এসেছেন মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের পাপময় জীবন থেকে নতুন জীবনে আনার জন্য।

০৮. স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয়েছে: যিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে এক মিলন বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ যেন স্বর্গে যেতে পারে তার পথ সুগম হয়েছে। মানব জাতি যিশুকে ভালোবেসে এবং তাঁর দেখানো পথ ও শিক্ষা গ্রহণ করে স্বর্গে যাওয়া জন্য নতুন দিগন্ত খুঁজে পেয়েছে। যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য ২৫ ডিসেম্বর হলো একটি বিশেষ দিন, যে দিনে মুক্তিদাতা বেথলেহেমের গোয়াল ঘরে জন্ম নিয়েছেন।

৯. প্রত্যাশাপূরনের দিন ২৫ ডিসেম্বর: যিশুর জন্ম হল এমন একটি উৎসব যা প্রত্যাশা পূরণের দিন বা উৎসব। যিশুর জন্মের বহু বছর পূর্বে বিভিন্ন প্রবক্তাগণের প্রত্যাশার বাণী অনুসারে যিশুর আগমনের জন্য মানুষ অপেক্ষায় ছিল। যা ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে পূরণ হয়েছে। "ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের জন্য এমন মহা আনন্দের শুভ সংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে; আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তিনি খ্রিস্ট প্রভু" *(লুক ২: ১০-১১ পদ)*।

১০. ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয় ২৫ ডিসেম্বর: ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর প্রিয় মানুষ একদিন অবাধ্য হয়ে পাপ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে ও ঐশ পরিকল্পনার বিরোধিতা করবে। অসীম ভালোবাসার ঈশ্বর তবুও মানব জাতিকে পরিত্যাগ করেননি বরং নিজের একমাত্র পুত্রকে মানুষরুপে মানুষের মাঝে প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষ পরিত্রাণ পায় ও ঈশ্বর পুত্রের দেখানো পথে চলে পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাই ২৫ ডিসেম্বর ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়েছে যিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে। সেই জন্য বড়দিন,অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর আমাদের জন্য অনেক অনেক বড় ও আনন্দের দিন।

১১. বড়দিন উদ্‌যাপনে অন্য ধর্মের ভাইবোনেরা: বড়দিনের আনন্দময় উৎসব শুধু খ্রিস্টানদের জন্য নয় বরং সকল ধর্মের মানুষ পালন করে থাকে। যিশুর জন্ম উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের সকল শ্রেণির মানুষ নানা আয়োজন ও আনন্দের মধ্যদিয়ে পুরো ডিসেম্বর মাস পালন করে থাকে। যিশুর জন্মদিনটি সত্যিই সকল দিনের চেয়ে বড় ও আনন্দের দিন হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাই এই দিনটি ছোট হলেও আমাদের কাছে অনেক অনেক বড়।

২৫ ডিসেম্বর দিনটি সত্যিই বড়দিন। কারণ আমাদের মুক্তিদাতা এ দিনে পৃথিবীতে দীনবেশে মানুষ হয়ে মা মারীয়ার কোলে নাজারেথের বেথলেহেমের গোশালায় জন্মগ্রহণ করেছেন। ২৫ ডিসেম্বর দিনটি বড় না হলেও, যিশুর মর্তে আগমনের কারণে এ দিনটি অনেক অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। নতুন সহস্রাব্দের জন্যে পবিত্র ক্রুশের আধ্যাত্মিকতা, পবিত্র ক্রুশের সংবিধান, 'স্মরণিকা' সন্ন্যাস জীবনে রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন, ৪ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

২। পালকীয় পত্র" পুণ্য যাজক বর্ষ, ২০০৯" পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট।

৩। প্রতীতি, মূলভাব: "খ্রিস্টের বিশ্বস্ততা-যাজকের বিশ্বস্ততা" ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন, ২০১০ খ্রি:

৪। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, "যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা" ও "সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন, সম্পদানায় ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা ও ফাদার বার্ণাড পালমা।

বড়দিন

উইলিয়াম জেরিয়েল

আবার একটি বছর পরে প্রভু যিশুর জন্ম
উৎসব এলো ফিরে।
সারাটি বছর শুধু গুনেছি আমি দিন,
এই বুঝি চলে এলো প্রিয় বড়দিন।
বছরের এই একটা দিন কেন জানিনা,
মনে হয় আমার কাছে অনেক রঙ্গিন।
বড়দিনের সময় চলে এলো বলে,
মনের মাঝে তাই আনন্দ যেন
শুধু টলো-মলো করে।
বড়দিনে শিশু যিশুর সাথে
আমি যেন জন্ম নেই পাপ-কালিমা ভুলে।
বড়দিনের বিশেষ দিনে প্রার্থনা করি,
যারা আছে অনেক দূরে
তাদের মঙ্গল কামনা করি।
যারা আছে বাড়িতে অসুস্থতা নিয়ে,
প্রভু যেন সকলকে সুস্থ করেন
এই বড়দিনে।
শুধু নিজে নতুন কাপড় যেন নাহি পড়ি,
প্রতিবেশির কথাও যেন আমরা চিন্তা করি।
বড়দিনে কত মানুষ না খেয়ে রবে,
আমরা যেন পাশে দাড়াই তবে বড়দিন হবে।
বড়দিনে আমি যেন আরো বড় হতে পারি,
সবার কাছে বড়দিনে এই প্রার্থনা করি।
বড়দিনে প্রভু তুমি এসো আমার হৃদয়ে,
আমি যেন তোমার দেখানো পথে চলতে
পারি ভালোবাসা ও সেবা নিয়ে।
বড়দিনে আমি যেন আরো বড় হতে পারি,
আধ্যাত্মিকতায় নতুন বছরে
বৃদ্ধি লাভ করতে পারি।
এভাবে যেন বড়দিন পালন করতে পারি ,
তোমার ভালোবাসা ও সেবা সবার কাছে
প্রকাশ করতে পারি।

বড়দিন- পাওয়া নয়, দেওয়াতেই আনন্দ

ড. সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ

বড়দিন ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা আমাদের জীবনে উপলব্ধির এক মহাসময়। আমরা বড়দিনে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনের উৎসব করি, যাকে স্বর্গীয় পিতা আমাদের জন্য এক মহাদান হিসেবে দিয়েছেন। যিশুর জন্ম সত্যিই আমাদের জন্য এক মহান আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসে। পূর্ব দেশের ৩ জন পণ্ডিত, রাখালেরা এবং স্বর্গদূতগণ সবাই আনন্দে আত্মহারা কারণ মহান যিশুখ্রিস্টের জন্মে তারা সবাই জানতেন এই শিশু সাধারণ কোন শিশু নয়। ইনি হচ্ছেন মহান রাজাধিরাজ ত্রাণকর্তা প্রভু এবং আমাদের সবার জন্যও তা একটি গভীর আনন্দের বিষয়।

প্রতিবছর বড়দিনে আমরা বিভিন্ন জনের কাছ হতে শুভেচ্ছা কার্ড ও উপহার পেয়ে থাকি। আর এ উপহার আমাদের হৃদয় মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। আমাদের জীবনে শিশুকাল হতে এ অভিজ্ঞতা কম-বেশী সবারই রয়েছে। শিশু যিশু জন্মের পর পূর্ব দেশের ৩ পন্ডিত স্বর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস নিয়ে এসেছিলেন যিশুর প্রতি তাদের ভক্তি ও ভালোবাসার প্রকাশ রূপে। আর এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই বড়দিনে আমরা একে অন্যকে যে কোন ধরনের উপহার দিয়ে থাকি তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার প্রকাশ রূপে। আবার আমরা উপহার অন্যের কাছ থেকে পেয়েও থাকি। এই পাওয়ার মধ্যে রয়েছে একটি গভীর আনন্দ। প্রত্যেকেই আমরা উপহার পেতে প্রত্যাশা করি এবং ভালোবাসি। আর এই উপহার পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি যে, অন্যেরা আমাদের কত ভালোবাসে এবং সে ভালোবাসার প্রকাশস্বরূপ এই উপহার আমাদের দিয়ে থাকেন। এটিতে কোন ভুল নেই যে বড়দিনে আমরা ভাল উপহার প্রত্যাশা করতে পারি। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সেটি পাওয়া আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে বড়দিনকে আমরা আরেকটু গভীরভাবে দেখতে পারি। সেটি হচ্ছে-উপহার দেয়া আর যার অর্থ হলো অন্যের জন্য আশীর্বাদ কামনা করা। উপহার পাওয়ার যে আনন্দ তার চেয়ে আরেকটু গভীর হলো উপহার দেয়া অর্থাৎ অন্যকে আশীর্বাদ দেয়া, মঙ্গল কামনা করা, প্রার্থনা করা। এই আনন্দ হচ্ছে অন্তরের আনন্দ যা ধরে রাখা যায় না। অন্যের সাথে সহভাগিতা করার মধ্য দিয়ে তা আরও গভীর হয়ে ওঠে।

সত্যিকারে অন্যকে দেয়ার জন্য যে অনুপ্রেরণা আমরা পাই, সেটি হচ্ছে শর্তহীনভাবে দিয়ে দেয়া কোন কিছু প্রতিদানে প্রত্যাশা না করে। আমাদের কাছের এবং দূরের ভাইবোনদের যখন আমরা বড়দিনে কোন উপহার দেই তখন আমরা যথার্থই বেথলেহেমের যিশুর অনুসরণকারী হয়ে উঠি। আর দেয়ার উদ্দেশ্যটি হবে সেটিই যেখানে পাওয়ার কোন আশা থাকবেনা। পাওয়ার প্রত্যাশা না করে যদি দিয়ে থাকি তবে তাই হবে পৃথিবীতে অন্যের জন্য আমার শ্রেষ্ঠ দান। যখনই আমরা অন্যকে কিছু দেই তখনই আমরা অনুভব করতে পারি যে তার জন্য আমি ইতিবাচক শক্তি অর্থাৎ অণুপ্রেরণামূলক শক্তি ও ভালোবাসা পাঠাচ্ছি। এই বড়দিনে যা তার হৃদয় ও মনকে আলোকিত করবে।

এর মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে একটি গ্রহণীয় মনোভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসতে হয় যে প্রতিদানে আমি কোনকিছু ঐ ব্যক্তির কাছ হতে ফিরে পাব না বা প্রত্যাশা করব না। এভাবে বড়দিন আমাদের প্রত্যেককে সেই সুবর্ণ সুযোগ করে দেয় অন্যকে দেয়ার মধ্য দিয়ে নিজের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করতে এবং আশীর্বাদিত হতে। বড়দিন হলো একটি উপযুক্ত সময় যখন আমাদের অন্তর মন পূর্ণ করতে হয় শিশু যিশুর ভালোবাসাপূর্ণ ঐশ্বর্য সম্ভারে। আবার সেই ঐশ্বর্য ভান্ডার হতে একে একে অন্যের জন্য বিলিয়ে দিতে হয়। আর কিভাবে তা আমরা করতে পারি?

যখনই আমি আমার আন্তরিকতাপূর্ণ ভালোবাসা ও কথা দিয়ে অন্যের মুখে হাসি ফুটাতে পেরেছি এবং তারই দুঃসময়ে সাহস ও শক্তি নিয়ে পাশে থেকেছি। যখন কেউ অসহায় ও দুর্বল ছিল আমি তার শক্তি হয়েছি। অন্যকে সময় দিয়েছি তার একাকীত্বতায়। অন্যের কষ্টের বিষয়গুলো মন দিয়ে শুনেছি। যখন সাহায্যের জন্য কেউ এসেছে, তাকে ফিরিয়ে দেইনি বরং হাসি মুখে সাহায্য করেছি।

একইভাবে, আমরা অনুধ্যান ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো আমাদের জীবনে সেই সব উপকারী বন্ধুবর্গ ও ভাই মানুষকে যারা আমাদের জীবনে আনন্দ এনে দিয়েছেন বিগত একটি বছরে। কোন না কোন ভাবে, আমাদের সহায় হয়েছেন, আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ দরদ ও ভালোবাসা নিয়ে এবং এখনও তা করে যাচ্ছেন তাদেরকে স্মরণ করে শিশু যিশুর চরণে ধন্যবাদের ডালিটা উৎসর্গ করি। বিনীতভাবে, আর এর মধ্য দিয়ে আমি আমার ঐশ্বর্য সম্ভার পুনরায় পূর্ণ করি শিশু যিশুর ভালোবাসায়। এমনিভাবে যারা আমার জীবনে তাদের দান দিয়ে অবদান রেখেছেন এ বিষয়টি যেমন আমার নিকট অত্যন্ত চমৎকার ও মূল্যবান। একইভাবে, আমার ক্ষুদ্র উপহারও অন্যের জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাদের জীবনে বিশেষ ফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। সত্যিই কতই না চমৎকার যখন আমার আনন্দ, কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা অন্যের জীবনে অধিকতর ফলশালী হয়ে ওঠে। আমার নিজ জীবনকে অন্যের জন্য সহভাগিতা করার মধ্য দিয়ে। বড়দিনের আনন্দ যিশুখ্রিস্টকে কেন্দ্র করে। আসলে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপহার যা অন্যকে দিয়ে থাকি তার মধ্য দিয়ে আমরা প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মের যাবপাত্র তৈরী করে থাকি।

পরম পিতা ভালোবেসে বড়দিনে আমাদের প্রত্যেককে সবচেয়ে বড় উপহার শিশু যিশুকে দিয়েছেন। তাই আসুন, তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা অন্যের জীবনের জন্য আশীর্বাদ উপহার স্বরূপ বয়ে নিয়ে যাই। আবার নিজেরাও আমাদের অতিপ্রিয় ও আপনজনের নিকট হতে এই উপহার যিশুকে গ্রহণ করে বড়দিনের আনন্দকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলি।

Sources:

1. Article Gilman John. (2016), "Christmas- A Reflection on Giving and Receiving."

2. http://www.awaleencberoproctic.comuk/gift giving-receiving-Cfristmas-2/

যিশু কেন্দ্রিক এক উৎসব বড়দিন

সিস্টার মেরী আলো পালমা আরএনডিএম

পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "যদি খ্রিস্টকে বড়দিনের উৎসব হতে দূরে রাখি, তাহলে সেই বড়দিনের আনন্দ উৎসব হবে শুধুই বাহ্যিক আনন্দ! বড়দিনের আনন্দ উৎসব হয়ে ওঠে না।" বড়দিন আনন্দোৎসব হয়ে ওঠে সাধু লুকের মঙ্গলসমাচার অনুসারে: '...স্বর্গদূত রাখালদের বলেন, "ভয় পেয়ো না! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে *(লুক: ২:১০-১১)* ।"

কেন বড়দিন হয়ে ওঠে মহা-আনন্দের সু-সংবাদ?

কারণ "আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন-তিনিই সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু!" আমরা কখন সেই মহা আনন্দের অভিজ্ঞতা করব? যদি আমরা ত্রাণকর্তার জন্মের মহা-আনন্দ আভিজ্ঞতা করতে না পারি; তা হলে সেই আনন্দ হবে শুধু বাহ্যিক আনন্দ! সেই আনন্দ হবে, 'খাও-দাও আর ফূর্তি কর' এই রকম আনন্দ, যা ক্ষণস্থায়ী। যা সাধারণত আমরা করে থাকি। যা দুই/এক দিন পর আর স্মরণেও থাকে না। সেই আনন্দ হৃদয়ে অনুভূত হয় না।

যিশু খ্রিস্ট কখন আমার মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা হয়ে ওঠেন?

মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে ১:২০-২১পদে দেখি: 'প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন: "দাউদ-সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে ঘরে আনতে ভয় ক'রো না, কারণ সে যে সন্তান-সম্ভবা হয়েছে, তা পবিত্র আত্মারই প্রভাবে। সে এক পুত্র-সন্তানের জন্ম দেবে; তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু, কারণ তিনিই আপন জাতির মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন।" অর্থ হলো, "ঈশ্বর পরিত্রাণ করেন।" যখন আমরা অভিজ্ঞতা করব যে, যিশু আমাকে পরিত্রাণ করেন, শুধুমাত্র তখনই অভিজ্ঞতা করব, তিনি আমাদের মুক্তিদাতা, তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। তিনি আমাদের নিরাময় করেন।

যখন আমরা পাপ নিয়ে মুক্তিদাতার জন্ম উৎসব পালন করি, তা কখনই সত্যিকার অর্থে 'যিশু খ্রিস্টের জন্ম উৎসব হয়ে উঠতে পারে কি? না পারে না। তা শুধু মাত্র বাহ্যিক খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেই অবস্থায় যিশু কখনও আমার হৃদয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারেন না। 'যিশুকে নিয়ে বড়দিন উৎসব পালন না করলে, সেই উৎসব হবে অর্থহীন আনন্দ। তাই তো, পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "যিশু খ্রিস্টকে বড়দিনের আনন্দ উৎসব হতে দূরে সরিয়ে রেখো না!"

কবি এলিয়ট (Poet Eliot) তাঁর কবিতায় লিখেন, "যিশুকে প্রণাম করার জন্য তিনজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের যাত্রা!" জ্যোর্তিবিদগণ আকাশে "তারাটি" দেখতে পান। পণ্ডিতগণ (Wise People) আকাশে তারা দেখে বুঝতে পেরেছিলেন "তারাটি হলো মুক্তিদাতা বা মহান রাজার জন্মলগ্নে উদিত হওয়ার তারা" *(মথি:২:১-১২)*। "তারাটি" দেখে জ্যোতির্বিদগণ চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। তাঁদের ঐ যাত্রা ছিল খুবই কঠিন, দুর্গম ও কষ্টের। যাত্রা পথে তাঁরা ক্লান্তি অনুভব করেন। এমনকি উটগুলোও ক্লান্তি অনুভব করে। কিন্তু তাঁদের

"...মনের ভেতরে কি একটা আগুন জ্বলছিল" *(লুক:২৪:৩২)*; যা তাঁদের সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। কারণ মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টকে খুঁজে বের করা, তাঁকে প্রণাম জানানোর অদম্য আগ্রহ তাঁদের তাড়িত করেছে। বেথলেহেমে প্রবেশের পর আকাশে তারাটি দেখতে না পেয়ে, পণ্ডিতগণ রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করেন ও রাজা হেরোদ এর কাছে 'ইহুদীদেও যে রাজা' জন্মেছেন তাঁর খোঁজ নেন। কেউই ইহুদীদের রাজার জন্ম-খবর জানত না। 'এই কথা শুনে রাজা হেরোদ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং জেরুসালেমের সমস্ত লোকও বিচলিত হন। হেরোদ...প্রধান যাজক ও শাস্ত্রীকে...ডেকে জানতে চান, সেই খ্রিস্টের কোথায় জন্মবার কথা। তারা বললেন: "যুদেয়ার বেথলেহেম নগরে!"...হেরোদ...গোপনে পণ্ডিতদের ডেকে এই বলে তাঁদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন: "আপনারা গিয়ে ভাল করে শিশুটির খোঁজ নিন। খোঁজ পেলেই, আমাকে খবর দেবেন, যাতে আমিও গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পারি *(লুক: ২: ৩-৫, ৭-৮)*।

এই নতুন রাজা খ্রিস্টের জন্ম নিয়ে কেউই বিচলিত ছিল না। "লোকেরা খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে-করা, বিয়ে-দেওয়া ও আনন্দ ফুর্তিতে" মেতে ছিল *(লুক: ১৭:২৬)*। পণ্ডিতগণ চিন্তা করেন, "আমরা কী কোন ভুল করেছি? কারণ যুদেয়ার বেথলেহেম নগরে যিশুর জন্মের বিষয় কেউই জানে না! কেউই নতুন শিশু রাজার জন্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়! কেন? কেন সবাই পান-আহার করছে, ফূর্তি করছে?" পণ্ডিতগণ নতুন শিশু রাজার কথা জিজ্ঞেস করলে, লোকেরা হেসে উত্তরে বলে, "নতুন শিশু রাজা! আমাদের তো একজন রাজা আছে, তিনি হলেন হেরোদ"। পণ্ডিতগণ লোকদের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে খ্রিস্টের খোঁজ করতে বেড়িয়ে পড়েন।

শেষে 'তারাটিকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। বাড়িতে ঢুকে তাঁরা শিশুটিকে তাঁর মা মারীয়ার কোলে দেখতে পেলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের রত্ন- পেটিকা খুলে তাঁকে উপহার দিলেন, সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস *(মথি:২:১০)* ।

পৃথিবীতে নতুন রাজার জন্মাবার সময় ও লগ্ন সম্পর্কে লোকেরা জানত না, তারা ধন-সম্পদের মোহে আসক্ত ছিল। বেথলেহেমের লোকেরা মুক্তিদাতা খ্রিস্টের জন্মাবার কথা জানত না। 'যুদা গোষ্ঠীর বেথলেহেম নগরের লোকদের কাছে' *(মথি:২:৬)* মুক্তিদাতা, যিশু খ্রিস্ট অগ্রহণীয় (Savior was rejected to them) ছিলেন। আজ/বর্তমানেও আমরা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনে গান, বাজনা, খাওয়া-দাওয়া, আরাম-আয়েস, নতুন জামা-কাপড় নিয়ে আনন্দে মেতে থাকি।

একজন প্রশ্ন করেন, "আমরা কি বড়দিনের উৎসবের মূল-কেন্দ্রে খ্রিস্টকে রাখি"? খ্রিস্ট ছাড়া উৎসব করার মধ্যে একটি বড় বিপদ রয়েছে। বড়দিনের মূল-অর্থ (Meaning) আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে উঠে! আমি বিশ্বাস করি পিতা ঈশ্বর এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন আছেন। তাই তো পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্র যিশুকে এই পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে 'দীক্ষাগুরু যোহনকে' পাঠালেন *(মথি ৩:১-১২)*।

'যুদেয়ার মরুপ্রান্তরে ... দীক্ষাগুরু যোহন বাণী প্রচার শুরু করেন।' তিনি চিৎকার করে বলেছেন: "তোমরা মন ফেরাও: স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই! ... তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত কর! সোজা সরল করে তোল তাঁর আসার পথ!" অর্থাৎ, 'তোমরা এবার পাপ ছেড়ে ঈশ্বরের কাছেই ফিরে যাও!' কিন্তু কেন? কারণ সেই পরম ধর্মযুগ শুরু হতে চলছে, যাঁর কথা প্রবক্তারা আগে থেকেই ঘোষণা করেছিলেন। ফলে, লোকেরা সবার সামনে নিজেদের পাপ স্বীকার করতে লাগল আর তিনিও তখন জর্ডান নদীর জলে তাদের দীক্ষাস্নাত করান' *(মথি:৩:১-৩, ৬)* ।'

যোহন ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, স্পষ্টভাষী, সত্যবাদী ভিন্ন চরিত্রের একব্যক্তি। 'তাঁর পোষাক ছিল: উটের লোমের, কোমরে ছিল চামড়ার একটি বন্ধনী, আর খাবার ছিল: পঙ্গপাল আর বনের মধু। তিনি কোন ঐশ্বতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র ব্যবহার করতেন না। তিনি জীবনের মৌলিক (Basic) ভিত্তি সম্বন্ধীয় কথা বলতেন। মৌলিক (ইধংরপ) বিষয় আবার কি? আমি কে (Who am I)? ঈশ্বর কে (Who is God)? আমি কি ভাবে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াই? এই উত্তর পেলেই মৌলিক বিষয় জানতে পারব।

আর দীক্ষাগুরু যোহন সকলকে বলেন, "মন পরিবর্তন কর! মন ফেরাও!" অর্থাৎ "পাপস্বীকার কর!" 'তোমরা সবাই পাপী! ফরিসি, সাদুকি সবাইকে দারুন ক্রোধে ও তীব্র ভাষায় ভৎসর্না করে বলতেন, 'কালসাপের জাত, .. (কুড়াল) তো আঘাত হানার জন্যে গাছের গোড়াটা ছুঁয়েই রয়েছে... কেটে আগুনে ফেলেই দেওয়া হবে" *(মথি:৩:৭-১০)*। ..."তোমরা পাপী, অনুতাপ কর! মন ফেরাও!" "স্বর্গরাজ্য খুব কাছেই!" কারণ মুক্তিদাতা আসছেন। "মুক্তিদাতা জন্ম নিয়েছেন! তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি সেই পরম মেষপালক,... যিনি ঈশ্বর-মনোনীত সকল মানুষের ভার বহন করবেন, অর্থাৎ প্রতিপালন করবেন *(মথি ২: টীকা : ৬)*"।

সেখানে যুদেয়া জেরুসালেমের সব ধরণের লোক এসেছিল-এমন কি রাজাও এসেছিলেন, আর যোহন তাদেও দীক্ষাস্নাত করান। তাই যোহন হলেন একজন অদ্ভূত আচরণের/ধরণের ব্যক্তি। তিনি লোকদের মুখের উপর বলেছিলেন, "তোমরা পাপী...! পাপ দ্বারা তোমরা তোমাদের হৃদয় বন্ধ করে রেখেছ! মুক্তি-দাতাকে গ্রহণ করার জন্যে 'মন পরিবর্তন কর ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তোমাদের হৃদয় প্রস্তুত কর।'

এখনই (বর্তমানে) আমাদের হৃদয় প্রস্তুত করার সময়। পবিত্র আত্মা আমাদের কানে ফিস্ ফিস্ করে বলছেন, "মন ফেরাও! পাপের জন্য অনুতাপ কর! পাপস্বীকার কর! আমি তোমাদের (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে) পাপ ক্ষমা করব!

আর তা যদি করি, তাহলেই আমরা বুঝবো যে, যিশু আমাদের বলছেন, "বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল!" এই জন্যই তো যিশু এই পৃথিবীতে এসেছেন। মৃত্যুর পূর্বে যিশু যাতনা-ভোগ, ক্রুশের উপর যন্ত্রণা-ভোগ ও লজ্জাজনক মৃত্যু বরণ করে, মৃত্যুকে জয় করে শিষ্যদের দিকে একবার ফুঁ দিয়ে বললেন, "এবার তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর! তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তবে তা ক্ষমা করাই হবে; যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর, তা ক্ষমা-না-করাই থাকবে" *(যোহন:২০:২২-২৩)*! এই ভাবেই যিশু পাপস্বীকার সংস্কার অর্থাৎ পুনর্মিলন সংস্কার প্রতিষ্ঠা করেন।

বড়দিনের আনন্দ উৎসব পালন করার জন্য, এই ভাবেই, আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। কারণ, যিশু আমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত, তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। এই কারণেই আমাদেরকে যিশুর কাছে আসতে হবে। আমাদের পাপ স্মরণ করতে হবে, পাপের জন্য অনুতাপ করতে হবে, পাপস্বীকার সংস্কারের মাধ্যমে পাপের ক্ষমা চেয়ে, ক্ষমা লাভ করতে হবে।

আসুন, একটু চিন্তা করি, আমরা কত সময় ব্যয় করি, জামা-কাপড় কেনা-কাটা ও তৈরী করার জন্য ও অন্যান্য বাহ্যিক জিনিস, ঘর-বাড়ি, খাবার প্রস্তুত করার জন্য! প্রয়োজন অনুযায়ী অবশ্যই করব! আর করা উচিৎও! কিন্তু কথা হল: এই বাহ্যিকতায় জোর দিতে গিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুতের কথা ভুলে যাই। অতিরিক্ত বাহ্যিকতায় আমাদের গৃহে ও হৃদয়ে যিশুর আসার পথ বন্ধ করে না দেই! গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল: প্রতিদিন কতটা সময় আমরা ব্যয় করি 'রবিবারে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ, পারিবারিক প্রার্থনা, পবিত্র বাইবেল বাণী পাঠ (Reading the Word of God & prayer) ও প্রার্থনায়? কারণ: 'ঈশ্বরের বাণী' ও '... যিশুর আনন্দ আমাদের অন্তরে থাকতে পারে এবং আমাদের আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হতে পারে' *(যোহন ১৫:১১)*।

আমরা জাগতিক ও বাহ্যিকতার প্রতি বেশী গুরুত্ব দেই, বলেই যিশুর 'সেই আনন্দ' আমাদের হৃদয়ে অনুভব করতে পারি না। এখনও সময় আছে চিন্তা, ধ্যান-প্রার্থনা করার, আমাদের জীবনে কোনটা প্রধান, তা অনুধাবন করতে পারলেই, বাহ্যিকতা দূরে সরে যাবে। যদি আমরা আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, ধর্মপল্লীতে সবার সাথে যিশুকে নিয়ে আনন্দ করি, তখনই 'বড়দিন' উদ্‌যাপন হবে- শান্তির, আনন্দের ও ভালোবাসায় পূর্ণ আনন্দের। এটাই হবে প্রার্থনার আনন্দ উৎসব! ঈশ্বরের রাজ্য! যিশুকে নিয়েই আমরা কীর্তন করব, খাওয়া-দাওয়া করব। কারণ "ঐশরাজ্য তো পানাহারের ব্যাপার নয়। ঐশরাজ্য বরং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ধর্মময়, শান্তিময়, আনন্দময় জীবন যাপনেরই ব্যাপার। "... যা-কিছু শান্তি আনে, আমাদের পরস্পরের অন্তরে যা-কিছু শক্তি জাগিয়ে তোলে। আসুন, সর্বদা তা-ই করার চেষ্টা করি" *(রোমীয় ১৪:১৭, ১৯)*।

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

নাম: সিস্টার বার্ণাডেট গমেজ (RNDM)
জন্ম: ২৮-০৮-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০-১২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সময়ের ধারাবাহিকতায় বছর ঘুরে এলো বেদনা বিধূর ২০ ডিসেম্বর, যেদিন তুমি এ জগৎ সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে স্বর্গীয় পিতার কাছে স্থান নিয়েছো। এই দিনটি আমরা শ্রদ্ধা ভরে শোকাহত চিত্তে স্মরণ করি। আমাদের আশীর্বাদ কর যেন তোমার জীবন আদর্শে পথ চলতে পারি।

তোমার শোকাহত পরিবার-
ভাই ও বোনেরা
গ্রাম: সোনাবাজু (বড় বাড়ী)

বর্তমান বাস্তবতায় বড়দিন উদ্‌যাপন

মিথুশিলাক মুরমু

বৈশ্বিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিব্যাপ্তিতে পারস্পারিক অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং পারস্পারিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব যেন ঊর্ধ্বমুখী। রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্র, গোষ্ঠীর সাথে ভিন্ন গোষ্ঠী এবং ধর্মের সংকীর্ণতা ক্রমশই উদিত হচ্ছে। আর এই অদৃষ্ট চক্রে ধৃত হয়েছে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আমরা। বিশেষ করে বছরের মাঝামাঝি দিক থেকে দ্রুত দেশের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়। পরিসমাপ্তি ঘটেছে সরকারের পরিবর্তন এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীদের দ্বারা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংস ও জঘন্য নির্যাতন-অত্যাচার, অবিচার ও হত্যাকাণ্ডের আরম্ভন। দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া উগ্রবাদী ঘূর্ণিঝড়ে মাইক্রোসকপিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও আক্রান্ত হয়েছে। দেশে বসবাসরত খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর সহায়-সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, জানমাল কোনোটিই রেহাই পায়নি। বরিশাল থেকে দিনাজপুর এবং সাতক্ষীরা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী-আদিবাসী খ্রিস্টানুসারীদের প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত ও নির্ঘুম রাত কাটাতে হচ্ছে। যতদূর জানা যায়, মাত্র কয়েক দিনে প্রায় ২৫/৩০টি খ্রিস্টবিশ্বাসী পরিবার কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দিনাজপুর জেলার, বীরগঞ্জ উপজেলার, কাশিমনগর গ্রামের মুংলু বেসরা। ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের সদস্য মুংলু বেসরা'র ভিটামাটিতে ট্যাক্টর দিয়ে চাষ করে কলাগাছ রোপণ করা হয়। এই পরিবারটি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন ও স্থানচ্যুত হয়েছেন। আমার সুযোগ হয়েছিলো দিনাজপুর বিরল থানার খ্রিস্টানুসারী অধ্যুষিত পিপুল্লা গ্রাম ও কাশিমনগর মুংলু বেসরা'র ভিটা পরিদর্শনের। খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছাড়া আর কোনো সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হয়েছি। আর এমন বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতিতেই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব উদ্‌যাপন করতে চলেছি, হতে পারে কারো জন্য এটি স্মরণীয়; আবার কারো জন্য বেদনাদায়ক। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত খ্রিস্টবিশ্বাসীরা প্রভু যিশুর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনে কতোটুকু সম্মিলিত হতে সক্ষম, সেটি অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেশের অভ্যন্তরে প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। এখনো ক্ষমতাবানরা প্রকাশ্যে দিনের আলোয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রিস্টান এবং আদিবাসী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের দিকে তর্জনী আঙ্গুল উঠিয়েছে। সত্যিই গ্রাম-গ্রামান্তরে থাকা নিরীহ ও একেবারেই সাদাসিদে খ্রিস্টভক্তরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন এই ভেবে যে, আসন্ন বড়দিনে আবার কোনো ধরনের দুর্ঘটনা কী অপেক্ষামান! ৫ আগষ্টের পরবর্তীকালে একাধিক অঞ্চলের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সাথে মতবিনিময় করেছি, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতায় ছিলো তিক্ততা ও দুর্ভাগ্যজনক বলছেন। দু'একজন বলেছেন,

Christmas Celebration around the world in different countrie

এবারই সবচেয়ে বেশি প্রতিবেশিদের প্রকৃত চেহারা উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই মাঠে ফসল ফলিয়েছে, হাট-বাজারে নিশ্চিন্তে গমনাগমন করেছেন কিংবা সুখে-দুঃখে একে-অপরের পাশে দাঁড়িয়েছেন; সেই চেনা লোকগুলোই ক্ষমতার পালাবদলে নিজেদেরকেও পাল্টিয়েছে। এটি কী ধর্মীয় সহিষ্ণুতা কিংবা ধর্মীয় উগ্রবাদের উর্বরতা! তবে একটি বিষয় সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় যে, ধর্মান্তরিত আদিবাসী খ্রিস্টানুসারীদের বসত ভিটা কিংবা জায়গা-জমির দিকে প্রতিবেশিদের বেশ নজর রয়েছে। নিরক্ষরতা, পশ্চাৎপদতা, প্রশাসনিক কাজের অজ্ঞতা এবং প্রান্তিক এলাকায় বসবাসের কারণে ক্ষমতাবানরা সহজেই আদিবাসী খ্রিস্টানুসারীদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি এবং ছলে-বলে কৌশলে সহায়-সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলমান থাকে। এবারও দৃশ্যমান হয়েছে, আদিবাসী খ্রিস্টান সম্প্রদায় যেখানেই হামলার শিকার হয়েছেন, রয়েছে জায়গা-জমির ক্রুটি এবং আদালতে বিচারাধীন মামলা। আইন-আদালতকে উপেক্ষা করে যদি আদিবাসী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উদ্‌খাত করা সম্ভবপর হলে, পরবর্তীতে উদ্বাস্তু আদিবাসী খ্রিস্টানরা মামলায় সুবিধা করতে পারবেন না। অতীতের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, পানির দামে ওই সম্পত্তি তাদের কাছে হস্তান্তর কিংবা শেষ পর্যন্ত মামলা পরিচালনা করতে ব্যর্থ এবং পৈত্রিক সম্পত্তি হাতছাড়া হয়। ক্ষমতাবানরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন, তবে বেশ কয়েক জায়গায় তাদেরকে আদিবাসীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সর্বশেষ ২৭ নভেম্বর অবলোকন করলাম, ঠাকুরগাঁও জেলার, হরিপুর উপজেলার, ডাংগীপাড়া ইউনিয়নের শিহিপুর দামোল গ্রামের আদিবাসী কান্দন সরেন পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়ে জমিতেই জবরদখলকারীদের হাতে নিহত হয়েছেন। অত্র অঞ্চলের আদিবাসী খ্রিস্টানরা এখন অজানা আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। স্থানীয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, অফিস-আদালতে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য দিনে দিনে এলাকার সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের অন্তরে বিরূপ মনোভাব ও ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে খ্রিস্টানুসারীদের পাশে দাঁড়ানো এবং সাহস যোগানো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। মাত্র কয়েক মাসে এতোগুলো খ্রিস্টান পরিবার শারীরিক ও মানসিকভাবে আক্রান্ত হলো, এ বিষয়ে খ্রিস্টান অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলো অথবা ধর্মীয় সংগঠনগুলো কোনোরূপ ভূমিকা গ্রহণে উদ্যোগী হোন নি। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর বর্বরতায় আমরা রাজপথে ব্যানার, ফেষ্টুন নিয়ে দাঁড়াইনি; সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাতে পারিনি যে, খ্রিস্টবিশ্বাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করছেন। আমাদের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগিতার হাত বাড়াতে ভুলে গেছেন, প্রতিকূল

পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে সংকটাপন্ন অবস্থার পরিবারগুলোকে মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে ভালোবাসার হাত প্রসারিত করা আবশ্যিকতা রয়েছে। প্রায় ২৫/৩০টি ঘটনায় একটি জায়গাতেও আমাদের যাজক শ্রেণীকে ভালোবাসা, সান্ত্বনা কিংবা পালকীয় পরিদর্শনে গমন করতে দেখি নাই। এটি যেমন ঘটনার শিকার হওয়া ভক্তবৃন্দ যারা আজীবন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে খ্রিস্টকে গ্রহণ করে বিশ্বস্তভাবে ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতিনীতি পরিপালন করে আসছেন, কিংবা তাদের খোঁজ-খবরে কদাচিৎ উপস্থিত হলেও; তাদের কোনো অভিযোগ নেই, বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে পালের মেষপালক হিসেবে দাঁড়ানো ধর্মীয় নির্দেশ রয়েছে। আদিবাসী খ্রিস্টানুসারীরা পালকবিহীন মেষের ন্যায় ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত লোকদের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা প্রভু যিশুখ্রিস্ট দিয়েছেন; এটির ব্যতয়ে নৈতিকভাবে দোষে দুষ্ট হয়ে থাকি।

প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিজেকে আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে মহর্ষি যিশাইয় পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, '...তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করবার জন্য, পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করবার জন্য' *(লুক ৪:১৮-১৯)*। মূলত এটি নাজারেথ মেনিফেষ্ট হিসেবে পরিচিত। এখানে অসহায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, হতদরিদ্র মানুষের প্রতি দয়া দেখানোর জন্য খ্রিস্টের আগমন ঘটেছে। তিনি জীবনকালে ধর্মীয় উগ্রবাদ, কুংস্কার, শোষিত-বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, হতাশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, শুনিয়েছেন আশার বাণী, প্রতিষ্ঠা করেছেন ন্যায্যতা। প্রভু যিশুখ্রিস্ট মানব মর্যাদা ও সাম্যতার পক্ষে অবিচল ছিলেন। তিনি বর্ণ বৈষম্যকে ছিন্ন করে অচ্ছুৎশ্রেণীর মানুষকেও ঈশ্বরের ভালোবাসার স্পর্শ দিয়েছিল। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রশাসনের, শাসকের রোষে পড়তে হয়েছে কিন্তু কখনোই পথ বিচ্যুত হননি। এটিই তো তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি আদর্শ ও পন্থা। তাঁর জন্ম রাজপ্রাসাদে হয়নি, হয়েছে একেবারে সাধারণ ঘরে; গোয়াল ঘরকে ঈশ্বর বেছে নিলেন কারণ তিনি হলেন সর্বজাতির ও সর্বসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং প্রথমজাত।

আসন্ন বড়দিন আমাদের কাছে যে বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে, সেটি হলো– মানুষের প্রতি ঈশ্বরের নিরঙ্কুশ ভালোবাসা। যে ভালোবাসায় কোন খাদ নেই, রয়েছে শুধু ভালোবাসা আর ভালোবাসা। সাধু যোহন লিখেছেন, 'কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করলেন যে, একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়' *(যোহন ৩: ১৬)*। মানুষ ঈশ্বরকে প্রথমে নয় কিন্তু ঈশ্বরই মানুষকে মনোনীত করেছেন, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রমাণ সাপেক্ষে প্রিয় পুত্র যিশুকে দিলেন। যিশুর জন্মে তাইতো স্বর্গের দূতেরা উচ্ছ্বাসিত হয়েছেন, মানুষের মধ্যে শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে শান্তিরাজের উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অসহিষ্ণু পরিস্থিতিতে হৃদয়ে ভারাক্রান্ত খ্রিস্টানুসারীদের কাছে ভালোবাসার উষ্ণতার স্পর্শ খুবই প্রয়োজন। সেটি হোক না উপস্থিতি দিয়ে কিংবা ভালোবাসার উপহার দিয়ে; কেননা অশান্ত হৃদয়কে উপহার দিয়েই প্রশান্তি করা যায়। বর্তমান বাস্তবতায় শান্তির বাণী ও সম্প্রীতিতে সহাবস্থানের উদ্যোগ ও দৃষ্টান্ত সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে। দেশের সর্বত্র থেকে সহিংসতাকে উদ্‌ঘাটে অহিংস ও সৌহার্দ্যের বিকল্প নেই। আর এটির জনক হচ্ছেন স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিস্ট। শান্তিরাজ প্রভু যিশুখ্রিস্ট মৃত্যু পর্যন্ত অটল ছিলেন, তিনি তাঁর শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত স্থাপনে নির্ভীক ছিলেন। আসুন, বিক্ষুব্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। তাহলেই আমাদের বড়দিন স্বার্থক ও অর্থপূর্ণ হবে। শুভ বড়দিন।

ইতালির তীর্থ-ভ্রমণ ২০২৫

ইতালির রোম নগরী, ভ্যাটিকান সিটি, পোপ মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদ অর্জনের স্বপ্ন ও সুযোগ জীবনে হয়তো একবারই আসে।

আমরা গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি আপনার স্বপ্ন পূরণে একরাশ সহযোগিতার ডালি নিয়ে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

তীর্থ অনুষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে ইতালির ভিসা প্রসেসিং এর সার্বিক দায়িত্ব আমাদের কাঁধে তুলে নিবো। আমাদের বিগত ২২ বছরের অভিজ্ঞতা নির্ভুল ও নিখুঁত Application Package Preparation & Submission আপনার ভিসা প্রাপ্তিকে প্রায় শতভাগ নিশ্চিত করে তুলবে।

বি. দ্র.:আমরা ইতালির ভিসা প্রসেস-এর জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।

CHRISTMAS & NEW YEAR
উপলক্ষ্যে বিশেষ DISCOUNT
20% DISCOUNT ON OUR SERVICE CHARGE
December 10, 2024 to January 31, 2025

Merry Christmas
&
HAPPY NEW YEAR-2025!

Student Visa: USA, Canada, Australia, New Zealand, France, Italy, Malta, Poland, Estonia, Romania, Norway, Denmark, Sweden, Finland, Japan, China, Russia & South Korea তে Study Visa প্রসেস করছি।
Visit Visa: USA, Canada, Australia, UK, Schengen Countries, Japan, Thailand, Singapore, Malaysia & Vietnam এ Visit Visa প্রসেস করছি।
Work Permit Visa: Japan, Schengen Countries, Serbia, Macedonia, Albania, etc.

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুন।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী
হেড অফিস : বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২ (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে এবং বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
+88 01718-885801
+88 01911-052103
+88 01827-945246
www.globalvillagebd.com
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

শ্রী যিশুর জন্মদিন সকলের বড়দিন

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

জন্মদিন বর্তমান প্রজন্মের মানুষের কাছে অনেক আশা-প্রত্যাশার সেই সাথে অনেক প্রস্তুতিরও বটে। প্রস্তুতির অবসানে যখন একটি শিশু জন্ম নেয় পৃথিবীতে তখন চারদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য চাই নিরাপদ বাসস্থান। শিশুর মা'র নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও সুষম খাবার সরবারহ করা পরিবারের সবার কর্তব্য। কয়েকমাস পর পর মায়ের পেটে শিশুর অবস্থান জানতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। শিশু কোন হাসপাতালে জন্ম নিবে তার জন্য হাসপাতাল আগে থেকে বুকিং করা এবং বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে রাখতে হয়। আমাদের চাহিদা, সামর্থ্য, প্রাপ্তি এগুলো বদলেছে। সেজন্য আমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ ও জন্মদিন পালন বেশ লক্ষনীয়।

আমাদের প্রভু যিশু জন্ম নিবেন ২৫ ডিসেম্বর তার জন্য আমরা প্রতীক্ষায় থাকি, প্রত্যাশা নিয়ে থাকি। প্রভু যিশুর আগমনের খড়-বিছালি দিয়েই কিন্তু গোশালা সাজাই। প্রভু যিশুকে বরণ করার জন্য আমাদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিতে হয়। এই আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি যার যত বেশী ভাল হয় তার বড়দিন অর্থাৎ শ্রী যিশুর আগমনে ব্যক্তির জীবনে অনেক আশীর্বাদ, অনুগ্রহ, প্রেম, শান্তি ও ভালোবাসা দিয়ে ভরে উঠে। সাধারণ মানুষের জন্ম হয় অনেক আয়োজন করে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, নিরাপদ জায়গায় অন্যদিকে ঈশ্বর পুত্র যিশুর জন্ম হয় গোশালায় গরু- ভেড়ার সাথে। এখানেই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয় তিনি তার ঈশ্বরত্বকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না বরং তিনি নিজেকে নমিত করলেন। নমিত বা নম্র না হলে বড় হওয়া যায় না।

পোপীয় পদে অধিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পর পুণ্যপিতা ত্রয়োবিংশ যোহনের জীবনের একটি ঘটনা। ঠিক বড়দিনের দিন বিকেলে তিনি গেলেন রোম নগরীর একটি জেলখানায়। উদ্দেশ্য ছিল কয়েদিদের সাথে দেখা করবেন। প্রায় হাজার খানেক কয়েদির সামনে দাঁড়িয়ে কথা নয় যেন ভালোবাসার হৃদয়ে কতগুলো বীজ তিনি ছিটিয়ে দিলেন উপস্থিত সকলেরই অন্তরে। তিনি বললেন, "আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই, আমি এলাম আপনাদের কাছে। আমি দৃঢ়ভাবেই বলতে চাই যে; ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকজনকে ভালোবাসেন। পাশে সাজিয়ে রাখা গোশালাটি দেখিয়ে তিনি বললেন এইতো আমাদের মত মানুষদের জন্য ঐশ ভালোবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ। এই ভালোবাসার অভিজ্ঞতায় প্রবেশের জন্য প্রয়োজন অন্তরের বিনম্রতায় বিশ্বাসভরা অন্তরে তাঁকে গ্রহণ করা। এখান থেকে যাবার পর আমার প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে আমি প্রার্থনা করবো তোমাদের জন্য।" একথা বলার সাথে সাথে পোপ মহোদয় নেমে গেলেন কয়েদিদের কাতারে। ভালোবাসার মোহনীয় ভঙ্গিতে আলিঙ্গন করতে থাকেন সবাইকে। সে এক অনুপম দৃশ্য! এসময় এক দাগী অপরাধী পুণ্যপিতার কাছে এগিয়ে এসে বললো জীবনে এমন কোন অপরাধ নেই যা আমি করিনি। ঈশ্বর কি আমাকেও ক্ষমা করবেন! অনুতপ্ত অপরাধীর এমন আকুতি শুনে পোপ মহোদয় তাকে দু'হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন, জড়িয়ে ধরলেন পরম আবেগে। অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকলো অনুতপ্ত অপরাধী কয়েদির দু'চোখ বেয়ে।

বড়দিন রাতে খ্রিস্টযাগের পরে বাড়ীর সবাই মিলে উঠানে জড়ো হয়েছে। ছোট-বড়, বুড়ো-বুড়ী, কাকা-কাকী সবাই মিলে জড়ো হল এবং তার ঠিক পাশেই বাড়ীর বাচ্চারা গোশালা বানিয়েছিল। বাবা আগেই বলে রেখেছিলেন, বড়দিনে সবার জন্য বিশেষ আকর্ষণ উপহার রয়েছে এবং তা দেওয়া হবে খ্রিস্টযাগের পর। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী পরিবারের সবার ছোট ছেলে কিংবা মেয়ে সবার হাতে উপহার তুলে দেবে। সেই দায়িত্ব পড়ল বাড়ীর সবার আদরের মেয়ে টুম্পার হাতে। সে সবার হাতে উপহার তুলে দেয়। সবশেষে একটা মাত্র উপহার বাকী থাকে এবং সেটাতে তারই নাম লেখা থাকে। সে চিন্তিত হয়ে ব্যাগের ভিতর আরো উপহার আছে কিনা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। তার বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি খুঁজছ? সবাই তো উপহার পেয়ে গেছে? ছোট মেয়ে উত্তর দেয় আজ তো শিশু যিশুর জন্ম দিন। আমি ভাবছিলাম তার উপহারটা কোথায়। মনে হচ্ছে সবাই যিশুর কথা ভুলে গেছে।

আমাদের মধ্যে বাস করার জন্য যিনি স্বর্গীয় মহিমা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন তাকে কিন্তু তাঁর আপনজনেরা গ্রহণ করেনি। যিনি আমাদের জন্যে রক্তমাংসের আকার নিয়েছিলেন তাঁর পুনরাবৃত্তি হয় প্রত্যেকটি খ্রিস্টযজ্ঞে। আমাদের সুযোগ থাকে প্রতিদিনের সেই খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার। যেখানে রুটি ও দ্রাক্ষারসের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব বিনিময় ঘটে। কিন্তু আমরা অধম পাপী মানুষ যারা তারা ঈশ্বরকে ভুলে থাকি। খ্রিস্টকে ভুলে আমরা অখ্রিস্টীয় যত কর্মযজ্ঞ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু তিনি আমাদের ভুলেন না। বরং তিনি আমাদের মধ্যে নতুন করে জন্মগ্রহণ করেন যেন আমরা তার সমরূপ হয়ে উঠতে পারি।

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের মধ্যস্থতায় আমরা সকলেই পরম পিতার অনুগ্রহ লাভ করি। কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে পিতার সমস্ত অনুগ্রহ ও সত্যের পূর্ণতা পেয়েছে। প্রভু যিশু হলেন ঐশানুগ্রহের ভাণ্ডার। তিনি বড়দিনে আমাদের শূন্য হৃদয় ঐশ অনুগ্রহে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিতে এই ধরাতলে নেমে আসেন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থে আছে 'আর

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

বড়দিনকে ঘিরে পুরনো কিছু কথা

ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং

আজ থেকে প্রায় পয়ত্রিশ বছর আগে কৃষক পরিবারে আমার জন্ম। চার বোন এবং তিন ভাইয়ের মধ্যে পরিবারে সবার ছোট আমি। বড় বোন ও ভাই বিয়ে করে সংসারি হয়েছেন। মেজো বোন সিস্টার হওয়ার মনোবাসনায় আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। বাকি ভাই-বোন আমরা বাড়িতে থেকে নিজেদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম। কৃষিনির্ভর পরিবার হওয়ায় চাষের জমি থেকে যে ধান আসতো, তাও অর্ধেকের বেশি বর্গাচাষীরা নিয়ে যেতো ঠকিয়ে ও নানান অজুহাতে। ফলে, ধানের গোলা বেশির ভাগ সময়ই খালি পড়ে থাকতো, বছরজুড়ে খাদ্য সঙ্কট লেগেই থাকতো। এদিকে, বছরের বাকিটা সময় বাবা-মা সহ সবাই মিলে অন্যের জমিতে কাজ করে যে রোজগার করতেন তা দিয়েই মূলত সংসার চলতো। এতো অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের প্রতি মা-বাবার ভালোবাসা ও যত্নাদির কমতি ছিলো না। ঘরে অভাব-অনটন, গায়ে পুরনো জামা-কাপড় ও পায়ে ছেড়া জুতো থাকলেও মনে কোন আক্ষেপ না নিয়েই বড়দিন ঘিরে থাকতো সীমাহীন আনন্দ। এই উৎসবকে ঘিরে পরিবারের সকলের মাঝেই বিরাজ করতো আনন্দ, ভালোবাসা ও সহভাগিতা। এভাবেই সেকালের গ্রামীণ জীবন আবর্তিত হতো তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার চাঁদোয়ায়।

শৈশবে যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব পালনের স্মৃতিগুলো আজও অক্ষয়। যদিও একেক বছর একেক রকম করে বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করা হতো। অবশ্য, সময় ও বয়সের পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কারণেও বড়দিন উদ্‌যাপন ভিন্ন মাত্রা পেতো। যিশুর জন্মের সময়কালের কথাই ধরা যাক। সাধু যোসেফ এবং মারীয়া নাম লেখানোর জন্য যখন বেথলেহেম শহরে যান, নগরবাসীরা কেউই জানতেন না যে মুক্তিদাতার আগমন সন্নিকট। তখন বেথলেহেমবাসী ব্যস্ত সময় পার করছিলেন, কেউ আত্মীয়-স্বজন ও অতিথিসেবায় রত; কেউ বা সরাইখানা বা হোটেল সামলাতে ব্যস্ত ছিলো। কতিপয় রাখাল এবং প্রাচ্যের তিনজন পণ্ডিত ছাড়া যিশুকে বরণ করার কেউই ছিলো না। এদিকে, আমি যে গ্রামে বেড়ে উঠেছি, সে গ্রামেও বড়দিনকে ঘিরে লোকজনের মাঝে যে ব্যস্ততা বিরাজ করতো তা বেথলেহেমের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলো না। আতিথেয়তা ও নানাবিধ ব্যস্ততায় বড়দিন কবে শেষ হয়ে যেতো তা টের পাওয়া যেতো না। শৈশবে আমিও ব্যস্ত থাকতাম নানাবিধ পরিকল্পনায়। তবুও চেষ্টা করতাম বড়দিনকে যথাযথ ভাবে পালন করতে। গ্রামবাসীদের মধ্যেও বড়দিনের আগে অসম্পূর্ণ কাজ সেরে ফেলার ব্যস্ততা ছিলো লক্ষ্যণীয়। অন্যদিকে, ২০-২৪ ডিসেম্বরে শহরে কাজ করা আত্মীয়-পরিজনদের বাড়ি ফেরার হিড়িক পড়ে যেতো। তাদের এগিয়ে নিয়ে আসতে মাঝপথে কিংবা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বসে অপেক্ষা করতাম। প্রতিবেশিদের কেউ শহর থেকে আসলে সেখানেও কৌতুহলী মন নিয়ে ছুটে যেতাম। দেখতাম, শহর থেকে বাড়ির লোকদের জন্য তারা কি এনেছে। বড়দিন নিকটে আসলেই এমন অনেক ফেলে আসা ঘটনার কথা মনে পড়ে বার-বার।

বড়দিন উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা ২৪ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২৫ ডিসেম্বর শেষ হলেও এর প্রস্তুতি চলতো কয়েক মাসব্যাপী। জুন-জুলাই মাসে অনেক ছেলে-মেয়ে এবং যুবক-যুবতীরা নিজ উদ্যোগে কাজ করে নিজের পছন্দের জিনিস কেনার টাকা সঞ্চয় করতো। বোরো ধান লাগানোর মৌসুমে গ্রামের সকলেই স্বতস্ফূর্তভাবে একজন-আরেক জনের ধান লাগানো, ঘাস তুলে ফেলা এবং পাঁকা ধান কাটায় সাহায্য করতো। ধনী ও প্রভাবশালীরা বিনিময়ে কিছু টাকাও দিতেন। সম্মিলিতভাবে আয়কৃত টাকা দিয়েই বড়দিনের বাদ্য-যন্ত্র মেরামত এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে সংগ্রহ করে রাখতো। নতুন আমন ধান গোলায় তোলার পরপরই শোবার ঘর মেরামতের কাজে মন দিতো সবাই। বাঁশের বেড়া নতুন করে বানানো এবং নতুন খড় দিয়ে ঘর ছাউনি দেয়ার ব্যস্ততা চলতো গ্রামজুড়ে। তবে, ঘর ছানি দেওয়ার কাজে ছোটরাও ধানের আটি ঢেল মেরে উপরে হাতের নাগালে পৌঁছাতে কম-বেশি সাহায্য করতো। কাজ শেষে বাড়ির কর্তা সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন। পরিবার বিশেষে মুরগী, কচ্ছপ বা শুকরের তরকারি রান্না হতো যা সবাই তৃপ্তিসহকারে খেতো। ঘর ছাউনি দেওয়ার কাজ শেষ হলেই বাড়ির কর্ত্রী ঘর লেপ দেয়ার কাজে হাত দিতো। গোবর দিয়ে কাঁদার প্রলেপ বানিয়ে মাটির ঘর অতি সুন্দররূপে সাজিয়ে তুলতেন তারা। এলাকায় বাড়ি বড় হলেও বিনাশ্রমে সবাই কাজ করতো, পরবর্তীতে দেনা শোধ করার মত করেই অন্যদেরকেও সাহায্য করার রীতি প্রচলিত ছিলো। বাড়িতে অতিথির আগমন ঘটলে আত্মীয়-স্বজনকে নিজের শোবার ঘরে ঘুমোতে দিয়ে নিজেরা বাইরে খড় বিছিয়ে ঘুমাতেন। এমন উদারতার সাথে অতিথি আপ্যায়ন করতে আজকাল দেখা যায় না বললেই চলে।

বড়দিনের আগের এবং শেষ রবিবারে গ্রামের হাঁট-বাজার বেশ জমে উঠতো। কারণ সাপ্তাহিক এ বাজার ছাড়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহজে পাওয়া যেতো না। তাই বাবা-মার হাত ধরে বাজারে যেতাম কত-শত জিনিস কেনার স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে। বাজারের কাছাকাছি গেলেই পাগল করানো একটা ঘ্রাণ নাকে আসতেই মনটা আনন্দে ভরে উঠতো। মা-বাবা নতুন জামা হিসেবে টেট্রনের কাপড় কিনে দিতেন। তখনকার দিনে প্লাস্টিকের সাদা জুতো পাওয়া যেত। পকেটে টাকা থাকলে এ দোকান থেকে সে দোকান ঘুরে বাবা কিনে দিতেন সেই এক জোড়া সাদা জুতো। এসব পরেই বড়দিনে আনন্দ প্রকাশ করতাম, সাথে থাকতো আতশবাজিও। তখনকার ছেলে-মেয়েদের কাছে আতশবাজির মধ্যে ফুটকা, রসুন বোমা, হাত বোমা এবং ঝারবাতি বেশ জনপ্রিয় ছিলো। বাজার থেকে আতশ এনে মাঝে-মধ্যে রোদে দিতাম এবং অপেক্ষা করতাম ২৫ ডিসেম্বরের রাতে পোড়ানোর

জন্য। এসব আতশবাজি কেনার জন্যও ব্যক্তিগতভাবে টাকা জমিয়ে রাখতাম। অনেক সময় ধান অতিরিক্ত পেকে যাওয়ার পর এবং ধান কাটার সময় অনেক ধান মাটিতে পড়ে থাকতো। পরবর্তীতে, সেগুলো কুড়িয়ে বিক্রি করে কিছু টাকা হাতে পেতাম, তা দিয়েই হাজারো জিনিস কেনার প্রত্যাশা করতাম।

বড় ভাই এবং দিদিরা ২৪ ডিসেম্বর স্নান সেরে দিনের বেলা ঘুমিয়ে নিতে বলতো, যেন মধ্যরাতের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পারি। বিকেল হওয়ার আগেই সমবয়সীদের বলে-কয়ে দল ভারী করে নিতাম মাঝরাতের খ্রিস্টযাগে একসাথে যাবার জন্য। গির্জায় ভালো জায়গা পাওয়ার আশায় রাত বারোটার অনেক আগেই চলে যেতাম সবাই। মেঝেতে চট বিছানো থাকতো, সেখানে বসেই অনেক বছর পর্যন্ত খ্রিস্টযাগ করে এসেছি। কনকনে শীতের রাতে জড়োসরো হয়েই খ্রিস্টযাগ করতাম। খ্রিস্টযাগের এক পর্যায়ে যখন গাওয়া হতো "শীত মাঝে এলো বড়দিন, এলো বুঝি ফিরে", তাল-লয় অমিল থাকলেও সে গানগুলো মন খুলে গাইতে চেষ্টা করতাম। খ্রিস্টযাগ শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেকে রাখালদের মতো ভাবতাম। আকাশ পরিষ্কার থাকতো, দূর আকাশে তারাও দেখা যেতো। তারাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, কোন তারাটি যে রাখালদের দেখা দিয়েছিল! কোন এক নাম জানা বড় তারাটিকে দেখে ভাবতাম, বোধহয় সেই তারাটিই রাখালদের সামনে উদিত হয়ে রাখালদের জানান দিয়েছিল যিশুর জন্ম সংবাদ। স্বর্গদূতদের কাছ থেকে যিশু খ্রিস্টের জন্ম সংবাদ পেয়ে রাখালেরা যেমন গোশালায় ছুটে গিয়েছিল। তেমনি আমিও মনে আনন্দ নিয়ে গির্জায় যেতাম, সুন্দর করে সাজানো গোশালায় যিশুকে চুম্বন করতাম। বড়দিন উৎসবের আনন্দকে দ্বিগুন করে খুশিমনে বাড়ির পথে রওনা দিতাম। ফেরার সময় কোন আত্মীয়দের বাড়িতে পিঠার ঘ্রাণ পেলেই সেখানে গিয়ে খেয়ে চলে আসতাম। কারণ সকালের খ্রিস্টযাগে যাবার জন্যে অনেকেই ভোরবেলা পিঠা বানানোর কাজ সেরে নিতো। তখনকার দিনে গ্রামীণ গারো নারীরা বড়দিনে হরেক রকম পিঠা-পুলি বানাতো কিন্তু কাউকে নিমন্ত্রণ দেয়ার প্রয়োজন হতো না। সবাই নিজের মতো করে এসে খেয়ে যেতো। সবার মাঝেই আপনত্বের বন্ধন ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো।

রাতের ও সকালের খ্রিস্টযাগে আলাদা-আলাদা আনন্দ পেতাম। তাই কোনটাই বাদ দিতে চাইতাম না। শীতের সকালের কাঁচা ঘুম সহজে ভাঙতো না, কিন্তু দাদা-দিদিরা জোর করেই জাগিয়ে তুলতেন। কষ্ট হলেও ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে গরম পিঠা দিয়ে নাস্তা করে নিতাম। অনেকেই মাইল দশেক দূর থেকেও পায়ে হেঁটে বা সাইকেলযোগে সকালের খ্রিস্টযাগে আসতেন। গ্রামের মানুষজন ব্যস্ত থাকলেও খ্রিস্টযাগ কখনও বাদ দিতেন না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার কষ্টকেও তারা কিছু মনে করতেন না। বর্তমানে এমন নিবেদিত ও ধর্মপ্রাণ মানুষের বড়ই অভাব। অন্যদিকে, সকালের খ্রিস্টযাগে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায় মিলন মেলার মতো মনে হতো। মিশন প্রাঙ্গনের বাইরে বড় ধরণের মেলাও বসতো। মেলার মূল আকর্ষণ ছিলো ছোটদের জন্য যা আমার ও সমবয়সীদের জন্য লোভনীয় ছিলো। খেলার পুতুল থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুই পাওয়া যেতো সে মেলায়। আমাদের মত ছোট ছেলে-মেয়েরা বাহাড়ি রঙের বেলুন, বাঁশি, পুতুল, গাড়ি ও নানা রকম খেলনা কিনতো। তবে, কেনা-কাটায় বড়রাও বাদ যেতো না। বড়রা সংসারের কাজে লাগে এমন কিছু জিনিস কিনে বাড়ি ফিরতেন। খ্রিস্টযাগের পর বা কীর্তন প্রতিযোগিতা না থাকলে মেলাতেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। বড়দিনকে ঘিরে সব কিছুই আনন্দময় ও উপভোগ্য ছিলো।

তখনকার দিনে বড়দিন উপলক্ষে গ্রামে সংকীর্তন করার রীতি ছিলো, যা এখনও আছে। অনেক গ্রাম ও ধর্মপল্লীতে ২৪ ডিসেম্বর রাতেই সংকীর্তন করে নিশি জাগরণ করেন। তবে, আমার ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিত এবং গ্রাম প্রধানের নির্দেশে ২৫ ডিসেম্বর নিশি জাগরণ ও সংকীর্তন করা হতো। কারণ ২৪ ডিসেম্বর সারা রাত জাগলে পরদিন সকালে খ্রিস্টযাগে মানুষ আসতে পারতো না, আবার অনেকে আসতেনও না। রান্না-বান্না এবং খাওয়া-দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। ২৫ ডিসেম্বর সকালের খ্রিস্টযাগ থেকে আসার পরই সংকীর্তনে গোটা গ্রাম বেরিয়ে পড়তাম। কারণ গ্রাম বড় হওয়ায় সারা রাত বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সংকীর্তন করলেও শেষ করা সম্ভব হতো না। বেশির ভাগ সময় সকাল অবধি সংকীর্তন করতে হতো। আমরা যারা বয়সে এবং সাইজে ছোট, তারা বাজনা এবং গানের সাথে তাল দিতে জানতাম না; আমরা কীর্তনের মাঝখানে যে ফাঁকা স্থান তৈরি হতো, সেখানে ঢুকে পড়ে বড়দের দেখাদেখি আনন্দ প্রকাশের চেষ্টা করতাম। ছোট-বড় সবাই মিলে সংকীর্তন করায় উঠানে জায়গা হতো না। আশেপাশের গ্রামও গারো এবং খ্রিস্টান হওয়ায় সুমধুর কীর্তন ও ঢোলের আওয়াজ শোনা যেতো। কোন-কোন গ্রামে বড়দিনের জন্য সংকীর্তন মাসব্যাপী অনুশীলিত হতো। অনেকেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গান গাইতেন। সংকীর্তনের মাঝখানে হ্যাজাক বাতির জন্য পাম্প করা হতো। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে আমরা সবাই হ্যাজাক বাতির চারদিকে বসতাম। বাজার থেকে যেসব আতশ কেনা হতো, সেগুলো পোড়ানোর জন্য বেরিয়ে পড়তাম সদলবলে। ক্ষণে-ক্ষণে আতশবাজির বিকট শব্দে কেঁপে উঠতাম। একালের ছেলে-মেয়েরা হয়তো সেকালের মত আতশবাজি করে না, প্রযুক্তির প্রভাবে সবাই মোবাইল ফোন নিয়েই ব্যস্ত।

এরপর অনেক বাড়িতেই সংকীর্তনের পর পিঠা বা গরম চা খেতে দিতেন। পেট ভরা থাকলে অনেক সময় প্লাস্টিকের ব্যাগে পিঠাগুলো ভরে রেখে দিতাম। পরে সবাই মিলে ভাগ করে খেতাম। সারা রাত সংকীর্তন করার পর সকালে ঘরে ফিরেই ঘুমিয়ে পড়তাম। দুপুরের খাওয়ার জন্য একদিন আগে থেকেই অনেকগুলো কলা গাছের খোল থেকে থালা বানিয়ে রাখা হতো। সেগুলোই ২৬ ডিসেম্বর দুপুরে খাওয়ার জন্য প্লেট হিসেবে ব্যবহার করতাম। তরকারির ঝোল গড়িয়ে গেলে ভাত দিয়ে আটকে রাখার প্রয়াস করতাম। দুপুরে খাওয়ার পর সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদি হিসেবে যে পরিবার প্রতিশ্রুতবদ্ধ হতো পরের বছর সমাজের জন্য খাওয়াতে, সেই বাড়ির উদ্দেশে কীর্তন সহযোগে ও শুকরের আস্ত এক পা কাঁধে বহন করে সবাই রওনা দিতাম। সাথে থাকতো গারোদের ঐতিহ্যবাহী পানীয়, তরিতরকারি এবং বিন্নি চালের ভাত। সেগুলো আবার সবাইকে খাওয়ানো হতো। এই রীতি ও ঐতিহ্য গারো সমাজে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

এদিকে অপ্রিয় বাস্তবতা হলো, রাত পোহালেই শহরবাসীরাও বড়দিনের আনন্দ সঙ্গে নিয়ে শহরের পানে ছুটে চলেন। সীমিত ছুটি থাকায় ফিরে যেতে হয় নিজ-নিজ কর্মস্থলে। এভাবেই যেন বড়দিনের আমেজ ও মিলনের আনন্দ শেষ না হতেই পরিবারে সদস্যদের বিদায় জানাতে হয়। অনেকেই বছরে বড়দিন উপলক্ষে একবার গ্রামে আসেন, গ্রামে থাকা বৃদ্ধ মা-বাবা, পরিবার-পরিজনদের সাথে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে পারেন না। এতে, বৃদ্ধ মা-বাবা ও স্বজনদের মধ্যেও কিছুটা আক্ষেপ থেকে যায়। গ্রামের বাড়িতে অনেকেই একাকী ও স্বজনহীন অবস্থায় বড়দিন করেন, তাদের আনন্দ ফিঁকে হয়ে যায় মেহেদিপাতার মতোই। রং গাঢ় হওয়ার আগেই যেন ধুয়ে ফেলতে হয় এক প্রকার বাধ্য হয়েই। তারপরও বড়দিন উৎসবকে আনন্দময় করে তোলা মানুষের সক্ষমতার উর্ধ্বে নয়। নিজ-নিজ অবস্থান থেকেই আমরা বড়দিনকে আনন্দ, মিলন ও একাত্মতা এবং সহযোগিতার উৎস হিসেবে তৈরি করে নিতে পারি। শত ব্যস্ততা এবং প্রতিকূলতার মাঝেও বড়দিন উপলক্ষ্যে

আমরা আমাদের হৃদয়ে স্থান করে দিতে পারি যিশু এবং মানুষকে। যেভাবেই বড়দিন উদ্‌যাপন করি না কেন, তা যেন যুগ-যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখে। গত পঁয়ত্রিশ বছরে সময়ের গতিশীলতার সাথে বদলে গেছে বড়দিন উদ্‌যাপনের গারোদের গ্রামীণ ঐতিহ্য ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদিও। বড়দিনে সকলের প্রচেষ্টা থাকুক নিজ জাতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে ঐতিহ্যগত সংশ্লিষ্টতা রেখে বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করা। তবেই, বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করার তাৎপর্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে, ছোটবেলায় বড়দিনকে ঘিরে গারোদের গ্রামীণ জনপদে যে আমেজ বিরাজ করতো, যেভাবে সম্মিলিত উদ্যোগে উদ্‌যাপন করা হতো তা সময়ের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এই উৎসবকে ঘিরে কাটানো ধূলোমাখা স্মৃতিগুলো বেদনাতুর করে তোলে। গ্রামের মানুষ বড়দিনকে কেন্দ্র করে যে উদারতা ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতো, তা যুগের সাথে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বর্তমানে মুক্ত মনের মানুষের বড়ই অভাব। বড়দিনে সবাই ব্যক্তিগত আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। বড়দিনের মতো সামাজিক একটি উৎসব দিন-দিন ব্যক্তিগত আনন্দ উৎসবের রূপ নিচ্ছে। কারণ হিসেবে ধরে নেয়া যায়, ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়ণ, মানুষের মাঝে কর্মব্যস্ততা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং উদাসীনতা যা বড়দিনের আনন্দ সহভাগিতায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও ভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশির সহাবস্থান এবং নিরাপত্তাহীনতাও অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া, এখনকার ছেলে-মেয়ে সহ বড়রাও ধর্মীয় রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য রক্ষা ও পালনে তেমন আগ্রহী নয়। যেমন: রাতের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা এবং সংকীর্তনে ছোট-বড় সকলের অনাগ্রহতা, আবার বাড়িতে কীর্তন দলের আগমনে নির্লিপ্ততার পরিচয় দেয়া, লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা, সামান্য সৌজন্যতা বা বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময়ে অনাগ্রহতা ইত্যাদি। বড়দিন বাড়িতে একত্রে রান্না-বান্না করে খাওয়ার মধ্যে যে অপরিসীম আনন্দ আছে তা বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় না। বড়দিন বাড়ির কর্তাকেই একাকী সব কিছুর ভার বহন করতে হয়। অনেকেই খরচের কথা ভেবে অংশগ্রহণও করতে চায় না। বোঝা যায় যে, বড়দিনকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি গৌণ হয়ে অর্থনৈতিক প্রভাবই মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। মূলকথা হলো, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে বড়দিনকে ঘিরে সকল আয়োজন ও আড়ম্বরতা পরিবর্তিত হোক এটাই কাম্য ॥

২৮ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে, আজ চলরে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।' তাই তো ছোট-বড়, পাপী-সাধু, ধনী-নির্ধন সবাই বড়দিনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পেতে চায়।

গোশালায় যিনি শুয়ে আছেন তিনি কোন সাধারণ শিশু নন তিনি সর্বোত্তম, সর্বশক্তিমান, সনাতন পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র। গোলাশায় শিশুর জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করতে পারি ঈশ্বর মানুষ হবার অপূর্ব কাহিনী। তিনি যে দীনবেশে গোলাশায় জন্ম নিলেন এর অর্থ তাঁর নির্মল স্বভাব। বাণী হলেন রক্তমাংসের মানুষ, বাস করতে লাগলেন আমাদের মাঝখানে। দেহটি দুর্বলতার প্রতীক, পাপের অধীনে থাকে, কিন্তু ঈশ্বর পুত্রের মানব দেহধারণ তাঁর উপর পাপের কোন কর্তৃত্ব নেই। তাঁর নির্মল স্বভাব না থাকলে তিনি খড়-বিছালীর গোশালায় জন্ম নিতে পারতেন না।

প্রভু যিশুর জন্ম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মানবের প্রতি ঈশ্বরের অপরিসীম ভালোবাসার কথা। ঈশ্বর আমাদের এতই ভালোবাসেন যে তার একমাত্র পুত্রকে আমাদের উদ্দেশে দান করে দিলেন। এর অর্থ তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন এবং আমাদের দুঃখ-কষ্টের সমব্যথী হন। এই তো বড়দিনে বড় আনন্দের বিষয়। আমাদের আনন্দ লাভের পরম ধন। আমাদের উচিত সব মান-অভিমান ভুলে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলি শ্রী যিশুর জন্মদিন, তোমার আমার বড়দিন।

একটি ছোট মেয়ে যখন থেকে বুঝতে শিখেছে তখন থেকে প্রতিবছর ঠাকুমা'র সাথে বিভিন্ন গির্জায় যায় গোশালা দেখতে এবং শিশু যিশুকে প্রণাম জানাতে। ঠাকুমা গোশালা দেখে অনেক আনন্দ পায় আর নাতনিকে বলে অনেক সুন্দর হয়েছে। কিন্তু ছোট মেয়ে জবাব দেয় ঠাকুমা ছোট যিশু তো একই রকম দেখতে। বড় হয় না কেন? ছোট শিশুর মনে এমন প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কেননা শিশু জন্ম নিলে সে তো ধীরে ধীরে বড় হওয়ারই কথা। প্রতিবছর সে শিশু যিশুকে এ রকম ছোট-ই দেখে।

আমরা যদি আমাদের হৃদয় বড় না করি তাহলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই যিশু ছোট হয়ে থাকে। আর ছোট হৃদয়ে আমার বেশী মানুষকে জায়গা দিতে পারি না। বড়দিনের অন্যের সাথে আমাদের আনন্দ সহভাগিতা করতে পারি না। বড়দিনে স্বর্গের ঈশ্বর পৃথিবীতে নেমে এলেন কিন্তু আমরা মান-অভিমান ভুলে পাশের বাড়ীতে প্রতিবেশির কাছে কিংবা ভাইয়ের কাছে যেতে পারি না। ভাইয়ের সাথে মিলতে পারি না। আমাদের হৃদয়ে ঘৃণা, রাগ-ক্ষোভ, অহংকার পুষে রাখি। এগুলো বহন করার অর্থ আমরা যিশুকে কারাগারে বন্দি করে রাখি, আমরা নিজেরাও তখন ছোট হয়ে থাকি। এ বছর আমরা প্রত্যেকে যেন আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিয়ে প্রথমত যিশুকে বলতে পারি- শুভ জন্মদিন যিশু, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

দ্বার খোল

সপ্তর্ষি

ধুলার মাটিতে জীর্ণ-শীর্ণ গোয়াল ঘরে
এসেছি আমি ধরার মাঝে মানববেশে
বরণ ডালা হাতে নিয়ে এসো হে বন্ধু
বরণ কর মোরে তোমার হৃদয়ে মন্দিরে।

চাই না আমি যত অমূল্য ধন রত্ন
দেখতে চাই বিনম্র আর পবিত্রচিত্ত
থাকবে না যেথা অহংকার দাম্ভিকতা
থাকবে শুধু অন্তরে অসীম ভালোবাসা।

সোনা রূপা আর যত দামী সম্পদ
সবই যে আমার কাছে ধুলার সম
গড়েছে জীবন যে পূণ্যের কাজে
বাস করবো আমি তার অন্তরে।

ফুটপাতে এখনও কত মানুষের বসবাস
ক্ষুধার্ত শিশুদের অনাহারী হাহাকার
ভালোবাসে না কেউ তাদের কাছে ডেকে
দুঃখিনী নারী চালের অভাবে খুদ রাঁধে।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ চারিদিকে
করছে সবাই বড়দিনে মিথ্যে আনন্দ
বড়দিন সত্যিকারের বড় করে তোল
যদি ভালোবাসার হৃদয়ের দ্বার খোল।

বড়দিন : বড় হয়ে ওঠার দিন

(পবিত্র বাইবেলের আলোকে ঘটনা ও অনুধ্যান)

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

বড়দিন যখনই আসে, মানুষের অন্তরে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে আসে। বড়দিন একটি ইতিহাস, একটি ঘটনা ও একটি মহোৎসব। এই ইতিহাস ও ঘটনা হলো ঈশ্বর স্বয়ং মানুষকে ভালোবেসে এই পৃথিবীর মানুষের মাঝে বাস করতেই নেমে এলেন এবং মানুষের মাঝে বাস করলেন। এক কথায় বলা যায়, বড়দিনে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এতো উদযাপন তা হল ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণ এবং এই পৃথিবীতে আগমন; কারণ, গোটা মানব জাতির মুক্তি সাধন। পাপের বন্ধন থেকে মুক্তি। *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ৪৬৪ থেকে ৪৬৭ অনুচ্ছেদ)*।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস তত্ত্ব: নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রে উল্লেখ আছে আমাদের মানবকুলের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশে স্বর্গ থেকে তিনি অবরোহন করলেন। এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করলেন এবং মানুষ হলেন" *(খ্রীষ্টযাগ রীতি: প্রভুর স্মরণ-উৎসব প্রষ্ঠা ১৫)*

যোহনের মঙ্গলসমাচারে আছে: বাণী "মাংস" হলেন। ঈশ্বরপুত্র আমাদের পরিত্রাণের কার্য সম্পন্ন করার জন্য মানবদেহ ধারণ করলেন *(হিব্রুদের প্রতি ধর্মপত্র ১০ অধ্যায় ৫ থেকে ৭ পদ)*। এই দেহধারণ রহস্য বিশ্বাস করা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের অনন্য বৈশিষ্ট্য *(কা.ম.ধ.শি ৪৬৪-৪৬৭)*।

তবে তাঁর ঈশ্বরত্ব ও প্রভুত্ব বিসর্জন না দিয়ে তিনি প্রকৃত মানুষ, আমাদের ভাই হয়েছেন *(কা. ম. ধ. শি. ৪৬৯)*

অভিনব জন্ম: নিষ্কলঙ্কা অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার গর্ভে ঈশ্বরপুত্র যিশুর গর্ভাগমন। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ। ২০২৪ বছর পূর্বে বেথলেহেমে মারীয়া ও যোসেফের আগমন নাম লেখাবার জন্য। সময় হয়ে যায় যিশুর জন্ম নেবার। কোথাও স্থান না পেয়ে শেষে গোশালায় *(লুক ২ অধ্যায় ৫ পদ)*।

অনুধ্যান: জন্মলগ্ন থেকেই যিশু দারিদ্রকে আলিঙ্গন করলেন। সবাই প্রত্যাখ্যান করে। অসহায়ের মতো মা মারীয়া ও যোসেফ জায়গা খোঁজেন, পায় না; শেষ আশ্রয় গোশালা।

আমরা দরিদ্র, গরীব, "সংখ্যালঘু" ব'লে আমাদের আখ্যায়িত করে। জিনিসপত্রের দাম অনেক। আমরা বর্তমান বাংলাদেশের সবই মেনে নিচ্ছি। আমরা হয়ে উঠছি সেই দরিদ্র যিশু। এই যিশু হয়ে ওঠাই বড়দিনের আহ্বান।

গোশালায় নবজাত যিশু: দামী পোশাক নয়, যাবপাত্র, খড়কুটো। যিশুর নিঃস্বতা ও অনাসক্ত জীবনের কথাই বলে *(লুক ২ অধ্যায় ৭ পদ)*।

অনুধ্যান: বর্তমান জগত ভোগবাদে পূর্ণ। মানুষের ভোগ করার, অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, পদ-পদবী লাভ করার তীব্র অভিলাসের যেন শেষ নেই। কোটি কোটি অর্থ পাচার, অট্টালিকাসম শত অবকাঠামো, এগুলোর যেন শেষ নেই। কাকে মেরে কে উচ্চ শিখরে উঠবে, ধন-সম্পদের পাহাড় গড়বে এর শেষ নেই। আমার মধ্যে মনোভাবে, কথায়, কাজে আচরণে কি এমন ভোগবাদ আছে কি? আমি কিসে আসক্ত?

দু'হাত বিস্তার করে আছেন শিশু যিশু: সবাইকে আলিঙ্গন করছেন। তাঁর কাছে সবাই সমান; সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পাপী-তাপী সবাই তাঁর বন্ধু। তাঁর অন্তর/হৃদয় সবার জন্য উন্মুক্ত। তাঁর ভালোবাসা সার্বজনীন, বৈষম্যহীন *(লুক ২ অধ্যায় ১২ পদ)*।

অনুধ্যান: আমার মনোভাব কেমন? আমার আচরণে কি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করে? আমি কি মাত্র আমার পছন্দের মানুষগুলোকে অন্তরে স্থান দেই? যারা তৈলমর্দন করে, অহেতুকভাবে বা স্বার্থের টানে অতি মাত্রায় প্রশংসার বাণীর ছন্দ উপস্থাপন করে, আমি কি তাদেরই শুধু কাছে রাখি? আমি কি ব্যক্তিত্বে যারা 'নরম' তাদেরকে কথা দ্বারা ঘায়েল করে তাদের জব্দ করি ও দূরে রাখি? আমরা যেন যিশুর দু'হাতের উপর ধ্যান করে প্রতিদিন সবাইকে ভালোবাসা, স্বীকৃতি, সম্মান দিতে শিখি এই মূল্যবোধ বাস্তবায়ন করতে করতে।

গোশালা, পান্থশালায় কোন জায়গা জোটেনি *(লুক ২ অধ্যায় ৭ পদ)*।

অনুধ্যান: যিশুর চারিদিকে গরু-ছাগল-ভেড়া; আছে রাখালদল। সবার সাথে যেন এক সম্প্রীতির বন্ধন। কাউকেই বহির্ভূত রাখেন না; সবার সাথে যেন এক গভীর মিলন। এইভাবেই যেন প্রবক্তা ইসাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা: "তখন নেকড়ে বাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে, চিতাবাঘ শুয়ে থাকবে ছাগলছানার পাশে। বাছুর আর সিংহের বাচ্চা একসঙ্গেই চরে বেড়াবে; গরু আর ভাল্লুক তখন মিলেমিশেই থাকবে, তাদের বাচ্চারাও পাশাপাশি শুয়ে থাকবে" (প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ ১১ অধ্যায় ১ থেকে ১০ পদ।

অনুধ্যান: সবার সাথে আমি কি মিলন, শান্তি সম্প্রীতি রাখতে পারি? পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে সবার সাথে কি আমার মিলন-বন্ধন রয়েছে? "চলতে নারী তার চলন বাঁকা" আমি কি কারো বা কয়েকজনের সাথে একবারেই মিলতে পারি না? সবসময়ই কি তার/তাদের দোষ ধরি? সৃষ্টির সাথে কি আমার সম্প্রীতির বন্ধন রয়েছে নাকি ঈশ্বরের এই সুন্দর সৃষ্টিকে নষ্ট করি? আসুন যিশুর মত সবার সাথে সম্প্রীতি-সংলাপে আবদ্ধ হই নিত্যদিন। সম্প্রীতি ও শান্তির মানুষ হয়ে উঠি।

রাখালদের কাছে স্বর্গদূত এক আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করেছিল: ভয় পেয়ো না! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দায়ুদ-নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন---তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু" *(লুক ২ অধ্যায় ১০ ও ১১ পদ)*।

অনুধ্যান: আমি আমার কথা ও আচরণ দ্বারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কি আনন্দের সংবাদ বহন করি? আমার পরিবারে, প্যারিশে, সমাজে আমি কি আমার ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব দ্বারা যিশুর আগমনের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করি? আসুন আমরা সেই স্বর্গীয় দূত হয়ে উঠি, মঙ্গলবাণীর ঘোষক হয়ে উঠি।

রাখালেরা প্রথম যিশুর দর্শন পেয়েছিল: প্রথম যিশুর জন্মসংবাদ পেয়েছিল *(লুক ২ অধ্যায় ৮ থেকে ১২ পদ)*।

অনুধ্যান: কোন উচ্চ পদস্থ মহা উপাধিধারী ব্যক্তি নয়, কিন্তু সেই অতি নম্র-সহজ-সরল রাখালেরাই যিশুর দর্শন পেয়েছিল। আমরা যখনই নম্র হই, বিনীত হই, সহজ-সরল-স্বচ্ছ হই, বলা যায় সেই রাখালদের মত হয়ে জীবনযাপন করি তখনই যিশুর দেখা পাই; যিশু হয়ে ওঠেন আমাদের ভাই ও বন্ধু। বর্তমান জগতে এমন 'রাখাল' হয়ে

ওঠা ভীষণ প্রয়োজন পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে, আমাদের বাংলাদেশে। আসুন রাখাল হয়ে উঠি।

স্বর্গদূতবাহিনী গেয়ে উঠেছিল: "জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে" *(লুক ২ অধ্যায় ১৪ পদ)*।

অনুধ্যান: বর্তমান জগতে, বর্তমান বাংলাদেশে অশান্তি বিদ্যমান। ক্ষমতার যুদ্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেন্ট গ্রেগরী স্কুল ও কলেজসহ বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বহু সরকারী ভবন, বাস ও অন্যান্য যানবাহন ধ্বংস, মানবনিধন, সম্পদ-চুরি এমন আরো অনেক লোমহর্ষক ঘটনার কবলে পড়ে বাংলার মানুষ হতভম্ব; নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে অশান্তি ও টেনশনে বাংলার মানুষ। শান্তি নেই!! এই অবস্থায় এবারের বড়দিন! শান্তিরাজ যিশুর আহ্বান : শান্তি ও সম্প্রীতির আহ্বান। আসুন, শান্তির মানুষ হয়ে উঠি অন্তরে ও জীবনে।

বাণী দেহধারণ করলেন, আমাদের মাঝে বাস করলেন *(যোহন ১ অধ্যায় ১৪ পদ)*

অনুধ্যান: এই বাণী (হিব্রু ভাষায় *দাবার*, গ্রীক ভাষায় **'লগছ'**) ঈশ্বরের পরিকল্পনা, ইচ্ছা; মানবজাতির জন্য মুক্তির পরিকল্পনা, তথা ঈশ্বর মানুষ হলেন। এতো নম্র হলেন: উর্ধ্ব থেকে একদম নিম্নে এলেন আমাদের ভালোবেসে আমাদের মতোই পূর্ণ মানুষ হলেন তাঁর ঈশ্বরত্বকে অক্ষুন্ন রেখেই *(ফিলিপ্পীয় ২ অধ্যায় ৬ থেকে ৮ পদ)*। তিনি আসলেন আমাদের মাঝে বাস করতে *(যোহন ১ অধ্যায় ১৪ পদ)*।

অনুধ্যান: আমার জীবনটা কি একটি মঙ্গলবাণী? আমার জীবনটা কি শান্তি-সম্প্রীতিতে ভরা? আমার কাছের মানুষগুলো কি শান্তি অনুভব করে? নিজের অনেক কিছুকে ত্যাগ করে হলেও আমি কি শান্তি রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালাই? আমি কি আমার জীবন দ্বারা অপরকে শান্তি দান করি? নাকি মানসিক নির্যাতন করি? আসুন, শান্তির মানুষ হয়ে ওঠি।

তিনি আমাদের মধ্যে বাস করবেন আমরা যদি তাঁর জন্যে আবাস নির্মাণ করি। মা মারীয়ার অন্তর নির্মল, পবিত্র। আমাদের মন-অন্তর, আচার-ব্যবহার, সত্য-সুন্দর, পবিত্র, স্বচ্ছ-পবিত্র, তবেই নবজাত যিশু আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে ও জীবনে জন্ম নিবেন ও বাস করবেন।

আকাশে জ্বলে উঠেছিল এক উজ্জ্বল তারা। তিনি আলো হয়ে এসেছিলেন *(যোহন ১ অধ্যায় ৯ পদ)*।

অনুধ্যান: পাপ মানুষের অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে তোলে। অবচেতনায় মানুষ অন্ধকারে বসবাস করতেই থাকে। আসুন পাপ পরিত্যাগ করে আলোর পথে আসি; আমরা প্রত্যেকেই উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠি। আলোর মানুষ, সত্যের মানুষ, ভালোবাসার মানুষ, শান্তির মানুষ; সে জ্যোতির্ময় যিশুর আলোতে বাস করে। শত চ্যালেঞ্জের সন্মুখেও বিচলিত হয় না; অন্ধকারের পথে পা বাড়ায় না *(সামসঙ্গীত ১)*।

উপসংহার: বড়দিন নবজাত যিশু হয়ে ওঠার দিন। দরিদ্র, নম্র, ভালোবাসাপূর্ণ ও সম্প্রীতির মানুষ হওয়ার দিন। এক কথায় যিশুর জন্মে নবজন্ম গ্রহণ করার দিন। আলোকিত মানুষ হওয়ার দিন। আর এমন হওয়ার সাধনা শুধু বড়দিনে নয়, এমন সাধনা নিত্যদিনের সাধনা। অতএব বড়দিন হয়ে উঠুক প্রতিদিন! হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার প্রতি শান্তি-সম্প্রীতির মানুষ হয়ে ওঠার শুভ দিন, বড়দিনের শুভেচ্ছা!!

আঠারোগ্রাম যুব সম্মেলন

সংশিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আসছে ১১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার আঠারোগ্রামনিবাসী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গোল্লা, হাসনাবাদ, তুইতাল ও শৌলপুর ধর্মপল্লী ও বক্সনগর, সোনাবাজু ও ইক্রাশী উপ-ধর্মপল্লীর যুব সংঘের সকল সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে এক বিশেষ যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। মূল আলোচ্য বিষয়ঃ শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা ও কর্মসংস্থান।

স্থান: পাদ্রিকান্দা প্রগতি সংঘের খেলার মাঠ, গোল্লা ধর্মপল্লী।
সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

সম্মেলনে অংশগ্রহন করার জন্য মিশনভিত্তিক যুব সংঘের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাই।

এ সম্মেলনে মিশনভিত্তিক সমাজপ্রধান ও বিশিষ্ট প্রবীণ বক্তিদেরকে ও আমন্ত্রন জানানো হবে। সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংশিষ্ট সকলের, বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহন একান্তভাবে কাম্য।

বিনীত,
প্রফেসর ড. লরেন্স গমেজ, প্রধান আহ্বায়ক
এলয়সিয়াস মিলন খান, যুগ্ম আহ্বায়ক
মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৫৯৬৬
খ্রিষ্টফার স্যার (তুইতাল), যুগ্ম আহ্বায়ক
০৮/১২/২০২৪

বড়দিন : আশার পূর্ণতা

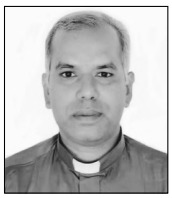

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

কালের পরিক্রমায় বড়দিন, মুক্তিদাতার জন্মদিন আমাদের দ্বারে উপস্থিত। মানবজাতিকে আশার বাণী সঞ্চার করতে, বিশ্বাসের নব জাগরণ ঘটাতে স্বর্গের ঈশ্বর মানব দেহধারণ করে মর্তে নেমে এলেন। খ্রিস্টের দেহরূপ মণ্ডলীকে নবায়ন ও আশায় জাগরিত করতে এবারের বড়দিন আমাদের কাছে নতুন বার্তা নিয়ে আসে; যে বার্তায় প্রকাশিত হয় খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসী ভক্তদের বিশ্বাসের নবায়ন ও আশা নিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে গ্রহণ। মণ্ডলীর নবায়ন সার্থক হয় ও পূর্ণতা পায় বিশ্বাসীভক্তদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য দ্বারা। বাণীর দেহধারণ সত্য হয়েছিল এক বিশেষ কালের পূর্ণতায়। যিশুখ্রিস্ট যিনি প্রভু তাঁর মানব ইতিহাসে জন্ম। বহুযুগের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঈশ্বরপুত্র মানুষ হলেন। ঈশ্বরপুত্র যিশু, যিনি "আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ" *(ইসাইয়া ৯:৫)*; যাঁকে যুগ যুগ ধরে বিশ্বাসী ঐশ জনগণ আশা নিয়ে অপেক্ষা করেছেন তাঁকে ঘিরেই আমাদের মহোৎসব। তিনি (যিশু) নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় গোটা পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলতে, পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, ঈশ্বর সন্তান হবার অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমাদের মাঝে উপস্থিত। বড়দিন আশা নিয়ে বিশ্বাসপূর্ণ তীর্থযাত্রা ও জীবন সাধনার মিলন উৎসব। বাণী রক্তমাংসের রূপ নিয়ে আমাদের সাথে বাস করলেন *(দ্রঃ যোহন ১:১৪)*। বিশ্বায়ণের যুগে আশাহত মানুষকে আশা নিয়ে বাঁচতে বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনায় বড়দিন আশা ও ভালোবাসা।

ঐশবাণীর দেহধারণঃ- "আদিতে বাণী ছিলেন, বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাণী ঈশ্বর ছিলেন। সেই বাণী আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন" *(যোহন ১:১-২)*। কালের পূর্ণতায় সেই "বাণী মানুষের রূপধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন" *(যোহন ১: ১৪ক)*। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি। সে বাণী অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ ছিলেন" *(যোহন ১: ১৪গ)*। এটা ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ ও ভালোবাসা সত্যের পূর্ণতা কারণ "সেই বাক্য অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ ছিলেন। আমরা সকলেই তাঁর থেকে অনুগ্রহের ওপর অনুগ্রহ পেয়েছি" *(যোহন ১: ১৬)*। আর এতেই সত্য হয় বাক্য/বাণীর মানবরূপ ধারণ ও প্রকাশিত হয় ঈশ্বরের মহিমা।

ঐশবাণী মানবরূপ ধারণ ঐশ প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা। "ঈশ্বর আমার প্রভু, তোমাদের একটা চিহ্ন দেখাবেন; ঐ যুবতী কন্যাটি গর্ভবতী হবে এবং দেখ সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল" *(ইসাইয়া ৭: ১৪)*। ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতির এই পূর্ণতা পায় কুমারী কন্যা মারীয়ার কাছে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে। গাব্রিয়েল মারীয়ার কাছে এসে বললেন, 'তোমার মঙ্গল হোক। প্রভু তোমার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন, তিনি তোমার সঙ্গে আছেন'। ... স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'মারীয়া তুমি ভয় পেও না, কারণ ঈশ্বর তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। শোন! তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার এক পুত্র সন্তান হবে। তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু" *(লুক ১:২৮; ৩০-৩১)*। যিশুই জগতে জন্মের ঐশ প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা পায়।

ঈশ্বর এই সকল কার্য তাঁর পুত্র যিশুখ্রিস্টের মধ্য দিয়েই সাধন করেছেন ও পুত্র যিশুও সেই দায়িত্ব শিষ্যদের দিয়েছেন। "সমস্ত কিছুই ঈশ্বর থেকে এসেছে, যিনি খ্রিস্টের মাধ্যমে নিজের সাথে পুনর্মিলিত করেছেন এবং অন্যদের তাঁর সঙ্গে আবার মিলন করিয়ে দেওয়ার কাজ আমাদের দিয়েছেন" (২য় করিন্থীয় ৫: ১৮)। বড়দিন মহা অনুগ্রহ ও মিলনের আশা নিয়ে আমাদের দ্বারে উপস্থিত। সাধু পল বলেন, "আমাদের পরিত্রাণ যে আশারই বস্তু" (রোমীয় ৮: ২৪)।

বড়দিনঃ আশার পূর্ণতাঃ- সময়ের এই সন্ধিক্ষণে এসেছিল এক মাহেন্দ্রক্ষণ। সে ক্ষণের পূর্ণতায় মুক্তির দিন ঘনিয়ে আসছে আশাহত মানবজাতির আশা আজ বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। ইহুদীদের পরাধীনতার হতে লাগল অবসান। বহু যুগের প্রতীক্ষা-তিতীক্ষা আজ অবসান কল্পনায় মুখর। প্রবক্তাদের কথানুসারে, "যুদেয়ার মরু প্রান্তরে দেখা গেল দীক্ষাগুরু যোহন বাণী প্রচার করতে শুরু করেছেন। তিনি সকলকে বললেন, "তোমরা মন ফেরাও; স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই!" এই মানুষটির কথা বলতে গিয়ে প্রবক্তা ইসাইয়া একদিন বলেছিলেন, "ঐ যে মরু প্রান্তরে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে চলেছে, তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করে রাখ, সোজা সরল করে তোল তাঁর আসার পথ" *(মথি ৩:১-৩)*। বহুযুগের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মানব ইতিহাসে ঈশ্বরপুত্রের জন্ম। আশায় জাগ্রত স্বপ্ন বিভোর মানুষ মুক্তিদাতাকে দর্শন করল। এভাবে জগতে বড়দিনের পূর্ণ ও পুণ্যক্ষণে শান্তির রাজকে মানুষ প্রত্যক্ষ করলো। বড়দিনেই মানব ইতিহাসে আশার পূর্ণতায় নব যুগের যাত্রা।

ক) প্রতিশ্রুতি পূরণঃ- "দেখ, যুবতী কন্যাটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল" *(ইসাইয়া ৭:১৪খ)*। যে কুমারী গর্ভবতী হয়েছেন তিনি ঈশ্বরের বাণীতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেছেন। যিশু খ্রিস্টের দেহধারণের ফলে ঈশ্বরের সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পেল। ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি

আব্রাহামের কাছে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রবক্তাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন, প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পেল খ্রিস্টযিশুর জন্মে। তিনি মানবদেহধারী শাশ্বত ঐশবাণীর মাধ্যমে প্রত্যাশা ও ঈশ্বরের ভালোবাসার এক মহা-মিলন। এই মিলন ঈশ্বর ও মানুষের সাথে পারস্পারিক মিলনেই পূর্ণতা লাভ করে; পূর্ণ হয় মানবজাতির আশা। বড়দিনে সকল প্রকার মতভেদ ভুলে খ্রিস্টের মিলন সমাজ গঠনে ও স্বর্গীয় পিতার সাথে মিলনের প্রত্যাশায় আমরা সবাই আশার তীর্থযাত্রী।

খ) যিশু অনন্য মন্ত্রনাদাতা:- যিশুর জন্মে প্রবক্তাদের ভবিষ্যৎ বাণীর পূর্ণতা পেয়েছে। তিনি অনন্য মন্ত্রণাদাতা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, শান্তির রাজপুত্র *(দ্রঃ ইসাইয়া ৯:৬)*। তিনি যে মহান ঈশ্বর সবকিছুই জানেন তা প্রকাশ পায় তাঁর কর্মে। শামরীয় নারীর জীবনের ঘটনা বলে দেন, এসো দেখে যাও যিনি আমার জীবনের সমস্ত কথা বলে দিয়েছেন *(দ্রঃ যোহন ৪:২৮-৩০)*। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটির সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারেন ও তাকে সাহায্য করেন। যিশুই সব বিধানের পূর্ণতা ও বিশ্রামবারের প্রভু। তাই তিনি নিয়ম রক্ষার চেয়ে মানুষের জীবনের গুরুত্ব দেন ও সুস্থ করে তোলেন *(দ্রঃ যোহন ৫:৬-১০)*। যিশু আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত চিহ্নেরও পূর্ণতা। দেখ, যুবতী কন্যাটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল" *(ইসাইয়া ৭:১৪খ)*। যিনি ইম্মানুয়েল (আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর), অনন্য মন্ত্রণাদাতা, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত।

গ) উন্মুক্ত স্বর্গ দ্বার:- যিশুর জন্মের ফলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাঁর আগমনে আকাশে উদিত হয়েছে মুক্তির নতুন তারা, পথহারা পথিকেরা পেয়েছে নতুন পথের দিশা। স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, স্বর্গদূতেরা পৃথিবীতে নেমে এসেছে ও ঈশ্বরের বন্দনায় মুখরিত হয়েছে ধরণী, "জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে" *(লুক ২: ১৪)*। অন্যদিকে স্বর্গদূত রাখালদের দেখা দিয়ে বলেছেন, "ভয় পেয়োনা! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ সমস্ত জাতির মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে" *(লুক ২:১০)*। আদি পিতা-মাতার পাপের ফলে আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যিশুর পৃথিবীতে আগমন ও তাঁর ক্রুশ-মৃত্যুর ফলে সে দরজা আবার খুলে গেল চিরতরে। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনায় আমরা উন্মুক্ত স্বর্গের তীর্থযাত্রী।

ঘ) পথ নির্দেশনা:- যিশুতেই সব কিছুর পূর্ণতা। তিনি আদি ও অন্ত। তাঁরই আগমনে মানবজাতি পেল এক নতুন পথের নির্দেশনা; বিশ্বাসী ভক্তগণের ঈশ্বর দর্শন; কেননা ঈশ্বর আমাদের মাঝে (ইম্মানুয়েল)। তিনি জীবন দিয়ে শিখিয়েছেন কিভাবে ভালোবাসতে হয়। তাঁর আদর্শ, প্রচার, মূল্যবোধ ব্যতিক্রমধর্মী যা মানুষকে আশান্বিত করে, প্রেরণা যোগায় উদ্দীপ্ত পদচারণায় পথ চলতে। তিনি বলেন, "তোমরা মনে করো না যে, আমি মোশীর বিধান বা প্রবক্তাদের নির্দেশ বাতিল করতে এসেছি। আমি তা বাতিল করতে আসিনি; বরং পূর্ণ করতেই এসেছি" *(মথি ৫: ১৭)*। "তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোইবাস" *(মথি ৫: ৪৪)*। "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে, বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর কিছুই নেই" *(যোহন ১৫:১২-১৩)*। যিশুর এই উক্তিগুলো বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে নিজের জীবন মানুষের জন্য ক্রুশে বলিকৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এজন্যই তিনি বলেছেন, "আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়; পুরোপুরি ভাবেই পায়" *(যোহন ১০: ১০খ)*। বড়দিন আজ সেই একই ভালোবাসার বাণী নিয়ে বিশ্বাসের জাগরণ ঘটাতে আশা নিয়ে আমাদের দ্বারে উপস্থিত।

ঙ) অনুগ্রহের মিলন-মেলা: বড়দিনকে কেন্দ্র করে আমাদের সাধনা, প্রতীক্ষা ও আয়োজন। কারণ এই উৎসব মিলনোৎসব। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ও সমস্ত সৃষ্টির মিলন মেলা। ধনী (পণ্ডিতগণ) গরীব (রাখালগণ) সৃষ্টকূল (গোশালা, উন্মুক্ত আকাশ, পশু ও প্রকৃতির মিলন) সবাই যিশুকে দেখতে পেল। স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন হল *(দ্রঃ লুক ২:১-২০; মথি ২:১-১১)*। যিশু সবার ও সকল জাতির পরিত্রাণ। তিনি ত্রাণকর্তা। তিনি ভালোবাসা! "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে" *(যোহন ১৫:১২)*। খ্রিস্ট যিশু মানবজাতির জন্য ক্রুশে জীবন উৎসর্গ তাঁর কথা ও কাজের পূর্ণতা। "আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়; পুরোপুরি ভাবেই পায়" *(যোহন ১০:১০খ)*। বড়দিন; ঈশ্বরের মহান ভালোবাসার পূর্ণতা ও অনুগ্রহের মিলন মেলা।

চ) মানব মর্যাদা ও মিলন সমাজ:- যিশুর জন্ম (বড়দিন), জগতে ঈশ্বরের প্রবেশের শুভ মুহূর্ত। মহান ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে জন্ম নিয়ে মানবীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের মর্যাদা দিয়েছেন। মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। যা হারিয়ে গেছে তা উদ্ধার করতেই যেন তাঁর জগতে জন্ম। "যা হারিয়ে গেছে তা খুঁজে বের করতে ও উদ্ধার করতেই মানসপুত্র এ জগতে এসেছেন' *(লুক ১৯:১০)*। অপব্যয়ী পুত্রের আত্মচেতনা, পিতা গৃহে ফিরে আসার সংকল্প ও হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা ফিরে পাওয়ার আনন্দ *(দ্রঃ লুক ১৫:১১-৩২)*। যিশুও এসেছেন আমাদের হারিয়ে যাওয়া সৃষ্টি-প্রকৃতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মানবাধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে। মানুষ হিসাবে নিজ সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও প্রকৃতি রক্ষা ও নিজের ও অন্যদের মর্যাদা রক্ষা করতে এগিয়ে যাওয়া।

ছ) বড়দিন ও খ্রিস্টবিশ্বাসীর নতুন মানুষ:- বড়দিনে জীবনের সমস্ত ব্যর্থতাকে মুছে ফেলে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ আশায় জাগ্রত হয়ে সাজে নতুন সাজে। আশায় নিজেদের মনের সমস্ত পাপময়তাকে মুছে খ্রিস্টকে বরণ করে নব উদ্যমে। পরস্পরের সাথে মিলনের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন সমাজে প্রভুকে স্থান দিতে হয়। সাধু পল এই বিষয়ে বলেন; "আজ কিন্তু রোষ-আক্রোশ, অনিষ্ট-কামনা, কটুকথা, অশ্লীল কথাবার্তা, এসব তোমরা ছাড়। পরস্পরের কাছে আর মিথ্যা কথা বলো না, পুরানো মানুষটাকে পুরানো পোশাকের মত ছিঁড়ে ফেলে তোমরা পরেছো নতুন মানুষটিকে" *(দ্রঃ কলসীয় ৩:৮-১০)*। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যে নতুন মানুষটিকে পরিধান করছে তিনি স্বয়ং খ্রিস্ট, বড়দিনে যিনি মানুষ হয়েছেন। খ্রিস্টকে ধারণ করে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বাসীগণ হয়ে উঠেছে এক নব সৃষ্টি *(দ্রঃ ২ করিন্থীয় ৫:১৭)*। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা পরমেশ্বরের মনোনীতজন, তাঁরই পুণ্যজন। পরস্পরে ক্ষমাদানে ও প্রদানে সবাই মিলিত হয় ভালোবাসার বন্ধনে। বড়দিনের মিলনবন্ধনে সবাই পরমেশ্বরের প্রশংসাগান করে ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ ও ভালোবাসার জন্য।

উপসংহার:- জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও বড়দিন এসেছে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ নিয়ে। মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট আমাদের মুক্ত করতে আমাদের সঙ্গে ও মাঝে উপস্থিত। সবকিছু ভুলে স্বাদ ও সাধ্যের মাধ্যমে আমাদের বড়দিন উৎসব হোক নতুন জীবনের আশা ও ভালোবাসা। আমাদের কাজ কর্ম দিয়েই প্রমাণ করতে হয় যে, আমরা যিশুর শিষ্য ও অনুসারী। "তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে প্রমাণ কর যে, তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য" *(যোহন ১৫:৮ক)*। বড়দিন একটি চলমান ঘটনা, যা আমাদের জীবনে প্রবাহমান; আশায় বাঁচতে জাগরিত করে। মঙ্গলসমাচারের আলোকে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধে জীবন যাপন করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। নিজে আশান্বিত হয়ে অন্যের জীবনেও আশা সঞ্চার করি। গড়ে তুলি সহভাগিতার সক্রিয় আনন্দপূর্ণ মিলন সমাজ। তাঁরই (যিশু) ভালোবাসা ও অনুগ্রহে ধন্য করি মানব জীবন। সত্য ও সার্থক হয়ে উঠুক বড়দিন (যিশুর জন্ম) আশার উৎসব।

বাংলাদেশ হতে বেথলেহেম কত দূরে

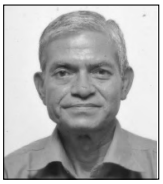

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

কতদূরে দাউদ-নগরী বেথলেহেম: আমি যখন ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে নটরডেম কলেজে অধ্যয়ন করি, শ্রদ্ধাভাজন তখনকার সহ-অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি আমাদের সেমিনারিয়ান ও ব্রাদারদের প্রতি শুক্রবার ধর্ম ক্লাস নিতেন। এক পর্যায়ে বছরান্তে তিনি চূড়ান্ত পরীক্ষায় ২০ নম্বরে একটি প্রশ্ন করলেন: যিশুর জন্ম বাংলাদেশে বিস্তারিত আলোচনা কর। নিশ্চয়ই প্রশ্নটি বই-পুস্তকের বাহিরে এবং উত্তরও কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ নাই। প্রশ্নটি পেয়ে প্রথমে চিন্তা করে পাচ্ছিলাম না এমন একটি অপ্রচলিত বিষয় এবং সিলেবাসের আওতাভুক্ত নয় তেমন প্রশ্নের উত্তর কিভাবে এবং কোথা হতে উত্তর লিখতে শুরু করব। সাময়িক চোখ বন্ধ রেখে ভাবতে শুরু করলাম। ফাদার নিশ্চয়ই আমাদের জানা-অজানা এবং জ্ঞানের পরিধি পরিমাপের জন্য এমন একটি বিরল প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তি প্রত্যাশা করছেন।

আমার চিন্তা লেখনীতে এমনভাবেই তুলে ধরেছিলাম বেথলেহেম গিয়ে যিশুর জন্মস্থান পরিদর্শন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। একাধারে ব্যয়বহুল, দূরত্ব এবং ভিসা প্রাপ্তিতেও বিড়ম্বনা হয়। তাই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান হতে উত্তরে উল্লেখ করেছি যেহেতু যিশুর জন্ম উৎসব পালনে প্রত্যেক ধর্মপল্লী এবং বাড়ীতে একটি করে গোশালঘর বেথলেহেমের অনুকরণে তৈরী করা হয়, সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা, ধ্যান-প্রার্থনা, আরাধনা এ গোশালাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রে আরো কাছে, আন্তরিকতার মণিকোঠায় অর্থাৎ যিশুকে যদি আমাদের হৃদয়রূপ মন্দিরে ধারণ করতে পারি তাহলে বেথলেহেমে যাওয়া কী প্রয়োজন। পরিত্রাণদাতা যিশুতো আমার হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার স্বপ্নের নিজস্ব দেশ বাংলাদেশের প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণের মাঝে তাঁর আবাস। এমনভাবে লেখার পরিপ্রেক্ষিতে ফাদার উত্তর পত্রটি ফেরত দিয়ে কিছুটা প্রশংসাই করেছিলেন একারণেই যে, তিনি একজন সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে এমন ধারণাই মনে মনে পোষণ করেছিলেন, তারই বোধ হয় প্রতিফলন হয়েছে আমার লেখার মধ্যে।

পাঠক মনে যে বিষয়টি অনুধাবন করাতে চেয়েছি তাহলো: মনের দৃষ্টিতে দাউদ নগরী বেথলেহেম মোটেই দূরে নয়। একান্ত নিকটে খুঁজলেই পাই। তবে খুঁজে পাবার মত চাই-হৃদয়, মন, আত্মা আর মানসিক সুস্থিরতা। গীতাবলী ৭১১ নম্বর গান-

রাজকুমারীর ছেলে হলো মাটির ঘরে গো

ধূপচন্দন দিয়ে তাঁরে বরণ করো গো।

বরণডালা কই, ফুলের মালা কই

প্রেমারতি দিয়ে তাঁরে বরণ কর গো।

এলেন তিনি গোয়াল ঘরে

স্বর্গ ছেড়ে ধূলার পরে

স্বর্গরাজ্য নিয়ে এলেন

বিশ্ব ভুবনময়

হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে

প্রণাম করো গো।

কি চমৎকারভাবে গান রচয়িতা অর্থবহ করে তুলেছেন প্রভু যিশুর জন্মক্ষণকে। এখানে কয়েকটি শব্দের উপর গুরুত্বারোপ করলে দেখা যায় বরণ ডালা কই, ফুলের মালা কই, প্রেমারতি দিয়ে এবং হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে প্রণাম করো গো। অবশ্যই এখন আমরা বুঝতে পারছি বেথলেহেম গোয়াল ঘর বাংলাদেশ হতে খুব বেশী দূরে নয়; বেথলেহেমের পবিত্র ভূমি এখন আমার হৃদয়ে স্থান করে আছে। এর সাথে আছে আনন্দের ভুবনে আমার ত্রাণকর্তা যিশু যিনি মনিকোঠায় আবাস ভূমি রচনা করেছে। বরণ যদি করতেই হয়, আমার হৃদয়ের সাজ-সজ্জা প্রথমে করে নিতে হবে পরে তাঁকে অন্তরের অন্তরস্থলে চির আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটি গানের কলি ৭২৮ নম্বর-

দাউদ নগরে বেথলেহেমে জীর্ণ গোশালায় পেতেছে বিছানা----- তোমার দেখা পেয়েছে তারা

নম্রনত আর জ্ঞানী যারা

স্বর্গ পৃথিবীর মিলন মোহনায়

মলিন গোশালায় হরো রচনা

তোমারই জনমের শুভক্ষণে।।

প্রচারিব গানে গানে ক্যাসেটের গীতাবলী ৭৩৪ নম্বর-

হৃদয় তোরণ দ্বার খুলে দাও আজি

স্বর্গ হতে আসিছে প্রভু

করিতে মানবে স্বর্গবাসী।।

প্রভু যিশুর জন্মের আগমনী গানে-

আয় আয়রে তোরা আয় বেথলেহেমের গায়

ত্রাণপতি জন্মেছেন আজ ঐ গোশালায়।।

এবার কী বলা যায়- কোন গোশালায় নবজাত শিশু যিশুকে শোয়াতে চাই বেথলেহেমের গায় না হৃদয়াসনে- হৃদয়মন্দিরে।

যাকে বরণ করে নিচ্ছি: মানুষের মাঝে মানুষের সাজে এসেছো তুমি ভগবান

মানুষের প্রাণে প্রেম প্রীতি দানে

ঘুচাতে মানুষের অপমান ।

ধরণী কি পারে ধরিতে তোমারে তুমি ধরা না দিলে

বড়দিন বড়দিন, যিশু তোমার জন্মদিন।

কি দেবো আজ বলো তোমায় তুমি বিধাতা অন্তহীন।

হাজার খুশীর বন্যা নিয়ে এসেছে আবার এক শুভদিন

বড়দিন বড়দিন বড়দিন বড়দিন।

ধরণী উঠেছে মেতে নব আনন্দে হৃদয় উঠেছে দুলে পুলক ছন্দে

ফুলদল সুধা ছাড়িয়ে মিষ্টি সুবাস দিল ভরিয়ে তাই ছন্দের বীণা বাজে।

বাংলাদেশে, আমার হৃদয়ে যিশুর জন্মবারতা অনুভব করছি এ আশ্বাস বাণীই আমার ও আমাদের বড় প্রাপ্তি, শান্তি, আনন্দ এবং স্বর্গীয় সুখ এর চেয়ে আর বেশী কী আমাদের প্রয়োজন।

বাংলাদেশ হতে বেথলেহেম কত দূরে বিষয়টি আত্মস্থ করতে যে সব শব্দ ও চিন্তা সংযোজন করা হয়েছে, তাতে আমার মনে হয় বাংলাদেশ আর বেথলেহেম এবং আমার হৃদয় মন্দির হতে দূরে নয়। বেথলেহেম আমার চির চেনা, আপন পবিত্র ভূমি যেখানে আমার প্রাণপ্রিয় প্রভু যিশু নিজেই জন্মিলেন। এখন যদি তাঁকে এবং তাঁর জন্মস্থানকে না চেনার ভান করি অথবা অস্বীকার করি, তাহলে কিছু করার নাই। যেমন গীতাবলী ৭১০ নম্বর গানে উল্লেখ করা হয়েছে-

বেথলেহেম বেথলেহেম বেথলেহেম চোখ মেলে তুমি দেখলে না

তোমার কুলে জন্মিল আজ পৃথিবীর রাজা তাঁকে তো তুমি চিনলে না।

অতএব আর না চেনা কথা ভেবে তিন পন্ডিত, নম্রচিত্ত রাখালবৃন্দ এবং দূতবাহিনীর দর্শন প্রাপ্ত এবং আনন্দ চিত্ত সুখবরের ঘোষণায় হৃদয়াসনে, হৃদয়রূপ মন্দিরে নবজাত শিশু যিশুকে ধারণ করে বড়দিনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগে পরমেশ্বরের বন্দনা করে বলে উঠি:

"জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়।

ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহিত মানবের অন্তরে।"

প্রভু যিশুর আনন্দঘন জন্মবার্ষিকীতে সকল বিশ্বাসীদের অন্তরে বিরাজ করুক অফুরন্ত, আনন্দ, সুখ ও শান্তি। সকলকে জানাচ্ছি-প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

বড়দিন

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

বড়দিন, যিশুর জন্মদিন এসে গেল। বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপনে আমরা সবদিক দিয়েই প্রস্তুত। যিশুর জন্ম দিন সকল জন্মদিনের চেয়ে উপলক্ষের দিক দিয়ে অনেক বড়। এই দিনটি পালনের জন্য আমরা পুরো বৎসর অপেক্ষায় থাকি। বড়দিন হলো আমাদের স্বপ্ন পূরণের দিন। এটা হলো ঈশ্বরপুত্রের জন্ম দিন যিনি আমাদের সঙ্গে বাস করতে এসেছেন। তাঁর জন্ম দিন মানে আমাদেরও জন্মদিন। কারণ তাঁর জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি। যারা তাঁকে গ্রহণ করে এবং তাঁর নামে বিশ্বাস করে তিনি তাদেরকে ঈশ্বর সন্তান হওয়ার সক্ষমতা দান করেন। বড়দিন হলো মহা আনন্দের খবর। একটি মহান আলো আমাদের মাঝে এসেছে। একটি শিশু আমাদের জন্য জন্ম নিয়েছে। এর চেয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বড় ঘটনা আর কি হতে পারে? এই অনন্য দিনে স্বর্গদূত আবির্ভূত হয়ে এই জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন, "জয় উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের জয়, সদ্বিচ্ছাপূর্ণ মানুষের অন্তরে নামুক শান্তি।"

যিশু কেন এই পৃথিবীতে আসলেন? ঈশ্বর জগতকে এতই ভালোবেসেছেন যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন সকলেই যারা তাঁকে বিশ্বাস করে অনন্ত জীবন লাভ করে। তাই এসো আমরা প্রভু যিশুকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাই যিনি আমাদের হৃদয়ে, মনে ও জীবনে এসেছেন। তিনি হলেন ইম্মানুয়েল, অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর আসার কারণেই পরিত্রাণ সম্ভব হয়েছে। কিভাবে আমাদের থাকতে হবে এবং আমাদের কি করতে হবে, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন। যে পর্যন্ত আমরা জীবিত আছি, আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে হবে এবং জীবনের এত সুন্দর উপহার উপভোগ করতে হবে, ভাল কাজে মনোনিবেশ করতে হবে এবং যা কিছু আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে, যেন আমরা মরে না যাই কিন্তু অনন্ত জীবন লাভ করি। তিনি এসেছেন যেন আমরা জীবন পাই, পরিপূর্ণভাবেই পাই। তিনি এসেছেন সেবা করার জন্য এবং অনেকের পরিত্রাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য। আজকের এই উদ্‌যাপন আমাদেরকে জীবন এবং জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ স্বর্গে অনন্ত জীবন। ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। যে কারণে ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতের জন্য পাঠালেন যেন আমরা তাঁর মধ্যে বাস করি।

সাধু আথানানিয়াস বলেছেন, ঈশ্বর মানুষ হলেন যেন মানুষ ঈশ্বর হতে পারে। বেথলেহেমের যাবপাত্রে শোয়ানো শিশু যিশু আমাদের কাছে সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্য, মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করে। যাবপাত্রের কাছে দাঁড়িয়ে এসো আমরা বুঝতে চেষ্টা করি ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী পরিকল্পনা। দীনবেশে তাঁর জন্ম আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানায় যেন আমরা পবিত্র, মিতাচারী ও ন্যায়পরায়নতায় জীবনযাপন করি। যিশুর জন্ম আমাদেরকে খ্রিস্ট্রীয় জীবনযাপনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়।

অন্ধকার ও মিথ্যার পৃথিবীতে তাঁর জন্ম আমাদেরকে আশ্বস্ত করে যে আমরা একদিন ঈশ্বরে উত্থিত হবই। কারণ তিনি হলেন প্রকৃত আলো যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকেই আলোকিত করে। ঈশ্বর যিনি ভালোবাসা তিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে পরিচালিত করবেন। এ কারণেইতো বাণী মাংস হলেন, আমাদের দুর্বলতা, দরিদ্রতা, ব্যথা বেদনা ও মরণশীলতায় সহভাগিতা করলেন। যিশুর জন্মের মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের আরো কাছে আসি।

আমরা যদি স্বর্গে প্রবেশ করতে চাই তবে স্বর্গ আগে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। যে কারণে যিশুখ্রিস্ট আমাদের কাছে আসেন, তিনি স্বর্গ আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন। তাঁর আসা শুধুমাত্র একটি অতীতের ঘটনাই না। যুগে যুগে, মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি আমাদের কাছে আসেন। তিনি আমাদের কাছে আসেন এমনভাবে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "তোমরা কি তাঁর নিরব পদধ্বনি শুনতে পাও নি? তিনি আসেন, আসেন, সব সময় আসেন।" আমরা যারা তাঁকে গ্রহণ করি তারা ধন্য।

আমাদেরকে অবশ্যই বড়দিনের আলোতে ও বিশ্বাসে বাস করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই বড়দিনের চেতনায় কাজ করতে হবে, আর তা হলো ভালোবাসার কাজ। আমাদেরকে বড়দিনের বিকিরণে আনন্দ করতে হবে আর তা হলো পবিত্রতা। আমাদেরকে অবশ্যই বড়দিনের উজ্জ্বলতায় পথ চলতে হবে আর তা হলো সত্য। আমাদের মনকে বড়দিনের কেন্দ্রে নিবদ্ধ করতে হবে আর তা হলো খ্রিস্ট। এভাবে বাস করলেই বড়দিনের লক্ষ্য ও ধারণা বাস্তবতার মুখ দেখতে পারবে।

বেথলেহেমের কোথাও তাঁর জন্য জায়গা ছিল না। সবই দখল হয়ে গিয়েছিল। আমরাও আমাদের কাজ, পড়াশুনা, রাজনীতি, সমস্যা, আকাঙ্খা এবং অন্য আরো অনেক কিছু নিয়েই ব্যস্ত। ঈশ্বরের জন্য আর জায়গা থাকে না। জীবনের সংকট, আকর্ষণ, প্রতিশ্রুতি, দুশ্চিন্তা ও দুঃখভাবনা, হতাশা-নিরাশা আছে এবং ঈশ্বর আসেন এরমধ্যেই জায়গা করে নিতে। ঈশ্বর আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে চান। তিনি চান আমাদের ফাঁকা জায়গাটুকু দখল করে নেওয়ার জন্য, আমাদের সাথে মিলিত হতে। যে মিলনে আছে আনন্দ এবং শান্তি। কারণ এই খ্রিস্ট জন্ম নিয়েছেন আমাদের ভাই, আমাদের আলো, আমাদের আদর্শ এবং আমাদের শক্তি হওয়ার জন্য। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে সত্য, দরিদ্রতা, নম্রতা এবং সর্বোপরি ভালোবাসা অনুশীলন করতে হয়।

যিশু মশীহ তাঁর জন্মের পর গরীবদের কাছে প্রকাশিত হয়েছেন। বেথলেহেমের শিশু গরীবদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন। তিনি এসেছেন গরীবদের কাছে সুখবর ঘোষণা করতে। তাই বড়দিনের আনন্দ গরীবদের সাথে সহভাগিতা করতে হয়। বড়দিনের সময় যারা গরীব ও নির্যাতিত তাদের কথা ভাবতে হয়। তাদের কথাও চিন্তায় আনতে হয় যারা কোনদিন যিশুর কথা শুনেনি এবং তাঁকে মুক্তিদাতা হিসেবে উপলব্ধি করেনি। এসো আমরা এই বড়দিনে গরীবদের সাথে একাত্ম হই, তাদের জন্য দয়ার কাজ করি। কারণ যিশু বিশেষভাবে তাদের জন্যেই জন্ম নিয়েছেন।

এখানে, একটি গল্প বলে শেষ করি। তাঁর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে যিশু তাঁর মহিমায় ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁর হাতে পায়ে ঠিকই ক্ষতচিহ্ন থেকে গেল। স্বর্গের একজন দূত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিতো পৃথিবীতে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছো।" যিশু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।" দূত আবার জিজ্ঞেস করলেন,

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

শিশু যিশুর জন্মোৎসব: পৃথিবীর জন্য আহ্বান ও আধ্যাত্মিক মহামিলনযাত্রা

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ

যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি পৃথিবীকে শান্তি, ভালোবাসা, সহানুভূতি, এবং মানবতার সেবা করার একটি মহান আহ্বান। যিশুখ্রিস্টের জন্মের দিনটি মানবজাতির জন্য একটি অমূল্য উপহার, যা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রেম ও দয়া প্রদর্শন করার সুযোগ করে দেয়। যিশুর জন্মোৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের নিজেদের জীবনকে পরিবর্তন করতে হবে।

কেননা খ্রিস্টরাজ নিজেই পরিবর্তিত হয়েছেন, পার্থিব জগতের মানুষ হয়ে। ঐশরাজ্যের রাজত্বকে ছেড়ে ধরণীর বুকে মানবতরে জন্মগ্রহণ করে। যাতে করে পাপীজন যেন পায় পরিত্রাণের আহ্বান পান। তাই শিশু যিশুর আগমন। তাহলে আমরা আজ রাজাধিরাজের জন্মোৎসব নিয়ে চিন্তা করতে পারি। তিনি কিভাবে আমাদের জীবনে আহ্বানস্বরূপ।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও সম্পর্ক পুনঃস্থাপন:

যিশুখ্রিস্টের জন্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলে। তাঁর আগমন মানুষের জন্য ঈশ্বরের প্রেম এবং দয়ার এক অবিরাম প্রবাহ ছিল। যিশুর জন্মের এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে পারি, এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে পারি।

বড়দিন আমাদের জন্য একটি আধ্যাত্মিক উপলক্ষ্য। এটি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রেম, দয়া, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার একটি মহাআহ্বান। যিশুর জন্মের দিনটি আমাদের প্রার্থনা, ধ্যানে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার আহ্বান বটে।

নতুন জীবন ও আশার সূচনা:

যিশুর জন্ম ছিল নতুন জীবন এবং নতুন আশার সূচনা। যিশুর আগমনের মাধ্যমে পৃথিবী নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছিল, যেখানে মানুষ একে অপরকে ভালোবাসতে, ক্ষমা করতে এবং শান্তির পথে চলতে শেখে। তাঁর জন্মের এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যে প্রত্যেক দিন একটি নতুন সুযোগ হতে পারে প্রত্যেকদিন নতুন আশা এবং নতুন জীবন পাওয়া সম্ভব। এই আহ্বান আমাদের পাপী মনকে ভেঙ্গে নতুন জীবনের দ্বার উন্মোচন করে।

মানবতা ও ভালোবাসার ঐক্য:

যিশুর জন্ম আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা একটি বৃহত্তর মানব পরিবার। পৃথিবী জুড়ে আমরা যতই ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, বা জাতির সদস্য হই না কেন, আমাদের সকলকে মানবতা এবং ভালোবাসার আদর্শে একত্রিত হওয়া জরুরি। বড়দিন পৃথিবীকে এই বার্তা দেয়: একমাত্র ভালোবাসা, শান্তি এবং সহানুভূতির মাধ্যমে আমরা সত্যিকারের ঐক্য এবং মানবতার জয় প্রতিষ্ঠা করতে পারব। এই দিনটি আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শান্তি, এবং ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় করার একটি আহ্বান।

আত্মত্যাগ ও সেবার আহ্বান:

যিশুখ্রিস্ট তাঁর জীবন কাটিয়ে ছিলেন আত্মত্যাগ এবং সেবার মাধ্যমে। তিনি শিখিয়ে ছিলেন যে, আসল ভালোবাসা এবং শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন আমরা নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের জন্য কিছু করি। তাঁর জন্মোৎসব আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, যদি আমরা সত্যিকার অর্থে মানবতার সেবা করতে চাই, তবে আমাদের নিজেদেরকে নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতি দেখাতে হবে। বড়দিনের সময় আমরা অনেক কিছু উদ্‌যাপন করি, তবে এর প্রকৃত অর্থ হলো অন্যদের সেবা করা বিশেষত তাদের যারা বিপদগ্রস্ত, অসুস্থ, দরিদ্র এবং নিঃস্ব। যিশুর জন্ম আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, যেন আমরা নিজেদের জীবনে আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমাজের জন্য কিছু ভালো করতে পারি। এই আহ্বান যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব আমাদের দেয়।

শান্তি স্থাপনের আশ্বাস:

যিশুর জন্মের প্রকৃত অর্থ ছিল শান্তি স্থাপনের আহবান। তিনি এসেছিলেন পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য শান্তির বার্তা নিয়ে। তাঁর জীবন ও শিক্ষা পৃথিবীকে শান্তির পথ দেখাতে চেয়েছিল। "শান্তি আমি তোমাদের সঙ্গে রেখে যাচ্ছি" *(যোহন ১৪:২৭)* এটি ছিল তাঁর পৃথিবী ত্যাগের পরেও আমাদের জন্য একটি বিশেষ আশ্বাস। যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিশ্বে শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন আমরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং ভালোবাসা বাড়াবো।

যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব, শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয় বরং এটি এক আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় মহামিলনের উৎসব, যা মানব জীবনে গভীর অর্থ এবং প্রভাব রেখে যাচ্ছে। প্রতিবার যখন যিশুর জন্মের দিন আসে, আমরা শুধু তাঁর জন্মের ঘটনা মনে করি না, বরং তার জীবন, শিক্ষা এবং মানবতার প্রতি তাঁর দয়া, ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিকতার গভীরতা উপলব্ধি করি।

আধ্যাত্মিকতার চেতনা:

যিশুর জন্ম ছিল আধ্যাত্মিকতার এক নতুন দিগন্তের সূচনা। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন মানবতার পাপ মোচনের জন্য, আর তাঁর জন্ম মানব জীবনের এক নতুন অর্থ প্রদান করেছিল। যিশুর শিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে যে, সত্য, দয়া, ভালোবাসা, ক্ষমা, নম্রতা, বিনীয়, অনুগ্রহ দান এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক পথে চলতে হবে। এই চেতনা অনুসরণ করলে আমরা একে অপরের মধ্যে সহানুভূতি ও ভালোবাসার অনুভূতি বৃদ্ধি করতে পারি। তাহলেই আধ্যাত্মিকতার এই চেতনায় পরস্পরের সঙ্গে মহামিলনের যাত্রা ঘটবে এই বড়দিনে।

ঐক্য এবং প্রেমের বার্তা:

খ্রিস্ট যিশুর জন্মোৎসব এবং জীবন ও শিক্ষা সকল মানুষের জন্য এক সাধারণ বার্তা দেয় "প্রেম করুন এবং পরস্পরের সহায়তা করুন।" তাঁর জন্মোৎসবে, আমরা পৃথিবী জুড়ে মানুষের মধ্যে ঐক্য এবং শান্তির বার্তা ছড়ানোর চেষ্টা করি। যিশুখ্রিস্টের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা আজও বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে প্রেম, শ্রদ্ধা, এবং ঐক্যের আলোকবর্তিকা হয়ে প্রভাব ফেলছে।

ভালোবাসা ও দয়া:

যিশুর জন্মোৎসবের সময়, আমরা তাঁর অসীম ভালোবাসা এবং দয়ার কথা স্মরণ করি। তিনি নিজে পৃথিবীতে এসে আমাদের শিখিয়েছেন যে, "সকলকে ভালোবাসো" এবং "শত্রুরাও তোমার ভাই"। এই আধ্যাত্মিক দর্শন আজও মানুষের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার

পথ দেখায় এই খ্রিস্টের জন্মোৎসব। কারণ যিশুর প্রধান আদেশের দ্বিতীয় আদেশটি হলো: 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসো"।

আত্মবিশ্বাস এবং আশা:

বড়দিনের সময়, আধ্যাত্মিকতার এক বড় বার্তা থাকে আত্মবিশ্বাস এবং আশাতে। যিশুর জন্ম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবীতে আলো নিয়ে আসার জন্য অন্ধকারে থেকেও একজন ব্যক্তি আলোকিত হতে পারে। তাঁর আগমন আমাদের শেখায় যে, কষ্টের মধ্যে থেকেও আশার আলোক ছড়ানো সম্ভব। কেননা যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না; আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল। খ্রিস্টের এই আধ্যাত্মিকতার মহাজন্মোৎব আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আশার আলোকবর্তিকার পিণ্ড।

তাই আসুন, খ্রিস্টের জন্মোৎসবে আমরা আধ্যাত্মিকতার মহামিলনের আহ্বানে যাত্রা করি। যাতে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি রাজাধিরাজ খ্রিস্টযিশুর জন্য আমি প্রস্তুত। তাহলেই আমরা অসহায়, অবহেলিত, দুঃস্থ, নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং ঝুঁকির মাঝে সাড়া ফেলতে পারবো মহা আনন্দের বার্তা। সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা, শুভ বড়দিন।।

৩৭ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

"তারা সবাই কি জানে তুমি তাদের জন্য কি করেছ?" যিশু বললেন, "না, এখনো তারা তা জানে না শুধু মাত্র অল্প কিছু প্যালেস্টাইনী ছাড়া।" দূত আবার বললেন, "সবাই যেন তা জানতে পারে সেজন্য তুমি কি করেছো?" যিশু বললেন, "আমি পিতর, যোহন, যাকোব এবং অন্য সব শিষ্যদের বলে এসেছি বংশ পরম্পরায় এই কথাগুলো সবাইকে তারা যেন জানায়।" দূতের মনে তবুও সন্দেহ থেকে গেল। তিনি আবার যিশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "যদি পিতর ও অন্যরা তা অন্যদের জানাতে ভুলে যায় বা তারা যদি তা বলতে ভয় পায়। যদি পরবর্তী প্রজন্মও তা বলতে ব্যর্থ হয়। তখন কি হবে? তোমার কি অন্য কোন পরিকল্পনা আছে?" যিশু উত্তর দিলেন, "না আমার অন্য কোন পরিকল্পনা নাই। আমি দেখছি তারা কি করে?"

এভাবেই যিশু আমাদের উপর ভরসা রাখেন যেন আমরা তাঁর মঙ্গলসমাচার প্রচার করি। তাঁর ভালোবাসার কথা সবাইকে জানাতে হবে। যিশু আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসা এবং মঙ্গলবাণী দিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব তা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা। আমরা যখন বিশ্বস্তভাবে তা করি তখনই বড়দিনের আনন্দ ও ফল সবার কাছে প্রকাশিত হয়।

বড়দিনের আনন্দ পূর্ণতা দানে ঐশবাণী

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

বড়দিন শ্রী যিশুকে কেন্দ্র করেই এই মহোৎসব, আয়োজন প্রস্তুতি ও মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রস্তুতি শুরু হয় আগমনকাল দিয়ে। আগমন মানেই কারো শুভ আগমন, অতিথিবরণ। মা মারীয়ার গর্ভেই এই অতিথির জন্ম, মানবজাতির পরিত্রাণের শুভলগ্ন। আমরা প্রত্যেকেই পরিত্রাণ বা মুক্তিদাতাকে গ্রহণ-বরণ করার প্রত্যাশায় জেগে আছি। স্নেহময়ী মা মারীয়া তাঁর আদরের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলেন। প্রত্যেক মা তার সন্তানদের গর্ভে ধারণ করেন, ভূমিষ্ঠ হলেই লালন ও পালন করেন এবং যত্ন নেন। মানুষ করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। মারীয়াও ভাগ্যবতী, তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে ঐশ সন্তান যিশুকে গর্ভে ধারণ করলেন। মারীয়া ঈশ্বরকে নত শিরে অর্থাৎ নম্রতার সাথে গ্রহণ করে নিলেন। যিশুকে গর্ভে ধারণ করলেন মারীয়া। মারীয়া জানতেন যিশুকে গর্ভে ধারণের মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠবেন ঈশ্বরের মা তথা বিশ্বমণ্ডলীর মাতা। সকল ভক্তজনগণের মাতা। বাণী দেহধারণ করলেন আর বাণী হয়ে উঠলেন রক্তমাংসের মানুষ। যিশু মানবরূপ ধারণ করলেন আর বাস করতে লাগলেন মানুষের হৃদয়ে অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে। যিশু একাধারে মানব স্বভাব আবার অন্যভাবে ঐশ স্বভাবে আর ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। প্রথমত, মানব স্বভাব হয়ে জন্মগ্রহণ করাটা প্রয়োজন ছিল। মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন মানবজাতির পরিত্রাণের এবং পাপজাত মানুষকে পাপের অন্ধকার থেকে রক্ষা করার জন্য। দ্বিতীয়ত, তিনি দেহধারণ করে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণতা দান করলেন, মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করলেন ও ঈশ্বরের বাণীকে পূর্ণতা দান করলেন। যদিও যিশু মানবরূপ ধারণ করলেন তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রদত্ত একমাত্র সন্তান। যিশুর দেহধারণ এক অলৌকিক শক্তিতে পবিত্র আত্মার ঐশ কৃপায় মারীয়া গর্ভবতী হলেন এবং ধারণ করলেন শাশ্বত জ্যোতি স্বয়ং যিশুখ্রিস্টকে যিনি মুক্তিদাতারূপে পরিচিত। মুক্তিদাতার আগমন সম্বন্ধে বহু প্রবক্তাগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একজন মহান প্রবক্তার আবির্ভাব হবে আর বাণী সত্য হলো । সময় পূর্ণ হলে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে পাঠালেন এক কুমারীর কাছে "প্রণাম আশিষ ধন্য তুমি, তুমি গর্ভধারণ করবে ও এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে তাঁর নাম রাখবে যিশু।" মারীয়ার কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলেও মারীয়া ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে স্বেচ্ছায়, নম্র হয়ে গ্রহণ করে নিলেন স্বর্গদূতের ঐশবাণী। আর ঈশ্বর কুমারী মারীয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর ঐশবাণী পূর্ণ করলেন। মারীয়া গর্ভবতী হলেন পবিত্র আত্মার ঐশ শক্তিতে। সময় যখন পূর্ণ হলো মারীয়া যিশুকে জন্ম দিলেন। যাঁর জন্মদিনে আমাদের বড়দিন।

বড়দিন আনন্দের দিন। বড়দিনে যিশুর জন্য অন্তরটা আমরা সাজিয়ে রাখি। এই বড়দিনের পটভূমিকায় রয়েছে প্রত্যাশাময় নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দেওয়া। মানবজাতির পরিত্রাণের আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থে শিশু যিশু নম্র হয়ে মানুষের হৃদয়ে নেমে আসেন। ঈশ্বর ও মানুষের মহামিলনের শুভলগ্ন। আবার মানুষের মানুষের মিলনের সুবর্ণ-সুযোগ। একে অপরের সাথে পারস্পরিক মিলন, একাত্মতা, ক্ষমা আদান-প্রদান, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, খ্রিস্টীয় পরিবারে, সমাজে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, স্বার্থপরতা ত্যাগ করে, ক্ষমার মনোভাব নিয়ে, একে অপরকে গ্রহণ করা। পুরাতন মন মানসিকতা ভুলে গিয়ে নিজেকে সুন্দর ও পবিত্র করে তোলার উপযুক্ত সুযোগ বড়দিন। পাপস্বীকার বা পুর্নমিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ, নির্জন ধ্যানের মাধ্যমে নিজেকে যিশুর জন্য প্রস্তুত করে তুলি। কিন্তু বাস্তবতায় অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসী আছেন জীবনে পাপস্বীকার সংস্কারকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দেয়। যিশু জন্মগ্রহণ করলেন সর্ব মানবজাতির জন্য। বড়দিন শুধুমাত্র বাহ্যিক আয়োজন ও আনন্দেরই নয় বরং পুণ্য সংস্কার অর্থাৎ পাপস্বীকার, নির্জনধ্যান, আধ্যাত্মিক অনুশীলন, ক্ষমা, অনুতপ্ত চিত্ত অর্থাৎ নির্মল হৃদয় নিয়ে যিশুকে বরণ ও গ্রহণ করে নিতে পারি। শিশু যিশুর সরলতা, নম্রতা, দীনতা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের আদর্শ। বড়দিন মানে ফ্যাশন নয়, বাহ্যিক জাগতিকতা আমাদের পরিত্রাণ বা মুক্তি দিতে পারে না। বরং জীবন পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক শুচিতা অর্জন করতে পারি যিশুর কাছ থেকে। বড়দিন মানে মনোভাবের পরিবর্তন, মান-অহংকার, বিদ্বেষ, বর্তমানের বৈষম্যমূলক জীবন, ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে অশান্তির বদলে ভালোবাসা ও ক্ষমার মধ্য দিয়েই বড়দিনে পুনর্মিলিত হওয়ার চেষ্টা করি। তবে হৃদয়ে প্রার্থনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর সেই নির্মল হৃদয়ে যিশু জন্মগ্রহণ করবেন।

ভালোবাসা ও সেবা কাজে কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস প্রোগ্রাম ডেস্ক

কারিতাস বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। সংস্থাটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন ১৮৬০ এ নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস বাংলাদেশ নামধারণ করে এবং পরবর্তীতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ এর অধীনে নিবন্ধন লাভ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একটি সংস্থা। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হল বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

(সিবিসিবি)। কারিতাস বাংলাদেশ এর প্রধান পরিচালনাগত কাঠামো হল সাধারণ পরিষদ, কার্যকরী বোর্ড এবং নির্বাহী অফিস। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কমিটি (সিপিইসি) এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কমিটি (আরপিইসি) ভূমিকা পালন করে থাকে।

কারিতাস বাংলাদেশ এর আটটি অগ্রাধিকার হচ্ছে ১) বিপন্ন-জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সমাজকল্যাণ ও ভালবাসাপূর্ণ সেবা; ২) প্রতিবেশগত সংরক্ষণ, জলবায়ু ন্যায্যতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা; ৩) মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৪) শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি; ৫) স্বাস্থ্যযত্ন পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা; ৬) আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়ন; ৭) মানবের সামগ্রিক উন্নয়ন; ৮) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বশীলতা। কারিতাস বাংলাদেশ বর্তমানে এর আটটি অগ্রাধিকারের আওতায় ৯৭টি প্রকল্প ও তিনটি ট্রাস্টের মাধ্যমে নানামুখি উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সংস্থার অগ্রাধিকার এবং কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে নিম্নে ধারণা প্রদান করা হলো-

১) বিপন্ন-জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সমাজকল্যাণ ও ভালবাসাপূর্ণ সেবা: বিপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সমাজকল্যাণ, দয়া ও ভালোবাসার কাজ বিস্তারের জন্য কারিতাসে যে বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পায় সেগুলো হলো; দারিদ্র দূরীকরণ এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; পরিবারে আয় বৃদ্ধি; পরিবেশ সম্মত নিজস্ব বাড়ি ও বসতভিটা উন্নয়ন; সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার, মর্যাদা এবং ক্ষমতায়ন; প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী পথশিশু, হিজড়া, দলিত ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক কল্যাণ; শহরের দরিদ্র, প্রান্তিক এবং বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন; অভিবাসী, বাস্তুচ্যুত/স্থানান্তরিত দেশে অবস্থানরত মানুষদের (বিউটি পার্লারে কর্মরত শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, গৃহকর্মী, হিজড়া,

যৌনকর্মী, পথ শিশু, ইত্যাদি) এবং বিদেশে অবস্থানরতদের এবং অননুমোদিত অভিবাসী/আগতদের আর্থ-সামাজিক এবং জীবিকার উন্নয়ন; সংলাপ এবং মিলনের সংস্কৃতি প্রচার; আধুনিক দাসত্ব দূরীকরণ। এছাড়া সংহতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তির মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য অধিপরামর্শ (অ্যাডভোকেসি) করা। বর্তমানে কারিতাস বাংলাদেশ বিপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সমাজকল্যাণ, দয়া ও ভালোবাসাপূর্ণ সেবা বিস্তারে বর্তমানে ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারিতাস জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষাধিক বঞ্চিত নারী-পুরুষ, শিশু, বয়স্ক, মাদকাসক্ত, প্রতিবন্ধী এবং গৃহহীন-উদ্বাস্তু মানুষকে সেবা প্রদান করছে।

২) প্রতিবেশগত সংরক্ষণ, জলবায়ু ন্যায্যতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা: প্রতিবেশগত সংরক্ষণ,জলবায়ু ন্যায্যতা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়সমূহ হল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্ন; স্থায়িত্বশীল এবং জলবায়ুসহনশীল (স্মার্ট) কৃষি চর্চার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ; অতি

দরিদ্র এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং বৈচিত্রময় খাদ্য ও বৈচিত্রময় পেশায় প্রবেশাধিকার; অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোত্তম ও টেকসই ব্যবহার; ক্ষুদ্র কৃষকদের বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা; বাস্তুতন্ত্র, প্রজাতি এবং জীনগত বৈচিত্র সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ও সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয়

জনগণকে সম্পৃক্তকরণ; প্রকৃতির সাথে পুনর্মিলনের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর; ন্যায্য পরিবেশগত রূপান্তর; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করা; মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ রোধের সমাধান আনয়ন; প্রাকৃতিকভাবে পানি যেন বিশুদ্ধ/পরিস্কার হতে পারে তার উপায় খুঁজে বের করা; কৃষি ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি এবং শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন; প্রকৃতি থেকে বিকল্প পণ্যের সন্ধান; জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে শিক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য উপযোগী কৌশল ও প্রযুক্তিসমূহের প্রসার; সবুজ জ্বালানী/শক্তির প্রসার এবং শক্তি ও পানির সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ইত্যাদি। প্রতিবেশগত সংরক্ষণ, জলবায়ু ন্যায্যতা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারিতাস প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ২ লক্ষ হত-দরিদ্র ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষকে সেবা প্রদান করছে।

৩) মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যে বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সেগুলো হল: মানবিক সাড়াদান শক্তিশালীকরণ এবং দুর্যোগ সহনশীল সমাজ

গঠন; দুর্যোগে সাড়াদান কৌশল স্থায়ীত্বশীলকরণ; দুর্যোগ কবলিত জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা; দুর্যোগের সাথে এবং দুর্যোগের সময়ে টিকে থাকার জন্য জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি; দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরী সাড়াদান পরিকল্পনা, কৌশল ও নীতিমালার সাথে যুক্ত করে জনগণকে মুলস্রোতধারায় নিয়ে আসা; দুর্যোগ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব হতে ক্ষতি ও ধ্বংস হ্রাস করা; বিপন্ন জনগোষ্ঠীর নগর জীবনে বসবাসের সক্ষমতা ও স্থায়িত্বশীলতা আনয়ন এবং বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা; ঘর এবং কমিউনিটি এর দিগ্‌দর্শন সম্প্রসারণ করা; নিরাপদ অভিবাসন এবং পুনঃএকত্রীকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ (জলবায়ু অভিবাসী, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত; প্রত্যাবর্তনকারী উদ্বাস্তু), দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম, ভৌত অবকাঠামোসহ মানবিক প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় কারিতাস বাংলাদেশ বর্তমানে

২১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ৬ লক্ষ দুর্যোগে আক্রান্ত সহায়-সম্বলহীন, গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত হত-দরিদ্র মানুষকে সেবা সহায়তা, পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষম করে তুলছে। এছাড়া দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মেরামতসহ সরকারের সহায়ক সেবাসংস্থা হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখছে।

৪) শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি: শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের যে বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেয়া হয় তা হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা; শিশু বিকাশ

এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ; প্রাক্ শৈশব (ইসিডি)/ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি; মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা; বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষা; পারিবারিক জীবন দক্ষতা শিক্ষা; পেশাগত শিক্ষা; গ্র্যাজুয়েটদের জন্য চাকুরী প্রাপ্তিতে সহায়তা; শিশু, যুবক এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন এবং অন্যান্য ঝুঁকি (পাচার, টিজিং ইত্যাদি) থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা; শিশুদের সামাজিক উন্নয়ন (শারীরিক, মানবিক, সৃষ্টিশীল/নান্দনিক, আধ্যাত্মিক, ইত্যাদি)-এর জন্য ব্যাপক ও সমন্বিত পদ্ধতিতে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; তথ্যপ্রযুক্তি এবং মিডিয়া-এর দাসত্ব দূর করা, নৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাম্যবাদ এবং সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি, আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্ন, ইত্যাদি বিষয়ে গঠন ও শিক্ষাদান। বর্তমানে কারিতাস শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান অগ্রাধিকারের আওতায় ২১টি প্রকল্পের

মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে ৫৫ হাজারের অধিক বঞ্চিত শিশু ও অবহেলিত যুব এবং নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং তাদেরকে দক্ষ ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হচ্ছে এবং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

৫) স্বাস্থ্যযত্ন, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা: স্বাস্থ্যযত্ন, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার যে বিষয়গুলোতে অগ্রাধিকার দেয়া হয় সেগুলো হলো- উন্নত স্বাস্থ্যযত্ন, পুষ্টি; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিচর্যা; প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণ; জীবন রক্ষাকারী (প্রো-লাইফ) প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবার

পরিকল্পনা; নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে মানসম্মত ও ন্যায্য প্রবেশাধিকার; সমাজের লোকদের মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণ, এইচআইভি ও এইডস, যক্ষা, কুষ্ঠ, মহামারি

এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা তৈরী করা; মাদকাসক্ত ও যৌন নির্যাতিতদের চিকিৎসা, যত্ন ও প্রতিরোধ; প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং শিশুদের যত্ন ও চিকিৎসা সেবা; পুষ্টি নির্দেশক ও পুষ্টি সংবেদনশীল উদ্যোগ জোরদারকরণ; মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অধি-পরামর্শ ও সহযোগিতাপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি। কারিতাস বাংলাদেশ স্বাস্থ্যহীন জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য স্বাস্থ্যযত্ন, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা নিশ্চিত করতে বর্তমানে ১১টি স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ৭ লক্ষ বঞ্চিত নারী-পুরুষ, শিশু, বয়স্ক, মাদকাসক্ত, প্রতিবন্ধী এবং সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত অসুস্থ মানুষকে সেবা ও সহযোগিতা প্রদান করছে।

৬) আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়ন: আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়নে অগ্রাধিকার হলো, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান ও মর্যাদার

উন্নয়ন; আদিবাসী জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা; ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে শক্তিশালীকরণ এবং আদিবাসী জনগণ দ্বারা পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ; আদিবাসীদের ভূমি, সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি, কৃষ্টি, ইত্যাদির সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ; বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণ; ভূমি উদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি; সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা; মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা প্রদান প্রভৃতি। আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়নে বর্তমানে কারিতাস বাংলাদেশ ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ৫৩ হাজার এর অধিক আদিবাসী ভাই-বোনদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভূমির অধিকার সুরক্ষা করাসহ ভাষা, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সুরক্ষায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

৭) মানবের সামগ্রিক উন্নয়ন: কারিতাস বাংলাদেশ এর সকল কর্মসূচি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সকল মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল

ও কল্যাণে পরিচালিত হয়। সংলাপ এবং ভ্রাতৃত্ব, মিলনের সংস্কৃতি, সুরক্ষাকে মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বজনীন চেতনা লালন, জনগণের অংশগ্রহণ, সুশাসন, অর্ন্তভুক্তিমূলক উন্নয়ন, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, ডকুমেন্টেশন এবং ডেটা/তথ্যের সুরক্ষা, যোগাযোগ, স্বেচ্ছাসেবীতা, অ্যাডভোকেসি, লবিং এবং নেটওয়ার্কিং, অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি ও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অংশীজনদের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সক্রিয়তা এবং উত্তম প্রতিবেশি হওয়া প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পায়।

৮) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বশীলতা: কারিতাসের ভালোবাসা ও সেবাকাজ এবং এর অংশীদারদের স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব এবং সম্পর্ক উন্নয়ন ও বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; সংস্থা, কর্মী এবং অংশীদারদের সক্ষমতাবৃদ্ধি, যুগোপযোগি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে

অর্থনৈতিক সাবলম্বিতা নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করবার জন্য স্থানীয় সম্পদ সমাবেশীকরণ; কারিতাসের সম্পদসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার; বিনিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি করার নতুন নতুন প্রকল্প, উৎস এবং সম্ভাবনা খুঁজে বের করা; কারিতাস মাইক্রো-ফাইন্যান্স কর্মসূচিকে জোরদার করা; সামাজিক ব্যবসা/আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ; কৃচ্ছতা সাধন/ব্যয় সংকোচন, ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়ার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বশীলতা আনয়ন করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বশীলতা নিশ্চিত করা।

কারিতাস বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত ১৯৭০ এর প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা দানের মধ্য দিয়ে। দুর্যোগের মধ্য দিয়ে জন্ম হলেও পরবর্তীতে কারিতাস সামাজিক উন্নয়নে এর কর্মক্ষেত্র বিস্তার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেনী নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণে কার্যক্রম পরিচালনা করে সকলকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও সংস্থা মানুষের প্রয়োজন ও সৃষ্টির যত্নে ভূমিকা পালন করবে। মহান খ্রিস্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে কারিতাস বাংলাদেশ সকল ভাই-বোন, শুভানুধ্যায়ী ও অংশীদের জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা! শুভ বড়দিন।

বিশপদের সিনড: শেষ পর্ব - অক্টোবর ২০২৪

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই

ভূমিকা: সিনড হলো দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ফসল। পোপ ষষ্ঠ পৌল এই সিনড স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভ্রাতৃত্ব, মিলন, একতা এবং অবধারণ করা; বিশপ কনফারেন্সগুলো এবং সাধু পিতরের উত্তরাধিকারীর সাথে এগুলো চলমান রাখা। "মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের ঐশ জনগণ এবং তাদের মধ্যে মিলন ও একাত্মতা" এই সত্যের আরও গভীরে প্রবেশ করা এই মহাসভার একটা বিশেষ দিক ছিল। এই সিনড বুঝতে চেষ্টা করেছে কি করে ঐশ জনগণ আরও পূর্ণভাবে মণ্ডলীর জীবনে এবং মিশনে অংশগ্রহণ করতে পারে। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে সর্বদা নবায়িত হওয়ার আহ্বান জানান আর সিনোডালিটি এই অংশগ্রহণকে বাস্তবায়িত করে। সিনোডালিটি হলো পবিত্র আত্মায় অভিজ্ঞতা করা যে: তিনি আমাদের অবধারণ করতে কাজ করেন যখন আমরা আমাদের জীবনের ভিত্তি করি প্রভুর বাণী শোনা, প্রার্থনা এবং একতাকে। সিনোডালিটি হলো একটা সংলাপ, সাক্ষাৎ এবং ভ্রাতৃত্বের অভিজ্ঞতা করা, "আমি" থেকে "আমরা"-তে রূপান্তরিত হয়ে একটা পরিবার গঠন করি, যেখানে আমরা সবাই একে অপরের কাছ থেকে শিখি। এটা হলো ভ্রাতৃত্বের অভিজ্ঞতা যা ঈশ্বরের দিকে আমাদেরকে উন্মুক্ত করে। এই সিনড শুরু হয়েছে অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। প্রধান বিষয়বস্তু হলো: মণ্ডলী হলো একটি মিলন সমাজ, একই বিশ্বাস ও ভালোবাসার একটা ভ্রাতৃত্ব ও একতার সমাজ। দ্বিতীয়টি হলো: অংশগ্রহণমূলক একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে সবার স্থান রয়েছে, কেউ যেন অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হয়; তৃতীয়টি হলো: মণ্ডলীর একটা মিশন দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর অস্তিত্বের কারণই হলো প্রভুর মঙ্গলবাণী প্রচার এবং সবার মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার। এতে সমগ্র বিশ্ব মণ্ডলী অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ দুই পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে ২০২৩ এবং ২০২৪ এর অক্টোবর মাসে বিশপ, খ্রিস্টভক্ত, ব্রতধারী নর-নারী, বড় মণ্ডলীগুলোর প্রতিনিধি এবং অল্পসংখ্যক পুরোহিত অংশগ্রহণ করেছেন। গতবারের মতো তাদের সংখ্যা ছিল ৩৫০ এর মতো এবং সাথে ছিল ১০০ জনের মতো সাহায্যকারী। এটার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পোপের নেতৃত্বে কাথলিক মণ্ডলীর মিলন, একতা ও ভ্রাতৃত্ব। বিশ্বে সম্ভবত এটার মতো এত বড় প্রতিষ্ঠান আর নেই যেখানে এত জাতি-গোষ্ঠি, বর্ণ, দেশ ও ভাষাভাষীর মানুষের মিলন ঘটে। এত ভিন্নতার মধ্যে একই বিশ্বাসে এত মিলন ও একাত্মতা আর কোন প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় না। সবার মধ্যে যেন একই চিন্তা, কি করে স্থানীয় ও বিশ্ব-মণ্ডলীর কল্যাণ, মঙ্গল এবং বিস্তার ঘটানো যায়। এই সিনডের বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা:

১) গত তিন বছর পথ চলতে চলতে সিনড সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছে

সিনোডাল মণ্ডলীর অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়েছে এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে। মণ্ডলী আরও জনগণের কাছে এসেছে। এ পর্যায়ে আমরা উপলব্ধি করছি যে মণ্ডলী হলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত একটি সত্তা, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক এবং আমলাতান্ত্রিক একটা সংগঠন নয়। বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতায় তারা পরস্পরের সাথে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের একটা সমাজ। পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, সামাজিকতার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য ধর্মপল্লী নয়, একটা ক্লাবও নয়। ধর্মপল্লী হতে হবে উদারতা ও সেবার বিদ্যালয়, যার দরজা উন্মুক্ত থাকবে, অন্তর্ভুক্ত এবং নন-অন্তর্ভুক্ত সকলের জন্য। ধর্মপল্লী জনগণমুখী, আমলাতন্ত্র বহির্ভূত ঘনিষ্ঠবন্ধনে আবদ্ধ একটা মিলন সমাজ।

এ জগতে মণ্ডলী হলো তীর্থযাত্রী স্বর্গরাজ্যের অভিমুখে। সিনোডালিটি হলো সকল খ্রিস্টানদের নিয়ে একত্রে পথ চলা এবং সমগ্র মানব জাতিকে নিয়েই এই পথ চলা। এই পথ চলায় রয়েছে একে অপরের কথা শোনা, সংলাপ এবং অবধারণ করা। পবিত্র আত্মা আমাদের পথ প্রদর্শক। মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের গৃহ, তাঁরই নিজস্ব পরিবার, অতিথি পরায়ণ একটা গৃহ, ভালোবাসা ও সেবার একটি স্থান, যেখানে থাকবে না কোন বৈষম্য।

সিনোডালিটি হলো আধ্যাত্মিক নবায়নের পথ এবং structural (পদ্ধতি ও ধরণ) পরিবর্তন আনা যাতে মণ্ডলী আরও সক্ষম হয় আরও বেশী নর-নারীর অংশগ্রহণে মণ্ডলী হয়ে উঠে আরও অংশগ্রহণকারী ও মিশনারী এবং পথ চলতে চলতে খ্রিস্টের আলো বিকিরণ করতে পারে। তাই সিনোডালিটি আহ্বান করে কর্তৃপক্ষসহ সবার মন পরিবর্তন করতে।

সিনোডালিটি তার নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য নয় অথবা নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নয়, মণ্ডলীর মিশনকাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করে যে মিশনকাজ পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে যিশু মণ্ডলীকে দান করেছেন। মণ্ডলীর অস্তিত্বের প্রধান কারণ হলো বাণী প্রচার করা (B.Gb 14)। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রেরণ করেছেন বাণী প্রচার ও বাপ্তিস্ম দান করার জন্য *(মথি ২৮: ১৯-২০)*। এখানে আমাদের একটি কমিটি গঠন করা অত্যন্ত জরুরী যাতে উপাসনার এই সিনডের চর্চা করা যেতে পরা যায়।

২) সিনোডাল মণ্ডলীর কেন্দ্র: পবিত্র আত্মার সাথে সংলাপে আহ্বান

ক) পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ

"রোববার দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই মাগদালার মারীয়া যিশুর সমাধি স্থানে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরখানা সরানো অবস্থায় রয়েছে। তখন তিনি দৌড়ে গেলেন সিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে, যাকে যিশু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন" *(যোহন ২০:১-২)*। মাগদালার মারীয়া, সাধু যোহন ও পিতর এই তিন জন ভোরে যিশুকে খুঁজতে বের হন তাদের নিজেদের মত করে। ভালোবাসার দ্বারা তাড়িত হয়ে মাগদালার মারীয়া সবার আগে যিশুর কবরে যান। তার কথা শুনে পিতর ও যোহন কবরের দিকে যেতে শুরু করেন। যিশু যাকে ভালোবাসতেন তিনি তার যৌবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়ে আগে কবরে গিয়ে সবকিছু অবলোকন করেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বুঝতে পারেন, তবুও তিনি পিতরকে কবরে প্রথম যাবার সুযোগ করে দেন কারণ তিনি ছিলেন তাদের নেতা যাকে তাদের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। পিতর প্রভুকে অস্বীকার করার বেদনা হৃদয়ে বহন করে চলছিলেন। পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ এবং প্রভুর দয়া ও ক্ষমা লাভ করেন যাতে তিনিও এই ক্ষমা ও দয়াপূর্ণ কাজই মণ্ডলীতে চালিয়ে যেতে পারেন। আর মাগদালার মারীয়া বাগানে যিশুকে দেখলেন, যিশু তাকে চিনে তার নাম ধরে ডাকেন এবং তাকে প্রেরণ করেন শিষ্যদের কাছে পুনরুত্থানের বাণী ঘোষণা করতে। এই জন্য মণ্ডলী তাকে স্বীকৃতি দেয় যে, তিনি হলেন প্রেরিতদের প্রেরিত। একে অপরের সাথে সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতাই হলো সিনোডাল মণ্ডলীর কেন্দ্রে।

মণ্ডলীর বেঁচে থাকা এবং অস্তিত্বের কারণ হলো বিশ্বের কাছে পুনরুত্থানের সাক্ষ্য বহন করা। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট বিশ্বকে তাঁর শান্তি দান করেন এবং দান করেন পবিত্র আত্মার উপহার।

জীবিত খ্রিস্ট হলেন আমাদের সত্যিকারের স্বাধীনতার উৎস এবং আশার ভিত্তি, যে আশা আমাদের কোন দিন নিরাশ করে না। ঈশ্বর তাঁর মুখমণ্ডল আমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং যা মানব জাতির শেষ আকাঙ্খা (লক্ষ্য)। মঙ্গলসামাচার আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে আমরা যদি পুনরুত্থিত খ্রিস্ট বিশ্বাসে প্রবেশ করতে চাই এবং তাঁর নামে জগতের কাছে সাক্ষ্য বহন করতে চাই তা হলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের অন্তরের শূন্যতা, ভয়ের অন্ধকারে অবস্থান, সন্দেহ এবং আমাদের পাপময় অবস্থা। তবুও যারা এই অন্ধকারে এবং ভয়ের মধ্যেও সাহস নিয়ে অনুসন্ধানী হয়ে বেরিয়ে পড়ে তারাই আবিষ্কার করে যে, ঈশ্বর তাদেরকেই খুঁজছেন। ঈশ্বর তাদের নাম ধরে ডাকেন, ক্ষমা দান করেন এবং তাদেরকে প্রেরণ করেন তার ভাই-বোনদের কাছে। মণ্ডলী হলো এই বিশ্বে একতার সাক্রামেন্ত (দৃশ্যমান চিহ্ন)।

খ) ঐশ জণগণের পরিচয়:

ঈশ্বরের জনগণের পরিচয়ের ভিত্তি হলো পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষা গ্রহণ। এই পরিচয় প্রকাশিত হয় আমাদের পবিত্র হওয়ার জীবন আহ্বানে এবং প্রেরণের মধ্য দিয়ে এবং সব মানুষকে পরিত্রাণের আহ্বানের মধ্য দিয়ে *(মথি ২৮:১৮-১৯)*। সিনোডাল মিশনারী চার্চে সৃষ্টি হয় এই বাপ্তিস্ম সংস্কার থেকে খ্রিস্টকে পরিধানের মধ্য দিয়ে *(গালা ৩:২৭)* এবং পবিত্র আত্মা আমাদেরকে নতুন জন্ম লাভে সক্ষম করে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার মধ্য দিয়ে *(যোহন ৩:৫-৬)*। সমগ্র খ্রিস্টীয় জীবনের অস্তিত্বের উৎস এবং ব্যাপকতা পবিত্র ত্রিত্বের রহস্যে নিহিত যা আমাদের জীবনে বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসায় জীবন ও নতুনত্ব আনয়ন করে।

"ঈশ্বর চেয়েছেন মানুষকে পবিত্র করতে ও তাদের উদ্ধার করতে তবে। তিনি মানুষকে আলাদা ক'রে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগশূন্য ক'রে তা করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন তাদেরকে নিয়ে একটি জাতি গঠন করতে, যারা তাঁকে সত্য বলে চিনবে এবং পবিত্রতায় তাঁর সেবা করবে" *(খ্রীষ্ট মন্ডলী ৯)*। প্রভুর ভোজ হলো আমাদের মধ্যে মিলন ও একাত্মতার উৎস এবং ঐশরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা পথে প্রতিনিয়ত পুষ্টিসাধন। "যেহেতু সেই রুটি এক, তাই আমরা অনেক হয়েও একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একই রুটির অংশভাগী *(১ করি ১০:১৭)*। পবিত্র আত্মার অনুপ্রাণনে মণ্ডলী হলো পরমেশ্বরের আবাসগৃহ *(খ্রীষ্ট মন্ডলী ৬)*। এখন তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মতো, নিজেদের নির্মিত হতে দাও এক আধ্যাত্মিক মন্দির রূপে *(১ পিতর ২:৫)*।

বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি, ভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি মানুষ মণ্ডলীতে একত্রিত হয়ে আমাদেরকে মানুষের জীবনের আরও কাছাকাছি এসে ঐশ জনগণ হয়ে উঠার আধ্যাত্মিক আস্বাদনে বেড়ে উঠতে হবে *(মঙ্গলবার্তার আনন্দ ২৬৮)*। ঈশ্বরের জনগণ শুধু সংখ্যা দিয়ে গণনার জন্য নয় কিন্তু মিলন ও একাত্মতায় যারা তীর্থযাত্রী হিসাবে মিশনকার্যে তাদের অবস্থান। ঈশ্বরের জনগণ তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে যে স্থানীয় মণ্ডলীতে প্রোথিত সেখানেই তারা মঙ্গলবাণী প্রচার এবং মুক্তি লাভের সাক্ষ্য বহন করবে।

গ) ঈশ্বরের ভালোবাসার জনগণ:

ঈশ্বরের হৃদয়মন্দিরে গরীবদের জন্য বিশেষ স্থান আছে, আর সেই স্থান এতটাই বিশাল ও বিস্তৃত যে, তাদের জন্য তিনি "নিজে হয়েছিলেন দরিদ্র *(২ করি ৮:৯)* আমাদের গোটা মুক্তির ইতিহাস জুড়েই দরিদ্রদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। স্বর্গরাজ্যে সুখবর প্রচারের শুরুতে তিনি ঘোষণা করলেন: প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ

প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে" *(লুক ৪:১৮)*। যারা শোকার্ত, দরিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত তিনি তাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরের মনে তাদের বিশেষ স্থান আছে: তোমরা, দরিদ্র মানুষ যারা ধন্য তোমরা! ঐশরাজ্য তোমাদেরই *(লুক ৬:২০)*; এমনকি তিনি নিজেই তাদের একজন হয়েছেন: আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে"। তাই পোপ ফ্রান্সিস বলেন: "আমি এমন মণ্ডলী চাই যে-মণ্ডলী নিজে দরিদ্র এবং দরিদ্রদের কল্যাণে নিবেদিত" *(মঙ্গলবার্তার আনন্দ ২৯৮)*। দরিদ্ররা (বিশ্বাসীগণ) তাদের কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে যিশুর যাতনাভোগের সাথে যুক্ত হয়। তাই মণ্ডলীকে তাদের কথা শুনতে হবে। মণ্ডলীকে আরও শিখতে হবে যে, তারাই আমাদের মঙ্গলবাণী প্রচারের ক্ষেত্র।

ঘ) জগতে মণ্ডলী:

খ্রিস্ট হলেন মানব জাতির আলো (খ্রীষ্ট মন্ডলী ১) এই আলো খ্রিস্টমণ্ডলীর মুখমণ্ডলকে আলোকিত করছে যদিও মানুষের ভঙ্গুরতা ও পাপের ফলে এর উজ্জ্বলতা শেষ হয় না। মণ্ডলী খ্রিস্টের কাছ থেকে অনুগ্রহদান এবং দায়িত্ব পেয়েছে যাতে সে মানুষের মধ্যে বন্ধন স্থাপন, সম্পর্ক এবং আত্মীয়তা স্থাপন করে। মণ্ডলী এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যখন মানুষের অংশগ্রহণ কমে আসছে বিভিন্ন কারণে, একত্রে অংশগ্রহণের অনিচ্ছা অথবা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। মণ্ডলী খ্রিস্টের প্রাবক্তিক দায়িত্বেরও অংশীদার *(খ্রীষ্ট মন্ডলী ১২)* যা হলো সমস্ত মানব জাতিকে মণ্ডলীতে একত্রিত করা স্বাধীনভাবে: মিলন ও একাত্মতায়। মণ্ডলী অর্থাৎ খ্রিস্টের রাজ্য যা ইতিমধ্যে রহস্যাকারে উপস্থিত, ঐশ ক্ষমতার বলে সেই মণ্ডলী এই জগতে স্পষ্টতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মণ্ডলী সমগ্র জাতির কাছে খ্রিস্টের এবং ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণার এবং প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব লাভ করেছে। এই জগতে মণ্ডলী হলো ঐশরাজ্যের বীজ ও সূচনা *(খ্রীষ্ট মন্ডলী ৫)*। সেজন্য মণ্ডলী সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে একত্রে পথ চলে, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং গণমঙ্গলের লক্ষ্যে।

সিনোডাল যাত্রা আমাদের বিভিন্ন ক্যারিজম, বিভিন্ন জীবন-আহ্বান এবং সেবাকাজের শিকড় পুনঃআবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। কারণ একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি *(১করি ১২:১৩)*। বাপ্তিস্ম হলো খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি। কারণ এই সাক্রামেন্ত প্রত্যেককে মূল্যবান ঐশ-দানের সাথে পরিচয় করে দেয় তা হলো ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠা অর্থাৎ যিশুর সাথে পিতার যে সম্পর্ক তাতে অংশগ্রহণ করা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে। বাপ্তিস্মে আমরা সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করি, সবাইকে তা সমানভাবে দেয়া হয় এবং আমন্ত্রিত হই খ্রিস্টকে পরিধান করতে এবং তাঁর সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হই যেমন বিভিন্ন শাখা প্রশাখা একই কাণ্ডে যুক্ত। আমরা "খ্রিস্টান" নামে ডাকার মর্যাদা, এর মধ্যে রয়েছে অনুগ্রহদান যা আমাদের জীবনের ভিত্তি, আমাদেরকে ভাই-বোন হিসাবে এক সাথে পথ চলতে সক্ষম করে।

ঙ) খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশের সাক্রামেন্ত:

বাপ্তিস্মের অর্থ তখনই আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা এই সাক্রামেন্তকে খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশের সাথে যুক্ত করে দেখি। এই সাক্রামেন্তগুলো হলো: বাপ্তিস্ম, হস্তার্পন এবং খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদ। এই সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে পুনরুত্থিত বিশ্বাস (পাস্কাল

বিশ্বাস) আমাদেরকে ত্রিব্যক্তি ও মণ্ডলীর মিলন ও একাত্মতায় আমাদের প্রবেশাধিকার প্রদান করে। বয়সভেদে এই ঐশ মিলন ও মাণ্ডলীক মিলন প্রতিটি খ্রিস্টানকে অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে। খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ সাক্রামেন্ত আমাদের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেয় বিভিন্ন জীবন আহ্বান এবং মাণ্ডলীক সেবা কাজের। মমতাময়ী মাতৃমণ্ডলী তার সন্তানদের শিক্ষা দেয় যে, তারা যাতে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সাথে এবং মাণ্ডলীক সমাজের সাথে একত্রে পথ চলে। মণ্ডলী তার সন্তানদের কথা শুনে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং তাদের সবধরনের সন্দেহ দূর করে। আমরা ধনবান হই নতুনের আগমনে যখন তারা বিভিন্ন ভাষা-কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে মণ্ডলীতে প্রবেশ করে। পালকীয় যত্ন ও সচেতনতার অভাবে এই মাণ্ডলীক মিলন ও একাত্মতা তারা তত উপলব্ধি করতে পারে না।

হস্তার্পন হলো খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশের আরও একটি সংস্কার, হস্তার্পনের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার উপচে পড়া দানে তারা তাদের জীবনে বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে। যিশুও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে *(লুক ৪:১)* অভিষিক্ত হয়েছিলেন মঙ্গলবাণী প্রচার করার জন্য। এই একই আত্মা হস্তার্পনে ভক্তদের উপর নেমে আসেন। এই পবিত্র অভিষেকের মধ্য দিয়ে তারা হয়ে উঠে ঈশ্বরের আপন। সেজন্যই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের অনুগ্রহদান এই হস্তার্পন সাক্রামেন্ত গ্রহনকারীর জীবনে ও খ্রিস্টীয় সমাজে বিদ্যমান থাকে মূল্যবান উপহার হিসাবে। এই আত্মার কৃপা-আশিস আমাদের মধ্যে আশ্চর্য কাজ এবং একটা মিশনের জন্য উদ্দীপনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করে যাতে তারা পথে প্রান্তরে মঙ্গলবাণী প্রচারে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠীর মানুষও তাদের কথা বুঝতে পারে। সকল বিশ্বাসীগণ আহূত এই তাড়নায় তাদের অবদান রাখতে, পবিত্র আত্মার যে অনুগ্রহ পর্যাপ্ত পরিমাণে তারা লাভ করেছে সেই অনুসারে তাদের ভাই-বোনদের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করতে বিনম্রভাবে এবং সৃষ্টিশীল সম্পদশালী হিসাবে।

প্রভুর ভোজ হলো খ্রিস্টযাগ যা প্রথম এবং প্রধান উপায় যেখানে প্রভুর পবিত্র জনগণ মিলিত ও একত্রিত হয়। খ্রিস্টযাগ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর ঐক্য এখানে দৃশ্যমান হয়। এখানে খ্রিস্টভক্তগণ সচেতনভাবে এবং সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সেবা দায়িত্বের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করে বিশপ অথবা পুরোহিতের নেতৃত্বে। এখানে তাদের উপস্থিতি এবং সহ-সেবাদায়িত্ব দৃশ্যমান হয়। এই কারণেই মণ্ডলী এক জনগোষ্ঠি হিসাবে খ্রিস্টযাগ থেকে শিখতে পারে কিভাবে তারা এক ও ভিন্ন: মণ্ডলীর একতা এবং খ্রিস্টীয় জনগণের ভিন্নতা/ বহুত্ব: সাক্রামেন্তের একতা এবং উপাসনা পদ্ধতিতে ভিন্নতা, একই ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু তাদের আহ্বান, পবিত্র আত্মার দান ও সেবাকাজের ভিন্নতা। খ্রিস্টযাগ প্রকাশ করে পবিত্র আত্মায় সবার মধ্যে একতা কিন্তু ইউনিফর্মিটি নয় প্রতিটি অনুগ্রহদান গণমঙ্গলের উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে। প্রতিটি খ্রিস্টযাগ উদ্‌যাপন প্রকাশ করে আমাদের ইচ্ছা এবং আমরা আবার আহূত সমস্ত বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের এক হওয়াতে। রোববারের খ্রিস্টযাগে জনগনের মিলন প্রভুর বাণীর কাছে এবং সেখানে যিশু নিজে উপস্থিত আছেন।

চ) একতা-সম্প্রীতি:

আধ্যাত্মিক সত্তা হিসাবে মানুষকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, তবে তারা পারস্পরিক সম্পর্কিত জীব। এই সম্পর্কগুলো যত সুন্দর ও খাঁটি হয় ততই ব্যক্তি আরও পরিপক্কতার পরিচয় বহন করে। সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় সে তার মেধা, গুন, চিন্তা-চেতনা, শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও সার্বিক বিকাশ ঘটাতে পারে না। তার বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে মানুষ ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এই সম্পর্কগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিনোডাল মণ্ডলী স্বীকার করে যে, এই পারস্পরিক সম্পর্ক উৎসারিত হয় পারস্পরিক ভালোবাসা থেকে যা তৈরী করে নতুন আদেশ যা যিশু তাঁর শিষ্যদের দান করেছেন *(যোহন ১৩: ৩৪-৩৫)*। বিশ্বজনীন খ্রিস্টমণ্ডলী হল ঐক্যবদ্ধ জনগণ, এবং তাদের ঐক্য পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য থেকেই আগত *(খ্রিষ্টমন্ডলী ৪)*। এই সম্পর্ক যে কত শক্তিশালী তার সাক্ষ্য তারা বহন করতে পারে; যা পবিত্র ত্রিত্বের উপর স্থাপিত যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বাতন্ত্রবোধ, কৃষ্টি ও সমাজকে আক্রান্ত করছে।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা পরিবারকে গৃহ মণ্ডলী হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। পরিবার হলো সেই স্থান যেখানে আমরা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর, সহজ ও ব্যাপকভাবে চর্চা করি যেখানে রয়েছে চরিত্র, লিঙ্গ, বয়স ও কর্মদায়িত্বের ভিন্নতা। আমরা পরিবারেই সিনোডাল মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা করতে শিখি। যদিও পরিবারে অনেক সংগ্রাম, সীমাবদ্ধতা ও ভঙ্গুরতা রয়েছে তবু পরিবারেই আমরা ভালোবাসার আদান-প্রদান করতে শিখি, একে অপরের উপর আস্থা রাখি, পুনর্মিলন, ক্ষমা করা এবং বোঝাপড়া করি। এখানে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের সবার সমান মর্যাদা রয়েছে এবং আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পারস্পরিক আদান-প্রদান করার জন্য। এখানে শিখি, একে অপরের কথা শুনতে হবে, আমরা শুনতে সক্ষম। এখানে আমরা একত্রে অবধারণ করি এবং একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমরা এখানেই কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করি এবং ক্ষমতা ব্যবহার করি। আমরা এখানে "আমাদের" মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করি আবার সদস্যদের মধ্যে যুক্তিযুক্ত ভিন্নতা উৎসাহিত করি।

সমগ্র মণ্ডলী গঠিত হয় বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি, বর্ণ ও ভাষা-ভাষী ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির মানুষদের নিয়ে। তাদের আবার রয়েছে বিভিন্ন ধরনের জীবন-আহ্বান, অনুগ্রহদান (ক্যারিজম) এবং জনমঙ্গলের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা। আবার কোন মণ্ডলীতে রয়েছে তাদের ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি। আবার রয়েছে বিভিন্ন মণ্ডলীতে ঐক্য প্রচেষ্টা।

এই জগতে মণ্ডলী বসবাস করে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনদের সাথে। তাই এখানে রয়েছে একে অপরের সাথে বোঝাপড়া, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা। অন্যধর্মের সাথে আমরা শান্তি, সম্প্রীতি এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সহভাগিতা করতে পারি। দরিদ্রতা দূরীকরণে, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় এবং মানব উন্নয়নে একসাথে পথ চলতে পারি। ধর্মগুলোর মধ্যে আমরা একটা সেতু বন্ধন স্থাপন করতে পারি। অন্য ধর্মের প্রতি আরও ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারি। অন্য ধর্ম আগন্তুক না হয়ে, হয়ে উঠতে পারে আমার প্রতিবেশি ধর্ম। আমাদের বিশ্বাস ও ধর্ম চর্চা অর্থপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠে না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসি। একত্রে পথ চলতে চলতে আমরা বুঝতে পারবো যে অন্য ধর্ম আসলে শুধু অন্যের ধর্মই নয়, সে-তো আমার প্রতিবেশির ধর্ম।

ছ) সিনোডাল আধ্যাত্মিকতা:

মণ্ডলীতে সিনোডালিটি আসলে একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। এটা সকল বিশ্বাসীদের জীবনে এবং মিশনকর্মের প্রতিটি স্তরে প্রবেশ করে প্রভাবান্বিত করে এবং সবকিছুতে সিনোডাল ধারার সৃষ্টি করে। এই আধ্যাত্মিকতা প্রবাহিত হয় পবিত্র আত্মা দ্বারা, তাঁর প্রেরণা ও কাজের মধ্য দিয়ে। এ জন্য প্রয়োজন পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শোনা, প্রভুর বাণী শোনা, ধ্যান-প্রার্থনা, নিরবতা ও হৃদয় মনের পরিবর্তন আনয়ন করা। সেজন্য পোপ ফ্রান্সিস তাঁর দ্বিতীয় সেশনের প্রারম্ভে বলেছেন: পবিত্র আত্মা আমাদের নিশ্চিত পরিচালনা দানকারী, আমাদের প্রথম কাজ হলো শিক্ষা গ্রহন করা কিভাবে পবিত্র আত্মার কণ্ঠ অবধারণ করতে পারি যেহেতু তিনি সবার মধ্য দিয়ে এবং সবকিছুর মধ্য দিয়ে কথা বলেন। সিনোডাল আধ্যাত্মিকতায় প্রয়োজন কৃচ্ছ্রসাধন, নম্রতা, ধৈর্য, ক্ষমা করার ইচ্ছা এবং ক্ষমা পাবার আকাঙ্খা। এই ধরনের মনোভাব পবিত্র আত্মার দেয়া দিব্য দান আমরা কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা সহকারে গ্রহণ করি সার্বজনীন মঙ্গল করার জন্য *(১করি ১২:৪-*

৫)। এই সমস্ত দিব্য দানগুলো আমরা গ্রহণ করি কোন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা, গর্বিত, উচ্চ আসন অথবা সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য নয়, খ্রিস্টের মনোভাব নিয়ে, যিনি নিজেকে রিক্ত করলেন ও দাসের স্বরূপ গ্রহণ করলেন *(ফিলি ২:৭)*। আমরা সিনোডাল মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতার ফল দেখাতে পারি যখন মণ্ডলীর দৈনন্দিন জীবনে ফুটে ওঠে মিলন এবং ভিন্নতার মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি। কেউই একা একা খাঁটি আধ্যাত্মিকতায় বৃদ্ধি পেতে পারে না; আমাদের প্রয়োজন অন্যের সমর্থন, পরামর্শ ও গঠনসহ, ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে সহযাত্রা করা।

খ্রিস্টীয় জীবনে নবায়ন শুধু তখনই সম্ভব যখন আমরা আমাদের জীবনে ঐশ-অনুগ্রহদানকে প্রাধান্য দান করি। যদি আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আধ্যাত্মিকতার অভাব ও ঘাটতি থাকে তখন মণ্ডলী সিনড বিশিষ্ট না হয়ে এটা হবে সাংগঠনিক শ্রীবৃদ্ধি। আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে যাতে করে সম্ভব হয় প্রভুর নতুন আদেশ পালন, ভালোবাসার পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটানো। আমাদের মণ্ডলীতে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে তা ব্যবহার করে সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী গঠনে অবদান রাখতে পারি এবং এখানে নবায়ন আনতে পারি: উন্মুক্ত হওয়া প্রার্থনায় সবার অংশগ্রহণে, একত্রে যাপিত অবধারণ এবং মিশনারী কর্মকাণ্ড যা আসে আমাদের সহভাগিতা থেকে এবং তা সেবায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

পবিত্র আত্মার সাথে কথোপকথন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য যা আমাদেরকে সক্ষম করে তোলে কথা শোনার মধ্য দিয়ে "ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলোকে কী বলছেন!" *(প্রত্যাদেশ ২:৭)* তা অবধারণ করতে। এই চর্চা আমাদের মধ্যে আনন্দের উদ্দীপক, বিস্ময়ের অনুভূতি সৃষ্টি এবং কৃতজ্ঞতাবোধ অভিজ্ঞতা করে সিনোডাল মণ্ডলীর চলার পথে ব্যক্তি, গোষ্ঠি এবং মণ্ডলীতে বয়ে আনে একটা পরিবর্তন ও রূপান্তর। পবিত্র আত্মার সাথে কথোপকথন সংলাপের চেয়ে আরও ব্যাপক ও গভীর: এগুলো আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং সম্পর্ককে এক সূত্রে আবদ্ধ করে একটা সম্মিলিত কার্যকারী জয়গা (space) তৈরী করে। এই কথোপকথন আনায়ন করে আমাদের মনের পরিবর্তন (conversation creates conversion)। এটাই আমাদের মধ্যে তৈরী করে একটা সার্বিক বোঝাপড়া ও একাত্মতা যা আমাদের সামগ্রিক ব্যাপারে জনমঙ্গলের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে। ঐশ-অনুগ্রহদান আমাদের মানবিক ব্যাপারগুলোকে কার্যকরী ও সফল করে তুলে। পবিত্র আত্মাতে কথোপকথনের অর্থ হলো বিশ্বাসের আলোতে জীবন-যাপন করা এবং মঙ্গলসমাচারীয় পরিবেশে ঈশ্বরের ইচ্ছা খোঁজা যখন আমরা আত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

জ) সিনোডালিটি হলো প্রাবক্তিক:

নম্রতার চর্চা সিনোডাল বৈশিষ্ট্যকে সক্ষম করে বর্তমান জগতে মণ্ডলীতে প্রাবক্তিক হয়ে ওঠার জন্য। পোপ ফ্রান্সিস বলেন: সিনোডাল মণ্ডলী হলো সকলের সামনে একটা মানসম্মত ব্যবস্থা যা সকল জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা এরকম একটা সময়ে বসবাস করছি যে, যেখানে রয়েছে ব্যাপক চলমান অসাম্যতা, প্রথাগত পদ্ধতির ফলে মানুষের স্বপ্নভঙ্গ, সমস্যায় জর্জরিত গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের উত্থান, সব কিছুতে মার্কেটিং মডেলের প্রভাব যা জনমঙ্গল ও পরিবেশের প্রতি হুমকি স্বরূপ। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সংলাপের পরিবর্তে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিনোডালের চর্চা আমাদেরকে critical ও প্রাবক্তিক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এইভাবে আমরা জগতের জন্য একটা অবদান রাখতে পারি যারা জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রয়েছে।

সিনোডাল পদ্ধতি একটা সুন্দর পারস্পরিক সম্পর্কের একটা পদ্ধতি এবং একটি দৃষ্টান্ত ও সাক্ষ্য জগতের সামনে। সিনোডালিটি বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উত্তর হয়ে উঠতে পারে। মানুষকে সাদরে গ্রহণ, মর্যাদা ও স্বীকৃতি দান করা অনেক সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। বর্তমান জগতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানুষ একাকী ও নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক যা মণ্ডলীকেও আক্রান্ত করছে, সিনড আমাদের আহ্বান করছে পারস্পরিক যত্ন, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সহ-দায়িত্ব পালন করে জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করতে। সবার কথা শোনা বিশেষ করে যারা দরিদ্র, এই বিশ্বের বিপরীতে ধনীরা নিজেদের নিয়োজিত করে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে যা দরিদ্রদের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির প্রতি সমাজের অবহেলা ও উদাসীনতা বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের সবার আবাস গৃহ এই পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর। সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিযত্ন দান করা দরকার যা আমাদের সম্পর্ককে আরও জোরদার করে। এভাবেই মণ্ডলীকে সবার কল্যাণে মিশন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩) আরও অতিথিপরায়ণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং শ্রবণকারী মণ্ডলী:

মণ্ডলী হলো অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ, এখানে সবাই আমন্ত্রিত এবং এখানে সবার স্থান রয়েছে। প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠি, বর্ণ ও ভাষাভাষীর নর-নারী নিয়ে গঠিত এই মণ্ডলী। দুর্ভাগ্যবশত: এখনও অনেকে উপলব্ধি করে যে, তারা বিভিন্নভাবে আহত ও কষ্ট পাচ্ছে কারণ অনেকে মনে করে এটা যেন তাদের আপন মণ্ডলী নয় কারণ তারা মণ্ডলীর বাইরে অথবা তাদের বিবাহিত জীবনে ত্রুটির জন্য অথবা তাদের পরিচয়ের জন্য অথবা তাদের লিঙ্গ বৈসম্যের জন্য। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে আহ্বান করছেন যাতে আমাদের ভালোবাসা ও আতিথেয়তার তাবুর সীমানাটা বাড়িয়ে দেই যাদের আমাদের সহায়তা প্রয়োজন তাদের জন্য। এখানে একে অন্যের কথা শুনতে হবে, তাদের আপন করে নিতে হবে, একসাথে পথ চলতে হবে এবং সঙ্গ দান করতে হবে। কথা শোনার মধ্য দিয়েই আমাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একই সাথে তার কষ্ট অনুভব করতে পারি এবং তার কান্না শোনার মধ্য দিয়ে তার জীবনে বয়ে আনি সান্ত্বনা, সুস্থতা ও নতুন জীবন। যিশুর নিকট যে-ই এসেছে তিনি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। এ রকম কোন ঘটনা আমরা দেখি না যেখানে যিশু পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন, তিনি থেমেছেন তাদের কথা শুনেছেন এবং তাদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন। সামগ্রিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে তাদের সাহচর্য দিতে হবে, প্রয়োজন হতে পারে সংলাপ, পরামর্শ এবং কাউন্সিলিং এবং সাথে সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে পুনর্মিলন ঘটাতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মুক্তির পথ খুঁজছে। তাদের সহায়তা প্রয়োজন।

৪) সিদ্ধান্ত নেয়া সিনোডাল পদ্ধতিতে:

সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতিতে মাণ্ডলীক অবধারণ প্রয়োজন, অন্যের কথা শোনার জন্য আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন (প্রতিটি ধাপে)। নারী-পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। মণ্ডলীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ও মাণ্ডলীক দায়িত্বে আরও বেশী সংখ্যক নারী-পুরুষের নিয়োগ দিতে হবে। ধর্মসংঘগুলো এবং তাদের ক্যারিজমের আরও স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মণ্ডলীর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সেবায় তাদের নিয়োজিত করা প্রয়োজন। যোগ্যতাসম্পন্ন খ্রিস্টভক্তদের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কর্তৃপক্ষকে তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে শুধু নাম মাত্র পরামর্শ নয়। মাণ্ডলিক আইনে বলা হয়েছে যে, অন্যের পরামর্শ শুধু পরামর্শমূলক কর্তৃপক্ষ এগুলো গ্রহণ করতে পারে অথবা বাদ দিতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে মাণ্ডলিক আইনের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সাধু সিপ্রিয়ান বলেছেন, কোন কিছুই বিশপ এবং পুরোহিতদের ছাড়া নয় আবার কোন কিছু খ্রিস্টভক্তদের ছাড়া নয়। এটাই যথাযোগ্য হবে প্রতিটি ধাপে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৫) সহ-দায়িত্ব (Co-responsible leadership) স্থানীয় মণ্ডলীর সর্বক্ষেত্রে প্রচলন করা:

অংশগ্রহণকারী দল: ধর্মপ্রদেশীয় সিনড, ধর্মপ্রদেশীয় কাউন্সিল, ধর্মপল্লী পরিষদ, প্রেসবিটারেল কাউন্সিল, অর্থ-কাউন্সিলকে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করা। মণ্ডলীতে বিদ্যমান সঙ্ঘ-সমিতিগুলোর মধ্যে এই সিনোডাল পদ্ধতি শুরু করার (ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ, যুব কমিটি, শিশু মঙ্গল, সেনা সঙ্ঘ, শ্রমজীবিদের সঙ্ঘ ইত্যাদি)। এই সমিতিগুলো আরও সিনোডাল করা। মহিলা, যুবকদের আরও উৎসাহিত করা বিশেষ করে যারা দরিদ্র ও প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এই সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলীর বিশেষ পদ্ধতি হলো: নীচে থেকে উপরের দিকে যাত্রা, উপর থেকে নীচের দিকে নয়। ব্রত-ধারী নর-নারী ও বিভিন্ন গোষ্টিকে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা।

৬) স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও মূল্যায়ন চর্চা করা:

মণ্ডলী জগতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো নয়। তার সমস্ত কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ এবং থাকতে হবে দায়বদ্ধ। শুধু অর্থের ব্যাপারে নয় তার পালকীয়, সমস্ত সেবা কাজেও এই নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে। পরিশেষে মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আরও সুসংগঠিতভাবে কাজ করতে হবে। মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আরও সঠিকভাবে কাজ কারার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত ধারণার পিছনে রয়েছে ঐশতাত্ত্বিক যুক্তি: স্বচ্ছতা হলো নির্মল হৃদয়ের প্রকাশ, দায়দ্ধতা হলো মিলন সমাজের চিহ্ন। এই চর্চাগুলো ধর্ম সংঘগুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রয়েছে।

৭) নারীদের নেতৃত্ব ও সেবা দায়িত্বে অংশগ্রহণ জোরদার করা:

বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই ঈশ্বরের জনগণ হিসাবে একই সম-মর্যাদা লাভ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো নারীরা এখন সম-অধিকার, আহ্বান ও বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছেন, তারা তাদের সেবার যথাযোগ্য স্বীকৃতিও লাভ করছেন না মাণ্ডলীক জীবনে। ঈশ্বর নারী-পুরুষ করে তাঁর প্রতিমূর্তি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন *(আদি পুস্তক ১:২৭)* অসমতা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ছিল না। বাপ্তিস্মে আমরা নতুন মর্যাদা লাভ করি, একই সম্মান ও গৌরব লাভ করি। ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার লাভ কারি। তাই নতুন নিয়মের আলোকেই এই বিষয়টি বিচার করতে হবে: "তোমরা যারা দীক্ষাস্নানে খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়েছ তারা সকলেই নববেশ-রূপে পরিধান করেছ স্বয়ং খ্রিস্টকে। তোমাদের মধ্যে এখন ইহুদী নেই, অনিহুদীও নেই, ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই, পুরুষও নেই, নারীও নেই, কারণ খ্রিস্ট যিশুর সাথে মিলিত হয়ে তোমরা সকলেই এক হয়ে আছ" *(গালা ৩:২৭২৮)*। খ্রিস্ট যিশুর সাথে মিলিত হয়ে এক হয়েছি, এই "এক" হওয়া বাস্তবে রূপ দিতে হবে। যত ধরনের বিভাজন ও বৈষম্য দূর করতে হবে।

এই সভা অনুরোধ করে মণ্ডলীতে নিয়ম অনুসারে তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। মণ্ডলীতে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ, সমতায়ন, তাদের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দান করতে হবে। মহিলা ডিকন হওয়ার ব্যপারটা উন্মুক্ত রইলো।

৮) প্রশিক্ষণ দান:

জনগণ, পুরোহিত, ব্রতধারী নর-নারী ও বিশপদের গঠন-প্রশিক্ষণ জরুরী: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তার শিষ্যদের মুক্তিদায়ী শান্তি-উপহার দান করেন এবং তাঁর মিশনের সহভাগী করেন। এই শান্তি হলো পূর্ণ জীবনের প্রতীক, ঈশ্বর ও মানুষ এবং প্রকৃতির সাথে সম্প্রীতি ও পুনর্মিলন। তাঁর মিশন হলো স্বর্গরাজ্যের বিস্তার করা, ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা সবাইকে দান করা। পবিত্র আত্মাকে লাভ করার মধ্য দিয়ে মিশনারী শিষ্য জন্মগ্রহণ করে। সিনোডালিটি বিশ্বাসীদের মধ্যে তাদের আহ্বান ও মিশনারী দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন করবে। আমাদের মাণ্ডলিক সম্পর্ক নবায়ন করতে হবে এবং সৃজনশীল অংশগ্রহণ করতে হবে। সিনোডাল প্রশিক্ষণ এবং সিনোডাল ষ্টাইল খ্রিস্টানদের আরও সচেতন করবে তারা বাপ্তিস্মে যে দান লাভ করেছে তা শুধু নিজেদের জন্য নয়, লুকিয়ে রাখার জন্য নয়, অন্যদের সেবায় প্রয়োগ করতে হবে। মিশনারী হওয়া শিকড় প্রোথিত আছে খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশের সাক্রামেন্তে (Sacrament of Initiation).

বাপ্তিস্ম থেকে হস্তার্পণ পর্যন্ত যথাযথ, ব্যাপক ও পূর্ণ গঠন প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এই গুরুত্বপূর্ণ গঠন-প্রশিক্ষণে বাইবেল, ধর্মশিক্ষা, বিশ্বাসের গঠন, মণ্ডলীর শিক্ষা, মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্য দিয়েই প্রতিটি খ্রিস্টান তার আহ্বান নতুন করে আবিষ্কার করতে পারবে, জীবনে পূর্ণতা লাভ করবে এবং খ্রিস্টকে প্রচারের তাগিদ অনুভব করবে। এই গঠনের বিশেষ দিক হলো আমাদের প্রত্যেককে খ্রিস্টেতে রূপান্তিত হওয়া, খ্রিস্টকে পরিধান করা। খ্রিস্টীয় জীবনে চলমান গঠন-প্রশিক্ষণ প্রয়োজন যাতে তাদের মিশনারী দায়িত্ব পালন করতে পারে। এই গঠনের উদ্দেশ্য শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন নয় বরং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে আরও উন্মুক্ত হতে পারে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ, সহভাগিতা, সহযোগিতা, সুচিন্তা, ধ্যান এবং জনমঙ্গলের কথা চিন্তা করে অবধারণ করতে পারে।

উপসংহার:

"সদাপ্রভু এই পর্বতের উপর সকল জাতির জন্য সাজিয়ে রাখবেন উৎকৃষ্ট খাদ্যের এক মহাভোজ, উত্তম আঙ্গুররস, রসাল-শাঁসাল খাদ্য, সেরা আঙ্গুররসের এক মহাভোজ। এই পর্বতের উপরে তিনি বিলুপ্ত করবেন সেই আচ্ছাদন, যা আচ্ছন্ন করে রাখছিল সকল জাতির মানুষের মুখ, সেই আবরণ যা পাতা ছিল সকল দেশের মানুষের উপর। তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন; স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল, তাঁর আপন জাতির অপমান গোটা পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন, কারণ স্বয়ং প্রভুই একথা বলছেন" *(ইসা ২৫:৬-৭)*।

সিনডের দ্বিতীয় এবং শেষ সেশন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পরিচালনার জন্য যে সহায়িকা পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়েছিল প্রবক্তা ইসাইয়ার উপরোক্ত বাণী দিয়ে শুরু করা হয়। প্রবক্তা ইসাইয়া একটা ভোজের সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। প্রভু একদিন পাহাড়ের উপড়ে বড় একটা ভোজ সভার আয়োজন করবেন। প্রচুর পরিমানে উত্তম ও সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হবে। এই ভোজসভার অর্থ হলো সকল মানুষের সহ-অবস্থান ও তাদের মধ্যে একটা মিলন ও ভ্রাতৃত্ব। পিতার কাছে যাবার পূর্বে যিশু তাঁর শিষ্যদের এই দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন তারা যেন বাইরে যায়, যাতে তারা অন্যের জন্য এই ভোজের আয়োজন করে যা তাদের দান করে জীবনের পূর্ণতা এবং আনন্দ। মণ্ডলী পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ঈশ্বর মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে মানব জাতির অন্তরে আশার সঞ্চার করবেন, আনন্দ পুনঃস্থাপন করবেন এবং সবাইকে মুক্ত করবেন বিশেষ করে যারা দুঃখ যন্ত্রনার মধ্যে রয়েছেন এবং চোখের জলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। যিশুর শিষ্যদের কানেও এই দীন-দরিদ্রদের কান্না পৌছায়। সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী প্রবক্তা ইসাইয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিয়োজিত। সব জাতির মানুষ মিলিত হবে একই ভোজসভায় - একই ভ্রাতৃত্বে।

বর্তমান বিশ্বে মণ্ডলীকে সিনোডাল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরী। এই পদ্ধতি অবলম্বন ও চর্চার মধ্য দিয়ে মণ্ডলী আরও শক্তিশালী হবে, হবে আরও যুগোপযোগী, জনগনের অংশগ্রহণে এবং মিশন-দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী হয়ে উঠবে আরও জীবন্ত এবং তাদের আপন পরিবার যারা একই বিশ্বাস, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ এক মিলন সামাজ। প্রভুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে পবিত্র আত্মার আলো ও শক্তি লাভ করে মণ্ডলী হয়ে উঠবে মিলন, একতা, সেবা ও ভালোবাসার দৃশ্যমান চিহ্ন। বৈষম্যহীন ভ্রাতৃত্বের এক মানব পরিবার।

সিনোডাল সংস্থার বৈশিষ্ট্য, নীতি ও বাস্তবানুগ পদক্ষেপ

ড. আলো ডি'রোজারিও

১। সিনোডাল সংস্থার আলোচনা আমাদের বেশ বড় একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায় আর সে প্রশ্নটি- সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান? তেমন কিছুই না। একদম সাধারণ সে চাওয়া, আমরা যেন মিলেমিশে থাকি। একত্রে থাকি। একসাথে চলি। তাঁর দেয়া দান, যা ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত, ব্যবহার করে আমরা যেন নিরাপদে, স্বস্থিতে ও সুখে-শান্তিতে থাকি। এখানে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি আমরা যারা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মানবসেবায় বা সমাজসেবায় নিয়োজিত তারা কেমন আছি? ভাই-বোন হিসেবে মিলেমিশে আছি? আমাদের যোগাযোগ কেমন? আমরা কী সুখে আছি? স্বস্তিতে আছি? শান্তিতে আছি? আমরা কী যেকোনো মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের দেখা পাই? আমরা যারা সংস্থায় নেতৃত্ব দিচ্ছি তারা কী সহকর্মীদের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে দেখি? সহকর্মীদের কী এমনভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারছি যেন তারা মাঠ বা পরিবার পর্যায়ে উপকারগ্রহণকারীর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরকে দেখেন?

২। আমাদের প্রতি মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস সিনোডাল পদ্ধতি নামক আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মাধ্যমে কী আহ্বান রেখেছেন? তিনি আহ্বান রেখেছেন, ভাই-বোন হিসেবে একসাথে বসার; সকলের সাথেই হবে এই বসা, বসে আলাপ-আলোচনা করা, বলার চেয়ে শুনতে বেশী সময় দেয়া ও গভীর মনোযোগ নিয়ে শোনা। আমাদের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, আশা-হতাশা, স্বস্তি-অস্বস্তি, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, ভালোলাগা-মন্দলাগা, ইত্যাদি সহভাগিতা করা। সেসাথে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখা, মানুষের জীবনকে নিরাপদ রাখা, অসুস্থ যারা তাদের সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলা। শুধু শারীরিক সুস্থতা না মানসিক সুস্থতার কথাও বিবেচনায় নিতে হবে। এখানে একটি সিনেমার কথা বলা বোধহয় প্রাসঙ্গিক হবে। জন ন্যাশ, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'ইকোনমিক সায়েন্স' এ নোবেলজয়ী আমেরিকান গণিতবিদ। তার জীবন নিয়ে সিলভিয়া নেসারের লেখা 'অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড' গ্রন্থ অবলম্বনে, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত সিনেমাটি জিতে নেয় অস্কার পুরস্কার। একটি মানসিক অসুস্থতার ধরন কী হয় কিংবা কীভাবে সামলাতে হয় সেটি এই সিনেমার অংশ। কোনো কোনো মানসিক অসুস্থতা কখনোই সেরে ওঠে না। এইরূপ ব্যক্তির কাছে কোন্ জায়গাটা হাসপাতাল নয়? এইরূপ একজন রোগীর পরিবারের সদস্যদের কাছে কোন্ সময়টা ধৈর্যের পরীক্ষা নয়? আর হাসপাতালে? তারা তো নামহারা ক্লায়েন্ট। ঔষধ কোম্পানীর কাছে নতুন ঔষধ আবিষ্কারের গিনিপিগ। আমরা যারা বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করি আমাদের কাছে আমাদের উপকারভোগীরা কী? শুধুই উপকারভোগী? নাকি একজন সম্ভাবনাময় ও আত্মমর্যাদাশীল মানুষ? তাদের আমরা কী বলে সম্বোধন করি? কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা সেবাগ্রহণকারীদের সম্বোধন করতেন 'আমাদের মানুষ' বা 'একজন মহান মানুষ' বা 'কী আশ্চর্য রকমের ভালো মানুষ' বলে।

৩। আমরা যেন সবসময় মনে রাখি, আমরা পুঁজিবাদী সমাজে বসবাস করছি। যে সমাজে গুরুত্ব পায় মুনাফা বা লাভ, উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক উপযোগিতা। পুঁজিবাদী সমাজের উপরোক্ত গুরুত্বের কারণে সীমিত চলাচলে সক্ষম ব্যক্তিগণ যে বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকারী, তা আর কেউ তেমন মনে রাখেন না। সীমিত চলাচলে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন- প্রবীণ, শিশু, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি (বা প্রতিবন্ধী), গর্ভবতী মা, শিশুকে স্তন্যদানকারী মা, দ্বীপে বসবাসকারী ব্যক্তি, পাহাড়ে বসবাসকারীগণ, সমতলে বসবাসকারী আদিবাসী ভাইবোন, জেলের অভ্যন্তরে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। এই তালিকা আরো বাড়ানো যাবে। মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস এক কথায় তাদেরকে বলেছেন প্রান্তিক এলাকায় বা প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় বসবাসকারী বাসিন্দা হিসেবে। সবার আগে তাদের প্রয়োজন উন্নয়নসেবার। উন্নয়নসেবার মধ্যে থাকবে মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিচর্যাও যেন সবার জন্যে পরিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত হয়। পরিপূর্ণ জীবনের শুরু এই জগতে আর তা চলমান থাকে পরজগতেও।

৪। সিনড কী ও কেন? এই বারের সিনড অন্যান্য বারের চেয়ে ভিন্ন কেন? সিনডের ধাপ কয়টি ও কি কি? আমরা কোন ধাপে আছি? সিনোডীয় আলাপে কীরূপ মনোভাব দরকার? কোন কোন বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে? এইরূপ অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে আপনাদের মনে। আমার মনেও অনেক প্রশ্ন যেমন: আমরা কি একা একা সব কিছু বুঝতে পারি? পারি না। আমরা কি একা একা সব কিছু করতে পারি? পারি না। আমরা কি একা একা অনেক দূর যেতে পারি? পারি না। কথায় বলে, তাড়াড়াড়ি যেতে হলে একা যাও, অনেক দূর যেতে হলে এক সঙ্গে যাও। আর অনেক দূর যেতে হলে আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ এবং আমাদের আশেপাশের ভাইবোনের সহযোগিতা। ভাইবোনদের সহযোগিতার পাশাপাশি প্রকৃতির সহায়তাও লাগে। বর্তমানে তাই বলা হচ্ছে- ইকোলজিক্যাল ফ্যামিলির কথা যা কিনা হিউম্যান ফ্যামিলির বা মানব পরিবারের চেয়েও আরো এক ধাপ উপরে। আরো বেশী ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক।

৫। সিনোডীয় সংস্থা একদিকে এমন এক নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে সংস্থার নেতৃবৃন্দ, কর্মী, উপকারভোগী, দাতাসহ সকল অংশীগণ একে অপরের ওপর আস্থাশীল হয়ে সর্বোত্তম সেবাদানে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। অপরদিকে, সহকর্মী ভাইবোনরা নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে আলোচনা করতে পারেন তাদের জীবন-যাপন, তাদের আদর্শ ও বিশ্বাস, তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ধারণ করতে পারেন, মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়তে পারেন সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ তথ্য আদান-প্রদান করার মাধ্যমে। তারা আলোচনা করবার সময় কেউ কাউকে থামিয়ে দেবেন না, কোনো তুলনা করবেন না, কোনো অভিযোগ আনবেন না, কাউকে তিরস্কার করবেন না। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সহভাগিতা করবেন। কোনো ঘটনার বর্ণনার ওপর অধিক গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দিবেন ঘটনা থেকে পাওয়া শিক্ষাটার ওপর। যেই শিক্ষা ভালোবাসার, সততা ও সেবার। তারা আলোচনার সময় মনে রাখবেন, সিনোডীয় সংলাপ বা আলাপ-আলোচনা জীবন বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিতে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী প্রার্থনা-নির্ভর এক অনন্য প্রক্রিয়া। এর প্রধানতম উদ্দেশ্য কাঙ্খিত ন্যায্য মানব সমাজ গঠনে সবার অংশগ্রহণ সর্বত্র বাড়ানো ও স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সকলকে যথাসম্ভব সক্রিয় করা। এই আলোচনায় আরো মনে রাখা হয় আমাদের ভেতরকার ঐক্যবদ্ধ শুভ শক্তি বাইরের সকল অশুভ শক্তির চেয়েও শক্তিশালী। সেই সাথে অনুপ্রেরণা দেয় সজাগ থাকতে, সৎ থাকতে, সচেতন থাকতে। অন্যের প্রয়োজনে সচেতন হয়ে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর প্রদত্ত অনুগ্রহ অপরের সাথে সহভাগিতা করতে।

৬। সিনোডীয় পদ্ধতিতে আমরা আলোচনার সময় মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের নীচের কথাগুলো মনে রাখতে পারি:

- সকলের কথা শুনুন
- কোনরূপ বদ্ধমূল ধারণা না নিয়ে সকলের কথা শুনুন
- খোলা মন নিয়ে সকলের কথা শুনুন
- হৃদয় দিয়ে সকলের কথা শুনুন।
- আমরা অনেক সময় অন্যকে বুঝতে পারার মনোভাব নিয়ে শুনিনা। আমরা শুনি কী উত্তর দিবো সেই চিন্তা মাথায় রেখে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা কিন্তু ভালোভাবে শুনিই না। প্রকৃতভাবে শুনতে কান, চোখ ও হৃদয় লাগে। এই তিনটি

অঙ্গ এক যোগে কাজ করলে সুন্দরভাবে শোনার কাজটা হয়। আমরা তো অনেক সময় না তাকিয়েই শুনি!

মহামান্য পোপ মহোদয় আরো বলেছেন:

- মন্দতা হতে সরে আসতে। মন্দতা আমাদের মধ্যে বিভক্তি আনে। আমাদের স্বার্থপরতা হলো বড় একটি মন্দতা যা আমাদের সুসম্পর্ককে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। স্বার্থপরতা প্রকট হলে একসাথে চলা যায় না। সিনডীয় পদ্ধতির মূল কথা এক সাথে চলা, এক সাথে পথ চলতে চলতে অপরের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা, অপরের কল্যাণে ভালোবাসাসহ দায়িত্ব পালন করা।

তুমি যদি একজন মানুষ, তবে মানবতা তোমার বৈশিষ্ট্য। মানবতাবাদী ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র নিজেদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না। সকলের কথাই তারা চিন্তা করেন। তাই যারা দূরে আছে, প্রত্যন্ত এলাকায় আছে, দৃষ্টি সীমানার বাইরে আছে, অবহেলিত অবস্থায় আছে, তাদের দিকে ভাইবোনের দৃষ্টিতে তাকাও, তাদের কথা শোনো।

৭। সিনোডীয় পদ্ধতির মূলভাবের (ঐক্য, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব) একটি হলো আলোচনায় অংশগ্রহণ। কারা এই আলোচনায় অংশ নিবেন? সকল বয়সের ও সকল শ্রেণির মানুষ। বিশেষ করে যারা প্রান্তিক এলাকায় আছেন, সবচেয়ে পিছিয়ে আছেন, দুঃখ-কষ্টে জীবন যাদের জর্জরিত তারাই অংশ নিবেন। তাদের জীবন-ঘনিষ্ঠ পরিস্থিতি শ্রবণে, অবধারণে ও অংশগ্রহণে সিনড সত্যিকারভাবেই এক সহভাগিতামূলক আলোচনার প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ অন্যের পরিস্থিতি মনোযোগ দিয়ে শোনার বিষয়ে পোপ মহোদয় দু'টি পরস্পর-সম্পর্কিত উদ্দেশেও ব্যক্ত করেছেন:

- ঈশ্বরের কথা শোনার সাথে সাথে আমরা যেন তাঁর মানুষের কথা ও কান্না শুনতে পারি; ও

- ঈশ্বরের মানুষের কথা ও কান্না ততক্ষণ পর্যন্ত শুনবো যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও আহ্বান অভিন্নভাবে বুঝতে পারি।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের যেরকম মনোভাব থাকতে হবে সে সম্পর্কে পোপ মহোদয় বলেছেন:

- ধৈর্য্যশীল, সহভাগিতামূলক ও অংশগ্রহণধর্মী মনোভাব; বিনয়ী ও সাহসী মনোভাব; নতুনত্ব গ্রহণ করার মনোভাব; পরিবর্তন ও রূপান্তর মানার মনোভাব; বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার মনোভাব; যাজকতন্ত্রের মন্দ দিক অতিক্রম করার মনোভাব; যুগচিহ্ন খুঁজতে ও বুঝতে পারার মনোভাব; পূর্বসংস্কার ও বদ্ধমূল ধারণা পরিত্যাগ করার মনোভাব; একাই সব, একাই সব পারি এই ধারণা পরিত্যাগ করার মনোভাব; জীবনে আশার বাণী শোনাবার মনোভাব; ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখার মনোভাব; সৃজনশীল ও সম-দায়িত্ববান সমাজ গড়ার মনোভাব।

৮। আপনারা আপনাদের সংস্থার মাধ্যমে কতো না ভালো সেবাকাজ করছেন। তা অব্যাহত রাখুন। ভালো সেবাকাজ করতে করতে ভুলে যাবেন না যে, আপনি যা করছেন তা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ও ঈশ্বরের শক্তিতেই করছেন, ঈশ্বরের মানুষের জন্যেই করছেন। ঈশ্বরের মানুষের জন্যে সেবাকাজ করার আর একটা অর্থ হলো- ঈশ্বরের জন্যেই সেবাকাজ করা। আপনার এই সংস্থায় আপনি শুধুই কাজ করছেন নাকি এই সংস্থার মাধ্যমে মানুষের সেবাকাজ করছেন? কাজ ও সেবাকাজের মধ্যে পার্থক্য কি? কোনো কাজ ভালোবাসার সাথে করলে তা হয়ে যায় সেবাকাজ! ভালোবাসার সাথে আরো বেশী বেশী কাজ করুন। লেখাটি শেষ করার আগে একটি প্রশ্ন রাখি– মানুষ সেবাকাজ করে কেনো? ভালো পদ ও বেতন পেতে? সুনাম ও মর্যাদার আশাতে? পরকালের চিন্তা করে? ঈশ্বরের নিকট হতে অনেক দান পেয়েছি সেই দান পাবার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ? যদি মূল কারণ হয় শেষেরটা, তবে আপনি বাদবাকি সব কিছুই পাবেন, এটা আমার বিশ্বাস। কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা বলতেন, "আমি সেবাকাজ করি ঈশ্বরের নিকট হতে প্রাপ্তদানের জন্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।" আপনারা কেনো সেবাকাজ করছেন? ভেবে দেখতে পারেন।

বটমলী হোমঅর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুল

১ হলিক্রশ কলেজ রোড, ৩ তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেইট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ০২-৫৮১৫৫৭৪৮, মোবাইল ঃ ০১৭৩২-৪৬৬৬৩৩

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুলে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষে অনাথ/ এতিম ক্যাথলিক ছাত্রদের ভর্তি চলছে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

১। ভর্তির তারিখ: ০৬/০১/২০২৫ থেকে ১৫/০১/২০২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত সকাল: (৮: ০০ - ১২: ০০ ঘটিকা), দুপুর: (১: ০০ - ৪: ০০ ঘটিকা)। ২। ভর্তি ফরমের মূল্য ৫০/-টাকা। ৩। ভর্তি ফরমের সাথে সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের (৪) চার কপি ছবি। ৪। বিদ্যালয় পরিত্যাগের ছাড়পত্র বা সার্টিফিকেট। ৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণী পাস থেকে এস.এস.সি পর্যন্ত। ৬। জন্ম নিবন্ধন পত্র আবশ্যক এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (যদি থাকে)। ৭। বয়স ১৪-১৮ বছরের অনাথ/ এতিম/ গরীব ক্যাথলিক ছাত্র। ৮। অনাবাসিক ভাবে অনাথ/ এতিম ও অন্যান্য ধর্মের ছাত্ররাও ভর্তি হতে পারবে। ৯। ক্যাথলিক ছাত্রদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট ও পাল-পুরোহিতের সুপারিশ পত্র অবশ্যই ভর্তি ফরমের সাথে জমা দিতে হবে। ১০। ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত ছাত্রদের ভর্তি ফি বাবদ ১,৫০০/= (এক হাজার পাঁচশত) টাকা জমা দিতে হবে। ১১। ২য় বছর ভর্তি বাবদ ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা এবং প্রত্যেক মাসে ট্রেনিং কাগজ, কলম, বই, খাতা, বাবদ ২০০/-(দুইশত) টাকা করে দিতে হবে। ১২। ভর্তির সময় নির্বাচিত ছাত্রদের উপযুক্ত অভিভাবক সাথে নিয়ে আসতে হবে। ১৩। প্রশিক্ষণের মেয়াদ দুই বছর। ১৪। প্রশিক্ষণ সমূহ: ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং, কার্পেন্ট্রি (দর্জি শুধু মেয়েদের জন্য অনাবাসিক)।

- ১ম বছর ভর্তি বাবদ = ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা।
- ২য় বছর ভর্তি বাবদ = ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা ।
- প্রতিমাসে = ২০০/- (দুইশত) টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

ব্রাদার যোগেশ জন কর্মকার, সি.এস.সি
বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুল।
সময় ঃ সোমবার থেকে শনিবার; সকাল: (৮: ০০ -১২:০০ ঘটিকা), দুপুর: (১: ০০-৪:০০ঘটিকা)
ফোন নম্বর ঃ +৮৮-০২-৫৮১৫৫৭৪৮
মোবাইল ঃ ০১৭৩২-৪৬৬৬৩৩

খোলা জানালা

খ্রিস্টীয় মনোভাব গড়ে তোলা

ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি

মানুষের মনোভাব মানুষের জীবনকে চালিত করে। মনোভাবের উপর নির্ভর করে তার জীবনযাপন কেমন হবে, তার আচার ব্যবহার কেমন হবে। মানুষের ইতিবাচক মনোভাব মানুষকে ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে বা চালিত করে। আমাদের মনোভাব যদি ইতিবাচক হয়, তবে আমাদের জীবন ও সেবাকাজও ইতিবাচক হবে। তাই সাধু পল আমাদের সকলকেই বলছেন, "তোমাদের মনোভাব তেমনি হওয়া উচিৎ, যেমনটি খ্রিস্ট-যীশুর নিজেরই ছিল" *(ফিলিপ্পীয় ২:৫)*। যিশু খ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের মনোভাব যিশুর মতই হওয়া উচিৎ।

সেবা পেতে নয়, সেবা করতে এসেছি: যিশুর মনোভাব ছিল মানুষকে ভালোবাসা ও সেবা করা। তাই তিনি বলেছেন," (মানবপুত্র) সে তো সেবার পাবার জন্য আসেনি, এসেছে সেবা করতে..." *(মথি ২০: ২৭-২৮)*। তিনি নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ভালোবেসেছেন ও সেবা করেছেন। তিনি সেবা করার উদ্দেশ্যে দাসের মত হয়েছেন। "দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন" (ফিলিপ্পীয় ২:৭)। তিনি গুরু হয়েও দাসের মত তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছেন *(যোহন ১৩: ১)*। তিনি বলেন," দাস কখনও তার প্রভুর চেয়ে বড় হয় না" *(যোহন ১৩: ১৬)*। তবু তিনি দাসের মত হয়ে সেবার কাজ করেছেন। কারণ আমাদের সামনে তিনি ভালোবাসার একটি নতুন আদর্শ তুলে ধরেছেন। খ্রিস্টান হিসেবে এই মনোভাবটি সর্বদা মনে রাখা এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। আমি সেবা পেতে নয়, সেবা করতে এসেছি। সেবা করার মনোভাব আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবার, ধর্মপল্লীর কাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ক্রেডিট ইউনিয়নে, গ্রাম কাউন্সিলের কাজ কিংবা রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে যিশুর এই বাণী মনে রাখা এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করার মনোভাব রাখতে হবে।

শিশুর মত বিনম্র হও: অন্যকে ছোট করে বড় হওয়া নয়, কিংবা অন্যকে নিচে ফেলে উপরে ওঠা নয়। বরং যিশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন শিশুর মত বিনম্র হই। তাই তিনি বলেন," যে নিজেকে শিশুর মতোই নম্র করে, স্বর্গরাজ্যে সেই সবচেয়ে বড়" *(মথি ১৮: ৪)*। বর্তমান জগতে সবাই বড় হতে চায়, উপরে উঠতে চায়, সম্মানের আসন পেতে চায়, কিন্তু যিশু আমাদের বলেন আমরা যেন শিশুর মত সহজ সরল থাকি। তাই তিনি আবার বলেন, "কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তাহলে সে যেন সকলের শেষেই থাকে, সে যেন সকলেরই সেবক হয়" *(মার্ক ৯:৩৫)*। আমরা যেন ক্ষমতার লোভ না করি,অহংকারী না হই, আত্মকেন্দ্রিক না হই বরং শিশুদের মত বিনম্র ও সহজ সরল হই। শিশুর মতই রাগ, হিংসা, দলাদলি ভুলে গিয়ে আবার পরস্পরের সাথে মিলিত হই।

পিতা যেমন দয়ালু, তেমনি দয়ালু হও: "ভগবান দয়াময়, করুণানিধান তিনি তো সহজে ক্রুদ্ধ হন না; মহাকৃপাশীল তিনি" *(সামসঙ্গীত ১৪৫: ৮)*। পিতা ঈশ্বর দয়ালু, আর সেই দয়ার মনোভাব যিশুর মধ্যেও ছিল। "একদিন লোকের ভিড় দেখে তাদের জন্য তাঁর কেমন দুঃখ হল: ক্লিষ্ট অবসন্ন তারা–যেন পালকবিহীন মেষেরই মতো"*(মথি ৯:৩৬)*। যিশু মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে দুঃখ পেয়েছেন, তিনি কেঁদেছেন, তিনি তাদেরকে দয়া করেছেন। তাই তিনিও আমাদের আহ্বান করছেন আমরা যেন তাঁর মত দয়ালু হই, দয়া করি। "তোমাদের পরম পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও" *(লুক ৬:৩৬)*। পাপী, দুঃখী-অভাবী ও অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অপার করুণা ও দয়া। আমাদেরও তেমনি যারা অসহায়, দুঃখী ও অভাবী তাদের দয়া করতে হবে।

আমি তাদের জানি, তারা আমাকে জানে: যিশুর মনোভাব ছিল আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। মেষপালক ও মেষপাল যেন তারা পরস্পরকে জানতে পারে। যিশু বলেছেন, "আমি আমার মেষগুলিকে জানি আর আমার মেষগুলিও আমাকে জানে *(যোহন ১০:১৪)*। যিশু মত আমাদেরও পরস্পরকে জানা প্রয়োজন এবং আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। কাউকে না জানলে ভালোবাসা যায় না। কাউকে না জানলে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। যিশুর মত আমাদের মনোভাব থাকতে হবে। সবার হয়ে সবার সাথে এবং সবাইকে নিয়ে কাজ করার মনোভাব থাকতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এক পাড়ায় কিংবা এক ফ্লাটে বসবাস করেও আমরা একে অন্যকে জানি না, কারো খোঁজ খবর রাখি না, বিপদ-আপদে সাহায্য সহযোগিতা করি না।

বিশ্রামবার মানুষের জন্য, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয়: যিশু বিশ্রামবারে নুলো লোককে সুস্থ করে তোলেন *(মথি ১২:৯)*। বিশ্রামবারে যা করতে নেই, যিশু তাই করেছেন। যিশু বলেন, "বিশ্রামবার মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য সৃষ্টি হয়নি" (মার্ক ২:২৭)। এর মধ্যে দিয়ে যিশু বুঝাতে চান যে, অসহায় মানুষকে সাহায্য করা বিশ্রামবারেও ধর্মসম্মত কাজ। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে যিশুর মতো এই মনোভাব রাখতে হবে। মানুষ যেন আসতে পারে, আসার জন্য যেন অনুপ্রানীত হয় ও উৎসাহী হয়। আমাদের ঘর-বাড়ি, আমাদের অফিস ও প্রতিষ্ঠান যেন টর্চার সেল কিংবা কারাগার না হয়। নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে যেন মানুষ কষ্ট না পায়, ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সরে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমি এসেছি বিচার করতে নয়, বরং সকলে যেন জীবন পায়: যিশু এ জগতে আসার উদ্দেশ্যে হল পরিত্রাণ করা। যিশু বলেন,"কারণ আমি তো জগতের বিচার করতে আসিনি, এসেছি জগতকে পরিত্রাণ করতে" *(যোহন ১২:৪৭)*। আবার যিশু এ কথাও বলেছেন, "পরের বিচারে যেয়ো না" *(মথি ৭:১)*। আমরা যাজকগণ যেন বিচারকের ভূমিকায় সর্বদা না থাকি। কে ভাল, কে মন্দ, কে পাপী কিংবা কে সাধু এসব বিচার বিশ্লেষণ করে সময় নষ্ট না করি। এসব করতে গিয়ে যেন মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে না যাই। বরং যিশুর মত আমাদের মনোভাব রাখতে হবে। পাপী মানুষের প্রতি ক্ষমা ও দয়া করার মনোভাব রাখতে হবে। তারা একদিন মন পরিবর্তন করবে সেই আশা নিয়ে কাজ করতে হবে। যিশুর মতো করগ্রাহক, গণিকা, জাখেয়, সামারীয় স্ত্রীলোক কিংবা তাদের মতো পাপীদের সময় দিতে হবে, মন পরিবর্তনের সুযোগ দিতে হবে, পথ দেখাতে হবে। তাদের প্রতি আরো যত্নশীল হতে হবে।

আমি সংসারকে জয় করেছি: এই জগত-সংসারে মন্দতার সাথে সংগ্রাম করতে হয়। যিশু নিজেও সংসারের মন্দতার সাথে সংগ্রাম করেছেন। ফরিসীদের বিদ্বেষী ও হিংসাত্মক মনোভাব, শয়তানের মন্দ শক্তি, ধন-সম্পদের প্রতি লোভ, ক্ষমতার প্রতি লোভ, স্বার্থপরতা, নানা প্রলোভন এ সবকে তিনি জয় করতে সক্ষম হয়েছেন *(মথি: ৪-১)*। তাই তিনি সাহস যোগাচ্ছেন, আমরাও যেন সংসারকে জয় করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকি "কারণ আমি যে সংসারকে জয় করেছি" *(যোহন ১৬:৩৩)*। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা এ জগতে আছি বা বাস করছি কিন্তু আমরা এ জগতের নই। আমরা জগতের মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হব না। খ্রিস্টের মূল্যবোধের দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করতে হবে আমাদের। জগতের এই পরীক্ষা-প্রলোভন জয় করার শক্তি অর্জন করতে হবে। আমরা যেন নিজেদেরকে জগতের এই মূল্যবোধের কাছে (যেমন: স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, একা বড় হওয়ার সাধনা) বিকিয়ে না দিই।

উপরোক্ত মনোভাবগুলো আমরা খ্রিস্টের মধ্যে দেখতে পাই। এখন আমরা যারা এই জগতে আছি, আমাদের উচিত হবে সেই মনোভাবগুলো নিয়ে পরস্পরের সেবা করা। তাই সাধু পল বলেন,"...হয়ে ওঠো একমন একপ্রাণ; তোমাদের সকলের মধ্যে যেন থাকে একই ভালোবাসা, একই মনোভাব, একই ঐক্যের আদর্শ" *(ফিলিপ্পীয় ২:২)*।

২য় ভাটিকান মহাসভার আলোকে
স্থানীয় সংস্কৃত্যায়ন ও উপাসনা সংগীত

ডা. নেভেল ডি রোজারিও

কাথলিক চার্চের ইতিহাসে ২য় ভাটিকান মহাসভা পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন কর্তৃক ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর শুরু এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর পোপ ষষ্ঠ পৌল কর্তৃক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ২য় ভাটিকান মহাসভা সারা বিশ্বের কাথলিক মণ্ডলীতে ধর্মীয়, সামাজিক, স্থানীয় মণ্ডলী ও স্থানীয় সংস্কৃত্যায়নে এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এক বৈপ্লবিক ও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২য় ভাটিকান মহাসভার আগে কাথলিক চার্চগুলো বস্তুতঃপক্ষে ছিল খুবইন রোমান। সে সময়ে খ্রিস্টীয় আরাধনা, খ্রিস্টযাগ ও উপাসনার অধিকাংশ অংশই ল্যাটিন ভাষায় করা হতো। খ্রিস্টভক্তগণ কিছু বুঝে বা না বুঝেই তোতা পাখির মত শেখানো বুলি আওড়ানোর মত ল্যাটিন ভাষায় উপাসনা-প্রার্থনা করতো এবং ল্যাটিন ভাষার উপাসনা-গীতি গাইতো। এর অব্যবহিত আগে দীক্ষাস্নান, পাপ-স্বীকার, বিবাহ-সংস্কার সাক্রামেন্ত অনুষ্ঠান সমূহের কিছু নির্দিষ্ট অংশ বিশেষে বাংলা ব্যবহৃত হতো। এ সব অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্যে ছিল পঞ্চাশের দশকে ঢাকা ও কলকাতা থেকে ছাপানো কিছু কিছু বই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ মিশনারীদের আগমনে বাংলায় খ্রিস্ট ধর্মের প্রর্বতন হয় ও খ্রিস্টধর্ম এ দেশের মাটিতে প্রোথিত হয়। যখন বিদেশী মিশনারীগণ এদেশে এসেছিলেন, তখন এদেশে সঙ্গে করে এনেছিলেন ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন। তখনো বাংলার আনাচে-কানাচের মানুষের রক্তের মধ্যে দেশজঃ সুর ও সংগীতের উপস্থিতি ছিল। উভয় বাংলায় ইউরোপ থেকে আসা খ্রিস্ট ধর্ম প্রোথিত হওয়ার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে চার্চ মিউজিক, ল্যাটিন সুর ও তার সাথে যোগ হয়ে গেছে এদেশীদের রক্তে থাকা দেশজঃ খ্রীষ্টিয় সংগীত চেতনা। এ যেন সবজর্ন গৃহীত সামাজিক অনুষঙ্গ মেশানো মৃত্তিকা লগ্নতায় আপন স্বকীয়তায় মিশ্রিত-- তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময়তায়। তাই রক্ত ধারায় বাহিত এ দেশীয় সংগীত ও কীর্তনের সুর, লয় প্রতিনিয়ত তাকে তাড়িত করেছে ও ধাবিত করেছে ভক্তকে সংগীতের উৎস-পানে। ইতিহাস বলে, ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তনী মন পরিবর্তন করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টবাণী প্রচার শুরু করেন। দোম আন্তনীর ধর্মপ্রচারের পদ্ধতি ছিল, জপমালা প্রার্থনা শেষে দোম আন্তনীর বাংলা ধর্মীয় গান সমবেতভাবে গাওয়ার পরই শুরু হতো ধর্মীয় আলাপ আলোচনায়-- খ্রিস্ট-বাণীর মহাত্ম্য হৃদয়গ্রাহী করতে এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণযোগ্য করাতে।

২য় ভাটিকান মহাসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খ্রিস্টযাগ এবং উপাসনা অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের যার যার মাতৃভাষা ব্যবহার ও স্থানীয় সংস্কৃত্যায়নের অনুমতি দে'য়া হয়। খ্রিস্টযাগ, উপাসনা ও উপাসনা গীতিতে এ কারণে ষাটের দশকের শুরুতে অনেক কিছু বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ ড. গাঙ্গুলী সিএসসি 'খ্রীষ্টযাগ' নামে একখানা বই প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি কিছু উপাসনা বই বাংলায় অনুবাদ করেন। বাংলার ঐতিহ্যগত রীতি নীতিতে উপাসনা অনুষ্ঠান প্রথম অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের কয়েকটি ধর্মপল্লীতে। এর

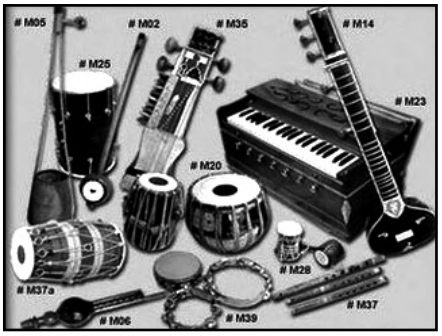

পেছনে ভূমিকা ছিল নমস্য ফাদার পাইয়া, ফাদার হবে, ফাদার লাবে সিএসসি, ফাদার ডেমার্স ও ফাদার সানপিয়ার। ওপার বাংলা কোলকাতার 'গীত-সঞ্চয়' ও এপার বাংলার 'পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী' উপাসনা-গীতির বই দু'খানাও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। '৬২ তে শেষ হওয়া ২য় ভাটিকান মহাসভার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তেরও কয়েক দশক আগে, ৪০, ৫০ ও ৬০ দশকে এ বাংলায় উল্লেখযোগ্য অনেকেই বাংলা ভাষায় উপাসনা সংগীত রচনায় অবদান রেখেছিলেন। ব্রতধারী স্বদেশী যাজকদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন ফাদার যাকোব দেশাই, ফাদার যাকোব গমেজ (ভূরা), ফাদার যাকোব আলেকজান্ডার কস্তা (আলীচান), ফাদার পিটার গমেজ।

সে যুগ সন্ধিক্ষণে, এপার বাংলার সংগীতাঙ্গণে বিশেষভাবে উপাসনা সংগীতের আকাশে উদিত হয় সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের মাঝ থেকে ধুমকেতুসম তিন নক্ষত্রের। ঢাকার নবাবগঞ্জের তুইতাল ধর্মপল্লীর সন্তান স্টিফেন ডিঃ রোজারিও, ঢাকা জেলার (বর্তমানের গাজীপুর জেলা) কালীগঞ্জ থানাধীন তুমিলিয়া মিশনের চড়াখোলা উপ-ধর্মপল্লীর পিটার ডমিঙ্গো পন্ডিত (ফাদার ফ্রান্সিস রোজারিও'র বাবা) এবং নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীর সুশীল বাড়ৈ। এদের মধ্যে ষ্টিফেন ডিঃ রোজারিও গড়ে উঠেছিলেন কোলকাতায় এক গুণী গুরুর ছায়াতলে (যার ছত্র-ছায়ায় মান্না দে-ও ছিলেন)। হঠাৎ করে বাবার মৃত্যুতে এ পারে এসে তাঁর আর যাওয়া হয়নি কোলকাতায়। ষাটের দশকে তিনি ছিলেন রেডিও পাকিস্তানের enlisted শিল্পী এবং নিয়মিতভাবে রেডিও পাকিস্তানে একক গান পরিবেশন করতেন। তিনি নিজেও লিখেছেন অনেক উপাসনা গীতি, অনেক গুলো 'পবিত্র ক্রুশ গীতীবলী'তে সন্নিবেশিত হলেও অনেক গুলোই অন্যের নামে বা সংগৃহীত বলে উল্লেখিত হয়েছে। এখনো তাঁর কিছু গান আঠারো গ্রাম এলাকায় প্রচলিত।

পিটার ডমিঙ্গো পন্ডিত উপাসনা গীতি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রচুর খ্রিস্টীয় কীর্তন, পালা গান, ঠাকুরের গীত, কষ্টের গান, যুগালী গান এবং বহু স্থানে আয়োজিত 'আগ্নেশের পালা গান' এর রচয়িতা হিসেবেও ব্যাপক ভাবে পরিচিত ও সম্মানিত। আগে বর্ণিত 'পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী'তেও তাঁর নামে বা বেনামে বা সংগৃহীত হিসেবে তার অনেক গান সংকলিত। যথাযথ সংরক্ষণ না হওয়াতে ডমিঙ্গো পন্ডিতের অনেক গান এলাকার অনেকের নিকট এখনো পড়ে আছে এবং অনেক প্রকাশনায় কিছু কিছু গান অন্যের নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

বরিশালের নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীর সুশীল বাড়ৈ গীত রচয়িতার চেয়ে সংগীত পরিচালক হিসেবে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চল্লিশের দশকের নারিকেলবাড়িতে গীর্জা ঘরে রোববারের মীসায় প্রথম বারের মতো হারমোনিয়াম,খোল-করতাল সহ বাংলা উপাসনা গান গাওয়া হয় কানাডিয়ান হলি ক্রস সম্প্রদায়ের ফাদার লাভে সিএসসির উদ্যোগে এবং সুশীল কুমার বাড়ৈ এর পরিচালনায়। এটা ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসী উদ্যোগ। এর পর পরেই তীব্র প্রতিবাদে আসে ধর্মপল্লীবাসীদের কাছ থেকে কারণ সেকালে শুধুমাত্র অর্গান বাদ্যযন্ত্র গীর্জায় ব্যবহার করার বিধিবদ্ধ নিয়ম

ছিল। দেশীয় কোন বাদ্যযন্ত্র গীর্জার উপাসনা-গীতির সাথে ব্যবহারের কোন চল ছিল না। যদিও ঢাকা জেলার আঠারো গ্রাম অঞ্চলে শুধুমাত্র বড়দিনের খ্রিস্টযাগে হারমোনিয়াম, সাথে তবলা, করতাল বাজিয়ে গান করা হতো। ভাওয়াল অঞ্চলে হারমোনিয়াম নিয়ে খোল, তবলা, করতাল আর কাঁসার ঘণ্টা বাজিয়ে বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সমবেত কীর্তন গান বড়দিনের খ্রিস্টযাগের পরে গীর্জার বাইরে করা হতো।

পূর্বেকার গীতাবলী'তে উপাসনা সংগীত খুব কম ছিল, --- বেশি ছিল ভক্তিমূলক গান। বরিশালে সিএসসি সম্প্রদায় (U.S. & Canadian Holy Cross) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Oriental Institute মূলত: বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসা ব্রতধারী/ধারিণীদের বাংলা শিক্ষা দান, স্থানীয় বাংলা ভাষায় উপাসনা গীতির উৎকর্ষতা আনয়নে গবেষণা ও নতুন নতুন গান রচনায় নিয়োজিত ছিল। সে সময়ে গীর্জার গান গুলো মূলত: ছিল ভক্তিমূলক। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট ভক্তিমূলক গানের সংখ্যা কমিয়ে উপাসনা বিষয়ক গান রচনা করে তা গীতাবলী'তে যোগ করার উদ্যোগ নেয়। সে সময় সেখানে ফাদার গিমো সিএসসি এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ দেশে আগত ভিনদেশী মহিলা রীতা বুশের পরিচালনায় অনেক গুলো বাংলা গান রচিত হয়েছিল। এ কাজে সুশীল বাড়ৈ, মতিলাল দাস, রিতা বুশ, টমাস দ্বিজদাল হালদার প্রমুখ প্রচুর অবদান রেখেছিলেন এবং যাঁদের অনেক গান বর্তমান 'গীতাবলী' তে এখনো বিদ্যমান। ফাদার বেনাস সিএসসি রবীন্দ্র সংগীত গীতাবলীতে যোগ করে দেন। পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয় কিছু নজরুল গীতি, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি গান। সে সময় এ পারের উপাসনা গীতির বই খানার নাম ছিল 'পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী'। এর উদ্যোগ নিতে কানাডিয়ান ফাদার ডেমার্স সিএসসি এবং এ সম্প্রদায়ের আরো অনেকে সহযোগিতা করেন। বরিশালের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট থেকে উপাসনার কিছু এবং সঙ্গীতের কিছু বইও বাংলায় ছাপা হয়েছিল। বেশীর ভাগ সময়ে মতিলাল দাস বিদেশীদের বাংলা শেখাতেন। ফাদার ইভান্স সিএসসি লক্ষ্মীবাজারের পালপুরোহিত থাকাকালে বাংলা খ্রিস্টযাগের উপাসনা-গীতির উন্নতি কল্পে বরিশালের Oriental Music Institute এ ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন শ্রীলঙ্কান ব্রাদারকে কয়েক সপ্তাহের জন্যে নিয়ে আসলেন গান শেখানোর জন্যে। ঐ সময়ে ইনষ্টিটিউটের সদ্য লিখা একখানা গানের কথা এখনো মনে আছে,

'যেখানে বিরাজে প্রেম, সেখানে তোমারই স্থান,
আমাদেরই মাঝে আছ তুমি বিদ্যমান।।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলা উপাসনা সংগীতের নতুন কারিগর ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ (সিমা)। অসংখ্যা হৃদয়-ছোঁয়া গানের রচয়িতা ফাদার সিমা, যে গুলো কাথলিকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রায় প্রতিদিনই গাওয়া হয়। বিশেষ করে প্রায় প্রতিটি খ্রিস্টযাগে উৎসর্গের সময়ে,

"তোমার নামের হোক মহিমা গান,
হোক স্তুতি জয়ো জয়ো গান;
তুমি ত্রাণেশ্বর, আনো পরিত্রান,
প্রণতি তোমায় হে প্রভু মহান"

কিংবা

"প্রভু, তোমার মরণ আমরা করি স্মরণ'

এ গানগুলো গাওয়া হয় শ্রদ্ধাভরে, সারা পৃথিবীতে প্রতিটি বাংলা খ্রিস্টযাগে, হয়তো অনেকেই রচয়িতা বা সুরকারকে না জেনেই। ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সিমাকে কাথলিক মণ্ডলী কৃতজ্ঞ চিত্তে মনে রাখবে কারণ উপাসনায় সংস্কৃত্যায়নে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি খ্রিস্টযাগ পরিচালনার বই রচনা ও অনুবাদ করেছেন, অনুবাদ করেছেন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল। গীতাবলী তার হাতেই সম্পাদিত হয়েছে দীর্ঘবার। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক যুব কমিশনের সহায়তায় খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘের আয়োজনে বনানী মেজর সেমিনারীতে অনুষ্ঠিত প্রথম ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনে সেমিনারীর চ্যাপেলে প্রথম বারের মত সামনে বেদী সাজিয়ে মোড়ায় বসা অবস্থায়, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের আয়োজন করেছিলেন তিনিই। তিনি 'উপাসনা ও সংস্কৃতি রচনা সম্ভার' নামে একটি বইও রচনা করেছিলেন।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সিমাকে আর্চবিশপ ড. গাঙ্গুলী সিএসসি'র আমলে উপাসনার বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য রোমে পাঠানো হয় এবং ৩ বছর পরে ফিরে এসে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে উপাসনা কমিশনের বাংলাদেশের সেক্রেটারীর দায়িত্ব নেন। সে সময়ের ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সিমা Liturgical inculturation বা গীর্জার উপাসনা রীতিতে স্থানীয় সংস্কৃত্যায়ন বা দেশীয়করণের দিকে ইঙ্গিত, গুরুত্ব ও জোর দিয়েছিলেন। তাঁর দে'য়া সাক্ষাৎকারেই পাওয়া যায়, "দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা সারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগত ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ইতিবাচক ভালো ফল গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে বাংলার এ অংশের অনেক এদেশীয় প্রাচীন মিশনারীগণ না বুঝে, বাংলার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অনেক কিছু ফেলে দিয়েছিলেন। সেকালে প্রচলিত ধারণা ও সীমিত জ্ঞানের কারণে অনেকে মনে করতেন যে রোমান তথা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিই প্রকৃত সংস্কৃতি (এ ধারণা পোষণকারী অনেকেই হয়তো জানতেন না যে রোমানরা ছিল হিন্দুদের মতই বহু দেব-দেবীর পূজারী)। এ কারণেই বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লাবণ্য ও উৎকর্ষের বিষয়ে সচেতন ও উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হলেও বিদেশী সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠার কারণে অনেকেই তা সহজভাবে নেননি"। তাঁদের অনেকের নেতিবাচক প্রভাবের কারণেই আমরা দেখেছি কিছু খ্রিস্টভক্ত লিটার্জির কিছু পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি ও চায়নি। যেমনটি ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সিমা বলেছিলেন, "কোন সংস্কৃতিই ধর্মগত নয় বরং জাতিগত ও দেশজ। কিন্তু ধর্ম যেমন সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে, তেমনি সংস্কৃতিও ধর্মকে ব্যবহার করে। এভাবেই ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পরকে সাহায্য করে বেড়ে উঠার জন্য। রোমানরা যখন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করল তখন তারা তো যিশুর অরামীয় ভাষা বা পরে গ্রীক ভাষা ব্যবহার না করে রোমান ভাষা -- ল্যাটিন ভাষাই ব্যবহার করা শুরু করল এবং রোমান সংস্কৃতিই তারা গ্রহণ করলো এবং সেটাকেই তারা খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি বলে সারা দুনিয়ায় চালিয়ে দিল"।

আমরা তো আমাদের দেশজঃ অনেক আচার-আচরণ ও রীতিনীতি, যা আমরা অনাদিকাল থেকে পালন করে আসছি সেগুলোকে হিন্দুয়ানির অপবাদ দিয়ে তা বর্জনের পক্ষে মত দিচ্ছি। সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বহু যুগ আগে থেকে পাক-ভারত-বাংলা ভূখন্ডে বসবাস করে আসছে। সুতরাং সে সময়কার অনেক স্থানীয় আচার-আচরণ এ অঞ্চলের সন্তান হিসেবে যে ধর্মাবলম্বীই হই না কেন জাতিগতভাবে তার প্রতিফলন আমার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতিতেও তা অবশ্যই পড়বে। আমরা আমাদের দেশে দেখি হিন্দুদের যে কোন পূজা-পার্বণ, বিয়ের অনুষ্ঠানে সনাতন-ধর্মীরা উলুধ্বনি দেয়। Iran শব্দের অর্থ 'Land of the Aryans'. ইরানে কাজ করা কালে দেখেছি ইরানী কট্টর মুসলিমরাও ইরানী বিয়ের অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মত অবাক করা 'উলু-ধ্বনি' দেয়। প্রশ্ন করে উত্তর পেলাম এ রীতি নাকি আর্যদের রীতি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ইরানীরা পেয়েছে।

হাতে কমিউনিয়ন, ইউক্যারিষ্টের সময় স্থানীয় ভাষার ব্যবহার, ফুলের ট্রে, ধূপ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, নাচের ভঙ্গিমায় ছোট ছোট মেয়েদের আরতি দান, গীর্জার ভিতরে বিবাহ-সংস্কারের কোন পর্যায়ে বর-কনের মালা-বদল, মেঝেতে মোড়ায় বসে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা, প্রাক-বিবাহ গায়ে হলুদ কিংবা হলুদ সন্ধ্যা ইত্যাদিতে ছিল প্রবল বাধা ও বিধি-নিষেধাজ্ঞা। প্রধানত বয়স্ক খ্রিস্টভক্তরাই উল্লিখিত লিটার্জিকাল ও স্থানীয় কার্যকরণের প্রবল বিরোধিতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতো অথবা তাঁদেরকে হয়তো প্রভাবান্বিত করা হতো বিশেষ কোন মহলের প্ররোচনায়। হাতে কমুনিয়ন দে'য়াকে কেন্দ্র

করে তেজগাঁও হলি রোজারী গীর্জা প্রাঙ্গণে সত্তর দশকের এক অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী অনেকে। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করা ফাদার স্ট্যাকমায়ার সিএসসি, বাংলাদেশ স্বাধীন হ'বার পরে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি'র আমলে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টযাগে পবিত্র কম্যুনিয়ন হাতে নে'য়াকে কেন্দ্র করে তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে ফাদার স্ট্যাকমায়ার মহোদয়কে খ্রিস্টভক্তদের চরম বিরোধিতায় পড়তে হয়। বেশ কিছু দেশীয় যাজকদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ও সমাজ নেতাদের কারণে এটি বিরাটাকার গোলযোগে পরিণত হয়। আর্চবিশপ মহোদয় ফাদারকে নমনীয় হয়ে তা বন্ধের আহ্বান জানালেও ফাদার স্ট্যাকমায়ার ২য় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশনামা উল্লেখ করে তাঁর ধারণায় অটুট থাকেন এবং বাংলাদেশ ছেড়ে নিজ দেশে ফিরে যান। বাংলাদেশে কর্মরত তাঁর আরেক ভাই ফাদার তুরুঞ্জো সিএসসি'ও তাঁর সাথে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। ফাদার স্ট্যাকমায়ারের এ অপ্রীতিকর ঘটনার কারণেই বিষয়টি বহুদিনের দেশী-বিদেশী ফাদারদের সংঘর্ষে পরিণত হলো। *('ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী --- বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব' বইয়ের ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)*। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাজার গীর্জায় আমাদের বড়দার বিয়ের অনুষ্ঠানে তখনকার পাল-পুরোহিত ফাদার পৌল গমেজ গীর্জার ভিতরে মালা বদলে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলেন। সেদিন গীর্জার বাইরে গীর্জার প্রবেশ পথের সিঁড়িতে বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে মালা-বদল করানো হয়েছিল।

পাকিস্তান আমলে বড়দিনটা চিহ্নিত হয়ে পড়েছিল নগর কেন্দ্রিক ও বিদেশী ষ্টাইলের। কিন্তু বাংলাদেশের বেশীর ভাগ খ্রিস্টান জনগোষ্টির বড়দিন উদযাপন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর--। স্বাধীনতার পরে, 'বাণীদীপ্তি' প্রতিষ্ঠার অনেক আগে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার খ্রিস্টান যুব প্রতিষ্ঠান 'সুহৃদ সংঘ' বড়দিন উপলক্ষে চিরায়ত পদ্ধতির বড়দিন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে আন্তঃমাণ্ডলিক শিল্পী সম্বন্বয়ে দেশীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সমন্বয়ে বড়দিন উদ্‌যাপন চিত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে পরিবেশন করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে টেলিভিশন, রেডিও'র বড়দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে একটা ভিন্ন মাত্রা আনয়নে রেভা স্মীথ অধিকারী ও সুহৃদ জর্জ ডি: রোজারিও লিখলেন নতুন ধরণের স্ক্রীপ্ট। গ্রাম বাংলার খ্রিস্টানদের বড়দিন উদ্‌যাপনের পুরো চিত্র চলে আসে বর্ণিত অনুষ্ঠানে। সুহৃদ দীপক বোস ছিলেন সংগীত পরিচালনায়। উপদেষ্টা হিসেবে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন ফাদার সিমা, হেবল ডিঃ ক্রুজ ও Youth for Christ এর পরিচালক, পরবর্তীতে অএ Church এর পাষ্টর রেভা: স্মীথ অধিকারী। বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রোগ্রাম এবং পরিকল্পনা পরিচালক, পরবর্তীতে BTV'র মহাপরিচালক বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী, কাজী সব্যসাচী পুরস্কার প্রাপ্ত কাজী আবু জাফর সিদ্দিকি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সে বড়দিন প্রোগ্রামের জন্যে কীর্তনের ঢংয়ে রচনা করলেন, 'আজ ফুলে ফুলে যায় দুলে দুলে, সোনালী রোদের আলো' -- সুহৃদ যোশেফ কমল রড্রিক্স নিজ সুরে এ গানটিতে কণ্ঠ দিলেন নিজেই। এর পর পরই বিভিন্ন সময়ে আরো আসে সুহৃদ উপদেষ্টা নিধন ডি: রোজারিও, সুহৃদ উপদেষ্টা হেবল ডি: ক্রুজ, উইলিয়াম অতুলের অনেক কীর্তন ও বাউল ঢংয়ের খ্রিস্টীয় সংগীত।

সুহৃদ সংঘের সংগীত বিগ্রেডের প্রায় সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংগীত পরিচালনার মূল কাণ্ডারী ছিলেন সুহৃদ দীপক বোস। খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ কেন্দ্র 'বাণীদীপ্তি'র শুরু থেকে প্রায় পাঁচ দশক 'বাণীদীপ্তি'র সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি প্রধান সংগীত পরিচালক হিসেবে অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। এ জ্ঞানী, গুণী সংগীত সাধকের নিকট ঢাকার চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার প্রস্তাব পেয়েও তিনি বিনয়ের সাথে জানিয়েছিলেন যে তাঁর এ সংগীত সাধনা খ্রিস্টীয় সংগীতের মাঝেই সীমাবদ্ধ এবং তা কোনক্রমেই ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে নয়। সংগীত পরিচালক দীপক বোস তাঁর অর্ধ শতাব্দীর স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে খ্রিস্টীয় সংগীত প্রচার ও প্রসাওে যে ভূমিকা রেখেছেন বাংলাদেশের খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় তা সারা জীবন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। 'প্রতিবেশী' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে এবং রোমে যাবার আগ পর্যন্ত ফাদার ফ্রান্সিস সিমা সুহৃদ উপদেষ্টা ছিলেন। আর নিধন ডি: রোজারিও ও হেবল ডি: ক্রুজ শুরু থেকেই সুহৃদ উপদেষ্টা ছিলেন অনেক বার। রোম থেকে ফেরার পরে বনানী মেজর সেমিনারীর সহ-পরিচালক পদে থাকাকালীন সময়েও ফাদার ফ্রান্সিস সিমা হোন্ডায় চেপে চলে আসতেন লক্ষ্মীবাজারে।

'ঈশ্বরের সেবক' আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি ২য় ভাটিকান মহাসভার আলোকে গঠন করেন Christian Communication commission এবং উদার ও মুক্ত মনের মানুষ ফাদার জ্যোতি গমেজ ছিলেন তার সেক্রেটারী। পাশাপাশি ফাদার জ্যোতি ছিলেন 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সম্পাদক ও একাধারে 'বাণীদীপ্তি'র পরিচালক। ফাদার জ্যোতির সবচেয়ে বড় গুণ ছিল অনেকের মত পোষাকী বাহাদুরীতে নিজের চিন্তা-ভাবনাকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্যের সক্ষমতাকে সম্মান দিয়ে সবাইকে নিয়ে একযোগে কাজ করতেন। ফাদার জ্যোতির সাথে নিধন ডি: রোজারিও, হেবল ডি' ক্রুশ, জর্জ ডি: রোজারিও, দীপক বোস -- এ পঞ্চ পাণ্ডব একত্রিত হওয়ার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'বাণীদীপ্তি' পেল এক ভিন্ন ভাবনা। সুহৃদ দীপক বোসের সাথে সুহৃদ সাংস্কৃতিক দলে আরো ছিল সর্বসুহৃদ ওস্তাদ লিও বাড়ৈ, যোসেফ কমল রড্রিঙ, নীপু গাঙ্গুলী, উইলিয়াম অতুল, AG Church এর পিটার সরকার,স্মীথ হালদার, ব্যাপটিষ্ট চার্চের মঞ্জুশ্রী দাস (সমর দাসের শ্যালিকা), অপু গাঙ্গুলী। সুহৃদ সাংস্কৃতিক ব্রিগেডে সংযুক্ত হলো একে একে সর্বসুহৃদ রুবি গাঙ্গুলী, শিখা গমেজ, কণা গমেজ, শীলা গমেজ, মলি গমেজ, ফ্রান্সিস চন্দন গমেজ, রেমন্ড ডিঃ রোজারিও, ক্লিফোর্ড জয়ন্ত গমেজ, লিলি কোড়াইয়া, মেরী তেরেজা দারিয়া। 'বাণীদীপ্তি' পেল সুহৃদ সংঘের প্রস্তুত করা একটি দল নিজেদের অনুষ্ঠানের জন্যে। 'বাণীদীপ্তি'র দলটি আরও বেগবান হলো ফার্মগেট থেকে লিওনার্ড শেখর গমেজ, রীটা বাড়ৈ, জাসিন্তা বাড়ৈ (সুশীল বাড়ৈ এর কন্যাদ্বয়), অলিম্পিয়া গমেজ, রোজলীন গমেজ, কাফরুল থেকে কনস্ট্যান্ট ভানু গমেজ, মতিঝিল কলোনী থেকে বাণী রোজারিও, এ্যানি গমেজ, রমনা থেকে স্নেহা রোজারিও, পংকজ গমেজদের আগমনে। গীতিকার, সুরকার ও সুগায়ক সুহৃদ পিটার সরকার খ্রিস্টীয় গানে নিয়ে আসেন নতুন মাত্রা। এক সুহৃদ পিটার সরকারেরই রচিত ও সুরোপিত ১৭ টি গান বাণীদীপ্তির বড়দিন ও ইস্টারের CD তে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে রেকর্ডভুক্ত। তারই ফলশ্রুতিতে বিনা পয়সায় যে সিডিগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী বছর গুলোতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেও সমমানের কিছুই সৃষ্টি হয়নি। বাণীদীপ্তির প্রথম ২/৩ বছরের CD'র গান গুলোই এখনো জনপ্রিয় ও বাণিজ্য সফল। ফাদার জ্যোতির প্রচেষ্টায় ভাটিকানের আন্তর্জাতিক খ্রিস্টীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় 'বাণীদীপ্তি' হেবল ডি' ক্রুজের কথা ও সুরে লিওনার্ড শেখর গোমেজের কণ্ঠে রেকর্ডকৃত 'ওরে আমার পাগলা মন..' গানটি নিয়ে অংশ নেয় ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে কণ্ঠশিল্পী শেখর গোমেজ. গীতিকার হেবল ডিঃ ক্রুজ ও সংগীত পরিচালক দীপক বোস ৩ জনেই স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। রেডিও ভেরিতাস, এশিয়ার বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারেও ফাদার জ্যোতি গমেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে প্রায় দু'বছর সেখানে অভিজ্ঞতা অর্জনের পরেও তাঁকে এক অজ্ঞাত কারণে পাঠানো হয় বান্দুরার গোল্লায়। সে সময়ের আর এক সংস্কৃতিবান পুরোহিত যিনি খ্রিস্টীয় উপাসনা পরিষদের প্রধান হিসেবে খ্রিস্টীয় উপাসনায় সংযোজন করেছিলেন নানা দেশজ উপাদান, তাঁকেও বনানী মেজর সেমিনারীর শিক্ষকের পদ থেকে বদলী করে পাঠানো হলো সিলেটের খাদিমনগর ধর্মপল্লীতে।

স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলীর রূপকার, দেশীয় রীতি-কৃষ্টিতে উপাসনা (সংস্কৃত্যায়ন-- Inculturation in the Church), আন্তঃধর্মীয় (অন্য মণ্ডলী এবং অখ্রিস্টান (Inter denominations / Inter Religious Dialogue) সংলাপ, মাণ্ডলিক কাজে খ্রিস্টভক্তদের আরো বেশী অংশগ্রহণ, মিশ্র-বিবাহ, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল বাস্তবায়নের উদ্যোক্তা -- চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রথম বাঙালি বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি মহোদয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি যখন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের আলোকে মাণ্ডলিক কাজে খ্রিস্টভক্তদের আরো বেশী অংশগ্রহণ বিষয়ে বলেছেন, লিখেছেন এবং দিক- নির্দেশনাও দিয়েছেন; ধর্মীয় রীতিতে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য সমন্বয় (সংস্কৃত্যায়ন)-এর কথা বলেছেন- তখন অনেকেই তাঁর বিরোধিতা করলেও দৃঢ়তার সাথে বিশপ মহোদয় তাঁর অবিচল-অবিরাম প্রচেষ্টায় স্থানীয় মণ্ডলী ও দেশজ সংস্কৃতিবান ধারণাটা প্রসার করেছিলেন। যুব-ছাত্র মানসে সে ধারণাটা এত খানি প্রভাব ফেলেছিল যে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘ আয়োজিত ৩-দিনব্যাপী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মেলনের অন্যতম বক্তা হিসেবে স্থানীয় মণ্ডলীর উপর তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে উপস্থিত সবাইকে এককালের খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা-- সন্দীপ ও বিক্রমপুর এলাকা কেন কাল ক্রমে খ্রিস্টান শূণ্য হল তা খুঁজে বের করা ও গবেষণা লব্দ উপাত্ত নিয়ে মণ্ডলীর পরবর্তী কর্মকৌশল প্রণয়নের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন। কিন্তু বাংলাদেশ মণ্ডলীর আর এক মহাপুরুষ 'ঈশ্বর সেবক' আর্চবিশপ ড. টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি'র হঠাৎ তিরোধানে পরবর্তীতে মণ্ডলীতে বিভিন্ন কারণে স্থানীয় মণ্ডলী ও দেশজ সংস্কৃত্যায়ন ধারণা বেগবান না হয়ে রূপ নেয় শম্বুক গতির।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ২য় ভাটিকান মহাসভার নথি-পত্রের বাংলা অনুবাদের প্রধান সম্পাদক ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস সিমা। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল ও খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা বই দু'টো বাংলায় অনুবাদের পরে ছাপানো হয়। প্রথম বইটিতে রয়েছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দিক-নির্দেশনা মূলক ১৬ টি দলিল। এ সব দলিলে মণ্ডলীর বিভিন্ন দিক ও মণ্ডলী জীবনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উপাসনা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথ াও এতে উল্লেখিত হয়েছে। ২য় ভাটিকান মহাসভা শেষ হয়েছিল ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর আর মহাসভার দলিল পত্রাদি ছাপার মুখ দেখতে পেল প্রায় ৫ বছর পরে। বইটির প্রধান সম্পাদক ফাদার ফ্রান্সিস সিমা দুঃখ করে বলতেন গুরুত্বপূর্ণ বইটি যথাযথভাবে বিপণণ ও বিতরণ হয়নি। বনানী মেজর সেমিনারী থেকে উপাসনা-কেন্দ্রিক কয়েকটি পাঠ্য বিষয়ের একটি ছিল স্থানীয় সংস্কৃত্যায়ন করণ। এর উপর গুরুত্ব দেয়া হলেও সংস্কৃ ত্যায়ন পদ্ধতি সচল ও সফল করার জন্য আরো গুরুত্ব সহকারে যাজক/ব্রতধারী-ধারিণী এবং খ্রিস্টভক্তদের জন্যে মহাসভার আলোকে সেমিনার করার প্রস্তাব থাকলেও তা তেমন ভাবে করা হয়নি। মণ্ডলীর বৈপ্লবিক ও ইতিবাচক পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও দিক-নির্দেশনা হয়তো পছন্দ না হওয়াতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী মহোদয়ের উত্তরসূরী মাণ্ডলিক প্রশাসন যাজক/ব্রতধারী-ধারিণীদের মাঝে তা বিলি করেননি এবং খ্রিস্টভক্তদেরও তা জানতে দেননি। ২য় ভাটিকান মহাসভার সিদ্ধান্তের আলোকে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাজারে বাংলাদেশের প্রথম 'ধর্মপল্লী পরিচালনা পরিষদ' বা 'প্যারিশ কাউন্সিল' Pilot Project হিসেবে চালু করেছিলেন। ফাদার পৌল গমেজ তখন পাল-পুরোহিত। আমি যুব প্রতিষ্ঠান সুহৃদ সংঘের G.S. হিসেবে ২ বছর এবং পরবর্তীতে ৭৯-৮০ সুহৃদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফাদার যোসেফ দত্তের আমলে এসে দেখেছি ১০ বছরের ব্যবধানেও দুই আমলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা (Transparency & Accountability) এর প্রশংসনীয় একই উদাহরণ। সে সময়ে প্যারিশ কাউন্সিলের সভাপতি হওয়া স্বত্বেও প্রত্যেক মাসিক সভায় ধর্মপল্লীর যাবতীয় হিসাব বিবরণী (রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে সংগৃহীত দান, খ্রিস্টভক্তদের দেয়া মাসিক Pastoral Fund collection, গীর্জার গুপ্ত বাক্সের সংগ্রহ, এমনকি ধর্মপল্লীর যাবতীয় ব্যয়)জানিয়ে কোষাধ্যক্ষকে দিতেন। ১৯৯৮-২০০২ পর্যন্ত ৪ বছর মহাখালী খ্রীষ্টান কল্যাণ সমিতির সভাপতি হিসেবে তেজগাঁও প্যারিশ কাউন্সিলে থাকাকালীন কোন সভায় কিংবা রোববারের কোন খ্রিস্টযাগে আগের রোববারে সংগৃহীত দানের পরিমাণের কোন ঘোষণা দে'য়ার কথা শুনিনি। যুক্তরাষ্ট্রে বাস করা অভিবাসী সবাই দেখছেন যে এখারকার সব কাথলিক গীর্জায় সংগৃহীত সকল আয়-বিবরণী ধর্মপল্লীর নিউজ লেটারে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করা হয়।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘ আয়োজিত প্রথম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সমাপনী দিবসে পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলাদেশে নিযুক্ত পোপের প্রতিনিধি, ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ (পরবর্তীতে কার্ডিনাল) ক্যাসিডী, যুব শক্তিকে আশ্বাস দিয়ে পবিত্র বাইবেলের তিমথী গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, "যৌবনের জন্য কেউ তোমাকে তুচ্ছ না করুক, কিন্তু বিশ্বাসীদের কথাবার্তায়, আচরণে, প্রেমে, বিশ্বাসে, পবিত্রতায় একটি উদাহরণ স্থাপন করুন"। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এসে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি ছাত্রদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র হোষ্টেল স্থাপনের জন্যে মোহাম্মদপুর আসাদ গেটস্থ আর্চডায়োসিসের ২ (দুই) বিঘা জমি দানের ঘোষণা দেন এবং আরো জানান যে, "এতকাল ইচ্ছে থাকলেও ছিল না যুব সম্প্রদায়ের সমস্যা তলিয়ে দেখার। এবার থেকে একজন যাজক থাকবেন যুব সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী রূপে"। *(প্রতিবেশী রির্পোট ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৫)*। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী'র মৃত্যুর পরে কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দূরদর্শী আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি'র গঠিত Youth Team কালক্রমে পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীর বদলে সে ইয়ুথ টিম কাথলিক যুব কমিশন হয়ে, সেবা দল হয়ে আবার কাথলিক যুব কমিশন নাম নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী না হয়ে -- পরিণত হয়ে দাঁড়ালো অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-যুব আন্দোলনে বিভেদকারী, সহযোগীর বদলে প্রতিযোগী ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিপক্ষ হিসেবে। শুরু হলো বিভাজন প্রক্রিয়া। এতে করে ধীরে ধীরে কমতে থাকে ষাটের শেষ ভাগে গড়ে ওঠা ত্রিবেণী ছাত্রকল্যাণ সংঘ, সুহৃদ সংঘ, খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘ, ভাওয়াল খ্রীষ্টান যুব সমিতি, তুমিলিয়া জাগরণী সংঘ, গারো প্রগতি সংঘ, তেজগাঁও যুব সংঘ, রমনা প্রগতি সংঘ, খ্রীষ্টান লেখক ফোরাম, উত্তরবঙ্গ সর্বকল্যাণ সংঘের মত অনেক ছাত্র ও যুব সংগঠনের সমাজ উন্নয়ণমূলক কাজ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। কিছু কিছু সংগঠন অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্তির পথে চলে যায়।

২য় ভাটিকান মহাসভায় এবং আজকালকার ডিজিটাল যুগে ভাটিকানের পুণ্যপিতা এবং তাঁর পরিষদ ও পোপীয় দফতর মণ্ডলীর জন্যে কি নির্দেশ দিচ্ছেন তা নিমিষেই যে কেহ যে কোন স্থান থেকে হাতের মুঠোয় পেতে পারে অনায়াসে। তাই কাথলিক বিশপ সম্মিলনীব সবার দৃষ্টি আর্কষণ করছি, বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের মনে কখনো যেন এমন চিন্তা না আসে:-- "তানপুরা কি সুর তোলে আর আমাদের সারেঙ্গী কি বাজায়"!!

কৃতজ্ঞতা : *ক. 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'ঃ ১৮-২৪ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ২০০৭ এ প্রকাশিত --- সুমন কোড়াইয়ার গৃহীত ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ এর সাক্ষাৎকার।*

খ. সুহৃদ নথি-পত্র।

নব দম্পতিদের বলছি

শিউলী রোজলিন পালমা

এখন আমরা যে সময়টা পার করছি, সে সময়ে জীবন চলছে ত্বরিত গতিতে, অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে অতি দ্রুত। একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ-খাইয়ে উঠার আগেই নতুন পরিস্থিতি চলে আসছে। ভৌত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিবর্তন আসছে আমাদের চিন্তা-চেতনার, মন-মানসিকতার ও আচার-আচরণের। যেন একটা অস্থির সময় পার করছি আমরা। এ অস্থির সময়ে যৌথ/যুগল জীবন যাপন করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ছে, ফলশ্রুতিতে দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গন এখন অনেক বেড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমাদের পরিবার, যেখানে একজন মানুষ বিকশিত হয়, মানবিক হয় এবং ভাল কাজের জন্য যোগ্য হয়ে ওঠে, সে পরিবারকে রক্ষা করতে সকলেরই সজাগ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের নবদম্পতিরা যেন যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে তাদের দাম্পত্য জীবনে তথা পারিবারিক জীবনে সুখী হতে পারে, সেক্ষেত্রে সহায়তা করতেই আমার আজকের এ লেখা।

১) বিয়ে অনেক আনন্দের ও স্বর্গীয় ঘটনা: বিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের একাকী ও নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান হয় এবং অনেক প্রতীক্ষার পর ভালোবাসার মানুষের সাথে আমরা ঘর বাঁধি। এ ঘর যেন হয়, অনেক যত্নের ঘর। অর্থাৎ সারাজীবন এ ঘরের অনেক যত্ন করতে হবে। এ ঘরে আমরা একে অপরকে যত্ন করব, একে অপরকে শান্তিতে রাখব, একে অপরকে সহযোগিতা করব, একে অপরের প্রতি মায়া মমতা বাড়াব, এভাবে দুইজন দুইজনের ভালোবাসা বাড়িয়ে তুলব ও দৃঢ় করব।

এ ঘরে শুধু দুইজন দুইজনকে যত্ন করব তা না, যত্ন করব আমাদের ভালবাসার সন্তানদেরকে, যত্ন করব আমাদের দুই পরিবারের মা বাবা, ভাইবোন ও আত্মীয় স্বজনদেরকে। মানুষের পাশাপাশি যত্ন করব ঘরের প্রতিটি জিনিসকে, আমাদের ঘর ছোট হতে পারে, জিনিসপত্র কম থাকতে পারে কিন্তু সেগুলো গুছিয়ে, সুন্দর করে রাখব, একদম স্বর্গের মত, যেখানে সবার থাকতে ভাল লাগবে, আসতে ভাল লাগবে। এজন্য প্রতিটি দম্পতিকে করতে হবে প্রচুর পরিশ্রম, দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে দুজনকেই কাজ করতে।

২) বিয়ের মধ্য দিয়ে আনন্দের জীবনের পাশাপাশি শুরু হয় খাপ খাওয়ানোর জীবন: বিয়ের পর নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন নিয়ম কানুন, নতুন খাদ্যাভাস, নতুন দায়িত্ব পালনের সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। এ জায়গাটায় প্রচুর ধৈর্য্য ও সহ্যশক্তি দরকার।

- বিয়ের পর অন্যের সাথে তুলনা হলে (অমুক বেশী সুন্দর, অমুক বড় চাকুরী করে, অমুকের রান্না ভাল) সহ্য করতে হবে।

- নিজের অপরিপক্কতা, অক্ষমতা নিয়ে কথা হলে সহ্য করতে হবে, নিজের ত্যাগস্বীকারের স্বীকৃতি না মিললে, সহ্য করতে হবে।

সহ্য করার ক্ষেত্রে যে শুধু স্ত্রী সহ্য করে তা না, স্বামীকেও অনেক কিছু সহ্য করতে হয়, এক্ষেত্রে স্ত্রীর কষ্ট হলে স্বামী তাকে মানসিক সাপোর্ট দিবে এবং স্বামীর কষ্ট হলে স্ত্রী তাকে মানসিক সাপোর্ট দিবে।

৩) দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে: দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তার

দুটো বিপরীত চিত্র আছে ১. স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে কোন কিছুই গোপন থাকবে না। কিন্তু স্বামী, স্ত্রী দুজনই যার যার শ্বশুরবাড়ির কথাবার্তা বাইরে প্রকাশ করবে না।

- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার কথা, নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। (ভাল ও আনন্দের ঘটনাগুলো অন্যকে বলা যাবে কিন্তু দ্বন্দ্ব, কষ্ট, রাগারাগি এগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করলে, দুজনের ভিতরে তৃতীয় পক্ষ ঢুকে যাবে এবং সবকিছু ঘোলাটে করে ফেলবে। স্ত্রী তার মায়ের কাছে ছোট একটি সমস্যার কথা প্রকাশ করলে, মা প্রতিদিন ফোন করে জিজ্ঞেস করবে, আজ কি হয়েছে, গতকাল কি হয়েছিল? এতে সামান্য ঘটনাও বড় অশান্তির হয়ে যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলছি, এক মেয়ে তার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ সময় পরে তার প্রাথমিক জীবনের কষ্টের কথা মাকে বলল, মা শুনে বলল, এসব কথা আগে বলিসনি কেন? মেয়ে বলল, বললে কি হত? মা বলল, কেন তোকে আমি নিয়ে আসতাম)।

৪) পরস্পরকে স্পেস দেয়া: প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা সত্তা, তাদের পছন্দ-অপছন্দ, চাহিদা ভিন্ন। বিয়ে করেছে বলে যে দুজন দুজনের সবটা বিসর্জন দেবে তা কিন্তু নয়। স্ত্রী যেন তার ভাল লাগার কাজটা করতে পারে স্বামীকে সে ছাড়টা দিতে হবে, ঠিক তেমনি স্বামী যেন তার পছন্দের কাজ করতে পারে স্ত্রীকে সে ছাড় দিতে হবে (কেউ গান শুনতে/গাইতে, আবার কেউ পড়তে/লেখালেখি করতে পছন্দ করতে পারে, তবে পছন্দটা অবশ্যই সামাজিকভাবে বৈধ হতে হবে)। ঠিক তেমনি একজন আরেকজনের উপর বেশি খবরদারি, একজন অন্যজনের জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি, দাম্পত্য সম্পর্কে ভালোবাসার গভীরতা আনার চেয়ে তিক্ততা বেশী আনে।

৫) যুগোপযোগী আচরণ: যুগ পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের চিন্তা ভাবনা পরিবর্তন হচ্ছে, সুতরাং পরস্পরের প্রতি আচরণ সময়ের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে। স্বামী বা স্ত্রী যদি তাদের বাবা মায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক বা আচরণ দেখে থাকে এবং তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে চায়, তা ঠিক হবে না। উদাহরণ হিসেবে বলছি, কেউ যদি দেখে দেখে বড় হয় যে, তার বাবা তার

মাকে সামান্য কারণে মারত আর তার মা চুপ করে মেনে নিত অথবা মা সারাক্ষণ বাবার সাথে বকবক করত আর বাবা চুপ করে হজম করত, এবং বিয়ের পর নবদম্পতি যদি পরস্পরের প্রতি একই আচরণ করতে চায় তাহলে হবে না। কারণ বাবা মায়েরা এক পরিবেশে বড় হয়েছে, বর্তমান যুগের ছেলে মেয়েরা আরেক পরিবেশে বড় হয়েছে আবার আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অন্য পরিবেশে বড় হবে সুতরাং পরিবেশ অনুযায়ী আচরণ করতে হবে, তবে আচার আচরণ আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী হতে হবে। এখন ছেলেমেয়ে উভয়ই একই রকম আদরে, একই রকম পড়াশুনার পরিবেশ পেয়ে বড় হয়, সুতরাং দুইজনেরই পেশাগত জীবনে বিকশিত হওয়ার ও এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ও অধিকার আছে। সুতরাং দুইজন দুইজনের অগ্রগতির জায়গায় সহযোগিতা করবে, আবার দুইজনকেই কিছু কিছু জায়গায় ছাড় দিবে। তবে পরিবারের জন্য কোনটা বেশী প্রয়োজন সেটা বুঝতে হবে। যেমন স্ত্রীর যদি পরীক্ষা থাকে স্বামী বাসায় একটু বেশী কাজ করবে, আবার স্বামীর অফিসে হয়তো কাজের চাপ বেশী চলছে, ফিরতে দেরী হবে সেদিন স্ত্রী বাসার কাজগুলো করে ফেলবে। এরকম পারস্পারিক সহযোগিতা ছাড়া কেউই শান্তিতে আগাতে পারবে না।

৬) পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ: পরিবারে যা কিছু করবে দুইজনে আলাপ করে করবে, শুধু স্বামী স্ত্রী না, যখন ছেলে মেয়ে হবে তাদের সাথেও আলাপ করতে হবে, তাহলে সিদ্ধান্ত সঠিক হবে। স্বামী/স্ত্রী যে কোন একজন পরিবারের নেতৃত্ব দিবে, সবাই তো সমান বুঝে না বা সমান জ্ঞানের অধিকারীও হয় না, তাই যে ভাল বোঝে সে মূল নেতৃত্বটা দিবে, তবে অন্যদের মতামতের গুরুত্বও দিতে হবে, অর্থাৎ যে যেটা ভাল বোঝে তার মতামতটা গ্রহণ করা উচিত। পরিবারের নেতার কথা অনেক সময় ভাল লাগেনা, কঠিন, কঠোর মনে হয় তবে নেতার কথা মেনে চললে পরিবারে শৃংখলা বজায় থাকে এবং পরিবারের ও পরিবার সদস্যদের কল্যাণই হয়। উদাহরণ স্বরূপ লিখছি- আমাদের পরিবারের নেতার দিকনির্দেশনা অনেক সময় আমাদের ভাল লাগেনি, কঠিন, কঠোর মনে হয়েছে কিন্তু দীর্ঘ সময় পরে, এখন মনে হয় সেগুলো সবই ভাল ছিল।

৭) দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্থ ও নেতিবাচক আসক্তিমুক্ত থাকা প্রয়োজন: বিবাহিত জীবনে অবিশ্বস্থতা কখনই কাম্য নয়, এটা দাম্পত্য জীবনকে চরম ঝুঁকিতে ফেলে। এমনকি দাম্পত্য জীবনের মৃত্যুও ঘটাতে পারে। স্বামী /স্ত্রী যেকোন একজনের মন্দ অভ্যাস/ আসক্তি সঙ্গীকে অনেক কষ্ট দেয়। মন্দ অভ্যাস/আসক্তিগুলির মধ্যে আছে -মদ্যপান, ধুমপান, নেশায় আসক্তি, অর্থের প্রতি লোভ, অতিরিক্ত আড্ডাবাজি, অতিরিক্ত মার্কেটিং, অতিমাত্রায় পার্লার নির্ভরতা, ফেইজবুক বা ফোনে দীর্ঘ সময় থাকা ইত্যাদি।

বর্তমান বাস্তবতায় প্রলোভনে পড়ার সম্ভাবনা আগের চেয়ে অনেক বেশী যেহেতু এখন স্বামী /স্ত্রী উভয়েই বাইরে যায়, কাজ করে, অনেক মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া, ফেইজবুকে প্রলোভনে পড়ার মত অনেক কিছু আছে। প্রলোভন সারা জীবন আসবে, শেষ হবে না, তবে আমাদের প্রাধান্য (প্রায়োরিটি) হল আমাদের স্বামী/ স্ত্রী/সন্তান, এখন কেউ যদি এদের রেখে প্রলোভনে পড়ে, তবে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে সেই দায়ী, এটা তারই দোষ। উদাহরণ হিসেবে বলছি- আগে চোর ডাকাতের ভয় কম ছিল তাই গ্রামের ঘরগুলো বেশী মজবুত ছিল না, এখন ভয় বেশী ঘরগুলো তাই বেশী সুরক্ষিত, বেশী মজবুত, ঠিক তেমনি এখন যেহেতু প্রলোভন বেশি এসব প্রলোভন থেকে রক্ষা পেতে বিবেকের ও পারস্পারিক সম্পর্কের ঘরটাকে অনেক মজবুত করতে হবে। এর জন্য পরস্পরকে বেশী সময় দিতে হবে, কথোপকথন বাড়াতে হবে, আধ্যাত্মিক জীবনকে দৃঢ় করতে হবে। পরিবারের বাইরে অন্যদের সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে সীমাটা (লিমিট) জানতে হবে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কলিগদের সাথে ততটুকুই সম্পর্ক রাখতে হবে যতটুকু সামাজিকভাবে শোভনীয়। তাহলে দাম্পত্যজীবনে সমস্যা হবে না।

৮) দাম্পত্য জীবনের মনোমালিন্য বা দ্বন্ধ: দাম্পত্য জীবনে দ্বন্ধ থাকবেই, ভাবা ঠিক হবে না যে, এখন দ্বন্ধ হচ্ছে, দুই বছর পর থাকবে না। টুকটাক দ্বন্ধ থাকবেই, দু'জন যতদিন একসাথে থাকবে, তবে এটাকে বড় করা যাবে না। আসলে দুটো মানুষ আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে বড় হয়ে আসে সুতরাং দুজনের চিন্তা ভাবনায় কিছু পার্থক্য থাকে। মনে রাখতে হবে, আমার সাথের মানুষটাকে আমি পরিবর্তন করতে পারব না, আমার কিছু দোষ সে মেনে নেবে, আবার তার কিছু দোষ আমি মেনে নিয়ে একসাথে পথ চলব। এটাই আসলে দাম্পত্য জীবন। দাম্পত্য জীবনের দ্বন্ধ নিরসনের সুনির্দিষ্ট কোন পথ নেই, প্রত্যেক দম্পতি দ্বন্ধ নিরসনের জন্য তাদের মত করে একটা পথ বের করে নেবে। কেউ দু'তিন দিন কথা বলবে না তারপর ঠিক হবে, কেউ একবেলা খাবে না তারপর ঠিক হবে, কেউ কেউ আছে একটু কান্নাকাটি করে মিটমাট করে রাতে ঘুমাতে যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলছি- ঝগড়ার পর এক স্ত্রী তার স্বামীকে নোট লিখেছে, 'সেদিনের ঘটনার জন্য দুঃখিত, ভুলে যেও', সেই নোটের উপর তার স্বামী উত্তর লিখেছে, 'তুমি বলার আগেই ভুলে গেছি।' তবে দ্বন্ধ যেন দীর্ঘায়িত না হয়, দুজনের মধ্যে দুরত্ব যেন না বাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৯) পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ: দুজনের আয় ব্যয় সম্পর্কে দুইজনের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে অনেকের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকে না, চাকুরীর বয়স কম থাকে, আয় কম থাকে, মা বাবা ভাইবোনদের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হয়, বাচ্চারা ছোট থাকে তাদের পেছনেও অনেক খরচ থাকে। সুতরাং আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে। বেড়ানো, খেলানো, উৎসব, কেনা কাটা সবই করব, তবে আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় নয়। আর সব সময় সঞ্চয়ের মনোভাব থাকতে হবে।

১০) প্রার্থনাপূর্ণ জীবন যাপন করা: প্রার্থনা তো জোর করে করার বিষয় না। আমরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যে, তিনিই সব করছেন, আমরা নিজেরা আসলে কিছুই করতে পারি না, তবেই আমরা অন্তরে ধার্মিকতা অনুভব করব এবং সারাক্ষণই আমরা প্রার্থনা করব। যেকোন প্রাপ্তিতে, যে কোন প্রয়োজনে আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করব। এই যে সংসার করতে গিয়ে আমরা ধৈর্য্য ধরব, সহ্য করব, বিশ্বস্থ থাকব, প্রলোভন মোকাবেলা করব এগুলোর শক্তিতো আসবে প্রার্থনা থেকে। আর সেজন্য সপ্তাহে একদিন মীসা শোনা ও দিনে ১৫ মিনিট প্রার্থনা আমাদের করতেই হবে।

১১) সন্তানদের সামনে আদর্শ হওয়া: সন্তানেরা তাদের বাবা মাকে সবচেয়ে ভাল বাবা মা হিসেবে দেখতে চায়। ছেলেমেয়েদের সামনে গালাগাল, রাগারাগি, মিথ্যা বলা, বাড়িয়ে বলা, নেশা করা ওদের কষ্টের কারণ অন্যদিকে দায়িত্বশীলতা, ভাল ব্যবহার, আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক , পরিশ্রমী ও সৎজীবন ছেলেমেয়েদের গর্বিত করে। শিশুদের তো উপদেশ শোনে না, তারা অনুসরণ (ফলো) করে, বাবা মা বাচ্চাদের সামনে যা করবে তারা তাই হবে। যেসব দম্পতি এখনও বাবা মা হয়নি, তাদের কাছে প্রত্যাশা তারা যেন বাবা মা হওয়ার আগেই, তদের মধ্যকার যে কোন মন্দ অভ্যাস কমিয়ে আনে বা তা সম্পূর্ণ বাদ দেয় এবং ভাল অভ্যাসগুলো বাড়িয়ে তুলে তাদের সন্তানের চোখে হয়ে উঠে সবচেয়ে ভাল বাবা মা। সকল দম্পতিদের ভালোবাসাপূর্ণ সুখী জীবন কামনা করি।

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে যারা অক্লান্ত সাধনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে গোড়াপত্তন করে গেছেন এবং প্রৈরিতিক কাজে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে রেখে গেছেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা আজ তাঁদের প্রায় ভুলতে বসেছি। আজ, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি; যাদের সাথে সৌভাগ্যক্রমে আমি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলাম এবং যাদের কাছে আমি চিরঋণী।

সকল আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের প্রতি রইলো আমার এবং পরিবারের পক্ষ থেকে বড়দিন এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা

শুভেচ্ছান্তে

ড. অগাস্টিন ক্রুজ ও পরিবারবর্গ

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট জুডস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

১০ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পারুল ডরোথি গমেজ

স্বামী : প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ
জন্ম : ১৬ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
পারুল ভিলা, ৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রিয় মা, তুমি আমাদের মাঝে নেই এ কথা যেন বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়। তোমার প্রতিটা কাজ, তোমার স্পর্শ আমাদের আজও ঘিরে রেখেছে। আমাদের মা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহায্যকারিণী, ঈশ্বর নির্ভরশীলা নারী। মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে, নিরবে-নিভৃতে থেকে তিনি অন্যকে সাধ্যমত সহযোগীতা করেছেন। তার শুভানুধ্যায়ীরা এখনো আমাদের মাকে স্মরণ করেন।

আমাদের মা মিসেস **পারুল ডরোথি গমেজ ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ প্রভুর কোলে আশ্রয় নেন।** মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

মা, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল ১০টি বছর তোমাকে ছাড়া। সর্বদা মনে হয় আমাদের কাছেই আছো। আমাদের বিশ্বাস, তুমি স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো এবং আমাদের আশীর্বাদ করছো।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায়

ছেলে ও ছেলে-বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ-মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক, আনন্দ ও টাইগো

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে ...

প্রয়াত রবার্ট গমেজ (আদি)
জন্ম: ১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা
মৃত্যু: ২৯ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
নিউজার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত এলিজাবেথ শেফালী গমেজ
জন্ম: ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা
মৃত্যু: ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
নিউজার্সি, ইউএসএ

মা তুমি জন্মেছিলে অতৃপ্তি নিয়ে, চলেও গেলে অতৃপ্তি নিয়ে। তোমাকে হারিয়েছি বেশ বেলা হলো। ২৮টি বছর পার হয়ে গেলেও, মা তুমি আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে গেঁথে আছে। মা তুমি চলে যাবার পর আমাদের একমাত্র **ভরসা** বাবাই আমাদের পরিবারের সবাইকে অতি যত্নে আগলে রেখেছিলেন। সেই **ভরসাও;** আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবা সবাইকে একা রেখে চলে গেলেন ২৯ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে।

বাবা ও মা তোমাদের মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে তোমাদের অনুপস্থিতি আমাদের সকলের জীবনে প্রতি মুহূর্তে হৃদয়ে কড়া নাড়ে। তোমরা দু'জনেই আমাদের চোখের সামনেই ছিলে, আছো আর থাকবে।

ব্যক্তি জীবনে আমাদের বাবা ও মা অত্যন্ত সৎ, ধর্মভীরু, সদালাপী, বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। স্বর্গ থেকেও তোমরা তোমাদের রেখে যাওয়া পরিবার এবং সবাইকে আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের আদর্শে আমরা সামনের পথে এগিয়ে চলতে পারি। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে, তোমরা শান্তিতে বিশ্রাম করো।

সবাইকে শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা -২০২৫

ফাদার স্ট্যান্‌লী, জেমস-সুইটি, জেভিয়ার-তুলি, অলড্রিন-ন্যান্সি, জুয়েল-লতা, মাইকেল-মনি, নোয়েল-চৈতী।
নাতী ও নাতীন : মোহনা, সৌরভ, খ্রীষ্টফার, এ্যান্ড্রিয়া, জোয়ানা, যোনাথন, এইডেন, এ্যান্টনী ও ব্র্যান্ডন গমেজ (আদি)।
New Jersey, USA

হৃদয়ে তোমরা অমর

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৪ মার্চ, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত শিশিলিয়া রোজারিও
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত বেনজামিন রোজারিও
জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা
মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : বেওন, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত ইউফ্রেজী রেনু রোজারিও
জন্ম : ২৯ আগস্ট, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

কালের আবর্তে দেখতে দেখতে ৯টি বছর পেড়িয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে হারিয়ে গেলে সেই অনন্তের অসীম নীলিমায়। কিন্তু তোমাদের অনিন্দ সুন্দর সদাহাস্য মুখগুলো অফুরন্ত ভালোবাসা, কতশত সুখময় স্মৃতি, তোমাদের জীবন আদর্শ আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান থেকে তোমাদের শূন্যতা ও অভাবকে একটি পুরোপুরি সম্পূর্ণতা দিয়ে ভরে রেখেছে এবং অনুপ্রাণিত করছে অকুতোভয়ে জীবন পথে চলতে এ অবর্ণনীয় এক সুখময় বেদনার অনুভূতি।

তোমরা তো আমাদের হৃদয়াকাশে তারা হয়ে নিত্য দীপ্তিমান। তোমাদের কি ভোলা যায়?

আমরা বিশ্বাস করি ও প্রার্থনা করি যে তোমরা ঈশ্বরের বাগানে সেরা ফুল হয়ে তার একান্ত সান্নিধ্যে পরম আনন্দে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমাদের আদর্শে সর্বদা মিলে-মিশে আগামী দিনগুলো অতিবাহিত করে জীবন শেষে তোমাদের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমাদের আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
শান্তিভবন
বেওন, নিউ জার্সি, আমেরিকা।

প্রয়াত পিটার গমেজ
জন্ম : ২ ডিসেম্বর, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : কাজীর বাড়ি, বক্সনগর, ঢাকা
মৃত্যু : ৬ এপ্রিল, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : জার্সি সিটি, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত আইরিন গমেজ
জন্ম : ৭ জুলাই, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

Until We Meet Again, Irene and Peter Gomes

Those special memories of you
will always bring a smile
If only we could have you back
for just a little while
Then we could sit and talk again
just like we used to do do
you always meant so very much
and always will do too
The fact that you're no longer here
will always cause us pain
but you're forever in our hearts
until we meet again

With love,
Veronica, Manuel, Elizabeth, Teresa
and Christopher

যখন আবার হবে দেখা

তোমাদের সেই বিশেষ স্মৃতিগুলো
সর্বদা নিয়ে আসবে আনন্দ বয়ে
যদি পেতাম তোমাদেরকে কাছে
শুধু ক্ষণিকের তরে
তখন বসে আবারও গল্পগুজব করতাম
যেমন করতাম ঠিক আগের মত।
তোমরা যে সর্বদা ছিলে আমাদের কাছে
অনেক প্রিয় এবং থাকবেও তাই
প্রকৃতপক্ষে তোমরা যে আমাদের কাছে আর নেই
এটা ভেবে আমাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়
কিন্তু তোমরা তো আছ সর্বদা আমাদের সাথে
যে পর্যন্ত না আবার দেখা হবে।

তোমাদেরই সন্তানেরা
ভেরোনিকা (শোভা), ম্যানুয়েল (বাবুল), এলিজাবেথ (সন্ধ্যা)
তেরেজা (জ্যোৎস্না) ও খ্রীষ্টফার (টিলু)

স্মৃতিতে তুমি অমর

আন্তনী জীবন গমেজ
জন্ম : ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিগত ১৬ জানুয়ারি রোজ শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, আন্তনী জীবন গমেজ, এক স্নেহাশীষ পিতা, দাদু এবং এক প্রিয় মামা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

আন্তনী গমেজের জন্ম হয় ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। তিনি ছিলেন লাজারেস ও লুসি গমেজের পাঁচ সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ। তিনি এলিজাবেথ লিওনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ঈশ্বর তাদেরকে দুইজন মেয়ে-জেইন লুসি এবং জুন আইরিন এবং একজন ছেলে-কেনেথ লাজারেস দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

আন্তনী সৌদি আরবে কয়েক বছর কাজ করেন। পরে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর অভিবাসন নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় চলে আসেন এবং অঙ্গরাজ্য নিউ জার্সির, জার্সি সিটিতে আজীবন বসবাস করেন। তিনি আরামাক কোম্পানীতে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত কাজ করেন।

বড়দিনের সময় তিনি তার বিশিষ্ট কেক বানাতে এবং সেগুলো পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বিলাতে খুব ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে যেতে খুব পছন্দ করতেন এবং তাতে প্রচুর আনন্দ পেতেন।

আন্তনী ছিলেন একজন কর্মঠ, স্নেহশীল, সৎ, সাধারণ ও স্বল্পভাষী মানুষ কিন্তু স্বপ্ন ও প্রেমে ভরপুর। তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল পিতা ও আদর্শ স্বামী। তিনি এমন একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে গেছেন যা কোনদিন পূরণীয় নয়।

আন্তনী গমেজ রেখে গেছেন তার স্ত্রী, তিন সন্তান, জামাতা, নাতি, ভাগ্নে-ভাগ্নি। আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন তাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : এলিজাবেথ গমেজ, মেয়ে : জেইন লুসি গমেজ, মেয়ে ও জামাতা : জুন আইরিন ও মহম্মদ আহমেদ
ছেলে : কেনেথ লাজারাস, নাতি : মার্চ

In Loving Memory of Anthony Jibon Gomes

প্রয়াত রোজবানার্ড গমেজ
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Anthony Jibon Gomes, a loving father, grandfather and a beloved uncle, passed away on Saturday, January 16, 2021, at the age of 69.

Anthony was born on March 28, 1951, in the district of Pabna, Bangladesh. He was the fourth of late Lazarus and Lucy Gomes' five children. He married Elizabeth Leona on January 5, 1979. They raised two daughters- Jane Lucy and June Irene and a son - Kenneth Lazarus.

He worked in Saudi Arabia for several years. He then immigrated to the United States of America on October 8, 1988 and settled in Jersey City, New Jersey. He worked at Aramark till his retirement.

Anthony loved baking his signature cakes during Christmas and share them with the family, relatives and friends. He enjoyed visiting family and friends in Bangladesh and it filled him with great joy.

Anthony was very hardworking, loving, honest, simple and a man of few words but filled with dreams and love. He was a loving father and an ideal husband. He cared for the less fortunate and often donated. He has left a void that can never be filled.

Anthony is survived by his wife, three children, son-in-law, grandson, in-laws, nieces and nephews, his sister and hosts of friends.

May God grant Anthony eternal peace and happiness.

With love,
Elizabeth, Jane, June, Kenneth, Ahmed and Mars

S.F.X. GREENHERALD INTERNATIONAL SCHOOL

Cambridge International Centre BD600 Since 1954

1954-2024 70TH ANNIVERSARY

OUTSTANDING CAMBRIDGE LEARNER AWARD 2023

TURUNA ISHRAQ
A Level Mathematics
Top in Bangladesh

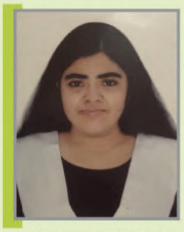

SOUMINI SOHA SAHA
A Level Mathematics
Top in Bangladesh

ADRITA ZAIMA ISLAM
AS Level
Biology Top in Bangladesh
Chemistry & Mathematics Top in World
Best across four, First place in Bangladesh

JOHANNA RAHMAN
O Level Literature In English
High Achievement

We wish you a
Merry Christmas
AND
HAPPY NEW YEAR
2025

ICON OF EDUCATION
Sr. Virginia Asha Gomes, RNDM
Former Principal

" A Truly Great
PRINCIPAL
is heard to find
difficult
to part with and
impossible
to Forget."

A WARM WELCOME
TO OUR NEW PRINCIPAL
Sr. Jacqueline Louisa Gomes, RNDM
Principal
May God bless us all.
May God bless Greenherald
Greenherald be blessed.

24, Asad Avenue, Mohammadpur Dhaka - 1207
+ 88-02-410 224 68 info@sfxghis.school
www.sfxghis.school

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

করুণা মারিয়া পিরিচ

জন্ম: ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্থায়ী ঠিকানা : ৫১/২ দক্ষিণ বেগুনবাড়ী, তেজগাঁও ঢাকা-১২০৮
বর্তমান ঠিকানা : ৮৬, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫

সদা হাস্যোজ্জ্বল, মায়াবী ও কঠোর পরিশ্রমী একজন মা ছিলে তুমি। পরম যত্নে ও আদরে গড়ে তুলেছিলে একটি সুন্দর পরিবার। সবার খোঁজ-খবর নেয়া ছিলো তোমার নিত্য দিনের অভ্যাস। পরিবারের মধ্যমনি ছিলে তুমি। প্রার্থনাপূর্ণ ও সহজ-সরল জীবন দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করেছিলে অনন্ত জীবনের জন্য। মা, তুমি তোমার জীবনাদর্শ দ্বারা চিরদিন বেঁচে থাকবে আমাদের অন্তরে।

তোমারই স্নেহের –

ছেলে-ছেলে বৌ:
স্বর্গীয় মিলন-বিউটি ও মিল্টন-মুক্তা
মেয়ে- মেয়ে জামাইগণ ও নাতি-নাতনীগণ

করুনা ম্যাগডেলিন গডিনু

জন্ম: ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্থায়ী ঠিকানা : দক্ষিণ ভাসানিয়া, মঠবাড়ী গাজীপুর
বর্তমান ঠিকানা : ৮৬, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫

সকাল থেকেই কথার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলে তুমি মা, আর বার বার বলছিলে আমরা যেন ভালো থাকি। মা, আমি বুঝতে পারিনি যে, আমার সাথে এটাই তোমার শেষ কথা। অতি সাধারণ, নম্র ও প্রার্থনাপূর্ণ জীবনে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করেছো স্বর্গীয় পিতার রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য। মা, তুমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মা হয়ে বেঁচে থাকবে আমার হৃদয়ে চিরদিন।

তোমারই স্নেহের –

একমাত্র মেয়ে-মেয়ে জামাই
মুক্তা কস্তা ও মিল্টন পিরিচ
নাতনীগণ: অরণ্য ও অরলিন

দেশে-বিদেশের সকল খ্রিস্টভক্তসহ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।
মুক্তিদাতা খ্রিস্টের আগমনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তিময় বিশ্ব।

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি....

প্রকল্পগুলোর কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণই আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার সার্থকতা।

৫ বছরে দ্বিগুণ — স্থায়ী আমানত — ৯ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস	সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
১৩.৫০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%	৬.০০%	৫.০০%

- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

SHORT TERM HDPS

One Year		Two Years		Three Years	
Total Deposit (1,000X12)	12,000/=	Total Deposit (1,000X24)	24,000/=	Total Deposit (1,000X36)	36,000/=
Interest 9%	585/=	Interest 9%	2,375/=	Interest 9%	5,411/=
Bonus (If Regular)	500/=	Bonus (If Regular)	1,000/=	Bonus (If Regular)	1,500/=
Amount Payable	13,085/=	Amount Payable	27,375/=	Amount Payable	42,911/=

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Diposit Amount	Total Benefit	Total Amount
3 Year			
23,850/=	858,600/=	1,41,400/=	1,000,000/=
5 Year			
12,900/=	774,000/=	2,26,000/=	1,000,000/=
10 Year			
4,850/=	582,000/=	4,18,000/=	1,000,000/=
12 Year			
3,700/=	532,800/=	4,67,200/=	1,000,000/=
15 Year			
2,630/=	473,400/=	5,26,600/=	1,000,000/=

[এছাড়াও ৫/১০ বৎসর মেয়াদী এইচডিপিএস ও ২৫ বছরে ২৫গুণ দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করার সুযোগ]

আগস্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282, Dated 06.06.1978

ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সংস্কৃত্যায়ন

ইউজিন জাসটিন আনজুস সিএসসি

বিগত ২০০৬ খ্রিস্টবর্ষে ভারতবর্ষের খ্রিস্টমণ্ডলী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের শততম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করল। কিন্তু কে এই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়? কেন-ই বা তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হলো?

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম ভবানী চরণ বন্দোপধ্যায়। তাঁর জন্ম হয় ফেব্রুয়ারি ১১, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে। মাত্র ছেঁচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয় ২৭ অক্টোবর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। এই অল্প পরিসরের জীবনে তিনি পরিচিত হন একজন 'ভারতীয় বাঙালী ধর্মতত্ত্ববিদ, সাংবাদিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে। তাঁর এই স্বল্পকালীন জীবনে তিনি যে সাক্ষ্য দান করেছেন, তার জন্য ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাঙালী সমাজ এবং বাঙালী খ্রিস্টসমাজ তাঁকে স্মরণ করে। এর কারণ হল তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষ এবং ইউরোপীয় মিশনারী প্রচেষ্টার দ্বারা খ্রিস্টবিশ্বাস প্রচার ও খ্রিস্টমণ্ডলীর গোড়াপত্তনের যুগে তিনি একজন খাঁটি বাঙালি খ্রিস্টান হওয়ার সাধনা করেছিলেন এবং প্রকৃত স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

ভবানী চরণ তখনকার শিক্ষিত সমাজের 'ভদ্রলোক' হিসেবে বাঙালী হিন্দু সমাজের মূল ধারার একজন নাগরিক ছিলেন। সেই সময়ে বাঙালী হিন্দু সমাজের দু'টি প্রধান ধারা ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। এর একটি হল পাশ্চাত্যের শিক্ষা, ভাবধারা, চিন্তাধারা বা দর্শন দ্বারা প্রভাবিত "নবীন বাঙালি সমাজ" যারা 'ভদ্রলোক' নামে পরিচিত ছিল। অপরটি হল তখনকার কট্টরপন্থী, রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের সংস্কারপন্থী দল, যা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্ম সমাজ' রূপে পরিচিত। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে দিকে ভবানী চরণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মমতের প্রচারক হয়ে উঠেন। তিনি সে সময় সিন্ধু প্রদেশের (বর্তমান পাকিস্তানে) হায়দ্রাবাদ শহরে একটি ব্রাহ্ম স্কুল শিক্ষক রূপে দায়িত্ব পালন করেন। রামমোহন রায়ের ছিল খ্রিস্টের প্রতি গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ, যা তাঁর মানবতাবাদী ধর্মবোধ ও নৈতিক ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের একজন সদস্য হিসেবে ভবানী চরণের অন্তরেও খ্রিস্টানুরাগ জন্মেছিল। তা ছাড়া ভবানী চরণের জীবনে তাঁর সমকালীন ব্যক্তিগণ, যেমন, কেশবচন্দ্র সেন (তৎকালীন অপর বাঙালী খ্রিস্টান), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (একই বছরে জন্ম), এবং সহপাঠী নরেন্দ্র নাথ দত্ত (পরবর্তী কালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন)-এর প্রভাব পড়েছিল।

ভবানী চরণ তৎকালীন বৃটিশ ভারতের যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: স্কটিশ মিশন স্কুল, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) এবং সাধারণ পরিষদের ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে কলকাতার 'স্কটিশ চার্চ কলেজ')।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, তখন সংস্কারপন্থী 'ব্রাহ্মসমাজ' ও গোড়াপন্থী 'ধর্ম সভা', এই দুটি দলই সমান্তরালভাবে ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। গোড়াপন্থী বা Orthodox Hindu দলের নেতৃত্বে ছিলেন রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭)। 'ধর্ম সভা' আন্দোলনের মূখ্য বিষয় ছিল সনাতন হিন্দুত্বকে অক্ষুণ্ন ও চলমান রাখার উদ্দেশে সাধারণ মানুষদের প্রভাবিত করা। এ ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার নবজাগরণ বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এর প্রবক্তাগণ চেয়েছিলেন প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার আলোকে পাশ্চাত্যের ধর্ম, পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও মতাদর্শকে প্রতিরোধ করা। অপর দিকে বাঙালি 'ভদ্রলোক' সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতীয় আত্ম-দর্শন ও আত্ম-পরিচয়ের সঠিক বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণ ঘটানো।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত "ব্রিটিশ ভারতীয় এ্যাসোসিয়েশন" ছিল 'বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা' এবং 'স্বদেশী আন্দোলন' গড়ে তোলার চালিকাশক্তিস্বরূপ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। সে সময়ে যুগপৎভাবে "ব্রাহ্ম সমাজ", "যুব বঙ্গ" (Young Bengal), ও "ব্রিটিশ ভারতীয় এ্যাসোসিয়েশন" অ-বিভক্ত বঙ্গে এবং গোটা ভারতবর্ষে "Bengal Renaissance" বা "বঙ্গীয় নবজাগরণ"-এর সূচনা করেছিল, যা অচিরেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন বা "স্বদেশী আন্দোলন"-এর রূপ নেয়। সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার (যাঁকে 'ব্রাহ্ম সমাজের মিশনারী' এবং 'নব-ভারতের প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয়ে থাকে), রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকান্দ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ্যানি বেসান্ত, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ভারতবর্ষের এই নবজাগরণের যুগেই অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর জীবন ছিল যেন একটি দৃশ্যমান 'বৈপরিত্য' (Paradox)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই "বৈপরিত্য"-পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করে বলেছেন : ".... তিনি ছিলেন রোমান কাথলিক সন্ন্যাসী, তথাপি একজন বেদান্তিক–উদ্বুদ্ধ, নির্ভয়, আত্ম-ত্যাগী, শিক্ষিত এবং ব্যতিক্রমী প্রভাব বিস্তারকারী" (জুলিয়াস লিপ্‌নার, The Writings of Brahmabandhab Upadhyay, Vol. I, Bangalore, ১৯৯১)।

ঐতিহাসিক লিপ্‌নার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনের চারটি অধ্যায় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, তাঁর বেড়ে ওঠা (১৮৬১-১৮৮১)। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৮২-১৮৯১) তিনি খ্রিস্টবিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' নাম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি হন অ্যাংলিকান, পরবর্তীতে একজন কাথলিক। লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি এই সময়কালে ধীরে ধীরে উপাধ্যায় (শিক্ষাগুরু) হয়ে ওঠেন। তৃতীয় পর্যায়ে (১৮৯১-১৯০৩) তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে 'অদ্বৈত' দর্শনের পরিমণ্ডলের মধ্যেই একজন দৃঢ়বিশ্বাসী খ্রিস্টান (কাথলিক) হয়ে উঠেন। চতুর্থ পর্যায়ে (১৯০৩-১৯০৭) তিনি একজন অগ্নিগর্ভ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং বঙ্গীয় রাজনীতির সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। মাত্র ছেচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি অসামান্য ক্ষিপ্রতার সাথে তখনকার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন সৃজনশীল মনের অধিকারী, সমকালীন চিন্তাধারার হৃদস্পন্দনের সাথে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত এবং তীব্র কর্ম-প্রেরণা (sense of mission) দ্বারা উদ্বুদ্ধ অনন্য ব্যক্তিত্ব।

ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায় বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবন ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হই তা হল : তিনি কি হিন্দু ছিলেন, না কি খ্রিস্টান? তিনি কি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, না কি খ্রিস্টবিশ্বাস প্রচারে নিবেদিত একজন মিশনারী? তাঁর দেশপ্রেম কি তাঁকে একজন স্বদেশপ্রেমী চরমপন্থী করে তুলেছিল? আমরা এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে দেখতে চেষ্টা করব তিনি জন্মসূত্রে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও একজন খ্রিস্টান (কাথলিক) ধর্মবিশ্বাসকে কিভাবে দেখেছেন এবং তাঁর জীবন কিভাবে সংস্কৃত্যায়ন বিষয়ক চিন্তা-ভাবনায় আমাদেরকে আলোকিত করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্রহ্মবান্ধবের "হিন্দু-খ্রিস্টান" পরিচয়কে তুলনা করা যেতে পারে বাইবেলে উল্লেখিত "ইহুদী ধর্মে ধর্মান্তরিত" গ্রীকদের সাথে তারা জাতিগতভাবে ছিলেন গ্রীক, কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে তারা হয়েছিলেন ইহুদী।

বঙ্গে খ্রিস্টবাণী প্রচার ও খ্রিস্ট মণ্ডলীর গোড়াপত্তনের সেই যুগে যে সকল হিন্দু বাঙালি, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এবং একই সাথে যাঁরা ভারতীয় ও বাঙালি আত্ম-পরিচয়কে

বিসর্জন না দিয়ে নিজেদেরকে ভারতীয়, বাঙালি, এবং খ্রিস্টান এই 'আত্মপরিচয়'-কে সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করেছেন এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ভবানী চরণকে নির্দ্বিধায় অগ্রগণ্য বলা যেতে পারে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কেশব চন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে আসেন এবং তখন থেকে তিনি আরও গভীরভাবে খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে কোলকাতার বিশপ কলেজের রেভারেণ্ড হিলটন নামে একজন অ্যাংলিক্যান যাজকের মাধ্যমে এবং এর ছয় মাস পরে তিনি করাচির একটি কাথলিক চার্চে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দীক্ষাস্নানের নাম ছিল 'থিওফিলাস" (Theophelus)। গ্রীক ভাষায় এর শাব্দিক অর্থ হল : Theos অর্থাৎ 'ঈশ্বর', এবং Phelus অর্থাৎ 'বন্ধু'। এ জন্যই ভবানী চরণ ভারতীয় এবং বাঙালি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থিওফেলাস নয়, 'ব্রহ্মবান্ধব' (ঈশবন্ধু) নামটি গ্রহণ করেন এবং একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী (ভিক্ষু) রূপে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেন। তিনি যেহেতু জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ (আচার্য) ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ও ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন তাই সঠিক অর্থেই তিনি 'উপাধ্যায়' (শিক্ষক) এই পদবীটিও গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি একজন প্রকৃত ভারতীয় এবং বাঙালি খ্রিস্টান এবং খ্রিস্টধর্মের একজন ঐশতত্ত্ববিদ হয়ে ওঠেন। একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী রূপে তিনি খালি পায়ে চলাফেরা করতেন, জাফরান রঙের সন্ন্যাসী-সুলভ পোশাক পড়তেন, এবং গলায় একটি আব্লুস কাঠের ক্রুশ পড়তেন।

তাঁর নানাবিধ কর্মময়তার মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে করাচি থেকে "সোফিয়া" (গ্রীক Sophia অর্থাৎ 'জ্ঞান') নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর রচনাগুলো তুলনা করা যেতে পারে আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর Apologetics-এর সাথে। পরবর্তীকালে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশের কাজ ভারতের মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে নিয়ে আসেন। এর কিছুকাল পর, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে দিকে তিনি তাঁর কর্মস্থল কোলকাতায় নিয়ে এসে বিডন্ স্ট্রিট-এর একটি ভাড়া করা বাসায় থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

১৯০২ থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্বৈত বেদান্তিক চিন্তাধারার আলোকে খ্রিস্টধর্মের মর্মসত্য ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন। এই সময় কোলকাতার আর্চবিশপ তাঁর সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন: "এই বিবৃতির মাধ্যমে আমরা ব্রহ্মবান্ধব নামে কোলকাতার একজন ব্রাহ্মণকে তাঁর স্বদেশীদের ধর্মান্তরিত করার জন্য উৎসাহী, জ্বলন্ত নৈতিকতার আদর্শ ও একজন ক্যাথলিক হিসাবে ঘোষণা করছি" *(Sebastian Pynodath I Jacob Parapalli, ভারতীয় খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের জন্য একজন হিন্দু-ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের তাৎপর্য, এশিয়ান ট্রেডিং কর্পোরেশন, বাঙ্গালোর, ২০০৮)*।

কর্মময় জীবনের এই পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে 'ভারতীয় চার্চ' গড়ে তুলতে, যা হবে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও জীবনযাত্রার মৌলিক ভাবধারার মধ্যে প্রোথিত এবং 'আশ্রমিক' সন্ন্যাস জীবন-প্রকাশক মণ্ডলী। এ থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে ব্রহ্মবান্ধব ভারতবর্ষে ইউরোপীয় আদলের খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে 'স্থানীয়' একটি মণ্ডলীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। 'সোফিয়া' পত্রিকায় "হিন্দু দর্শন ও খ্রিস্ট্রীয় ঐশতত্ত্ব" বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে তাঁর এরূপ চিন্তাধারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি যা চেয়েছিলেন তা হল: "a Christian Church in Indian face" *(Evelyn Monteiro, SCC, The Church in Upadhyay's Vision, Jnanadeepa, Vol. 11, January, 2008)*।

অদ্বৈত বেদান্তিক দর্শন অনুসারে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের খ্রিস্ট্রীয় ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাধারা মূলত কি ছিল? ব্রহ্মবান্ধব এ বিষয়ে তাঁর প্রচার ও লেখনীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে খ্রিস্ট্রীয় ঐশতাত্ত্বিক আলোচনায় ও প্রচারে ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারা, যুক্তি এবং ভাষার ব্যবহার করতে হবে কেন? মূলত পাশ্চাত্যের ঐশতত্ত্ব খ্রিস্টপূর্ব 'অ-খ্রিস্ট্রীয়' (গ্রীক ও হেলেনিস্টিক) দার্শনিকদের (এ্যারিস্টটল, প্লেটো) যুক্তিতত্ত্ব নির্ভর। টমাস আকুইনাসও তাঁর 'শীর্ষ ঐশতত্ত্ব' *(Summa Theologiae)* রচনার জন্য এই সকল দার্শনিকদের যুক্তির সাহায্য নিয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধবও বিশ্বাস করেছেন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বেদান্তিক দর্শন ও ভারতীয় চিন্তাধারার মাধ্যমেই খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও তত্ত্ব আলোচনা করা ও শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। তিনি এটাও বিশ্বাস করেছেন যে, ভারতীয়দেরকে খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত করতে হলে ভারতীয় দর্শণ ও 'ভাষা'-ই ব্যবহার করতে হবে।

তিনি যে অদ্বৈত দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন তা মূলত কি ছিল? বেদান্ত (উপনিষদ-এর শিক্ষা) মতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, যা প্রকাশ পায় "সচ্চিদানন্দ"-এর ধারণার মাধ্যমে। সচ্চিদানন্দ হল : সৎ-চিৎ (চিত্ত) আনন্দ। ব্রহ্মবান্ধব বিশ্বাস করেছিলেন খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস 'পিতা, পুত্র ও আত্মা মিলে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর' এই পরম সত্যটি 'সচ্চিদানন্দ'-এর ধারণা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। 'অদ্বৈত' অর্থাৎ যাঁর 'দ্বিতীয়' কেউ বা কিছু নেই। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর এই 'অদ্বৈত'-এর ধারণাটি দ্বারা বেদান্তের আলোকে 'শাশ্বত বাণী' অর্থাৎ Logos-কেই বুঝিয়েছেন। সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "আদিতে বাণী ছিলেন; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর" *(যোহন ১:১)*। যোহন গ্রীক (pagan) ভাষা থেকে পবিত্র ত্রিত্বের রহস্যকে যখন Logos -রূপে তুলে ধরেছেন, তখন ব্রহ্মবান্ধব এই নিগূঢ় বিষয়টিকে "সচ্চিদানন্দ"-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মবান্ধবের সমসাময়িক কালে অপর একজন ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গুরু ঋষি অরবিন্দ ঘোষ উপনিষদের ব্যাখ্যায় 'সচ্চিদানন্দ' সম্বন্ধে লিখেছেন :

"'সচ্চিদানন্দম্'। পরম হলেন শুদ্ধ সত্তা, অনপেক্ষ অস্তিত্ব, 'সৎ'। তিনি 'সৎ' কেননা একমাত্র তিনিই 'অস্তি', তাঁর আত্ম-অভিব্যক্তির অনধীন কোন অন্তিম সদ্‌বস্তু বা কোন সত্তা অন্য কিছুর নেই। আর তিনি 'অনপেক্ষ' অস্তিত্ব কারণ যেহেতু তিনি আছেন আর অন্য কিছু সতত নেই, সেহেতু স্বীকার করতেই হবে যে তিনি আছেন নিজের দ্বারা, নিজের মধ্যে ও নিজের কাছে। পরতম আবার শুদ্ধ সংবিৎ, একান্ত চেতনা, 'চিৎ'। ব্রহ্মের শুদ্ধ চেতনা এমন একটি ধারণা যা আমাদের চিন্তার সব প্রকারের অতীত। পরতম হলেন শুদ্ধ উল্লাস, অনপেক্ষ আনন্দ, 'আনন্দ'। 'সৎ' ও 'চিৎ' যেমন একই, 'সৎ' ও 'চিৎ' তেমনই 'আনন্দ' থেকে ভিন্ন নয়; ঠিক যেমন অস্তিত্বই চেতনা এবং ইহাকে চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, সচেতন অস্তিত্বও তেমন আনন্দ এবং ইহাকে আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়" *(শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, উপনিষদাবলী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী, ২০০৯)*।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের উপনিষদের এই ব্যাখ্যা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সনাতন হিন্দু ধর্মকে যতই 'পৌত্তলিক' বলে সমালোচনা করা হোক না কেন, উপনিষদের মূলকথা কিন্তু অদ্বৈত দর্শন অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্মবান্ধব 'গ্রেকো-রোমান' বা 'হেলেনিস্টিক' দার্শনিক তত্ত্বে আবরণে আগত খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের তত্ত্বকে অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিত রেখেই সম্পূর্ণ ভারতীয় চিন্তাধারার সাথে 'সংস্কৃত্যায়িত' করে ভারতীয় শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রচার করার জন্য নিবেদিত হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রাক্কালে, কাথলিক মণ্ডলীর 'রক্ষণশীল' মনোভাব এবং 'ব্রিটিশ রাজ'-এর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের পরিমণ্ডলে এরূপ চিন্তধারা কতটা সক্রিয়, বুদ্ধি-দীপ্ত ও সাহসী ছিল তা অনুমান করা খুব কঠিন বিষয় নয়।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নিজস্ব চিন্তাধারায় 'সচ্চিদানন্দ'-এর সারমর্ম হল: 'স্ব-অস্তিত্ব' বা self-existent being-এর সমীপে আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হয়, নতুবা আমাদেরকে এমন এক অর্থহীনতার গহ্বরে নিমজ্জিত হতে হয়, যার উৎপত্তি অস্তিত্বহীনতার মধ্যে। ঈশ্বর প্রদত্ত 'চিৎ', অর্থাৎ চেতনাশক্তি, যিনি নিজে 'স্ব-অস্তিত্ব' অর্থাৎ যার অস্তিত্ব অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না (বাইবেলের ভাষায় ও Am Who Am) – তাঁকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের মানবিক চেতনার দ্বারা। কারণ যিনি শাশ্বত-সত্তা, তিনি তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানবের মধ্যে প্রতিভাত হন, এবং মানুষ সেই শাশ্বত-সত্তার সাথে মিলিত হওয়ার বাসনায় নিজের মধ্যে পূর্ণতা

লাভের সাধনা করতে থাকে।

এখানে আমরা লক্ষ্য করছি 'বিশ্বাসমন্ত্র'-এর "তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ, তাঁর দ্বারা সমস্তই হলো সৃষ্ট"– এই নিগূঢ় কথাগুলোই ব্রহ্মবান্ধব উপনিষদের ভাষায় ব্যক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

"খ্রিস্ট্রীয় পবিত্র ত্রিত্বের নিগূঢ়তত্ত্ব আর বেদান্তিক সৎ-চিৎ-আনন্দ এর ধারণা একই। খ্রিস্ট্রীয় ঐশতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর যিনি পবিত্র ত্রিত্ব, পিতা, পুত্র ও আত্মা, সদা-স্বপ্রকাশিত তাঁর আত্ম-জ্ঞানের মাধ্যমে, কারণ তিনি সেই পরম প্রজ্ঞা। যে সত্তাকে জানা যায়, তিনি পিতা, যিনি জ্ঞাত বা পরম জ্ঞান (known self I begotten-self) তিনি পুত্র, আর পবিত্র আত্মা হলেন যিনি পিতা ও পুত্রের প্রেম থেকে সম্ভূত" *(Upadhyaya, Hinduism and Christianity as compared by Mrs. Besant, in "Sophia",vol. IV, No. 2, Feb. 1897)*।

ব্রহ্মবান্ধব ঈশ্বর ও তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে ঐশতাত্ত্বিক মৌলিক শিক্ষাকে 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'-এর ধারণা অনুসারে 'পরব্রহ্ম' (আমরা যাঁকে 'সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর' বলি) রূপে উপস্থাপন করেন এই ভাবে :

"আমরা বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং নির্ভয়ে এই সত্য স্বীকার করতে পারি যে, বেদান্তিক দর্শণ অনুসারে পরাব্রহ্ম অর্থাৎ যিনি 'সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা' (The Supreme Being) তাঁর স্বরূপ হলো এই যে, তিনিই হলেন মানবিক চিন্তার গতিসীমা বা পরিণতি। কাথলিক বিশ্বাসও তা-ই। ঈশ্বর হলেন একমাত্র চিরন্তন সত্তা; তিনি হলেন উত্তমতার পরিপূর্ণতা, তিনি স্বয়ম্ভূত এবং তিনিই প্রজ্ঞা" (Upadhyaya, "An exposition of Catholic Belief as compared with the Vedanta", in "Sophia", vol. V, No.1, January 1898)।

ব্রহ্মবান্ধব তাঁর খ্রিস্টবিশ্বাসকে কেবলমাত্র দার্শনিক চিন্তাধারা সমৃদ্ধ প্রবন্ধের মাধ্যমে ব্যক্ত করেননি, তিনি সংস্কৃত ভাষায় তাঁর খ্রিস্টবিশ্বাস ও ভক্তি প্রকাশ করে "বন্দে সচ্চিদান্দম" স্তোত্র-গীতি রচনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে পিতা, পুত্র ও আত্মার আরাধনা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন আদি উপনিষদ এবং শংকরাচার্য্যের (নবম শতাব্দির) রচনাতেও পৃথকভাবে সৎ-চিৎ-আনন্দ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে উপরোক্ত গ্রন্থাবলীতে সচ্চিদানন্দের অনুন্ধান করেছেন, তথাপি তিনি তাঁর উপলব্ধি ও বিশ্বাসকে 'নব্য-টমাসীয়' ঐশতত্ত্ব (neo-Thomism)-এর সাথে তুলনা কিংবা মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করেননি। তাঁর চিন্তা ও রচনায় স্বকীয়তা ও নতুনত্বই বরং প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর জীবন প্রবাহের সাথে সাথে তাঁর চিন্তা-চেতনার অগ্রগতি, পরিপক্কতা এবং সৃজনশীলতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিন শব্দকে এক করে 'সচ্চিদানন্দ' রূপে পিতা, পুত্র ও আত্মার পরম পবিত্র ত্রিত্বের একত্বে উপনীত হয়েছিলেন। এরূপে তিনি উপনিষদের 'অদ্বৈত' ও খ্রিস্টীয় 'ত্রিত্বের' ধারণা ও বিশ্বাসকে একটি বিন্দুতে মিলিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা তাঁর অকাল মৃত্যুতে থেমে যায়নি। পরবর্তীকালে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে ইউরোপীয় অনেক সাধকগণ পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় ঐশতত্ত্বকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ও জীবন-ধারার সাথে একাত্ম করার সফল প্রয়াস পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় বীড্ গ্রিফিত *(ব্রিটিশ, জন্ম : ডিসেম্বর ১৭, ১৯০৬, মৃত্যু : মে ১৩, ১৯৯৩, তামিল নাড়ু)* ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে The Cosmic Revelation: The Hindu way to God নামে বইতে সচ্চিদানন্দের ধারণা এবং অন্যান্য উপনিষদাবলীর শ্লোকের উল্লেখ করে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও "ভাষা"-র মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন সম্ভব এবং খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাসের যথার্থ সংস্কৃত্যায়নও সম্ভব। Don Henry le Seaux, OSB, *(ফ্রান্সের কাথলিক বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসী, জন্ম: আগষ্ট ৩০, ১৯১০, মৃত্যু : ডিসেম্বর ৭, ১৯৭৩)* ভারতে এসে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সাথে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার মিলনবন্ধন রচনা করেন এবং ভারতীয় রীতি অনুসরণ করে "স্বামী অভিষিক্তানন্দ" নাম গ্রহণ করে ভারতবর্ষের মানুষের কছে অপূর্ব ভাবে খ্রিস্টীয় সন্ন্যাস জীবনের সাক্ষ্য দান করেন। এ ছাড়া ফ্রান্সের অপর এক কাথলিক যাজক, জ্যুল মন্‌শেন (Jules Monchanin, 1895-1957) যিনি একইভাবে ভারতে এসে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আবহে নিজেকে খাপ-খাইয়ে "স্বামী পরমারূব্যানন্দ" নাম গ্রহণ করে তামিল নাড়ুর ত্রিচিতে ভারতীয় আদলে খ্রিস্টীয় আশ্রমিক জীবনকে পরিচিত করে তোলেন। স্থানীয়দের মধ্যে যাঁর নাম উল্লেখ না করলে নয়, তিনি হলেন বন্দনা মাতাজী। তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ের একটি পার্শী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পার্শী নাম ছিল গুল দাহ্‌ল্লা ('যে গোলাপ গান করে')। তিনি মুম্বাইয়ের Sophia College-এ অধ্যয়ন করেন এবং এই সময়ই তাঁর মধ্যে খ্রিস্টানুরাগ প্রকাশ প্রায়। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় : "she had fallen in love with the Lord Jesus, whom she found a fantastic figure of personal integrity and courage to born of incomprehensible love"– যার ফলে তিনি গুল দাহ্‌ল্লা থেকে 'বন্দনা মাতাজি' নামে কাথলিক সন্ন্যাসিনী হয়ে ওঠেন। তিনি স্বামী অভিষিক্তানন্দের সান্নিধ্যে এসে খ্রিস্টীয় -ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন হন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের রচনাবলীর ভাষ্য রচনা করেন।

এঁরা বিদেশী হয়েও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কিভাবে খ্রিস্টীয় জীবন, দর্শন ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে ইউরোপীয় মোড়ক থেকে মুক্ত করে ভারতীয় আঙ্গিকে ভারতবর্ষের খ্রিস্টবিশ্বাসী ও অপরাপর ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে সহজতরভাবে সমাদৃত করে তোলা যায়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সমকালীর অন্যান্য যে সকল বাঙালি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁরা একাধারে মনে-প্রাণে বাঙালীত্ব, আত্মপরিচয় এবং খাঁটি দেশপ্রেম নিয়েই খ্রিস্টবিশ্বাসের অনুশীলন ও প্রচার করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্তত আরো চার জনের কথা স্মরণ করা যায়, তাঁরা হলে : কেশব চন্দ্র সেন, কালী চরণ বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চরণ বন্দোপাধ্যায়, এবং কালী চরণ চট্টোপাধ্যায়। এঁরাও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতোই বাঙালীত্ব বজায় রেখে এক একজন খাঁটি খ্রিস্টান ও খ্রিস্টবিশ্বাসের শিক্ষক ও প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সবাই কাথলিক না হলেও তাঁদের মধ্যে যে বিষয়গুলোতে মিল প্রত্যক্ষ করা যায় তা হলো : তাঁরা ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালী খ্রিস্টবিশ্বাসে দীক্ষিত হওয়ার কারণে তাঁরা ইউরোপীয় 'চিন্তাধারা' গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয়ত, তাঁরা জন্মগত আত্মপরিচয় বজায় রেখেছেন। তৃতীয়ত, তাঁদের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান স্বরূপ তাঁরা পাশ্চাত্য দর্শন বা ঐশতত্ব নয়; বরং ভারতীয় দর্শন বা চিন্তা-ধারা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়েই খ্রিস্টবিশ্বাস ও ঐশতত্ত্ব ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরার সাধনা করেন।

'ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায়' থেকে 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' হয়ে ওঠা চরিত্রটির মধ্যে আমরা সংস্কৃত্যায়নের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষালাভ করি। প্রথমত, আমাদের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত্যায়ন সম্পর্কে সকীর্ণ ধারণা রয়েছে। সংস্কৃত্যায়নকে জীবনের সামগ্রিকতা থেকে পৃথক করে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে (যেমন, উপাসনা) দেখার এক ধরণের compartmentalize করার মত প্রবণতা আছে। অর্থাৎ জীবনের অন্যান্য দিকগুলোকে পৃথক রেখে শুধু উপাসনার ক্ষেত্রে 'বাঙালী সংস্কৃতি', বিভিন্ন 'আদিবাসী সংস্কৃতি'–ইত্যাদির কথা চিন্তা করা। সংস্কৃত্যায়ণের প্রকৃত ও গভীরতর বিষয়গুলো (সম্ভবত চ্যালেঞ্জপূর্ণ বলে) এড়িয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির কিছু কিছু উপাদান উপাসনার মধ্যে যুক্ত করে দেওয়াকেই অনেকে সংস্কৃত্যায়ন বলে মনে করেন, এতে খ্রিস্টীয় এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাথলিক বিশ্বাস বা ঐশতত্ত্বের সাথে মিল থাকুক আর না থাকুক তা বিবেচনা না করেই এরূপ করা হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, উপাসনায় আমরা যা করি আর যা বলি তার মাধ্যমে অপরিবর্তিত বিশ্বাস ও অখণ্ড ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দান করি *(দ্রঃ রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকা, অরতরণিকা)*। এজন্য উপাসনায় সংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে পরিবর্তন, খর্ব, কিংবা খণ্ডিত করে ফেললে মণ্ডলীর অস্তিত্বের সংশয় সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়ত, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত "বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা"-য় বাংলাদেশের সার্বিক বাস্তবতা ('উদ্বেগজনক যুগলক্ষণ' এবং 'আশাব্যঞ্জক যুগলক্ষণ') পর্যালোচনা করে যে সকল "অগ্রাধিকার" চিহ্নিত করা হয়েছিল তার মধ্যে চতুর্থ অগ্রাধিকারটি হলো "খ্রিস্টের দেহধারণ ভিত্তিক সংস্কৃত্যায়ন"। এই অগ্রাধিকারটির মৌলিক শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা হল (১) খ্রিস্ট যেমন মানব দেহধারণের মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাই খ্রিস্ট অর্থাৎ মঙ্গলসমাচারকে মানব সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে হবে; (২) খ্রিস্ট যেমন মানব সংস্কৃতির মন্দতা ও পাপময়তাকে 'তিরস্কার' করেছেন, তেমনি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে যেসকল মন্দতাপূর্ণ দিকগুলো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে তা বর্জন করতে হবে; এবং (৩) খ্রিস্ট যেমন তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান দ্বারা জগতকে 'রূপান্তর' করেছেন, তেমনি সংস্কৃত্যায়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে মঙ্গলসমাচার, অর্থাৎ মঙ্গলসমাচারে বর্ণীত খ্রিস্টশিক্ষা দ্বারা মন্দতাপূর্ণ মানব সংস্কৃতির রূপান্তর করা। যারা সংস্কৃত্যায়নকে সংকীর্ণভাবে দেখেন, তারা মনে করেন উপাসনায় কোন বিশেষ মানব সংস্কৃতির (যা পাপ ও মন্দতাপূর্ণ) কিছু উপাদান 'সংস্থাপন' (jaxtaposition) করা। কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃত্যায়ন হল মানব-সংস্কৃতির মধ্যে মঙ্গলসমাচারের প্রবেশ (penetrate) এবং এর দ্বারা তাকে পরিশুদ্ধ, 'খ্রিস্টের মৃত্যুযন্ত্রনাভোগ ও পুনরুত্থান রহস্য' দ্বারা রূপান্তরিত (transform) করা এবং সেই সংস্কৃতিকে 'মুক্তিদায়ী' করে তোলার নিরবধি প্রচেষ্টা। খ্রিস্টের পরিত্রাণকার্য যেমন জীবনের অংশ বিশেষের জন্য নয়, বরং সামগ্রিক; তেমনি সংস্কৃত্যায়নও আংশিক, অর্থাৎ জীবনের দু-একটি দিকের বিষয় হবার কথা নয়, তা হতে হবে সামগ্রিক। যারা সংস্কৃত্যায়নকে সংকীর্ণ অর্থে শুধু উপাসনার ক্ষেত্রে দেখতে চেষ্টা করেন, তাদের অনেকের অবস্থাটা হলো চলনে-বলনে-পোশাকে, সামজিক-পারিবারিক, উৎসব-অনুষ্ঠানে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি বা 'লাইফ-স্টাইল' অনুসরণ করা, শুধু উপাসনার বেলায় দু-একটি জায়গায় সাংস্কৃতিক উপাদান কিংবা দু-একটি জিনিসপত্র ইত্যাদির সংযোজনকেই সংস্কৃত্যায়ন বলে মনে করেন। আমাদের দেশের কিছু বাঙালিকে যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি আর পয়লা বৈশাখের বাঙালী আখ্যা দেওয়া হয়, আমাদের সংস্কৃত্যায়ন প্রচেষ্টা অনেকটা যেন তাই! আমাদের মণ্ডলী চিন্তাধারা ও মিশনকর্মের দিক দিয়ে এখনও 'বিদেশী', 'দাতা সংস্থা মডেল' বা 'অনুদান নির্ভর' রয়ে গেছে, খাঁটি অর্থে দেশীয় হয়ে উঠতে পারছে না! এর একটি কারণ হলো আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কেশব চন্দ্র সেন, কিংবা বন্দনা মাতাজির মতো লোকদের চিনি না, তাদের মতো ভারতীয় বা বাঙালী খ্রিস্টান হওয়ার চেষ্টা করছি না, ব্রহ্মবান্ধবের মতো "a Church with a truly Indian face" গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখারও সাহস করছি না।

তৃতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দির প্রাক্কালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিগণ অত্যন্ত দৃঢ় চিত্তে এবং তৎকালীন British Raj-এর শাসন-শোষণ ও কাথলিক মণ্ডলীর কঠোর রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে বাঙালি আত্মপরিচয়, স্বদেশী ভাবধারা ও স্বদেশ প্রেম, ভারতীয় শাস্ত্র, দর্শন ও ঐশতাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনা এই সব কিছু বিসর্জন না দিয়ে বরং এগুলোর মধ্যেই "বাঙালি খ্রিস্টান" হওয়ার, খ্রিস্টবিশ্বাসের অনুশীলন ও প্রচারের দুঃসাহসিক কাজ তাঁরা করতে পেরেছিলেন। তাঁদের জীবনাদর্শ ও কাজ (বিশেষত লেখনী) থেকে প্রকৃত সংস্কৃত্যায়নের স্বরূপ, অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশ লাভ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা জরুরী তা হলো : দেশীয় ভাবধারায় ও ভাষায় খ্রিস্টীয় ঐশতত্ত্বের গবেষণা ও চর্চা। গোটা এশীয় মণ্ডলীর জন্য Peter C. Phan যেমন In Our Own Tongues I Asian Face of Christianity গ্রন্থে এশীয় বাস্তবতায়, এশীয় ভাবধারায় বাণী-প্রচার, ঐশতত্ত্বের চর্চা ও শিক্ষাদান, এশীয় মণ্ডলীকে খাঁটি এশীয় অবয়ব দান করার কাজ করেছেন এরূপ গবেষণামূলক কাজ বর্তমান মণ্ডলীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। অপরদিকে, ভারতীয় ঐশতত্ত্ববিদ Michael Amoaladoss, SJ-এর The Asian Jesus (Orbis Books, 2006), শ্রীলংকার Tissa Balasuryia, OMI-Gi Eucharist and Human Liberation (Orbis Books, 1977)-এর মত রচনায় এশীয় এবং ভারতীয় আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় খ্রিস্ট ও তাঁর শিক্ষা নিজস্ব বাস্তবতার মধ্যে তুলে ধরার মতো Doing Local Theology (Clemens Sedmak, Orbis, New York, 2002) অর্থাৎ 'স্থানীয় ঐশতত্ত্ব চর্চা' ব্যতিত সংস্কৃত্যায়নের সংকীর্ণ ও "দেখা-দেখি" কিংবা "অনুকরণ-নির্ভর" অনুশীলন সংস্কৃত্যায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন না করে বরং অন্য ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে যেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তেমনি কাথলিক ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও কাথলিক বিশ্বাস ও ঐশতাত্ত্বিক মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি করে। আমরা অন্তত এইটুকু বিবেচনায় রাখতে পারি যে, যে-সংকীর্ণ অর্থের সংস্কৃত্যায়নের কথা উল্লেখ করছি তার কারণে উপাসনাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো ভাবা এবং এতে সংস্কৃতিগত কিছু উপাদান জোড়াতালি দিতে গিয়ে উপাসনাকে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'-এ পরিণত করার প্রবণতা প্রকৃত সংস্কৃত্যায়ণ নয়। এর যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। প্রধান কারণটি হল: "প্রার্থনার বিধান হল বিশ্বাসের বিধান" *(দ্রঃ Lex orandi, lex credendi, 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা', ধারা ১১২৪, ১১২৫)*। আবার, "কোন যাজক বা জনগণের ইচ্ছামত কোন সংস্কার-অনুষ্ঠান পরিবর্তন করা কিংবা কারও স্বার্থে সুবিধাজনক করে নেওয়া যাবে না। এমনকি খ্রিস্টমণ্ডলীর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও যেন যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন না করেন; শুধুমাত্র উপাসনা-অনুষ্ঠানের রহস্যের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যের করণে তিনি পরিবর্তন সাধন করতে পারেন" *(একই গ্রন্থের ধারা ১১২৫)*। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান-এর ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে উপাসনার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতিমালায় বলা হয়েছে: প্রথমত, "পুণ্য উপাসনার নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে একমাত্র মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ প্রৈরিতিক আসনের উপর এবং আইনগত নির্দেশ অনুযায়ী বিশপের উপর।" দ্বিতীয়ত, "আইন-প্রদত্ত ক্ষমতাগুণে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উপাসনার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের আইনগত অধিকার সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার বিশপ-সম্মিলনীর হাতেও তা রয়েছে।" এবং তৃতীয়ত, "অতএব অন্য কেউ, এমনকি পুরোহিতও নিজ ক্ষমতায় উপাসনার কোন কিছু যোগ, বিয়োগ, বা পরিবর্তন করতে পারেন না।"

এজন্য ঔপাসনিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ব্যতীত এবং বিধানিক কর্তৃপক্ষ ব্যতীত, যে-কেউ উপাসনার সংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে দু'টি প্রধান জায়গায় ক্ষতি করে ফেলতে পারেন, তা হল: 'অপরিবর্তিত বিশ্বাস' বা unchanged faith, এবং কাথলিক মণ্ডলীর 'অখণ্ড ঐতিহ্য' বা undivided tradition *(দ্রঃ রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশসমূহ, অবতরণিকা নং ২-৯)*।

উপরোক্ত বিষয়টি স্পষ্টতর করার জন্য আমরা স্মরণ করতে পারি যে, বাংলাদেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশের এতদঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনাদি বহু ভারতবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি; বরং তাদের কাছে অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো–

"যিশুখ্রিস্ট এক মহান মনীষী ছিলেন। এমন একজন ব্যক্তি যিনি মনে হয়, নিজের শক্তিবলে অন্য কাহারও সাহায্য বিনা কিছু বিদ্যাজ্ঞান পেয়েছিলেন; যদিও এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না কিন্তু যেসব লেখক তাঁর কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করেছিল তারা তাঁর সর্বাপেক্ষা গূঢ় কথাগুলিকে নিতান্তই ভুল বুঝেছিল। যেমন, তিনি যে বলেছিলেন, "আমি ও আমার পিতা এক", তাতে এই গভীর সত্য প্রকাশিত হয়েছিল যে মানবাত্মা ও ভগবত আত্মা অভিন্ন, কিন্তু তারা ভেবেছিল যে তিনি যে এই দাবী করেছিলেন যে তিনি ভগবান; আর এই জন্যই কুমারী মারীয়া ও তা থেকে অন্যসব অলৌকিক উপাখ্যান এসেছে। আমরা সকলেই শেষ নৈশভোজের কাহিনী জানি এবং রুটি ভেঙে শিষ্যদের মদ্য বিতরণের সময় তিনি যে অত্যাশ্চর্যজনক অর্থগর্ভ উক্তি করেছিলেন, "ইহা আমার দেহ ও ইহা আমার রক্ত", তা-ও আমরা জানি; এবং যিশুর প্রাণদানস্মারক ভেজের (Eucharist) যে প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান এবং ইহার উপর রোমান কাথলিক সম্প্রদায় যে "যীশুর রক্তমাংসে পরিবর্তনের" (Transsubstantiation) তত্ত্ব

প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা-ও জানি। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে যিশুর কথা সর্বদাই অর্থবহ ছিল আর সাধারণত সে অর্থ সত্য ও সুন্দর। অপরপক্ষে "যিশুর রক্তমাংসে পরিবর্তনের" তত্ত্বটি কাথলিকরা নিজেরাই বোঝে না, তাদের কাছে ইহা এক "রহস্য"। কিন্তু প্রাচ্য বুদ্ধির কাছে ইহার অর্থ কত সরল। জড়ের জৈবনিক, বিশ্বের অন্নকোষ যার অর্ন্তগত হল রুটি ও মদ্য পরিণত হয় ভগবানের রক্ত ও দেহে আর ইহাতে সেই আদি মহান যজ্ঞ সূচিত হয়। যার দ্বারা ভগবান নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করলেন যাতে জগৎ বাঁচতে পারে। অনন্তকে শান্ত হতে হবে, নিরুপাধিককে নিজেকে উপাধিযুক্ত করতে হবে, চিৎ-পুরুষকে বিকশিত করতে হবে। যে রুটি ও মদ্য খ্রিস্টের নৈশ ভোজ উৎসবে খাদ্যগ্রাহক খায় তার মধ্যে সত্যই ভগবান আছেন কিন্তু তিনি আমাদের চেতনায় উপস্থিত নন, আর বিশ্বাসের ঐ ক্রিয়ার দ্বারাই তিনি শুধু ঐরূপ উপস্থিত হন (এখানে আমাদের চেতনার কাছে); ইহা-ই "যিশুর রক্তমাংসে পরিবর্তনের: তত্ত্বের সমগ্র অর্থ। কেননা উপনিষদ বলে, আমাদের প্রথম ভগবানে বিশ্বাস করা চাই তবে যদি আমরা পরে তাঁকে জানতে পারি; প্রথমে তাঁকে উপলব্ধি করা চাই "তিনি আছেন" বলে, তবেই তাঁকে স্বরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে" *(শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, উপনিষদাবলী, উপনিষদসমূহের দার্শনিক তত্ত্ব, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১৯৭২)*।

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারছি যে, ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ খ্রিস্টবিশ্বাস, খ্রিস্টীয় ঐশতত্ত্ব এবং খ্রিস্টীয় ঔপাসনিক বিষয়াদি অগ্রাহ্য করেননি, কিংবা এর নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারেনি তাও নয়; বরং তাঁরা তা বোঝার চেষ্টা করেছেন ভারতীয় দার্শনিক বা ঐশতাত্ত্বিক ভাষা ও Indian pattern of understanding-এর মধ্য দিয়ে। এজন্যই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, নিজে ভারতীয় ভাবধারায় খ্রিস্টান সন্ন্যাসী-সুলভ জীবনযাপন করেছেন, এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় ভাষায় খ্রিস্টধর্মের 'তত্ত্ব' (বা doctrine) ভারতীয় জনগণের বোধগম্যতার ধরণ অনুযায়ী প্রচার করেছিলেন। আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীতেও ঐশতাত্ত্বিক চর্চা, প্রচার ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে "স্থানীয় ঐশতত্ত্ব চর্চা" একান্ত প্রয়োজন এবং তা করতে হবে "আমাদের নিজেদের ভাষায়", আর এটা ব্যতিত আমাদের সংস্কৃত্যায়ন চর্চা শুধুই বাহ্যিক ও সংকীর্ণ থেকে যাবে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে। একদিকে তৎকালীন রক্ষণশীল মণ্ডলী তাঁকে অস্বীকার করে এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে দিকে তাঁর ঐশতাত্ত্বিক রচনা ও প্রকাশের কাজ প্রায় বন্ধ করে দেয়। এই সময় তিনি দেশপ্রেমিক হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি 'সন্ধ্যা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে 'স্বরাজ' নামে অপর একটি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ শাসকগণ রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে। বিচারে তাঁর রচনাগুলোকে "উস্কানিমূলক" আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন (২৬ অক্টোবর, ১৯০৭ খ্রী.) তিনি বলেছিলেন, "আমি বন্দী হিসাবে কাজ করার জন্য ফেরিংগির কারাগারে যাবো না... তারা আমাকে জেলে পাঠাবে, কিন্তু আমি কিছুতেই তাদের কাজ করব না– আমার ডাক এসে গেছে!" এই কথাটি সত্য হল ঠিক তারপরের দিন। বিচারকালীন সময়ে তিনি তাঁর পেটে তীব্র ব্যথার কথা জানালে তাঁকে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, আর সেখানেই ২৭ অক্টোবর, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হার্নিয়া অপারেশনের সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায়, থিওফিলাস, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লেখার কোন উপসংহার নেই! এই বাঙালী, ব্রাহ্মণ ও কাথলিক, শিক্ষক, ঐশতত্ত্ববিদ ও সংগ্রামী দেশপ্রেমিক, যিনি এদেশে একটি খাঁটি দেশীয় মণ্ডলী গড়ে তোলার স্বপ্নদ্রষ্টা, তিনি বহু বাঙালী এবং বাংলাদেশী খ্রিস্টবিশ্বাসীর হৃদয়ে প্রকৃত সংস্কৃত্যায়ন চর্চার অনুপ্রেরণা রূপে বেঁচে থাকবেন অনেক অনেক প্রজন্ম ধরে!

দ্রষ্টব্য: কিছু কিছু উদ্ধৃতাংশে বানান রীতি ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো মূল রচনার প্রতি আনুগত্য, ইচ্ছাকৃত কিংবা অসচেতনতা বশত ভ্রান্তি নয়।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. K.P. Aleaz, Trinity as Sat-Chit-Ananda in the Thoughts of the Indian Theologian Brahmabandav Upadhyaya, in Kurien Kunnumpuram, SJ, Edt., Jnanadeepa, Vol. 11, No. 1, Bangalore, January 2008

২. Antony Kalliath, Brahmabandhab Upadhyay, An Evoking Parable of Christian Vocation, in Fr. Cleophas D. Fernandes, Edt., Word & Worship, NBCLC, Bangalore, 2007

৩. Julias Lipner, Brahmabandhab Uadhyay,The Life and Thought of a Revolutionary, Oxford University Press, Delhi, 1999

৪. শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, উপনিষদাবলী, উপনিষদসমূহের দার্শনিক তত্ত্ব, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১৯৭২ খ্রী.

৫. কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা, সিবিসিবি, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী.

৬. ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা, (সম্পাদিত), দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল সমূহ, সিবিসিবি, ১৯৯০ খ্রী.

৭. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, সিবিসিবি, ঢাকা, ২০০০ খ্রী.

বড়দিন

শ্রাবন নিকোলাস কস্তা

বড়দিন বড়দিন বড়দিন
শিশু যিশু আসে আমাদের কাছে
মুক্তিদাতাকে পেয়ে হৃদয় মন যেন হাসে।
তুমি আছ আমাদের হৃদয় মাঝে
মহাদূত গাব্রিয়েলের কথা যেন
মারীয়ার কানে ভাসে।
আকাশেতে দেখা দিল সেই তারা
পৃথিবীতে পড়ল শিশুযিশুর সাড়া।
শীতের মাঝে জন্ম নিলো শিশু
সে যে আমাদেরই ছোট্ট শিশুযিশু।
পণ্ডিতেরা এলো গহীন পথে
তারা ভরা আকাশ ছিল তাদের সাথে।
রাখালেরা যখন শুনলো শিশুযিশুর কথা
ঘুঁচে গেলো তাদের মনের সকল ব্যথা
মারীয়ার কোলে এক ছোট্ট শিশু
সে যে আমাদের পরিত্রাতা যিশু।
পণ্ডিতেরা দিল শিশুকে সোনা,
ধূপ ও ধুনো।
স্বর্গদূতেরা বললো "তোমরা সবাই শোন"
সবাই দিলো স্বর্গ-দূতদের ডাকে সাঁড়া
যোসেফ যেন আনন্দে আত্মহারা।
শিশুযিশুই আমাদের ধরণীতে এনেছেন মুক্তি
পণ্ডিতদের কথায় ছিলো অধিক যুক্তি।
মা-মারীয়ার কাছে সবাই ছিলো বসে
মুক্তিদাতা এলো দীন বেশে।
পৃথিবী হলো শিশু যিশুর আলোয় আলোকিত
মানুষ হলো অন্ধকার মুক্ত
শিশু যিশুতেই আমাদের জীবন যুক্ত
তিনি আমাদের মুক্তিদাতা
আমাদের সকলের পরিত্রাতা।

পরিবারে সিনোডালিটি চর্চা

প্যানক্রাসিয়াস দীপু কোড়াইয়া এবং রীতা রোজলীন কস্তা

সিনড আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিলো সকলে মিলে এক নব জীবনের সূচনা করা। যে জীবনধারা হবে মিলনধর্মী মণ্ডলীর ঐক্য প্রচেষ্টা বাড়িয়ে, অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ও প্রেরণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। ২০২১ থেকে ২০২৪ দীর্ঘ চার বছর ধরে বিশ্বের সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী অন্যদের সাথে একত্রে মিলিত হয়ে এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। এই সিনোডাল যাত্রা যা আমরা পরিবারের সাথে প্রথমে শুরু করি, যেখানে আমরা নিজেদেরকে একে অপরের কাছে উন্মুক্ত করি, একে অন্যের কথা শুনি এবং মন খুলে কথা বলি, একে অন্যের আবেগকে উপলব্ধি করি, মতামতকে গ্রহণ করি এবং একসাথে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করি।

আমাদের পরিবারগুলো মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সামাজিক উত্থান-পতনের চ্যালেঞ্জের ফলে বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন। আমরা এখন পরিবারের চাইতে বেশী হয়ে গেছি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমাদের যত কাজকর্ম, পরিকল্পনা সবকিছুই করে থাকি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। ফলস্বরূপ, পরিবারগুলোর পারিবারিক বন্ধনও এখন ঝুঁকিতে। আজকে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান এর সূচনা এবং অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা মণ্ডলীতে বলা হচ্ছে, কেননা পরিবার হচ্ছে গৃহমণ্ডলী। পরিবারের পরিচর্যার মাধ্যমেই সম্ভব হবে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

একইভাবে, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এক মণ্ডলী হিসাবে এই যাত্রায় আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মাকে একটি পরিবার হিসাবে আমাদের চলার পথে আমাদের গাইড করার অনুমতি দিতে হবে। আমরা প্রায়শই বুঝতে পারি না যে যিশু আমাদের সাথে সাথে একই পথে হাঁটছেন এবং সবসময় আমাদের যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হচ্ছেন।

আমরা পরিবারে কিভাবে সিনোডালিটি চর্চা করেছি এবং করছি তা নিয়ে আমাদের স্বামী স্ত্রী দুজনকে সহভাগিতা করতে বলা হয়েছে। আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, কিভাবে আমরা দু'জনে আমাদের পরিবারে এই বিষয়টি দেখেছি এবং তা চর্চা করেছি মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণে। আমরা যা করেছি এবং আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য আমরা আরও কি করতে পারি তা কিছু সহভাগিতা করব।

আমরা দু'জনে একসাথে আমাদের বিবাহিত জীবনের তরীটি প্রায় ৩৮ বছর ধরে বেয়ে চলেছি এবং জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পার করেছি। সংসার বাগানে আমরা দু'জনে ঈশ্বরের আর্শীবাদ হিসাবে আমাদের তিন কন্যাকে পেয়েছি এবং একজন মেয়ের জামাই পেয়েছি। দু'জনে মিলে পেয়েছি বাবা, মা ও শ্বশুর-শাশুড়িসহ ১৩ জন ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন । এদের সবাইকে নিয়ে আমরা দু'জনে একত্রে আমাদের পরিবার জীবনের পথ চলেছি এবং সিনড যাত্রার এই আহ্বানে আমরা দু'জনে সংলাপের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছি যে, সিনড এর চর্চা এটি একটি জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া যা একবারে বা একদিনে শেষ হবে না। আসলে এটি এমন একটি জীবনযাপন, যার ভিত্তি খ্রিস্টের জীবনাদর্শে, যার নেতৃত্ব আসে পবিত্র আত্মা হতে। এই ধরনের জীবনযাপন ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরবের জন্যে। এই জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় রয়েছে: প্রার্থনা, অনুধ্যান, আত্ম-সমালোচনা, আত্মসমর্পণ, অন্যের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে আমন্ত্রণ জানানো ও নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণভাবে সংলাপ করা। এই সংলাপ হবে সুচিন্তিতভাবে অন্যের অবস্থা জানার ও প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য। এবং এই সংলাপের সর্বোত্তম উপায় হলো অংশগ্রহণমূলক আলোচনা। অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় আমরা একে অন্যের বিশ্বাস, মতামত, আদর্শ, চিন্তাধারা ইত্যাদি জানতে পারি। আমরা যখন ভিন্ন বিশ্বাস ও ভিন্ন মতের মানুষের সাথে সংলাপ করি, তখন আমাদের সুযোগ হয় একসাথে বসার, একে অপরকে জানার, ঐক্য বাড়াবার, সম্প্রীতি গড়ার। এমন কী ঈশ্বর নিজে কখনো কখনো তাদের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেন যাদের আমরা দূরে রাখি, আলোচনায় ডাকি না, গুরুত্বপূর্ণ ভাবি না, সবকিছু থেকে বাদ দিয়ে রাখি।

আমরা দু'জনে আমাদের পরিবারের সিনোডাল যাত্রায় যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে অনুসরণ করছি তার মধ্যে অন্যতম হলো যত ব্যস্ততাই থাকুক আমরা দু'জনে বাড়িতে একসাথে প্রার্থনা করি এবং সন্তানদের উৎসাহিত করি আমাদের সাথে প্রার্থনায় যোগ দিতে। এছাড়া অন্যান্য প্রার্থনা অনুষ্ঠানগুলোতেও যথাসম্ভব চেষ্টা করি অংশগ্রহণ করতে।

পারিবারিক মিলন, পরিবার হল মিলনের এমন একটি স্থান যেখানে আনন্দ করা যায়, দুঃখ সহভাগিতা করা যায়, একসাথে ভাল ও সুন্দর সময় কাটানো এবং একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করা যায়। আমরা মনে করি যে, যখন আমরা পরিবারের সদস্যদের সাথে আমাদের চিন্তা ভাবনা, নিজেদের কথা ও ঘটনা ইত্যাদি শেয়ার করি তখন আমরা জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো উপভোগ করি । আমরা দু'জনে এই সুন্দর সময়গুলো পাওয়ার জন্য দু'জনে মিলে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে চিন্তা করি এবং তাদের কী করে খুশি করা যায় ও তাদের ভালো রাখা যায় তার উপায়গুলো খুঁজে বের করি। মাঝে মাঝে তারা পছন্দ করবে এমন কিছু দিয়ে তাদের অবাক করার চেষ্টা করি। এগুলো আমরা করি যাতে পরিবারে অন্য সদস্যরা আমাদের এই আচরণগুলো দেখে শিখে এবং সবকিছুতে সক্রিয়ভাবে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে। আমরা দেখেছি প্রথমে অনিচ্ছুক হলেও, সময়ের সাথে সাথে, তারা এটি অনুসরণ করেছে এবং আমাদেরকে খুশি করতে তারা আমাদের জন্য কী করতে পারে তা নিয়ে ভাবে।

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ৪৯ তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের জন্য তার বার্তায় বলেছিলেন যে, "মিলন আমাদেরকে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতা তৈরি করতে সাহায্য করে। যখন আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে একে অপরকে গ্রহণ করে দূরত্ব কমিয়ে ফেলি, তখন আমরা কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ অনুভব করি।" সত্যিই মিলনের জন্য ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রয়োজন। আমরা আমাদের পরিবার জীবনে এই বিষয়টিকে মেনে চলি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশিদের সাথে যথাসম্ভব যোগাযোগ রাখি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও বলি তারা যোগযোগটি যেন বজায় রাখে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বিশেষ দিন এর যে কর্মসূচি থাকে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করি, তাদের বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনে সহযোগিতা করি এবং এ ক্ষেত্রে আমরা স্বামী স্ত্রী একজন আর একজনকে সহযোগিতা করি। পরিবারে আমাদের নিজেদের এবং সন্তানদের বিশেষ দিনগুলো উদ্‌যাপন করি। সবসময় অন্যদের সাথে ভাল যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি, আমরা খোলাভাবে অন্যদের গ্রহণ করি এবং অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে মিলন সমাজ গঠনে অবদান রাখতে চাই। গির্জায় নিয়মিত যোগদানের মাধ্যমে যিশুর সাথে ও অন্যান্য ভাইবোনদের সাথে মিলিত হওয়ার সুন্দর সুযোগ সৃষ্টি হয়, সেটি আমরা সবসময়ই ব্যবহার করি আর নিয়মিতভাবে রবিবাসরীয়

ও অন্যান্য উপাসনায় যোগদান করি। আর আমরা বিশ্বাস করি এভাবেই মিলন সেতু তৈরি হয়।

দম্পতি হিসাবে আমাদের মধ্যে ঐক্য এবং মিলনকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা সর্বদা সব বিষয়ে হয়ত একমত ছিলাম না। অনেক সময়, আচরণগত সমস্যার কারণে ভিন্ন মতাদর্শের কারণে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। পরিবারের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ও মতামতের পার্থক্য নিয়ে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে, দূরত্ব তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা তা বেশীদূর বাড়তে দেইনি। আমরা নিজেদের মধ্যে সংলাপ করেছি এবং দূরত্ব ঘুচিয়েছি। আমাদের জীবনে চ্যালেঞ্জগুলো আরও জটিল হয়ে উঠলে, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপর আরও বেশি নির্ভর করতে শিখেছি। আমরা যদি আমাদের সময়মত বুঝতে পারতাম, তাহলে আমরা আমাদের পরিবারের জন্য পবিত্র আত্মার ইচ্ছাকে বোঝার বিষয়ে প্রথম থেকেই আরও বেশি আগ্রহী হতাম। তবে এখন আমরা আমাদের একতা বজায় রেখে পরিবারে মিলনের উপর গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি ও কাজ করি।

আমাদের তিন কন্যার মধ্যে দু'জন দেশের বাইরে একজন আমাদের সাথে থাকে। আমরা তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে সম্মান করি। তাদেরকে পরিবারে সকল কিছুতে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করি। পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সকল বিষয়ে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করি ও আলোচনা করার জন্য উন্মুক্ত থাকি এবং তারা সকল আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে আমরা তাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের অধিকার এবং দায়িত্ব বজায় রাখি পিতামাতা হিসাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। তারা আমাদের মতামতকে সম্মান করে। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো সমস্ত সদস্যের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম স্বার্থে হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আজকের ব্যস্ত পৃথিবীতে পরিবারের ও আত্মীয়স্বজনের জন্য একসাথে থাকার জন্য সময় বের করা কঠিন হয়ে পরে। কিন্তু পারিবারিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানগুলোতে পরিবারগুলোকে একত্রিত হওয়ার এবং একে অপরকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট উপায় হতে পারে। একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান হলো এমন একটি উপায় যা একটি পরিবারকে একত্রিত করার জন্য অন্যতম। এটা হতে পারে একসাথে খাওয়া দাওয়া করা, একসাথে ছুটি উদ্‌যাপন করা, একসাথে গির্জায় যাওয়া বা একসাথে বেড়াতে যাওয়া। আমরা মনে করি পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানগুলো পরিবার হিসাবে আমাকে এবং আমাদের দায়িত্বগুলো কি তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে পরিবারের জন্য একত্রিত হওয়ার, একে অপরের সাথে অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করে নেওয়ার এবং একে অপরের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার সুযোগ ও সময় করে দেয়।

আমরা চেষ্টা করেছি অন্যদের সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে। পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি প্রায়শই শুরু হয় যখন একজন অনুভব করে যে তার মতামত সবচেয়ে বেশী গুরত্বপূর্ণ এবং সবারই উচিত তার মতামতটিকে গুরুত্ব দেয়া কারণ এটিই একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা দু'জনে পরিবারে শান্তি রক্ষার উদ্দেশে নিজের মতামতটি কেন সঠিক সেটি না দেখে চেষ্টা করি অন্যের মতামতটির প্রতি দৃষ্টিপাত করার এবং বুঝতে যে পরিবারের অন্য সদস্যদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবারের জন্য মঙ্গলজনক। তখন একে অপরের প্রতি নেতিবাচক চিন্তা না করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। একে অপরের কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং শুধু নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অন্যের স্বার্থের দিকে দেখার চেষ্টা করি এবং তাই হওয়া উচিত। কিন্তু সবসময় হয়তো তা হয়ে উঠে না তাও চর্চা করি।

'সিনড' এর সকল আলোচনায় এবং সমাপনীতেও নারীদের অবদান ও অংশগ্রহণের বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। আমরা আমাদের পরিবারে কাজে, আলোচনায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও কন্যা শিশুর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। নারী বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করি।

'সিনড' এর আলোচনায় শোনা বিষয়টিকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আমরা যেন একে অন্যের কথা মন দিয়ে শুনি। আমাদের মধ্যে এমন হয়েছে যে আমরা একজন কথা বেশি বলি এবং শুনি কম এবং একজন খুব কম কথা বলি। এখন আমরা চেষ্টা করি একে অন্যের কথা মন দিয়ে শুনতে এবং না শুনে কোন কিছু বিচার না করতে। যখন আমরা বেশী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি তখন অনেক সময় আমাদের কাজ এবং কথাগুলোর সহজেই ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বা উদ্দেশ্যগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সে কারণেই মনোযোগ সহকারে শুনতে শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । খোলা মনে এবং কোনো পক্ষপাতদুষ্টতা ছাড়াই অন্যের কথা শুনতে হবে এবং যে বলছে তার বা তাদের অনুভূতিকে মূল্যায়ন করতে হবে। এভাবে শোনার ফলে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং একে অপরের মতামতকে সম্মান করা সম্ভব।

আমাদের আচরণের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সংযত হতে হবে। ছেলেমেয়েদের সামনে লড়াই করা যাবে না কিন্তু যদি আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদেরকে মারামারি করতে এবং তর্ক করতে দেখে তাহলে আমাদের তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং বলতে হবে যে, "আমরা দুঃখিত, যে তোমাদেরকে এরকম একটি পরিস্থিতি দেখতে হয়েছে। বাবা-মা হিসাবে আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত এবং আমাদের মধ্যে শুধু একটু মতবিরোধ ছিল, কিন্তু এখন সবকিছু ঠিক আছে।"এর ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাবে এবং তারা অপরকে সম্মান করতে ও মর্যাদা দিতে শিখবে। আমরা যাতে সংযতভাবে আচরণ করি সেদিকে খেয়াল রাখি।

আমরা এখন এমন কাজ করি যাতে পরিবারকে বেশী করে সময় দিতে পারি এবং অন্যদেরকেও বলি যে খুব বেশি কাজ করবেন না এবং আপনি যদি সবসময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, দূরে থাকেন এবং আপনার সন্তানদের অগ্রাধিকার না দেন, সময় না দেন তাহলে আপনার সন্তানেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে এবং তারা বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে তারা যথেষ্ট মূল্যবান নয় বাবা মায়ের কাছে। তারা দূরে সরে যাবে এবং পারিবারিক মিলনের পরিবর্তে বিচ্ছেদ তৈরি হবে। আমরা চেষ্টা করে চলেছি আমাদের দু'জনের ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সন্তানদের মধ্যে মিলন, সহভাগিতা ও নৈতিকতার মানসিকতা গড়ে তুলতে। হয়তো পুরোপুরি সফল হতে পারিনি তবে চর্চা করে যাচ্ছি এবং প্রভু যিশুকে আমাদের কাণ্ডারী করেছি। পুণ্য পিতার ভাষায় বলি, "আসুন আমরা এই পথ ধরে আনন্দ এবং ধৈর্যের সাথে হাঁটি, নিজেদেরকে পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হতে দেই।" আমাদের পরিবার আমাদের শেখায় কিভাবে পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার দেখানো পথে কাজ করতে হয়। কিভাবে পরিবারে সকলকে ভালোবাসা এবং উষ্ণতা প্রদান করা উচিত, কিভাবে একে অন্যের সুখে দুঃখে অংশী হওয়া যায়, জীবনের কঠিনতম সময়গুলোর মধ্যে প্রিয়জনের সমর্থন যোগায়, মিলনের মাধ্যমে বন্ধনকে শক্তিশালী করে, একজন সুযোগ্য প্রেরিত করে গড়ে তুলে। আমরা আমাদের পরিবারকে ভালোবাসি, পরিবারে সকলে মিলে সারাটি জীবন ধরে আমাদের প্রতিটি জীবন আচরণে ঈশ্বরের বন্দনা করতে চাই। তাই, আমরা দু'জনে সামসংগীতের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের পাথেয় করেছি যে, "তোমার সকল নির্দেশবাণী, সেই তো আমার শাশ্বত সম্পদ, আমার প্রাণের মহা আনন্দ-ধন, মনে মনে পণ করেছি যে আমি, মেনেই চলব তোমার বিধিবিধান, মেনেই চলব আজীবন চিরকাল!"

জীবন দর্শন গন্তব্য সম্মুখে

দোলন যোসেফ গমেজ

জীবন কি আসলেই জীবনের নিয়মে চলে! নাকি চাইলেই এর গতিপথ পরিবর্তন করা সম্ভব। এই পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণ, প্রতিটি জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের জীবন বা অন্যের জীবনের মূল্য কতটুকু আমরা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আলাদা করে ভেবে দেখিনা। জীবন নিয়ে আমাদের ভাবনা গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যেখানে সামষ্টিক ভাবনার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থই বেশি প্রাধান্য পায়। বর্তমান পারিপার্শ্বিক চিত্র এবং ঘটনাগুলো যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন বেশি প্রাধান্য পায় তখন সামগ্রিকতা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। স্বার্থপরতা, অহংকার ও হিংসা আমাদের হৃদয়ে বাসা বাঁধে। আমরা যখন স্বার্থপর হয়ে উঠি তখন বৃহত্তর সমাজের স্বার্থ বাদ দিয়ে নিজের পরিবার বা অতি কাছের মানুষের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করি। পরবর্তীতে এক সময় সবকিছু সংকীর্ণ করে শুধু নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এতে করে আমরা সমাজ, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার হতে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকি। এভাবে একসময় একাকিত্বের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া বা ফাঁদে আটকে যাই। এই প্রক্রিয়ার চরম নেতিবাচক প্রভাব যেমন: ব্যক্তিগত জীবনে পড়ে ঠিক একইভাবে পড়ে অন্যদের জীবনেও। ব্যক্তি স্বার্থের সাথে যখন অহংকার ও হিংসা জুটি বাঁধে তার ফলাফল হয় ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর। এর অনেক উদাহরণ আমরা একটু চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাই।

বর্তমানে আমরা এক অস্থির সময় পার করছি। জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির এ যুগে এসে মানুষ যেন সাধ-সাধ্য ও চাওয়া-পাওয়ার হিসেব সঠিকভাবে মিলাতে পারছে না। আর এ হিসাব মিলাতে না পারার কারণেই বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতার প্রবণতা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে মানুষের অন্তরে বিস্তৃতি লাভ করছে হিংসা, ঘৃণা, প্রতিশোধ পরায়ণতা। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে নেমে আসছে হতাশা। ব্যক্তির জীবনে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। সে জীবনের জন্য বড় কোনো লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না। আবার তা অর্জন করার জন্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছে না। কোমলমতি শিশু, তরুণ ও যুবকরা এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার। কেউ যদি জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার চেষ্টা করে আমাদের সমাজ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা ভালোভাবে গ্রহণ করেনা। অনেক ক্ষেত্রে আবার নিরুৎসাহিত করে। এতে করে উদ্যমী ব্যক্তিরা ইচ্ছা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হন। এ কথা সত্যি নদী বা পুকুরের শান্ত জলে জাহাজ চালিয়ে দক্ষ নাবিক হওয়া যায় না। একজন দক্ষ নাবিককে অবশ্যই ঝড়-ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। সমতলে বাস করা লোকজনের চেয়ে পাহাড়ে বসবাসকারী লোকেরা বেশি শক্তিশালী, সাহসী এবং পরিশ্রমী হয়। এর অন্যতম কারণেই হচ্ছে এখানে প্রকৃতি ও জীবন পরিশ্রম ও কঠিনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এখানে প্রতিদিন যুদ্ধ করে জীবন টিকিয়ে রাখতে হয়। জীবনে উন্নতির বা সফলতার জন্য বৈধভাবে শর্টকাট কোন পদ্ধতি নেই। অর্থাৎ হয় ব্যক্তিকে কঠোর পরিশ্রমী বা সাধনা করতে হবে, না হয় সফলতার জন্য অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতা বা গুণের অধিকারী হতে হবে। যেকোনো অর্জন বা সফলতার পিছনে অনেক গল্প লুকানো থাকে। যা আপাতত সাদা দৃষ্টিতে দেখা যায় না বা অনুভব করা যায় না। কিন্তু সফল ব্যক্তিই জানে তার জীবনের অর্জনের পিছনে কত ত্যাগ-তিতিক্ষার গল্প ও ব্যর্থতার গল্প লুকিয়ে আছে। বেশিরভাগ সময়ে সেই গল্প আমরা শুনি না বা সেই গল্প শোনার প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ থাকেনা। অন্যের সফলতা দেখে যারা হিংসা বা আত্ম দহনে ভোগে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিক দৈন্যতা বা বিকারগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই সমস্ত ব্যক্তির রোষানলে পড়ে অনেক সময় সম্ভাবনাময় জীবন ও স্বপ্ন অংকুরেই নষ্ট হয়ে যায়। শুধুমাত্র লক্ষ্যে অটুট ব্যক্তিরাই এই বাধা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

একথা সত্যি যে প্রতিটি মানুষের জীবন দর্শন আলাদা। আর এই জীবন দর্শন নির্ভর করে ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকতার উপর। যেখানে আর্থসামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ যুগে কেউ চাইলেই একা চলতে পারে না বা কেউ যদি একান্ত নিরিবিলি নিভৃত জীবনযাপন করতে চায়, অনেক ক্ষেত্রে তা প্রায়ই অসম্ভব। কারণ এক শ্রেণীর লোক আছে যারা অন্যের জীবনের সুখ শান্তির বিষয়টাকে সহজে মেনে নিতে পারে না এবং কোনো কারণ ছাড়াই এ শ্রেণীর লোকগুলো অযাচিত অন্যের জীবনে হস্তক্ষেপ করবে এবং তার স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটাবে। এই শ্রেণীর লোকগুলোকে আমরা গায়ের চুলকানি বা ফোঁসকার সাথে তুলনা করতে পারি। যার কাজই হচ্ছে বিরক্তির সৃষ্টি করা এবং লক্ষ্যে স্থির থাকতে বিঘ্ন ঘটানো। এদেরকে চাইলেই জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়া সম্ভব নয়। আবার একথাও মনে রাখতে হবে আমাদের চারপাশে অনেক লোক রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির উপর নির্ভর করে সে কাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবন পরিচালনা করবে। এই সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির জীবন দর্শন কি হবে। বর্তমানে আমাদের জীবনযাপনের অনেকটাই প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ইতিবাচক দিক যেমন আছে, তেমনি রয়েছে এর নেতিবাচক দিক। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যেই প্রযুক্তির এই আসক্তি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় দখল করে নিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া একদিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে সকলকে সংযুক্ত করছে। অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি মানুষের সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে এবং একাকিত্বের প্রবণতা বৃদ্ধি করছে। পাশাপাশি অবস্থান করেও নিজেদের মধ্যে একরকম দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে । যা মানুষের জীবনবোধ ও জীবন দর্শনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।

ইদানিং পিতা-মাতার মধ্যে সন্তানদেরকে নিয়ে এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অযৌক্তিক প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পিতা-মাতারা নিজেরাও জানে না আসলে তারা সন্তানদের কাছ থেকে কি চান। সন্তানদের কাছে তাদের প্রত্যাশার পাল্লা করা অনেক ভারী। তারা চান সন্তান যেন লেখাপড়ায় সবচেয়ে ভালো করে। খেলাধুলা, গান বাজনা, চিত্রাঙ্কনসহ সবকিছুতেই সে ভালো করবে। পারলে প্রতিটা সন্তানকেই তারা সুপারম্যান বানাতে চান। সন্তানেরা পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে এবং তাদের প্রত্যাশার চাপে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। যা সোজা কোথায় অত্যাচারের সামিল। শিশু ও সন্তানদের জীবন আনন্দময় করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি বাবা মারই উচিত একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা। যে পরিবেশ তার শিক্ষা জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে এবং তার জীবনকে নিয়ে ভাবার বিশেষ সুযোগ দিবে। পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের কখনোই

বাকি অংশ ৬৬ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স (EI)

চয়ন হিউবার্ট রিবেরু

সূচনা

বর্তমান বিশ্ব হল একটি ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্ব, আবেগগত বুদ্ধিমত্তা (EI), ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় দিকে নিজেকে পরিচালনা ও খাপ খাওয়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্যদের সাথে সহানুভূতিশীল হওয়ার সাথে সাথে নিজের আবেগকে চিনতে, বুঝতে এবং পরিচালনা করাতে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। EI কার্যকর, যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। IQ এর বিপরীতে, যা জ্ঞানীয় ক্ষমতা পরিমাপ করে, মানসিক বুদ্ধিমত্তা আত্মসচেতনতা, সহানুভূতি এবং আন্তঃব্যক্তিগত গতিবিদ্যার সূক্ষ্ম ইন্টারপ্লেতে তলিয়ে যায়। এই নিবন্ধটি সংবেদনশীল বুদ্ধিমত্তার বহুমুখী প্রকৃতি, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর উপকারিতা এবং এটিকে উন্নত করার কৌশলগুলো অন্বেষণ করে, মানব সংযোগ এবং সাফল্যের ভিত্তি হিসাবে এটির গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স (EI), যা ইমোশনাল কোশেন্ট (EQ) নামেও পরিচিত। যা আবেগ উপলব্ধি করার, ব্যবহার করার, বোঝার এবং পরিচালনা করার ক্ষমতা। সংবেদনশীল বুদ্ধিমত্তার মধ্যে রয়েছে নিজের এবং অন্যদের আবেগের মানসিক স্বীকৃতি, চিন্তাভাবনা এবং আচরণকে গাইড করার জন্য মানসিক তথ্য ব্যবহার করা, বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য করা এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আবেগগুলোকে সামঞ্জস্য করা।

বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি কেইস স্ট্যাডি বা গল্পের মাধ্যমে অবতারণা করা হলো:

দুই বন্ধু। স্বপন ও সুজন। বয়সে কিছুটা বড় হলো স্বপন। কিন্তু বয়স তাদের মধ্যে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তারা বন্ধুর মত লম্বা সময় ধরে এক সাথে চলছে। তাদেরকে সবাই মানিক জোড়া বলে ডাকতো। লেখা-পড়া শেষে তারা দু'জনই একই প্রতিষ্ঠানে আগে পড়ে জয়েন্ট করে। ভালই দিন যাচ্ছিল। স্বপন এক সময় অফিসের বড়পদে আসিন হন এবং এ পদে আসার জন্য সুজন তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে এবং তার লবিং কাজে দিয়েছে। স্বপন যখন বড় পদে আসিন হন, তখন থেকে সুজনের সাথে একটু একটু করে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। সুজন এসব কিছুই মনে করে না। সে ভাবে বন্ধু বড় হয়েছে এবং প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তাকে সুস্থ রাখে এবং বড় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। হঠাৎ স্বপনের একটি বিরাট বিপদ ঘটে যায়। সুজন এ বিষয়ে কিছুই জানতো না। যখন সুজন জানতে পারে, তখন সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সেখানে থেকে উদ্ধার করতে এবং সে সফলও হয়। কিন্তু বিপদ কেটে যাওয়ার পর স্বপন সুজনকে ভুল বুঝে এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শুরু হয় সুজনের মানসিক যন্ত্রণা। সুজনকে বদলি করা, প্রমোশন না দেয়া, অন্যের কাছে হেয় করা ইত্যাদি। এতে করে সুজন তার পরিবারে, সমাজে ছোট হতে লাগলো এবং একটা সময় সে নিজের প্রতি আস্থা ও জীবনের প্রতি বিষাদ নেমে আসে।

এখন যদি এ গল্পটাকে শুধরাতে চাই, তাহলে দেখা যাক: প্রথমত, স্বপন যদি একটু সচেতন হতো তাহলে সে বুঝতে পারতো তার মনে সুজনের প্রতি প্রতিহিংসা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ প্রতিহিংসার কারণে একটা মানুষের ক্যারিয়ার, ভবিষ্যৎ, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। স্বপন যদি সুজনের অবস্থাটা যদি আরো একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সহমর্মিতার সাথে দেখতো, তাহলে হয়তো সুজন মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, চাকুরি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হতো না। এ ক্ষেত্রে মনের প্রতিহিংসার আবেগটার পরিবর্তে প্রয়োজন ছিল সহমর্মিতা আবেগ। স্বপনের কাছ থেকে সহমর্মিতা, সহানুভূতি পেলে সুজন হয়তো তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকতো। পরম শ্রদ্ধার সাথে সে স্বপনকে দেখতো এবং কোন না কোনভাবে সে তার প্রতিদান নিশ্চয়ই দিতো।

উল্লিখিত ঘটনায় আমরা বুঝলাম যে, আমাদের আবেগ সম্পর্কে অবগত হওয়া, বুঝতে পারা আর সে অনুযায়ী কাজ করা, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক আবেগগুলোর ব্যাপারে সচেতন হয়ে সেগুলোকে বাদ দিয়ে নিজের এবং অন্যের উন্নতি করা বা নিজের উন্নতির জন্য দু'জনের সম্পর্কের উন্নতি করতে কিছু আবেগকে সক্রিয় করার নামই হল **ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স** যা বাংলায় বলা হয় **আবেগজনিত বুদ্ধিমত্তা**।

এটা এমন একটা বিষয় বা ক্ষমতা যার মাধ্যমে আমরা কোন একটি মুহূর্তে নিজের এবং অপরের আবেগ সম্পর্কে সচেতন হই, যার ফলে উপকারী আবেগগুলো সক্রিয় ও ক্ষতিকারক আবেগগুলোকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। যা আমাদের নিজের কাজকর্ম ও আচার আচরণ এবং অন্যের সাথে সম্পর্ক সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে। এ প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হলে আমাদের উন্নতি নিশ্চিত হয়।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ধারণাটি আর্বিভাব বা ইতিহাস

প্রথম ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হয়, মনোবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান সাংবাদিক ড্যানিয়েল গোলম্যানের ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের "বেস্ট সেলিং" বই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিছু গবেষক পরামর্শ দেন যে মানসিক বুদ্ধিমত্তা শেখা এবং শক্তিশালী করা যায়, অন্যরা দাবি করে যে এটি সহজাত।

EI পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন মডেল তৈরি করা হয়েছে: বৈশিষ্ট্য মডেল স্ব-প্রতিবেদন আচরণগত স্বভাব এবং অনুভূত ক্ষমতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে; ক্ষমতা মডেল মানসিক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সামাজিক পরিবেশ নেভিগেট করার জন্য এটি ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর ফোকাস্ করে। গোলম্যানের আসল মডেলটিকে এখন একটি মিশ্র মডেল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা ক্ষমতা EI এবং বৈশিষ্ট্য EI হিসাবে আলাদাভাবে মডেল করা হয়েছে তা একত্রিত করে।

EI সাধারণত সহানুভূতির সাথে যুক্ত, কারণ এতে একজন ব্যক্তি জড়িত থাকে। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে সম্পর্কিত। সাম্প্রতিক দশকে এর জনপ্রিয়তা এবং কর্মক্ষেত্রের পারফরম্যান্সের সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকে, EI বিকাশের পদ্ধতিগুলো আরও কার্যকর নেতা হওয়ার জন্য লোকদের দ্বারা চাওয়া হয়েছে।

মানসিক শক্তির ধারণাটি আব্রাহাম মাসলো ১৯৫০-এর দশকে চালু করেছিলেন। "আবেগজনিত বুদ্ধিমত্তা" শব্দটি প্রথম ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল বেলডোকের একটি গবেষণাপত্রে এবং বি. লিউনারের ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের একটি গবেষণাপত্রে প্রথম প্রকাশিত হতে পারে।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে, হাওয়ার্ড গার্ডনারের ফ্রেম অফ মাইন্ড: দ্য থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স এই ধারণার প্রবর্তন করে যে ঐতিহ্যগত ধরনের বুদ্ধিমত্তা, যেমন: আইকিউ, জ্ঞানীয় ক্ষমতাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়। তিনি একাধিক বুদ্ধিমত্তার ধারণা প্রবর্তন করেন, যার মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক

বুদ্ধিমত্তা এবং বাহ্যিক ব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা তিনি যথাক্রমে অন্যদের এবং নিজেকে বোঝার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।

"EQ" (আবেগগত ভাগফল) শব্দটির প্রথম প্রকাশিত ব্যবহারটি ব্রিটিশ মেনসা ম্যাগাজিনে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কিথ বিসলির একটি নিবন্ধে।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে, স্ট্যানলি গ্রিনস্প্যান EI বর্ণনা করার জন্য একটি মডেল প্রস্তাব করেছিলেন। পরের বছর, পিটার সালোভে এবং জন মায়ার আরেকটি মডেলের প্রস্তাব করেন।

শব্দটি ড্যানিয়েল গোলম্যানের ১৯৯৫ বই প্রকাশের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে: ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কেন এটি আইকিউ-এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গোলম্যান এই শব্দের ব্যবহারকে শক্তিশালী করে এমন বেশ কয়েকটি অনুরূপ প্রকাশনার সাথে অনুসরণ করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে, গোলম্যানের হাভার্ড বিজনেস রিভিউ আর্টিকেল "হোয়াট মেকস এ লিডার? জনসন অ্যান্ড জনসনের কনজিউমার কোম্পানিতে সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিবন্ধটি যুক্তি দিয়েছিল যে EI দক্ষতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে গঠিত যা নেতৃত্বের কর্মক্ষমতাকে চালিত করে। জনসন অ্যান্ড জনসন একটি গবেষণায় অর্থায়ন করেন যা উপসংহার পৌঁছে ছিল যে, উচ্চতর পারফরম্যান্স নেতা এবং মানসিক দক্ষতার মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক ছিল, তাত্ত্বিকদের পরামর্শকে সমর্থন করে যে EI নেতৃত্বের কর্মক্ষমতার একটি বিশিষ্ট ফ্যাক্টর।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সর একটি মডেল নিম্নে দেয়া হল:

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স	নিজেকে নিয়ে	অপরকে নিয়ে
সচেতনতা	আত্মসচেতনতা	সামাজিক সচেতনতা
ব্যবস্থাপনা	আত্মব্যবস্থাপনা	সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা

আত্মসচেতনতা: আত্মসচেতনতা দক্ষতাটি আমরা কিছু কৌশলের মাধ্যমে আয়ত্তে আনতে পারি। যেমন: নিজের আবেগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া, নিজেকে সঠিক মূল্যায়ন করা ও আত্মবিশ্বাসের চর্চার মাধ্যমে আত্মব্যবস্থাপনা শুরু হয় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ করা।

আত্মব্যবস্থাপনা: নিজেকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারি আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা, নমনীয়তা, ইতিবাচক এবং আশাবাদী চিন্তাভাবনা, তৎপরতা, নতুন কিছু তৈরি করার আকাঙ্খা ও বুদ্ধি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ক্ষমতাগুলো নিয়েই তৈরী হয় আত্মব্যবস্থাপনা।

সামাজিক সচেতনতা: মানুষ সামাজিক জীব। আমরা একা চলতে পারি না। আমরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে। আমরা সহমর্মিতা, সাংগঠনিক সচেতনতার ও কর্তব্য পালনে দৃঢ়তার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে পারি।

সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা: সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা হল কারো সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স চর্চা করা। অপরকে প্রভাবিত করা, অনুপ্রেরণা, অপরের দক্ষতা গড়ে তোলা, দলগতভাবে কাজ ও মতবিরোধের সমাধান করার মাধ্যমে আমরা সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করতে পারি। কোন ম্যাজিক দিয়ে বা পিনকোড দিয়ে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স তৈরী করা সম্ভব নয়, তবে এর বিষয়গুলো চর্চার মাধ্যমে তা তৈরি করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন ইচ্ছা, সময়, দৃঢ়তা ও অটল অধ্যবসায়।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের গুনগুলো তৈরী করার সহজ প্রক্রিয়া হল

নিজের আবেগের ব্যাপারে সচেতন হওয়া
↓
নিজের আবেগের উৎপত্তি ও ফলাফল জানতে পারা
↓
আবেগের প্রকাশের উপর নিয়ন্ত্রণ করা
↓
তৈরি হবে ইমোশন ইন্টেলিজেন্সের গুণগুলো

উপসংহার

আবেগগত বুদ্ধিমত্তা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত সম্পদের চেয়ে বেশি; এটি একটি রূপান্তরমূলক দক্ষতা যা সম্পর্কের গুণমান, নেতৃত্বের কার্যকারিতা এবং জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিস্থাপকতাকে আকার দেয়। কর্মক্ষেত্রের বিকাশ এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ক্রমবর্ধমান জটিল হয়ে উঠলে, EI চর্চা করা আর ঐচ্ছিক হিসাবে থাকে না, তখন এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আত্মসচেতনতাকে উন্নত করে, সহানুভূতি বৃদ্ধি করে, এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জন করে, ব্যক্তি তাকে পূর্ণ সম্ভাবনাকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্মানের উপর উন্নতি করে কার্যকর সুন্দর একটি পরিবেশ তৈরি করতে পারে। পরিশেষে, মানসিক বুদ্ধিমত্তা আমাদেরকে কেবল অন্যদের সাথে আরও গভীরভাবে সংযোগ করতে নয় বরং আরও পরিপূর্ণ এবং প্রভাবশালী জীবনযাপন করার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

তথ্যসূত্র:

- ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স- খুলে দেয় সম্ভাবনার দ্বার-রূশদিনা খান
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নাল
- ইন্টারনেট

৬৪ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

উচিত নয় সন্তানদেরকে তার জীবনের লক্ষ্যস্থির করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা। তারা সন্তানদেরকে এই বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ বা উপদেশ দিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন অপশনগুলোকে তাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। সন্তানেরা এক সময় নিজেরা সিদ্ধান্ত নিবে আসলে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে এবং সে অনুযায়ী তারা জীবনকে পরিচালনা করবে। পিতা-মাতা, অভিভাবকেরা সন্তানের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ অবশ্যই দিবে। অর্থাৎ সন্তানদের স্বপ্ন দেখানো এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করাই পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত। কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে যদি সন্তানদেরকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবেই তারা মানসিকভাবে দৃঢ়তা অর্জন করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন দর্শন সন্তানদেরকে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা থেকে অভিভাবকদের বেরিয়ে আসতে হবে।

জীবন একটি নদীর মতো। এখানে দুঃখ, কষ্ট, হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা সবই আছে। এর কোন একটি অংশ বাদ দিলেই আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হবে না। জন্ম আমাদের জীবনে হাসি আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। ঠিক একইভাবে মৃত্যু আমাদের জীবনে কান্না এবং বেদনার বার্তা দেয়। একজন পরিপূর্ণ মানুষ আনন্দের সময় হাসবে এবং কষ্টের সময় কাঁদবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অতি আনন্দের আতিশয্যে সে ডুবে যাবে না। আবার দুঃখ-কষ্টের সময় সে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ে যাবে না। কষ্ট-আনন্দ বা সফলতা-ব্যর্থতা জীবন নৌকার বৈঠার মতো। এই বৈঠা শত ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে জীবন নৌকাকে গন্তব্যের দিকে স্থির রাখে। আর ব্যক্তি হচ্ছে এই নৌকার মাঝি। ব্যক্তির দক্ষতার উপর নির্ভর করে নৌকা কি ভেসে থাকবে নাকি ডুবে যাবে। তাই বলা যায়, জীবন কোনো মাঝিহীন নৌকা নয়। ব্যক্তি নিজেই তার জীবন নৌকার মাঝি। তাই জীবন নদীর পাড়ি দিতে হলে অবশ্যই নিজ দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে হবে। সেই দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মনে রাখতে হবে জীবন বহমান কিন্তু স্থির নয়। সময় এবং জীবন একই সুতোই গাঁথামালা। যার গন্তব্য শুধুই সামনে।

একজন নবীন লেখক বরাবর খোলা চিঠি, লেখকের দায়বদ্ধতা, স্বাধীনতা এবং প্রাপ্তি

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

হে নবীন,

সাহিত্য জগতে তোমাকে স্বাগতম!

তুমি সাহিত্য চর্চার এবং লেখালেখির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছ। এ জন্য তোমাকে জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। এই সময়, 'লেখকের দায়বদ্ধতা, স্বাধীনতা এবং প্রাপ্তি' শিরোনাম দিয়ে তোমার বরাবর লিখতে বসেছি আমার খোলা চিঠি।

হে ব্রতধারী

প্রথমেই জেনে রাখ, তুমি যে বন্ধুর পথে এগিয়ে যাবার শপথ নিয়েছ, সেই পথ থেকে ফিরে আসার উপায় নাই! এবং তোমার কোন মুক্তি নাই! তোমার দায়কে এড়িয়ে যাওয়ার, সম্ভাব্য কোন পথ নাই। মূলত তোমার নিজের শৃঙ্খলে, তুমি নিজেই বন্দী হয়ে আছো। প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে চলেছ নিয়তই, "তুমি এখন কার? শুধুই কি তোমার?" না আছে তোমার অর্থ। না আছে বিত্ত। না আছে প্রভাব, ক্ষমতা। তারপরও বুঝি, টের পাও তুমি। তোমার বিবেক আমাকে, টানা দংশন করছেই, 'দাও! দাও! মানুষকে। সমাজকে। যা পারো দাও!' আমিও বলি, না। মানুষ তাঁরা তোমার কাছ থেকে চায় না অর্থ সাহায্য। চায় না বৈষয়িক কিছু। কিন্তু তাঁরা চায়, তুমি তাঁদের কথা বল। তুমি তাঁদেরকে দেখ। নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ কর। তাঁদের শোন। তুমি হাত বাড়াও। সে হাতে থাকবে তোমার কলম।

তোমার লেখায় উঠে আসবে, মানুষের কথা। এ বিশ্বের জীব-বৈচিত্রের কথা। বিশ্ব-মানবতার কথা। আমি বলবো একেবারেই সোজাসাপ্টা কথা। তাদের পক্ষেই তুমি কলম ধর। তাদের কথাই লিখ। তোমার প্রতিবেশি মানুষকে দেখাও তুমি, তোমার আছে এই একটি মাত্র সম্পদ। যা দিয়ে, উপরতলায় আওয়াজ তুলতে পারো। নিচের তলার মানুষদের কথা জানান দিতে পারো। এর চেয়ে বেশি কিছু তো, তারা তোমার কাছে চায় না। তারা তোমার কাছে, অধিক কিছু আশাও করে না এবং যা তুমি দিতে পারো, নিশ্চিত জেনো অন্য অনেকেই তা পারে না। আবার, কেউ কেউ পারে। তো, তারা আবার তোমার মতো নয়। তুমিও তাদের মতো নও। যার যার মতো, সকলেই তা করবে। তুমিও করবে। তাই তুমিও, সম্ভাব্য সবকিছু কর। যা অন্যদের মতো হবে না। তুমিও কিছু বল। যা অন্যদের মতো হবে না। তোমার নিজের মতো লিখ।

তোমার লেখা হবে, আলাদা। তোমার সেই লেখা হবে, হৃদয়স্পর্শী। মানুষের কাছে তা হবে গ্রাহ্য। তোমার পাঠক তারা তাদের আশার, ভাষার এবং ভরসার কথা খুঁজে পাবে তোমার প্রচ্ছদের অভ্যন্তরে। তোমার অন্ততঃ সলিলে প্রবাহমান ধারায়, তাদের হৃদয়ের স্পন্দন অনুরণিত হবে। তবে আর চুপচাপ বসে থাকা কেন? কেন তুমি নিজেকে এত অগ্রাহ্য, অপাংক্তেয় মনে করছো? তুমি নিজেকে, 'অকৃতী-অধম' হিসেবে মূল্যায়িত করছো। হ্যাঁ! নম্রতা, গুণীর ভূষণ। যে যত গুণী, সে তত নম্র, বিনয়ী। সাধারণ মানুষ, কারও ঔদ্ধত্য পছন্দ করে না। সে অর্থ-বিত্তের বা শিক্ষা-জ্ঞানের অধিকারী, যেই হোক না কেন। সাধারণ মানুষ যেমন বিনয়ী হয়। সরল হয়। হ্যাঁ, তোমাকেও সেই বিনয় এবং সরলতাকে তোমার সত্তায় ধারণ করতে হবে। তোমার পোশাকে, তোমার চলনে, তোমার বলনে এবং তোমার স্থিতিতে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। এমনকি যেখানে তুমি পা বাড়াবে, তোমাকে বুঝে নিতে হবে; পাশের মানুষেরা তোমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। তারা তোমাকেই নিরীক্ষণ করছেন। তুমি তাই, এমন কোন পথে পা বাড়াবে না, যা তাদের কাছে অগ্রহণীয় হবে। এমন কোন আচরণ প্রকাশ করবে না, যা তাদের দৃষ্টিকটু মনে হবে। তুমি বাহ্যতঃ তাদের কাছে, সৃজনশীল একজন মানুষের প্রতীক হয়েই আছো। তা তোমাকে জানতে এবং মানতে হবে।

তুমি তোমার সৃষ্টির বিনিময়ে, মানুষের শুধু প্রশংসাই পাবে তা আশা করো না। বরং প্রশংসার বিপরীতে নিন্দাবাদের জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাকে। তোমার লেখা যাদের বিপক্ষে যাবে; তারাই তোমার নিন্দা করবে। তারা তোমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে এবং তুমি যা বলছো, যা লিখছো তার মধ্যে সামান্যতম খুঁত থাকলেও; মানুষ তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবে। তা তোমাকে মনে রাখতেই হবে। সাধারণ মানুষ, তোমার পাঠক। তোমার দর্শক। তাদের মন-মর্জির উপর লক্ষ্য রেখেই, তোমাকে অগ্রসর হতে হবে। তাই তুমি, তোমার নীতি বিসর্জন দেবে না। তোমার বিকৃত মনের পরিচয়, মানুষের সামনে তুলে ধরবে না। তোমার মনের পঙ্কিলতাকে সাধারণ পাঠক-মানুষের নাগালে ছড়িয়ে দেবে না তুমি। তাতে তাদের মধ্যেও তার প্রভাব বিস্তৃত হবে। সাধারণ মানুষ, ওই পাঠক সমাজের সবাই তো একই শ্রেণীর নয়। কেহ কেহ সহজেই মত ও পথ পাল্টে ফেলে এবং এক সময় তাদের কাছে তুমি, পরিত্যাজ্য, পরিত্যক্ত হয়েই যাবে। তাই তোমার লক্ষ্য থাকবে, সুন্দর একটি মানবিক সমাজ গড়ে তোলায় প্রত্যয়ে বলিয়ান অবয়ব; তাদের সামনে উপস্থাপন করা। মানুষের মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টির মোহনীয় আবহ এই তোমাকেই শুরু করতে হবে।

তোমার সামগ্রিক লেখকসত্তার চেতন, সংবহন প্রক্রিয়ার প্রগলভতায় হবে সম্ভূত। তোমার দর্শন, সক্রিয় বিষয়-ভাবনা, আত্মসমীক্ষা হৃদয়ের জারণরসে জারিত হয়ে প্রাঞ্জলতার মাত্রা পাবে। সেগুলো হবে, আত্মসমীক্ষামূলক। সেখানে সময়ের এবং মানুষের প্রয়োজনে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে, অন্য আরেক পরিমণ্ডল। অভূত পরিবেশ এবং তোমার অধ্যবসায়ের, নিষ্ঠার ও পরিশ্রমের চিত্রও। তোমার সৃষ্ট লেখাগুলো; সাহিত্যনিষ্ঠ গবেষকদেরও প্রয়োজন মেটাবে। পাশাপাশি সেগুলো কালের দলিল ও ইতিহাস আকারে সংযোজিত হয়ে থাকবে জগতের ইতিহাস গ্রন্থের সূচিপত্রে।

মানুষের জীবনের সাথে, তোমাকে যোগসূত্র এবং নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রচনা করতে হবে। তোমার নিজের প্রতি পক্ষপাত নয়। মানুষের পক্ষেই তোমাকে অবস্থান নিতে হবে। তোমার দৃষ্টি-ভঙ্গি হবে, মানব-সমাজের কোথায় কোন স্তরে রয়েছে ঘনীভূত অন্ধকার, রয়েছে জীর্ণতা, অব্যবস্থার শিথিলতা, শ্রেণীবৈষম্যের দেয়াল। সমাজে বর্তমান সমস্ত অচলায়তনের বিপক্ষে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। তখন নজরুলের ভাষায়, তোমাকে বলতেই হবে, 'লাথি মার, ভাঙ্গরে তালা! যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা। ফেল উপাড়ি!' এবং সেখানে কীভাবে আলোর ছটা ছড়িয়ে দেয়া যায়।

জীর্ণতাকে মেরামত করা যায়। ব্যবস্থার কঠিন বলয় নির্মাণ করা যায়, তার সম্ভাব্য পথ বাদলে দিতে হবে।

আবার জীবনের যা কিছু আলোকিত, মাধুর্যমণ্ডিত, কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে 'এসো শ্যামল, সুন্দর!' বলে স্বাগত জানাবে। তোমার লেখার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি চরণে, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং হৃদয়বৃত্তিক অভিযোজন প্রতিভাত হবে। মননের পরিশীলিত শিল্প এবং তার কলা-মাধুরী পরিস্ফুট হয়ে উঠবে, লেখার অনুচ্ছেদে। মোহনীয় পেলবতার স্পর্শে তোমার ভাষা, শব্দশৈলী এবং ছন্দ অনুরণিত হবে। হয়েই যাবে! মোট কথা, সাহিত্যের ইতিহাসে, তোমার সৃষ্টি উল্লেখিত হয়েই থাকবে এবং ব্যাপক পটভূমিকায় বর্তমান পরিস্থিতির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার ভাষ্য, সময়ের পুস্তকে অনিবার্য পাণ্ডুলিপি রূপে সংরক্ষিত হয়েই থাকবে। সেখানে তুমিও স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকবে।

মানুষের নিত্যকার জীবনাচরণে উপলব্ধি প্রবঞ্চ, তোমার লেখনীর আঁচড়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। মানুষের প্রবৃত্তির অংশ ভয়, ক্ষোভ, উষ্মা, প্রতিহিংসা, আনন্দ, বিহ্বলতা ইত্যাদি পরিস্থিতির বাস্তব ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং সেগুলোর উপস্থিতি ও বিস্তার তুমি তুলে আনবে; তোমার কলমের আঁচড়ে। বোধগম্য, বোধের বিপরীতে নিম্ন কাঠামোর শ্রেণীগুচ্ছকে উপরিকাঠামোর শ্রেণীগুচ্ছ তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ (ধর্মীয়, জাতিগত ও প্রান্তিক)-র উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপ প্রয়োগ; এবং তাদের অনুশাসনের নিগড়ে ক্রমাগত ভয়ের যে আবহ সৃষ্টি করে, সেই বাস্তব চিত্র সুচারুরূপে নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণ করে তোমার লেখায় ফুটিয়ে তুলবে।

তোমার সৃষ্ট সাহিত্য হবে শিল্পগুণে সমৃদ্ধ উৎকর্ষতার, উপযোগিতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। তোমার লেখা হবে, ভাবে বৈচিত্রে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণধর্মী। মানুষের মনে সৃষ্টবেদনা, বিভাজন, বৈরিতার উন্মুক্ততা এবং আনন্দের উচ্ছ্বাস তোমার কলমে বাস্তব হয়ে উঠবে। তোমার মনের পটে প্রতিবিম্বিত, বাস্তব-চিত্র অংকন করাই হবে তোমার লক্ষ্য এবং অর্জন।

তোমাকে হতে হবে, একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রগতিশীল লেখক। এই দুইয়ের সমন্বয়ে, তুমি হয়ে উঠবে একজন পরিশীলিত কথাশিল্পী! তো, একজন দায়বদ্ধ লেখক হওয়ার জন্য, তোমাকে বিশ্বসাহিত্য পাঠ করার পাশাপাশি, তোমার পাঠকদের মনের ভাষাও পাঠ করা প্রয়োজন। তাঁদের চাহিদার ব্যাকরণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, তোমাকে রাখতেই হবে। প্রথমত সমাজের এবং মানুষের প্রতি; তোমার দায় সম্পর্কে সচেতন হতেই হবে। তোমার নিজের সাথে নিজেরই; বোঝাপড়া করতে হবে। শিল্প-সাহিত্যের উপযোগিতা নিয়ে ভাবতে হবে। সাথে তোমার সামগ্রিক লেখক সত্তার চেতন-সংবহন প্রক্রিয়ায়, অবশ্যই নিজেকে জারিত করতে হবে।

একজন লেখক তাঁর চিন্তা-চেতনায় ত্রি (তিন) বিষয়ের এবং সত্তার সাথে নিজের মননকে সংযুক্ত রাখেন। তিনি তাঁর জীবনকালে, সময়ের তিন কালকে একই সমান্তরালে দেখতে প্রবৃত্ত হন। এগুলো হল, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। তিনি ভাবেন স্রষ্টা, মানুষ এবং সমস্ত সৃষ্টিকুল নিয়ে। আমি (আমরা), তুমি (তোমরা) এবং সে (তারা), এই তিন ব্যক্তিসত্তা নিয়েই হয় তাঁর লেখার বিচরণক্ষেত্র।

আবার বলা যায়, ব্যক্তি, কাল এবং পুরো সৃষ্টি জগত, নিয়েই তিনি তাঁর লেখনী সচল রাখেন। আমরা মানুষ, আমাদের ধর্মীয় মতে, ত্রি-জগত বিশ্বাস করি। লেখক তিনিও মর্ত, স্বর্গ এবং নরক নিয়ে ভাবেন এবং তিনি লেখক সমস্ত কিছুই দেখেন, তাঁর তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে।

বলছি, তুমিও তাই অনুশীলন করবে। তুমি প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়েই, তোমার লেখার জগতে বিচরণ করবে এবং তোমার সার্বভৌম সত্তাকে লালন করবে তুমি। তোমার সমাজকে, সমাজের মানুষকে একরকম শর্তহীন চুক্তিতে, বিনামূল্যেই অনেক কিছু দিতে হবে। তার বিনিময়ে, একজন লেখকের প্রাপ্তি; অর্থমূল্য বা বৈষয়িক কিছু বিচার্য বিষয় হতে পারে না। পাঠকের গ্রহণযোগ্যতাই, লেখকের বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত। লেখক হিসেবে তোমার, যা কিছু বলার, স্বাধীনভাবেই তা লিখবে। তোমার পাঠক, সচেতন হয়েই তা পাঠ করবে। তাঁরাও তোমার মতো চিন্তা করতে প্রণোদিত হবে। তাঁদের আচরণে, তুমি তা প্রত্যক্ষ করবে। এটাই তোমার জন্য বড় পাওনা!

মানুষের সাথে তোমাকে সংযুক্ত হতে হবে। তুমি নিজের কথা লিখবে না। তাতে তুমি মানুষের সংলগ্নতাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তুমি লিখবে, মানুষের আনন্দের, দুঃখ-বেদনার কথা। তাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জাত, তোমার লেখায় থাকবে, 'বিন্দুতে সিন্ধুর গভীরতা' এবং 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ' নিগুঢ় শৈলী! তোমার পাঠক বার বার, তোমার লেখায় তোমাকেই আবিষ্কার করতে চাইবে।

তোমার মধ্যে থাকবে, তোমার শিল্পকে প্রশ্নহীন প্রত্যয়ে নির্বিকল্প উচ্চতায় তুলে ধরার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবণতা এবং নৈর্ব্যক্তিক মনন, আবেগ ও চরিত্র দর্শনের সম্মিলনে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও কর্মে গতিশীলতা। তুমি হবে একটি প্রশান্তির জগত নির্মাণের স্বপ্নদ্রষ্টা! হবে, বিনম্র শ্রদ্ধা, প্রেরণা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস উদ্রেকের স্রষ্টা। হবে তুমি ভরসা-পুরুষ! সহজাত প্রতিভার জাদুকরী মুগ্ধতা দৃষ্ট হবে তোমার মাঝে!

তোমার লেখনীতে ধরা পড়বে, আধুনিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত সমাজ সভ্যতার চিত্র। তার সাথে চিত্রিত হবে, পূর্ববর্তী পৃথি বীর আদিম প্রকৃতির মানুষ যাপনের রূপ, রীতি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য। লেখার ক্যানভাসে নিশ্চিত ফুটে উঠবে অকৃত্রিম আনন্দের পরিবেশ, অসীমের হিল্লোল, অপরিমেয় শক্তির রং-বেরঙের ঊর্মিমালা। আর সকল সংস্কারের বাইরে, সহজাত উত্তরাধিকারের স্নায়ুবাহিত আনন্দ, সংবেদনা, উদারতা, যৌথ-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত মহিমা, দায়বদ্ধতা প্রকাশিত হবে।

তোমার লেখা হবে শিল্পগুণে গুণান্বিত। তা হবে না, কোন আপোষের বৃত্তে বন্দী। ভাষার এবং শব্দের পরিশীলিত কলবরে এবং নান্দনিকতার ব্যাপ্তিতে, স্বাধীন হয়েই তুমি নিজে বিচরণ করবে। তাতে সাধারণ মানুষ, তোমাকে তাঁদের পার্শ্বচরিত্রের একজন সতীর্থ মনে করেই, তোমার পাশে এসে অবস্থান নিবে।

তোমার লেখায়, মানুষের জীবন ও তার সংজ্ঞা সম্পর্কে, একজন লেখকের পরিবর্ধমান ধারণার অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। জীবনের ব্যঞ্জনার সমস্যা, শাস্ত্র, লোকাচার, নির্বিচারে আনুগত্য এবং শৃঙ্খলিত জীবনের মধ্যে নতুনত্বের ঢেউ জাগানোই হবে তোমার লক্ষ্য। দ্রোহ নিয়েই লিখতে হবে তোমাকে। এই দ্রোহ, সংস্কার ভাঙ্গার আন্দোলনে সক্রিয় তোমার নিজের শিল্পীসত্তা। এই সত্তাকে, সৃষ্টি-কর্মে সমস্ত আপাত অসঙ্গতি এবং উৎকেন্দ্রিক বিক্ষেপ, যা গভীর সামঞ্জস্যে গ্রন্থিত করে দেবে। তোমার উদ্ভাবনী প্রতিভা এবং এই অভিযাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার দুঃসাহসিকতাকে নিশ্চয় তোমার পাঠককুল সজ্ঞানেই স্বীকৃতি দেবে।

সাহিত্যের এবং শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকে ও প্রকরণে নিজেকে খুলে, তুলে ধরবে তুমি। তোমার পাঠক সমাজ তোমার মাঝে

দেখবেন সুপ্ত শিল্পবোধ, নতুন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। মানুষের মানবিক সান্নিধ্যে এবং প্রকৃতির ওম-সাহচর্যে বেড়ে উঠবে তুমি। কারণ লেখক তুমি আত্মসন্ধানী উপাচারের আশ্রয়ে লালিত হয়ে এসেছ।

সদা সর্বদাই তোমার বিবেক, তোমাকে তাড়া করেই যাবে। তার দহন অনুভব করবে; তুমি তোমার সত্তায়। যা কিছু চলমান এবং ঘটমান তুমি দেখবে চোখের সামনে, তাতে তুমি এক ধরণের তাড়া অনুভব করবে। তুমি বুঝতে পারবে, কেহ অনবরত তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কে যেন তোমার পিছু নিয়েছে। সারাক্ষণই অনুসরণ করছে তোমাকে। অদৃশ্য কোন ছায়া; তোমাকে সঙ্গ দিচ্ছে। তুমি সুস্থির হয়ে শুয়ে থাকতে, বসে থাকতেও পারবে না। এমন কি অন্য কোন জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকলেও তোমার পাশের ছায়া বলবে, 'কলম ধর! লিখো! এই কথাটি, এই শব্দটি এখনই লিখে রাখো। তা না করলে, এক মুহূর্ত পরই তুমি তা ভুলে যাবে। তোমার ভিতরের এই কথামালা বা শব্দমালা; হারিয়ে যাবে। ফের তুমি তা শত চেষ্টা করেও; গুছিয়ে আনতে পারবে না। তুমি লিখো।'

আমিও বলছি, তুমি লিখো। তোমার এই ছোট্ট কথাটি বা শব্দটি হতে পারে; বড় কিছুর শুরু। শক্ত ভিত্তি। তাকে সম্বল করেই; তুমি লিখো। যা তোমাকে নিয়ে যাবে, অনন্য এক উচ্চতায়। তোমার সেই লেখা পাঠ করে, তোমার পাঠক সমাজ আন্দোলিত হবে। তোমাকে মনে রাখতে হবে; তোমার কোন লেখাকেই চূড়ান্ত বিচারে, মানসম্মত ভাবার সুযোগ নেই। তুমি অহংকারকে প্রশ্রয় দিও না। তোমার অহংবোধ, তোমার সামনে এগিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করেই দিবে। তোমাকে থামিয়ে দেবে। তুমি তখন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায়, ব্যাকুলতা অনুভব করবে না। অতীত তোমাকে; পিছন থেকে টেনে ধরবে।

একজন অহংকারী মানুষের অর্থ, যশ, কৌলীন্য, বংশখ্যাতি সামাজিক দৃষ্টিতে মলিন হয়ে যায়। তাঁর মনুষ্যত্বের গায়ে নোনা ধরে। সেই মানুষ একজন শিল্পী বা লেখক যা-ই হন, এ রকম পরিস্থিতিতে তখন তাঁর মননে, আচরণে, ভাবনায়, সৃষ্টির জৈব-সত্তা উত্তীর্ণ, সজীব, সমস্ত উদার কেন্দ্রিক মঙ্গলের, অলৌকিক আনন্দের এবং সৌন্দর্যে ছাপ প্রতিভাত হয় না!

যখনই সময় পাও, তোমার রচিত পুরনো লেখাও পাঠ করো। দেখবে, নতুন শব্দমালা, নতুন ভাব এসে ভিড় জমাবে তোমার মনের জানালায়! তুমি একধরণের অদম্য স্পৃহা অনুভব করবে। মনে হবে, তোমার আগের লেখা বড্ড সেকেলে হয়ে গিয়েছে! তাকে মেরামত এবং আধুনিক করা প্রয়োজন। তাই বলে, তোমাকে পুরনো সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে, তা বলছি না। ভাষা যেমন ঝরনা-ধারার মত সচল এবং পরিবর্তনশীল, ঠিক তেমনই হবে তোমার কল্পনার এবং চিন্তার প্রবাহ।

তোমার স্পৃহাকে; তোমার অবচেতন মনের শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখার কোন সুযোগ নেই। মনে রাখবে তুমি, তোমার পাঠক সমাজ তোমার কাছ থেকে নতুন সৃষ্টি প্রত্যাশা করে। তারাও চলমান রেলগাড়ির মতো, এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। তাদের হাতে, তোমার সেই নতুন সৃষ্টিকর্ম তুলে দেয়ার দায়িত্ব একান্তই তোমার। তারা গ্রহীতা এবং তুমি দাতা। কোনভাবেই; তাদের ফাঁকি দিতে বা বঞ্চিত করতে পারবে না তুমি। যদি তাই কর, তবে তোমার ব্যবসায় ধস নামবেই। তুমি আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। তোমার পাঠক তারা, মুখ ফিরিয়ে তোমার দিকে তাকাবে না আর। তারা তখন, তাদের মনের খোরাক জোগাতে অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত লেখকের দ্বারস্থ হবেই।

তো, ভাষা ও ভাবের যুক্তি-শৃঙ্খলার বালাই ঘোচানো, তোমার পাঠকদের পক্ষে মেনে নিতে হয়তো বা সময় লাগবে। কিন্তু জীবন দুর্জ্ঞেয়, জটিল এবং বিচিত্র বলেই তার অপার রহস্য তোমাকে; তোমার কলমে তুলে আনতে হবে। তোমার সাহিত্য-ভাবনা, অন্যসব লেখকদের ভাষার প্রতিধ্বনি হতেও পারে। তোমার তেমন পরিবেশ, দিনযাত্রার মুহূর্তে তোমার সত্তার সহাবস্থান, সংগ্রাম ও সমস্যা ইত্যাদির অভিজ্ঞতার আলোকে তুমি হয়ে উঠবে অকুণ্ঠিত সত্য প্রকাশের মূর্ত প্রতীক। মধ্যবিত্তের যুগ যন্ত্রণায়, তুমিও তাদের সাথে অলাতচক্রে সারথি হয়ে চলেছ। তাই তোমার অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত বক্তব্য, নানান আঙ্গিকে, বিচিত্র মাত্রায় প্রকাশ করতে হবে।

অন্য মানুষের মতো ভাবনার, অনুভূতির, বুদ্ধির এবং বিচারের সীমাবদ্ধতা তোমারও আছে। একজন ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে তোমার দুর্বলতাও আছে। এ কথা মানতেই হবে। লিখতে যেয়ে, অসীম দুর্বিষহ একাকীত্বের সাথে একাত্ম তোমাকে হতেই হয়। এ সময় তোমাকে ক্লান্ত এবং বিরক্ত হলে চলবে কেন? এই কঠিন সত্যকে, স্বাভাবিক বলে মেনে নিতেই হবে। তোমার আশেপাশে যা ঘটে চলেছে, তা তোমার চেতনায় চিত্রিত হয়ে থাকলেও, যখন তুমি লিখে যাচ্ছ তখন তোমাকে নির্জনতার গভীরে আকণ্ঠ ডুবে যেতেই হবে। আবার তোমার নির্জনতার আবেশকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে, সময়ের উদ্ভাসনে, নিজেই নিজেকে ভেঙ্গে ফেলার প্রবৃত্তিতে ব্যস্ত হয়েই লিখে যেতে হবে। নিজেকে গতিশীল রাখতেই হবে।

তবে জীবনের গল্প বলার সাধনকে, একান্তই আরোপিত সনাতনী জরুরী বিষয় মনে করে নয়, ক্রমাগত ভাষা-শৈলীর ভাঙচুর এবং বিনির্মাণ সাধন করেই, নতুনত্বের দিকে নিয়ত অগ্রসর হবে তুমি। নতুন যুগ-মলাটের শুভ আচারের, উন্মোচক হয়ে উঠতে হবে তোমাকে। এটিকে রীতিসিদ্ধ নবধারা বিবেচনা করেই, এগিয়ে যাও তুমি। তোমার অগণিত ভক্ত-পাঠকও; তাদের চাওয়া-পাওয়ার নিক্তি হাতে নিয়ে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। তাদের সকলের আগ্রহের বিষয়, তাদের তুমি কী নতুনত্ব উপহার দেবে এবং তাদের আকাঙ্খিত সেই নতুনত্ব; হবে না পানসে। হবে না রংহীন। সেই তোমার পুরনো চর্বিত বিষয় মাত্র। তা হবে একেবারেই আকর্ষণীয়। রঙিন। সর্বোপরি তা হবে, আধুনিক এবং সত্যনিষ্ঠ। তুমি তোমার অভীষ্ট পাঠক জনের যাপিত জীবনের কথা, প্রতিদিনের জমা-খরচ, খুঁটিনাটি ঘটনার কথা একান্তই প্রাঞ্জলতার আবেশে আকর্ষণীয় করে তুলবে দক্ষতার সাথেই। এতে প্রাণও দেবে। এটাই তাদের প্রাণের দাবী। তুমি যখন লিখছো, কখনও সত্য-সীমাকে অতিক্রম করবে না। অনিবার্য তাল-লয় এবং মাত্রাগত ছন্দ নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে তোমাকে।

তুমি লিখতে পারো। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, জীবনচরিত্রের নির্ঘণ্ট রচনা করতে পারো। জীবচিত্র আঁকতেও পারো। এতকিছুর পারঙ্গমতায় ঋদ্ধ হয়েই, সামনে এগিয়ে যাও তুমি। সাবলীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েই, তোমার চিত্রিত গল্পের ক্লাইমেক্সে আরোহণ করতে হবে তোমাকে এবং চূড়ান্ত রূপে একজন লেখক হিসেবেই। লেখাকে কেন্দ্র করে, একমাত্র সাহিত্য রচনা করাই তোমার একমাত্র সাধনা!

মূলত আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, রোমাঞ্চ, সৌন্দর্য আবর্তিত হয় এই সাহিত্যকে ঘিরেই। এই আবর্তনে, সাহিত্যের ধারা সদা চঞ্চল গতিময় ঝরনাধারার মতো। তোমার সাহিত্যে গল্পের, কাব্যের, ছন্দের ভাষা হবে একেবারেই সরল। সাদা-মাটা। তোমার উদ্দিষ্ট পাঠকের চিন্তা-ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সমান্তরালভাবে এগুতে হবে তোমাকে। তুমি একটি জগতের দেশ, সমাজ, জীবন এবং মানবতার মধ্যেই বসবাস কর এবং তুমি একজন জীবন

শিল্পী। তোমাকে, তোমার এই শিল্পী সত্তাকে স্বীকার করতেই হবে। আনন্দিত হয়ে, মেনে নিতেই হবে। মনে রেখো, একটি শিল্পকে জননন্দিত করে তুলতে, একজন নিবেদিত প্রাণ শিল্পীকে ঘাম এবং রক্ত দুটোই ঝরাতে হয়। তার কায়িক পরিশ্রম, মানসিক অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি মানবিক হৃদয়ানুভূতি, এত সবের মিথস্ক্রিয়ায় এক একটি কলা, বাস্তবিক হয়ে ওঠে শিল্প, তা তোমার বিবেচনায় রাখতেই হবে। তাই বলে, তুমি একজন শিল্পী। লেখক যখন, অন্যজনে তোমার সাদর পরিচর্যা করবে এবং তুমি আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে, নীরবে নিভৃতে জাল বুনে যাবে, তা ভাবলে চলবে না। তোমাকে, তোমার নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। জীবনের কঠিন সত্য ও বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গম করতেই হবে। তোমার সামগ্রিক ভাবনা, উপলব্ধি, জিজ্ঞাসা ও সকলের মিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং তথ্যকে সাজিয়ে; নিজের আত্মলেখনে প্রবৃত্ত হতে হবে তোমাকেই।

তখন তোমার লেখার অনুপ্রাস, তোমার পাঠক-শ্রেণীকে আকর্ষণ করবে। করেই যাবে। তাঁরা তখন অনুপুঙ্খ মনোযোগ তোমাকে, তোমার সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করবে। তাই সৃজনশীলতার বারিধারায় পরিস্নাত হয়েই; অন্তর্গত বিশ্বাসে বলিয়ান হতে হবে তোমাকে এবং তার মূর্ত পরিস্ফুটন ঘটবে তোমার কল্পনায়; তোমার স্বপ্নে এবং অভিজ্ঞানে। এই তোমাকেই তখন, তোমার নিজেকে একটি বিশেষ রূপ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। তোমার যত লেখা, বার বারই ছাড়িয়ে যাবে তোমাকে।

মনে রেখো তুমি, অন্য অভিজ্ঞ এবং দক্ষ লেখকরা কিন্তু বসে নেই। তারা তোমাকে দেখছে। তুমি এগিয়ে যাচ্ছ, তা তাদের নজরে আছে। তারাও বিষয় বৈচিত্রে ভরপুর সাহিত্য সৃষ্টি করতে উন্মুখ হয়ে আছে। প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি তাদেরকেও সাহস জোগাতে চাই। তাঁরাও তো তোমার পথের পথিক। একই তীর্থ-যাত্রার সারথী। বস্তুত তোমরা সকলেই এগিয়ে চল। সকলেই সামনের দিকে এগিয়ে চলার ধারায় সচল রয়েছ। তবেই তো একটি নতুন জগত উন্মোচিত হবে আমাদের সকলের সামনে। সেখানে নব সৃষ্টির আলোর ছটা ঠিকরে উঠবে। ঝলমলিয়ে উঠবে আমাদের এই জগত।

তোমার হাতের নাগালে যা পাও, তাই পাঠ করো। পড়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই তোমার। ঠিক তেমনই, যখন পারো লিখো। যা পারো লিখো। তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই রচনা করার। যা কিছু রচনা কর, তাকে সযত্নে পাঠ করার উপযোগী করে তোল। যে সময় চলে যাচ্ছে, তা চিরতরেই হারিয়ে যাচ্ছে তোমার জগত থেকে। তোমার মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবন অনিশ্চয়তায় ভরপুর। আগামীকাল যা করবো বলে, ঠিক করে রেখেছ, হতে পারে সেই কাল বা সময় আর কখনও ফিরে আসবে না তোমার জীবনে। সৃজনশীল মানুষের জন্য, আগামীকাল বলে কিছু নেই। থাকেও না। আজই তার সেই মোক্ষম কাল এবং এখনই। তোমাকে বলতে হবে, 'আজই, এ সময় যা পারি দু'হাত ভরেই জগতকে দিয়ে যাই। মানুষকে আলোকিত করে যাই। আমি মানুষ তো হারিয়ে যাবোই। কিন্তু আমার নিজের মন দিয়ে কিছু যা করেছি, করবো; তাই থেকে যাবে এই জগতে। এই জগতের মানুষের মাঝে।'

এখনই তোমার সময়। এখনই কিছু রচনা করার উপযুক্ত সুযোগ সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার তোমাকে করতে হবে। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে প্রতিদিনই পড়ো এবং প্রতিদিনই লিখো। যা পারো। যখনই পারো। তোমার ইচ্ছাশক্তিই বড়। তার থাকবে না ধরা-বাধা নিয়ম, সময়। যখন পারো তখনই কর। জগত শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিখ্যাত বইগুলো পড়ে নেয়া উচিত। যতটুকু পারা যায়। প্রয়োজনে সেই গল্পগুলোর চলচ্চিত্ররূপও দেখে নেয়া ভালো। একজন লেখকের পাঠের এবং লেখার স্পৃহা সবসময় সমান থাকে না। সময় ও সুযোগও তা বাদলে দেয় না। তাই এখনই সময়। পঠনে, লিখনে নিজেকে নিয়োজিত করার সমসাময়িক দেশী-বিদেশী সাহিত্যের চারণ-ভূমিতে বিচরণ করতে হবে। মনে রাখবে, তোমার ইচ্ছা-শক্তিই প্রধান।

তুমি পড়বে অনেক; লিখবে কম। জানবে বেশি; জানাবে কম। শুনবে বেশী; বলবে কম। যে আমি, তোমাকে এতকিছু লিখলাম তার সব কিছুই আমি মেনে নিয়েছি, সেভাবেই নিজেকে পরিচালিত করেছি, আমি বলবো না। আমি পারিনি, তা মেনে চলতে। কিন্তু চেষ্টা করেছি। যা কিছু জেনেছি, তার প্রতিফলন ঘটেনি আমার মাঝে। এটাই স্বাভাবিক। যদি তাই হতো, তবে কিছু কালজয়ী লেখা তো; লেখক সকলের হাত দিয়ে বেরিয়ে আসতো। কিন্তু তা হয়নি, অনেকের মধ্য দিয়ে। আমিও পারিনি; তেমন কিছুই লিখতে। তাই এ সময় তোমাকে লিখছি, তোমার চিন্তা-চেতনায় যেন এমন স্পৃহা কাজ করে। তোমাকে এগিয়ে যেতেই হবে। এগিয়ে যাওয়াই, চিন্তাশীল মানুষের একমাত্র পথ। এগিয়ে যাওয়া মানে, নিজেকে সমৃদ্ধ করা। তোমার নিজের মধ্য দিয়ে, অন্যকে কিছু দেয়ার প্রচেষ্টা। এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটিয়েই; সৃজনশীল হতে হয়।

নিজের লেখা শুধুমাত্র বই আকারে প্রকাশ করতে হবে, এর সাথে আমি একমত নই। বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে সামাজিক মাধ্যম, অনলাইন ভিত্তিক প্রকাশনাতেও নিজের লেখা পাঠাতে হবে। তাতে নিজের লেখার সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে। সম্পাদক, প্রকাশকেরা কী চান, সেভাবেই নিজেকে বিনির্মাণ ধরতে হবে।

একটি জীবনসঙ্গত বাস্তবতাকে ভিত্তি করে, কল্পিত চরিত্র-ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করে, সর্বজনীনতার পটভূমিতে চিত্রিত করেই তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা একজন লেখকের প্রধান কাজ। তার সত্তার অংশ, এ জগতের বিখ্যাত লেখকদের আঁকা চরিত্রগুলোর যা কিছু নিজস্বতা রয়েছে, সেগুলো তাদের ব্যক্তি-বিশিষ্টেরই বাস্তব এবং নান্দনিক রূপ।

কালের বিবর্তনের ধারার সাথে শিল্প-সাহিত্যের গতিপ্রবাহ বাঁক নিলেও, পরম্পরায় সময়ের সাক্ষী হয়ে থাকে পূর্ব-প্রজন্মের সৃষ্টি। অমর হয়ে থাকেন তার স্রষ্টারা। মনে রেখো, তুমিও একজন স্রষ্টা। আবার তোমার উপরও রয়েছেন, আরেক স্রষ্টা! তোমার ভিতর; সেই স্রষ্টার অলৌকিক রুহ বা আত্মা কাজ করেন। তিনি স্রষ্টার প্রেরিত শক্তি। তাকে যত্নে সাথে তোমাতে লালন, পরিচর্যা করা একমাত্র তোমারই কাজ, পবিত্র দায়িত্ব। আমি মনে করি, পরলোকে তাঁর কাছে এ বিষয় আমাকে, তোমাকে এবং মানুষ সবাইকেই জবাবদিহি করতে হবে। কী আমরা করেছি, আমাদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কী আমরা করিনি, তার হিসাব তাকে দিতেই হবে!

তোমার আরাধ্য সাফল্য কামনা করি। নিশ্চয়, আগামিতে তোমার গুণমুগ্ধ পাঠক-সমাবেশে তোমার নাম উচ্চারিত হবে। তোমার সৃষ্টি, অভিজ্ঞান নিয়ে তারা সকলে, প্রচার মাধ্যম এবং তাদের আসর মাতিয়ে রাখবে। সেখানে তারা, শ্রদ্ধার সাথেই তোমার নাম স্মরণ করবে।

হে নবীন! আমরণ লেখার সাথেই নিজেকে সংযুক্ত রাখো এবং তুমি তোমার পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকো। তোমার সাধ্য মতো, মানুষকে শুধু দিয়েই যাও! তোমার জন্য এই শুভ কামনা রইল!

ইতি,

তোমার শুভানুধ্যায়ী।

ভাওয়াল এবং বাংলা সাহিত্য

জেরী মার্টিন গমেজ

বাংলা সাহিত্যে যে তিনটি গ্রন্থ অমর হয়ে রয়েছে, সেই সাহিত্য তিনটি নাগরী থেকেই রচিত। হয়ত বা বেশির ভাগ জার্নাল বা ব্লগে নাগরী শব্দটা লেখা হয় না, কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করাও যায় না। ব্রাহ্মণ-রোমান কাথলিক সংবাদ, কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এবং বাংলা ব্যাকরণ ও তৎসম বাংলা পর্তুগীজ শব্দকোষ এই তিনটি গ্রন্থ লেখা হয়েছিল এই নাগরী থেকে। এই তিনটি বই কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। হয়ত, অনেকে বুঝতেই পারছেন না বাংলা সাহিত্যের জন্য কি পরিমান মূল্যবান এই তিনটি গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজতে গেলে আপনি কখনোই এই তিনটি গ্রন্থকে বাদ দিতে পারবেন না। প্রথম বইটির লেখক, একজন রাজপুত্রের। যার নাম ছিল দোম আন্তনীও ডি রোজারিও। উনার বিষয়ে বিশাল একটি আর্টিকেল লেখা আছে, আমার ওয়েব সাইটে, চাইলে পড়ে দেখতে পারেন।

আজকে উনার সৃষ্ট গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করব আর বাকি দুইটার রচয়িতা ম্যানুয়েল দা আসসুম্পাসাও। সেন্ট নিকোলাস চার্চে বসে যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে, কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার হস্টেন এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে এই বই তিনটির তথ্য উপাত্ত দেন। আগে কেউই এই গ্রন্থগুলোর খবর আমাদের দিতে পারেনি। এই তিনটি গ্রন্থের আগে অনেকের নাম বলেছেন। উদাহারণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ন্যাথায়েল ব্রাসি হলডেটের কথা। তার গ্রন্থ, যা বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে লেখা সেটিকে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন ইউরোপীয়দের প্রথম গ্রন্থ বলে দেখান। আসলে এর আগেই ম্যানুয়াল দা আসসুম্পাসাও তার গ্রন্থ লেখে শেষ করেছিলেন। সিলোগ নামে একটি গ্রন্থে বাংলা ভাষায় রচিত একটি গানকে বাংলা ভাষায় ইউরোপীয়দের লেখা প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত উল্লেখ্য করা হলেও পরে জানা যায় সেটা আসলে বাংলা না। মালয় ভাষা। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সেই ভুল সবার ভাঙ্গে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ফাদার হস্টেন সবার ভুল ভেঙ্গে প্রমাণ করেন যে, ইউরোপীয়দের হাতে প্রথম রচিত বাংলা গ্রন্থ আর কোথাও না, নাগরীতে বসেই রচিত হয়েছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ফাদার তা সুধী সমাজে পরিবেশন করেন এবং তা পরবর্তীতে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুনে রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ হতে মুদ্রিত হয়।

১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণ রোমান-কাথলিক সংবাদ ম্যানুয়েল দা আসসুম্পাসাও সম্পাদনা করেছিলেন। যার লেখক ছিলেন, ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টান সমাজ গড়ে উঠার প্রথম কারিগর দোম আন্তনী ডি রোজারিও। এটি মূলত খ্রিস্টধর্মকে প্রচারের জন্য লেখা হয়েছিল। এটিকে ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা না করে, সাহিত্য বিবেচনায় বেশি সমাদৃত করা উচিত। দোম আন্তনী ছিলেন

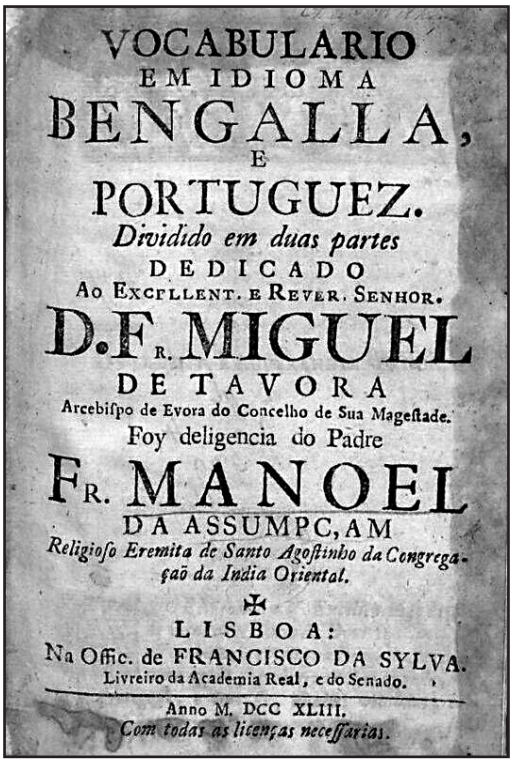
VOCABULARIO
EM IDIOMA
BENGALLA,
E
PORTUGUEZ.
Dividido em duas partes
DEDICADO
Ao Excellent. e Rever. Senhor.
D.F.R. MIGUEL
DE TAVORA
Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade.
Foy deligencia do Padre
FR. MANOEL
DA ASSUMPC,AM
Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregaçaõ da India Oriental.
LISBOA:
Na Offic. de FRANCISCO DA SYLVA.
Livreiro da Academia Real, e do Senado.
Anno M. DCC XLIII.
Com todas as licenças necessarias.

ভূষানার রাজপুত্র। পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাকে অপহরণ করে এবং ম্যানুয়েল ডি রোজারিও নামের একজন খ্রিস্টান যাজকের কাছে বিক্রি করে দেন।

ব্রাহ্মণ-কাথলিক সংবাদ মূলত একটি কথোপকথন গ্রন্থ যা হিন্দু ধর্মকে অসার প্রমাণ করে, খ্রিস্টধর্মে গুনগান করা হয়েছে। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি ফাদার ম্যানুয়েল দা আসসুম্পাসাও পর্তুগালের এভোরোর আর্চবিশপের গ্রন্থালয়ে দান করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। ফাদার আসসুম্পাসাও সেটার পর্তুগীজ অনুবাদও করেন। দোম আন্তনীও প্রথম বাঙ্গালী খ্রিস্টান যার গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। আর যার জন্ম হয়েছিল নাগরীতে।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ ফাদার ম্যানুয়েল দা আসসুম্পাসাও ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত, যার উৎসই ছিল নাগরী। যা ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবনে, ফ্রান্সিস দা সিলভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির তিনটি কপির সন্ধান পাওয়া যায়। একটি পর্তুগালের এভোরাতে, আরেকটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে ও আরেকটি নাম পত্র বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে চন্দন নগরের ফরাসী পাদ্রী গুয়ারিন পরিবর্ধিত সংস্করণ হিসেবে বের করেন শ্রীরামপুর হতে। এই গ্রন্থ যে, ভাওয়ালের নাগরীতে বসে লেখা হয়েছিল, তার প্রমাণ ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৫ নভেম্বরের ফাদার ফ্রে এমব্রোসিও নামের একজনের চিঠির মাধ্যমে। যিনি বলেছিলেন এই গ্রন্থ যখন লেখা শুরু হয় তখন ম্যানুয়েল দা আসসুম্পাসাও ভাওয়ালেই ছিলেন। তবে এই গ্রন্থ ভাওয়াল অঞ্চলে বসে লেখা শুরু হলেও এর শেষ কিন্তু ভাওয়ালে হয়নি। ফাদার ম্যানুয়েল ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে নাগরীর সেন্ট নিকোলাস টলেন্টিনুর পরিচালক ছিলেন। ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ২৮ আগষ্টের পূর্বেই ধারণা করা হয় কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ লিখিত হয়ে যায়। কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ উৎসর্গ করা হয়েছিল, এভোরার আর্চবিশপ মিগেল দা তাভোরাকে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ৩ মার্চ এই গ্রন্থটি কলকাতায় পাওয়া যায় এগোনেস নামের একজনের কাছ থেকে। যার মধ্যে ৩৩ থেকে ৪৮ পৃষ্ঠা, ১৫৫ হতে ১৫৮ পৃষ্ঠা, ৩২১ হতে ৩৩৬ আর ৩৭১ ও ৩৭২ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৯১। এই গ্রন্থটি মূলত গুরু শিষ্যের কথোপকথন। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের প্রায় ১০০ বছর পর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। এই বইটি মূলত ফাদারদের জন্য লেখা হয়, যারা বাংলায় ধর্ম প্রচারে আসতো, তাদের সুবিধার জন্য। কৃপা শাস্ত্রের অর্থবেদ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নীতির বিশদ ব্যাখ্যা অন্যভাগে খ্রিস্টধর্মে প্রার্থনা।

উদাহারণস্বরূপ আমরা খ্রিস্টধর্মে দুইটি প্রার্থনার কথা ধরতে পারি। যেগুলো নাগরীতে বসে প্রথম বাংলায় অনুবাদ করা হয়। বেশি করে খ্রিস্টধর্মে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের আকৃষ্ট করার জন্য। হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক এবং হিন্দুধর্মের অসারতা প্রকাশের জন্য এই কৃপা শাস্ত্রের অর্থবেদ গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল। ক্রেপার শাস্ত্রের অর্ধবেদ শব্দটি দেখলে ও বুঝতে পারি, যে হিন্দুধর্মের বেদের সমতুল্য করে এই গ্রন্থটিকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই নামকরণ নিয়ে বিস্তার আলোচনা করা যায়। এই গ্রন্থের একটি শ্লোক ছিল এমন-

"দোস্ত বেঙ্গলী, শোন পুথি

সকলের উত্তম পুথি, শাস্ত্র সকলের

উত্তম শাস্ত্র, শাস্ত্রী সকলের উত্তম,

শাস্ত্রী ক্রেপার শাস্ত্রী, ক্রেপার শাস্ত্র

এবং ক্রেপার শাস্ত্রের পুথি

এহি পুথিতে শোন মন দিয়া"

বুঝায় যাচ্ছে, সকলকে উদ্দেশ্য করে, খ্রিস্টধর্মকে মহিমান্বিত করতেই এই গ্রন্থখানা লেখা হয়েছিল। ক্রেপার শাস্ত্রের অর্ধবেদ গ্রন্থটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশটি হলো নীতির ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয় ভাগে হলো খ্রিস্টধর্মের প্রার্থনা। এর পরিচ্ছদ সংখ্যা ছিল নয়টি। যেহেতু প্রাচীন বাংলা এবং ভাওয়ালের বাংলা আমি নিজেও প্রথমে বুঝিনি। ইন্টারনেট এবং কিছু গবেষণামূলক বইয়ে বর্তমান বাংলার খোঁজ পেয়েছি।

১. স (কল কর) অনের অর্থ এবং প্রথখ্যে প্রথখ্যে বুঝান।

মানে, খ্রিস্টীয় নীতির পালনকরণের অর্থ এবং তাহার ব্যাখ্যা।

২. সিদ্ধি ক্রুশের অর্থবেদ।

মানে, ক্রুশের চিহ্নের অর্থবিচার বা ব্যাখ্যা। আমি এখনো আমাদের অঞ্চলে ক্রুশের চিহ্ন করতে গেলে সিদ্ধ শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাই।

৩. পিতার পাড়ন এবং তাহান অর্থ

মানে, খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধতা এবং তাহার অর্থ।

৪. মানি সত্য, নিরাঞ্জন, আস্থার চৌদ ভেদ এবং তাহান দিগকের অর্থ।

মানে, সত্য নিরঞ্জনের প্রতি বিশ্বাস, বিশ্বাসের চৌদ্দটি অনুচ্ছেদ তাহাদের ব্যাখ্যা।

৫. দস আগগ্যা এবং তাহান দিগের অর্থ।

মানে, দশটি আজ্ঞা এবং তাহার অর্থ।

৬. পাচ আগগ্যা এবং তাহান দিগকের অর্থ।।

মানে, পাঁচ আজ্ঞা এবং তাহার অর্থ।

৭. সাত সাক্রামেন্ট এবং তাহান দিগের অর্থ।

মানে, খ্রিস্টধর্মের সাতটি অনুষ্ঠান এবং তাহার অর্থ।

৮. আস্থার ভেদ বিচার সত্য করিয়া সিখিবার সিখাইবার উপাএ তরিবার।

মানে, বিশ্বাসের ভেদ বিচার, তাঁড়াবার উপায় তা সত্য করে শেখবার ও শেখাবার বিষয়।

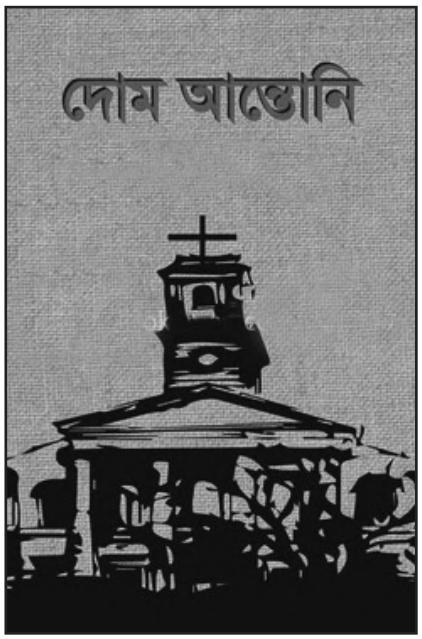

৯. পড়ন সাস্ত্র নিরালা।

মানে, নিরবে পড়বার শাস্ত্র।

এইবার আসা যাক, প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটির কথায়। "পড়ন সাস্ত্র নিরালা" মানে হলো নিরবে পড়বার শাস্ত্র। মানে, প্রার্থনা শাস্ত্র। এই প্রার্থনা শাস্ত্রেই সর্বপ্রথম প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটা পাওয়া যায়। যদিও এই ছাড়া আরো পাঁচটি প্রার্থনা এই বইতে ছিল। বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করা প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটি।

প্রাণাম মারীয়া,

কৃপাতে পুর্নিত,

তোমাতে ঠাকুর আছেন,

ধর্মী তুমি

সকল স্ত্রী লোকের মধ্যে,

ধর্ম-ফল

তোমার উদরে

যেসুস।।

সিদ্ধা মারীয়া

পরমেশ্বরের মাতা।।

ধারণা করা হয়, বাংলা ও পর্তুগীজ ভাষায় শব্দকোষ ও ব্যাকরণ নামের বইটিও নাগরীতে বসেই লেখা হয়। কারণ ফাদার ম্যানুয়েল যে সময়ে বইটি শেষ করেন, তখন তিনি ভাওয়ালেই ছিলেন। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই বইটি এভোরার আর্চবিশপ ডি. মিগলকে উৎসর্গ করা হয় এবং ফ্রান্সিস্কো দা সিলভা তা প্রকাশ করেন। এটি রোমান হরফে লেখা একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেড়টার মত আছে। একটি সম্পূর্ণ ও আরেকটি খন্ডিত। এই গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০২। প্রথম দশ পৃষ্ঠা ভূমিকা। পরের ১ থেকে ৫৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। এই বইটি নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকে ধারণা করেন, এই গ্রন্থটি ম্যানুয়েল দা আসসুম্পাসাও রচিত নয়। কারণ ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে বাংলায় চারটি সম্প্রদায় বাংলায় বাণীপ্রচার করেছেন। কয়েক জন ফাদারের নাম উল্লেখ্য করা যায়, যেমন ফ্রান্সিসকো ফার্ন্দাদেজ, ডোমিনিকা গো দা সুজা, মেইকইর দা ফনস্কো, আদ্রো বোভে, ফাদার গস্পার ডা, ফাদার আসসুম্পাসাও, ফাদার পেরেরা, ফাদার ফিগুরেডা। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাই তারা বাংলা শেখার জন্য হলেও শব্দকোষগুলো শিখেছিলেন। তাই ধারণা করা হয়, উক্ত গ্রন্থটি লেখক ফাদার আসসুম্পাসাও নাও হতে পারে। তবে সেটা অনুমান মাত্র। এমনটা নাও হতে পারে।

ভাওয়াল, তার বুকে হাজার অজানা তথ্য নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরকে বলার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে, আমাদের তার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়, লুইস প্রভাত সরকার ।

২। দোম আন্তনীও, সংগ্রাম ও সৃষ্টি, সুরঞ্জন মিদ্দে ।

৩। ইতিহাসে উপেক্ষিত, তারাপদ মুখোপধ্যায়।

৪। হিস্ট্রি অফ পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, যোয়াকিম যোসেফ এ ক্যাম্পস।

৫। এ হিস্ট্রি অফ খ্রীষ্টানীটি ইন ইন্ডিয়া, জি এম মোজেশ।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, সবিতা চট্টোপধ্যায় ।

আরো অনেক গ্রন্থ ও লেখক ।

কাউন্সেলিং

সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম

কাউন্সেলিং ল্যাটিন রুট কন্‌সিলিয়াম থেকে এসেছে, যার অর্থ "পরামর্শ"। কাউন্সেলিংকে সংজ্ঞায়িত করলে বুঝা যায় - বিশেষ এমন একটি প্রক্রিয়া যা একটি সিদ্ধান্ত বা কর্মের পথ হিসাবে দিকনির্দেশ বা পরামর্শ প্রদান করে। কাউন্সেলিং হল একটি থেরাপি। আলাপ বা কথা বলার মাধ্যম, যাতে একজন প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট কোন ব্যক্তির কথা শোনে এবং তাকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, মানসিক সমস্যা মোকাবেলা করার উপায় খুঁজে পেতে সাহায্য করে। কখনও কখনও "কাউন্সেলিং" শব্দটি সাধারণভাবে কথা বলার থেরাপির জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে কাউন্সেলিং তার নিজ অধিকারে এক ধরণের থেরাপি বা পদ্ধতি। যা ব্যক্তির নিজের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণগুলো অণ্বেষণ করতে তাদের সামগ্রিক সুস্থতার উন্নতি করতে সহায়তা করে। কারো চিকিৎসা বা নিরাময় পদ্ধতি নির্দেশনা; আলোচনা ও সাক্ষাতকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান নির্ণয়ে পেশাদারি আচরণের মাধ্যমে করণীয় নির্দেশনা হলো কাউন্সেলিং। কাউন্সেলিং এ দুই পক্ষ, কাউন্সেলর এবং যে ব্যক্তি সাহায্য চায় তাকে কাউন্সেলি বা ক্লায়েন্ট বলা হয়।

কাউন্সেলর ব্যক্তির আচরণ সংক্রান্ত সমস্যায় সহায়তা করে যেখানে ব্যক্তির আবেগ এবং প্রেরণা প্রধান। কাউন্সেলিং হল একজন ব্যক্তির সাথে মুখোমুখি সম্পর্ক। এই সম্পর্ক একজন কাউন্সেলর এবং একজন ক্লায়েন্টের মধ্যে। সর্বোত্তম কাউন্সেলিং ক্লায়েন্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কাউন্সেলিং এক ধরণের "টক থেরাপি", এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন ব্যক্তি, দম্পতি বা পরিবার, ছাত্র-ছাত্রী, গোষ্ঠী একজন প্রশিক্ষিত পেশাদার কাউন্সেলরের সাথে তাদের জীবনে যে সমস্যাগুলো এবং সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় সে সম্পর্কে কথা বলার জন্য দেখা করে। পেশাদার কাউন্সেলিং গোপনীয় এবং বিচারহীন। কাউন্সেলিং এর উদ্দেশ্য হল ইতোমধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে ব্যক্তিকে সাহায্য করা, ভবিষ্যতে সমস্যাগুলোর সংকট রোধ করা এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক, মানসিক, শিক্ষাগত এবং বৃত্তিমূলক বিকাশকে উন্নত করা। সুতরাং, কাউন্সেলিং এর প্রতিকারমূলক, প্রতিরোধমূলক এবং উন্নয়নমূলক দিক রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং প্রয়োজন হয় যেমন - বিবাহ কাউন্সেলিং, পারিবারিক কাউন্সেলিং, শিক্ষাগত কাউন্সেলিং এবং পুনর্বাসন কাউন্সেলিং।

কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় মৌলিক পর্যায়:

১) ক্লায়েন্ট ও কাউন্সেলর এর মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা;

২) উপস্থাপনকারী সমস্যা বা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়ন;

৩) কাউন্সেলিং বা চিকিৎসার লক্ষ্য চিহ্নিত করা,

৪) একত্রে চিন্তাভাবনা আদান-প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন;

৫) পরিকল্পনা, সমাপ্তি এবং ফলো-আপ।

কাউন্সেলিং এর প্রধান লক্ষ্য হল কাউন্সেলর ক্লায়েন্টদের চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গভীর মনোযোগ সহকার শুনে থাকেন। স্বাস্থ্যকর উপায়ে তাদের আবেগ প্রক্রিয়া প্রকাশ করতে এবং প্রয়োজনীয় সংস্থান এবং পরিসেবাগুলোর সাথে ক্লায়েন্টদের সংযোগ করতে সহায়তা করেন। কাউন্সেলিং লক্ষ্যের মধ্যে থাকতে পারে আচরণ সামঞ্জস্য করা, অভ্যাস দূর করা, অবস্থার চিকিৎসা করা, মোকাবিলা করার পদ্ধতির উন্নতি করা এবং ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া। কাউন্সেলিং গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রশিক্ষিত পেশাদারদের দ্বারা প্রদত্ত কাউন্সেলিং ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিসেবাটি লোকদের জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে হাল ধরতে সাহায্য করে, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু, বিবাহবিচ্ছেদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্কুলের চাপ, চাকরি হারানো এবং সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি।

কাউন্সেলিং এর মৌলিক দক্ষতা:

কাউন্সেলরগণ ক্লায়েন্টদের চিন্তাভাবনা, আবেগ, এবং অভিজ্ঞতাগুলো অন্বেষণ করার জন্য একটি নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ স্থাপন করে দেয়। কয়েকটি মূল কাউন্সেলিং দক্ষতা: (১) সক্রিয় শ্রবণ এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা। একজন কাউন্সেলর হিসাবে, কাউন্সিলিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ক্লায়েন্টদের শোনা, সম্মানিত এবং বৈধ বোধ করতে সহায়তা করা। (২) প্রশ্ন করার ক্ষমতা। কাউন্সেলরদের শোনার ক্ষেত্রে যতটা দক্ষ হতে হবে ততটাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা রাখতে হবে। (৩) তথ্য ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা। ক্লায়েন্ট যতটা সহভাগিতা করেছে, ততটাই শোনা ও প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি ও বিশ্লেষণ করা। ক্লায়েন্টের মুখে কাউন্সেলরের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা শব্দ অনুপ্রবেশ না করা। (৪) বিশ্বস্ততা অত্যন্ত জরুরী। তার অভিজ্ঞতার গোপনীয়তা রক্ষা করা। কারণ সহভাগিতার গোপনীয়তা ও পবিত্রতা অবিচ্ছেদ্য। কাউন্সেলর বিশ্বস্ততার সাথে গোপনীয়তা ও পবিত্রতা রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

(৫) সহানুভূতি। যখন ক্লায়েন্ট তার চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি সহভাগিতা করে, তখন কাউন্সেলর কোনভাবেই তার নিজস্ব অনুভূতি, অভিজ্ঞতায় যেন হারিয়ে না যান বা সহভাগিতা না করেন। সক্রিয়ভাবে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে শুনতে হবে, যেন ক্লায়েন্ট তার স্বস্থির জায়গাটা খুঁজে পায়। বিশপ থিউটনিয়াস বলেন, "শোনার মানুষ হল সোনার মানুষ।" অনেকেই নিজের কথা বলতে বেশি ভালোবাসে; কিন্তু অন্যের কথা শোনার মত ধৈর্য খুবই কম বা নাই বললেই চলে। কাউন্সেলর এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে একটি সহযোগিতা যেখানে সমস্যাযুক্ত সমস্যাগুলোর চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কৌশল ব্যবহার করা হয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাউন্সেলিং জীবনের মান উন্নত করার একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সহানুভূতি, সক্রিয় শ্রবণ এবং বিচারহীন মনোভাবের মধ্যে নিহিত সঠিক কাউন্সেলিং ক্লায়েন্টকে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা গ্রহণে সহায়তা করে।

কাউন্সেলিং কাদের জন্য প্রয়োজন?

যখন একজন ব্যক্তি দুঃখ, হতাশা, ঘন ঘন উদ্বেগ, একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য দৈনন্দিন কাজকর্মে অসুবিধার মতো নেতিবাচক আবেগ অনুভব করেন এবং এটি মোকাবেলা করতে পারেন না, তখন তারা পূর্বে নির্ধারিত সময় নিয়ে কাউন্সেলরের কাছে যেতে পারেন। কাউন্সেলিং হল একটি থেরাপিউটিক প্রক্রিয়া যেখানে একজন প্রশিক্ষিত পেশাদার কাউন্সেলর, একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা অন্বেষণ এবং পরিচালনা করতে সহায়তা করে। এই সমস্যাগুলো মানসিক স্বাস্থ্যের উদ্বেগ থেকে শুরু করে মানসিক অসুবিধা, জীবনের চ্যালেঞ্জ বা ব্যক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্য পর্যন্ত হতে পারে।

পরিবারিক জীবনে কাউন্সেলিং:

বর্তমানে বিশ্বে নানা বিপদজনক ঝুঁকির মধ্যে পরিবারের সম্পর্ক ভাঙ্গন একটি ভয়াবহ বিপদ বা ঝুঁকি। বিবাহিত মানুষের সমস্যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানবীয় জীবনে লক্ষ্যণীয়। যেমন: টাকা-পয়সা, শ্বশুরবাড়ি, ক্ষয়কারী ব্যক্তিগত অভ্যাস, যৌন সমস্যা। ম্যারেজ কাউন্সেলিং একটি সালিশ, যেন কোন বিরোধী দুই দল বা দেশের মধ্যে মিমাংসা করার মত। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী যখন সহজ জীবনযাপন করে এবং নিজের মেজাজকে সংযম করে, একটি ফলনশীল স্বভাব পরিচর্যা করে তারা পরিবারে মহান ভাল কাজ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু লোক এই সহজ পথ খুব কম বেছে নেয়। কারণ সমস্যার সমাধান যুক্তি দর্শানোর মধ্যে নিহীত থাকে না, এমনকি যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তির মধ্যেও না। কেননা সমস্যার মূল উৎস হল আবেগ ও অনুভূতি। যাহোক, আবেগ যুক্তিসঙ্গত সমাধান এবং শান্ত কথোপকথনের জন্য তাদের মানসিক কারণগুলো তাদের ক্ষমতাকে বাঁধা দেয় ও বন্ধ করে রাখে। স্বামী স্ত্রী সচেতন থাকলে নিজেরাই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে, এমনকি যৌথ পরিবারের, আত্মীয়ের মধ্যের সমস্যারও সমাধান করতে পারে। কিন্তু হতাশাজনক যে তারা সেই যুক্তিসঙ্গত সমাধান করতে নারাজ। ম্যারেজ কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব হলো দম্পত্তির আবেগ যা তাদের মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন ও বাধার সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা অন্বেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সাথে যুক্তিকে পুনরায় একত্রিত করতে সহায়তা করে। কাউন্সেলর ম্যারিড কাপলদের সমস্যার সমাধান খুঁজেন না, শুধু তাদের সমস্যা শুনেন না বরং তাদেরকে শুনেন, তাদের জীবন শুনেন। কারণ তারা তাদের অনুভূতি বাছাই করার এবং নিজেদের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন যেন আমরা পরিবারে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শুনি। আমরা পরস্পরের কথা শুধু কান দিয়ে না শুনে বরং হৃদয় দিয়ে শুনি। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা শোনার, তাদের সময় দেওয়ার জন্য খুব কম মানুষ থাকে। কারণ নানা কর্মকাণ্ডে নিজের অজান্তে সময় অতিবাহিত হয়। ফলে পরিবারে অনেকেই অবহেলিত হয়। অনেক সময় পিতামাতাগণ সংসারের কাজকর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, সন্তানদের সাথে সময় কাটানো হয়ে উঠে না। সন্তানেরা তাদের সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা পিতামাতার সাথে সহভাগিতা করতে পারে না। অনেক সময় তারা ঘরে ও স্কুলে নেতিবাচক আচরণ করে। আর যুবক-যুবতীরা পিতামাতার কাছে তাদের কথা শোনার ও সহভাগিতা করার পরিবেশ ও সময় না পেয়ে স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অসৎ সঙ্গীর সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা সঙ্গদোষে নানা প্রকার অনৈতিক পন্থা বেছে নেয় এবং সময় অতিবাহিত করে। এতে তাদের পড়ালেখায় যথেষ্ট ক্ষতি হয়। জীবন রসাতলে যায়। যদি সেখানে পিতামাতা পরস্পরের কথা হৃদয় দিয়ে শুনে এবং সন্তানরা সেটা লক্ষ্য করতে পারে, তবে সন্তানেরাও পিতামাতার কথা শুনতে শিখে। বাড়ীতে ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদা, জেঠা-জেঠীমা, কাকা-পিসিদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। সেই পরিবারে সকলে একটি সুস্থ সুন্দর পরিবেশে বৃদ্ধি পাবে। পরিবার যদি একটি বীজতলা হয়, তবে বিদ্যালয় হয় প্রথম কাউন্সেলিং বা পরামর্শ কেন্দ্র।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনেকের ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার সুব্যবস্থা রাখে। যে সমস্ত শিশুরা নানাভাবে ভুগছে তাদের সহভাগিতা শুনে তাদের শোক অনুভব করে একজন কাউন্সেলর তার শোক নিরাময়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অনেক সময় ছাত্র ছাত্রী তাদের সমস্যার সমাধান খোঁজে। সমস্যার উৎপত্তির কারণ বহুলাংশে পরিবারে, যেখানে পারস্পারিক সুসম্পর্কের অভাব রয়েছে। অনেক সময় তারা নিজেরা অপ্রাপ্ত বয়সে বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আবার পরিবারের পিতামাতার কাছ থেকে পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপের সম্মুখিন হয়। কখনো লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্য কোন কো-কারিকুলাম বা খেলাধূলায় অংশ নিতে পরিবার থেকে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী পরস্পরের নিকট বুলিং বা ঔদ্ধত্য আচরণে মানসিকভাবে আহত হয়। তখন তারা একটি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। কাউন্সেলিং হল এমন একটি পরিবেশ, এখানে কিছু মূল দিক রয়েছে: সহায়ক এবং সহানুভূতিশীল; কাউন্সেলিং একটি নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ প্রদান করে যেখানে ক্লায়েন্টরা তাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং উদ্বেগ নিরাপদে প্রকাশ করতে পারে। কাউন্সেলর সহানুভূতি এবং বোঝাপড়া দেখায়, ক্লায়েন্টদের নিজস্ব আবেগ এবং অভিজ্ঞতাগুলো অন্বেষণ করার জন্য একটি অবিচারযোগ্য স্থান তৈরি করে।

কাউন্সেলরের প্রাথমিক ভূমিকা হল ক্লায়েন্টদের নেতিবাচক নিদর্শন, প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং জীবনের মান উন্নত করার মাধ্যমে তাদের মনোসামাজিক কার্যকারিতার সর্বোত্তম স্তরে পৌঁছাতে সহায়তা করা। তিনি এমনভাবে প্রশ্ন করেন যেন ব্যক্তি নিজেই তার সমাধানের কিছু উপায় খুঁজে পেতে পারে। কাউন্সেলিং সেশন চলাকালে যতদূর সম্ভব "কেন" প্রশ্ন পরিত্যাগ করতে হবে। 'কেন' প্রশ্নটি ব্যক্তির মনে ভয় সঞ্চার করতে পারে। সেজন্য 'কি' বা 'কিভাবে' প্রশ্ন করলে ক্লায়েন্ট নির্ভয়ে তার মনোভাব, অভিজ্ঞতা, আবেগ সহভাগিতা করতে পারে। যেসব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' সেসব প্রশ্নও বর্জন করলে ভালো।

কাউন্সেলিং এর উদ্দেশ্য:

কাউন্সেলিং এর অনেকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে যেমন:

(১) ব্যক্তিকে তার মতামত শেয়ার করার, শোনার এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করার সুযোগ দেওয়া।

(২) সমস্যাগুলোর চারপাশে স্পষ্টতা প্রদানে সহায়তা করা।

(৩) ব্যক্তির একটি পছন্দসই ফলাফলের দিকে কাজ করতে সাহায্য করা।

(৪) ব্যক্তিগত বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা।

কাউন্সেলিং হল একটি "Bs" "ing" শব্দ: এটি এমন একটি ক্রিয়াকলাপ বা ক্রিয়াকলাপগুলোর সিরিজ নির্দেশ করে যেখানে সাহায্যকারী এবং ক্লায়েন্ট চলমানভাবে জড়িত। যাহোক, ক্রিয়াকলাপের মূল্য কেবলমাত্র সেই মাত্রায় রয়েছে যা এটি ক্লায়েন্টের দৈনন্দিন জীবনে মূল্যবান ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। যদি সাহায্যকারী এবং ক্লায়েন্ট কার্যকরভাবে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হন, তাহলে মূল্যবান কিছু থাকবে যা সাহায্যকারী সেশনের আগে ছিল না।

পরিশেষে বলা যায়, কাউন্সেলিং গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সুযোগ আপনাকে আপনার জীবনে সুস্থতা এবং ভারসাম্য ফিরে পেতে সাহায্য করতে পারে। কাউন্সেলিং প্রায়ই ক্লায়েন্টদের আরও স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে এবং আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। থেরাপির মাধ্যমে ক্লায়েন্টরা অনুপ্রাণিত, আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, যার ফলে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বজায় রাখতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

মোবাইল আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে যা কেড়ে নিয়েছে

জেম্‌স গমেজ (আদি)

মোবাইল বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এক অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। মোবাইল ছাড়া আমাদের জীবনে একটি দিনও থাকা অসম্ভব। মোবাইল ছাড়া এক ঘণ্টা থাকাটাও বেশ কষ্টের ও অস্থিরতার ব্যাপার। ছোট শিশু থেকে বয়োজেষ্ঠ মানবজাতির প্রায় সকলেই মোবাইলে দিনের পর দিন আসক্ত হয়ে পড়েছে। মোবাইল আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে বিশেষ করে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ভূগোল, মিডিয়া ফেসবুক, ইনস্ট্রাগ্রাম, হোয়াট্‌স এ্যাপ, ই-মেইল এমনকি বিশ্বের অপর পার্শ্বে ম্যাসেঞ্জারে কিংবা হোয়াট্‌স এ্যাপে ফ্রিতে কথা বলাটা ও ফেইজটাইম করাটা অসাধারণ। জীবনটা অতি সহজ করে দিয়েছে এ মোবাইল। মোবাইলটা যা ভাবে আমাদের জীবনটাকে পৃথিবীর অনেক কাছে এনে দিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মোবাইল আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে অচল করে দিয়েছে। আমি এখন সেই কেড়ে নেয়া, অচল করে দেয়া বস্তুগুলো সহভাগিতা করব।

১. রেডিও: রেডিওতে গান শোনা খুবই কমে গেছে। আগে গৃহিনীরা ঘড়ের কাজ কর্ম শেষ করে দুপুরের আহারের পরে রেডিওতে গান শুনতেন। সবার হাতে মোবাইল থাকাতে আজ আমরা মোবাইলেই গান শুনে থাকি। আজ এ মোবাইল রেডিওকে অচল করার পথে ঢেলে দিচ্ছে।

২. টেলিভিশন: আগের দিনগুলোতে পরিবার পরিজন মিলে নাটক-সিনেমা, খবর এবং অন্যান্য শোগুলো দেখাটা কি মজার ছিল। এখন সবার হাতে মোবাইল থাকাতে যার যার মত করে মোবাইলে শো দেখি। একসাথে বসে টেলিভিশন দেখাটা কমে গেছে। দোকানে টেলিভিশনের দাম কমে গেছে বলতে গেলে অচলের পথে।

৩. পত্রিকা: ছোটবেলা দেখতাম দাদু-নানা, বাবা, জ্যেঠু-কাকাদের পত্রিকা পড়তে। তারা পত্রিকা পড়ার পর হেড-লাইনগুলো পরিবারের সকলের সাথে সহভাগিতা করতেন। মোবাইল সবার হাতে হাতে থ াকাতে এখন আর পত্র পত্রিকা পড়ার সংখ্যা কমে গেছে। মানুষ এখন অনলাইনে খবর পড়ে কাজেই পত্রিকাকে অচলের পথে ঢেলে দিচ্ছে।

৪. সিনেমা হল: আগের দিনগুলোতে মানুষ পরিবার পরিজন নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতো। মোবাইল সবার হাতে আসার পর মানুষ আর তেমন সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখে না। ভালো ভালো সিনেমাগুলো এখন আর হল পূর্ণ হয় না। মোবাইলে এখন সিনেমার ছবি দেখা যায় বলে এ সিনেমা হলগুলো অচলের পথে।

৫. ক্যামেরা: মোবাইলে ছবি তোলা খুবই সহজ আর সে ছবি খুবই সহজভাবে

আপলোড করা যায় বিভিন্ন মিডিয়াতে। ক্যামেরার ব্যবহার আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। দিনে দিনে এ ক্যামেরাও অচলের পথে যাচ্ছে।

৬. ঘড়ি: মোবাইল হাতে হাতে থাকাতে ঘড়ি ব্যবহারও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। বাড়ীতে দেয়াল ঘড়ির কদরও কমে গেছে, কটা বাজে জানতে চাইলে মোবাইলে চোখ পড়ে প্রথমে। হাত ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ির কদর বেশ কমে যাচ্ছে।

৭. টর্চলাইট: আগের দিনগুলোতে গ্রামের বাড়ীতে গেলে দেখা যেত রাতের বেলায় ঘরের বাইরে গেলে সবাই টর্চলাইট ব্যবহার করছে। বর্তমানে সবার হাতে হাতে মোবাইল থাকাতে সবাই মোবাইলের লাইট ব্যবহার করছে তাই এ টর্চলাইটও দিনে দিনে অচল হয়ে আসছে।

৮. সিডি, ভিসিডি: সিডি ও ভিসিডিতে গান শোনা, সিনেমা দেখা কি মজাই না ছিল। হায়রে! মোবাইল হাতে হাতে আসার পর এ সিডিতে গান শোনা ভিসিডিতে সিনেমা দেখা আর হয় না। এ মোবাইল সিডি, ভিসিডিকে অচল করে দিয়েছে।

৯. রাতের ঘুম: হাতে হাতে মোবাইল থাকাতে এবং অতিরিক্ত ব্যবহারে অনেক মানুষের রাতের ঘুম নষ্ট করছে। এতে বেশী রাত জাগার অভ্যাসে যেমন পরিণত করছে, তেমনি শরীরের ক্ষতিও করছে বটে।

১০. পড়ালেখা ঘর: এ মোবাইল সবার হাতে হাতে থাকাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের কারণে পড়ালেখার বেশ ক্ষতি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের।

১১. সময়: হাতে হাতে মোবাইল থাকাতে আর তা অতিরিক্ত অপব্যবহারে মানুষ দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রচুর সময় নষ্ট করে যাচ্ছে। সে সময়টা পরিবারের সবাই মিলে কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনা করত যে, সময়টা মোবাইলে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ মোবাইল সময়ের অপব্যবহার করাচ্ছে।

১২. সংসার ভেঙে যাচ্ছে: এ মোবাইল সবার হাতে হাতে থাকাতে অনেক মানুষ তা অপব্যবহার করছে। ফেসবুক, হোয়াটস-অ্যাপ, ম্যাসেনজারে বিবাহিত স্ত্রী কিংবা যুবতী মেয়েরা, বিবাহিত স্বামী কিংবা যুবক ছেলেরা প্রচুর পরিমাণে অ্যাপসের অপব্যবহার করছে এবং পরকীয়ায় লিপ্ত হচ্ছে। বাড়ির আশেপাশে তাকালে প্রচুর দেখা যাবে যে এ মোবাইলের অপব্যবহারের কারণে এ সুখের সাজানো পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। সত্যি খুবই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা।

মোবাইল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীকে যেমন হাতে মুঠোয় এনে দিয়েছে। তেমনিভাবে এ মোবাইল অপব্যবহারে আমাদের সমাজের হাজার হাজার পরিবার ভেঙে দিচ্ছে। মোবাইল সদ্ব্যবহারে নিজেদেরকে সতর্ক রাখলেই আমরা রক্ষা করতে পারব আমাদের সুখের-সংসার ও পরিবারগুলোকে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ

পেট্রিক গনসালভেস্

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আন্তনী পিউরিফিকেশন- এর সাথে আগরতলা মরিয়ম নগরে মিশনে একমাস অবস্থান এবং কিছু প্রাসঙ্গিক কথা-

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ১৪ আগস্ট, বাড়ি থেকে র্ওনা দিয়ে আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু মুক্তিযুদ্ধে যোগ দে্ওয়ার জন্য আখাউড়া বর্ডার দিয়ে অতিক্রম করে আগরতলা ভ্রমণ করি। আমরা দালালদের সাথে আগরতলা দিয়ে কংগ্রেস ভবনে উঠি। কংগ্রেস ভবন থেকে আমাদের গোমতি ক্যাম্পে নেওয়া হয় ট্রেনিং এর জন্য। ১৫ দিন ট্রেনিং নিতে থাকি আমাদের ক্যাম্পে এর মধ্যে অনেক পাকিস্তানি গুপ্তচর লুকিয়ে ছিল এবং রাত্রে বিশেষভাবে মাইক দিয়ে ঘোষণা দিয়ে কোথায় যেন নেওয়া হত। এমন একদিন রাত্রে আমাকে ক্যাম্প এর একজন মাইক দিয়ে বললো "পেট্রিক গনসালভেস্, পিতা তেধর্নী গনসালভেস্ কোথায় আপনি, তাড়াতাড়ি আমাদের ক্যাম্প এর সেক্রেটারির সাথে দেখা করেন"। তখন আমি ভয় পেয়ে গেলাম হয়ত কোন বিপদ আমার। বাহিরে এসে দেখি কয়েকজন বড় বড় নেতা তারা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র। তাদের সাথে আন্তনী কাকা। আন্তনী কাকা আমাকে বলে যে চল আমার সাথে। তখন বললাম, "কোথায় কাকা?" বললো, "মরিয়ম নগর মিশন।"

আন্তনী কাকার সাথে মরিয়ম নগর মিশনে যাই এবং তৎকালীন মিশনে পাল-পুরোহিত কানাডিয়ান ফাদার জর্জ এবং একজন কেরালীজ ফাদার মেথিডসের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ফাদার বলেন, আমাকে যেন দেখে শুনে রাখে। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, সেই সময় একদিন সন্ধ্যা বেলায় টংগীর শাহাজাহান সাহেব বলেন, "আন্তনী দেশে যাই। আমরা অপারেশন করে আসি।" আরো বলে যে, "তোমাদের বাড়ীতে সবাই ভাল আছে। তাদের জন্য কোন চিন্তা করো না।" কিছু দিন পর কাকা ট্রেনিং এর জন্য ভারতে বিখ্যাত "মিলিটারী ট্রেনিং" সেন্টার দেরাদুন ট্রেনিং সেন্টার থেকে ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশে যাবে। তখন আমার মন খারাপ হয়ে গেল এবং আমাকে বললো যে, দেরাদুন যাওয়ার আগে তোর একটা ব্যবস্থা করি। বার বার বলতো তোর স্বাস্থ্য দুর্বল কাজেই তুই ট্রেনিং নিতে পারবি না। কোন কিছু হলে তোর মাকে কী জবাব দেব। আন্তনী কাকা খুব দুরদর্শী ছিলো। সে যা মুখে বলত তা বাস্তবায়ন করত। একদিন হঠাৎ বিকেল বেলা আমাকে বলে যে, চল আমার সাথে তোকে নিয়ে এক জায়গায় যেতে

Mariamnagar Catholic Church

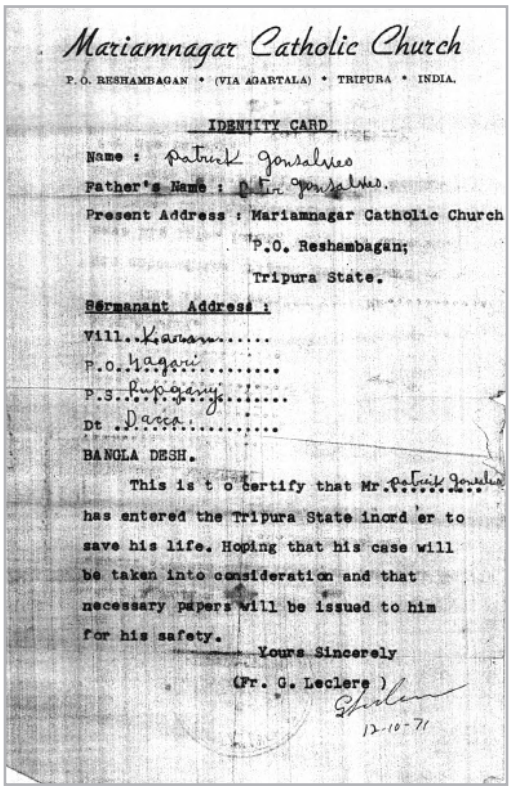

P. O. RESHAMBAGAN • (VIA AGARTALA) • TRIPURA • INDIA.

IDENTITY CARD

Name : Patrick Gonsalves

Father's Name : [illegible] Gonsalves.

Present Address : Mariamnagar Catholic Church
P.O. Reshambagan;
Tripura State.

Sermanant Address :

Vill. Karan......

P.O. Nagari..........

P.S. Rupganj..........

Dt . Dacca..........

BANGLA DESH.

This is t o certify that Mr. Patrick Gonsalves has entered the Tripura State inord er to save his life. Hoping that his case will be taken into consideration and that necessary papers will be issued to him for his safety.

Yours Sincerely
(Fr. G. Leclere)
12-10-71

হবে। আমাকে নিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার এক থানায় নিয়ে যায়। উক্ত থানার অফিসার দিয়ে আমাকে তখনকার কলকাতা যওয়ার জন্য শরনার্থী কার্ড ইস্যু করেন। তখন আমি ভয় পেলাম কি করে কলকাতা যাব। আন্তনী কাকা আমাকে সাহস দিয়ে বলল যে, তোর কোন ভয় নাই। আমি তোকে ধর্মনগর পৌছে দেব। ধর্মনগর আগরতলা থেকে ১২০ কিলোমিটার দুরে। আন্তনী কাকা আমাকে ধর্মনগর পৌছাবার পর বলে যে, তুই দেরী কর; আমি রূপগঞ্জ থানার কোন শরনার্থী পাই কিনা। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে আমার দলে পেয়েছি, রূপগঞ্জের শরনার্থী গাড়ারিয়া গ্রামের বিশ্বনাথ। এখানে উল্লেখ্য, আমি বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য শরনার্থীর সাথে কলকাতায় চলে যাই এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে আন্তনী কাকাকে স্মরণ করি।

প্রত্যেক দিন বিকেলে আন্তনী পিউরীফিকেশন, ফাদার লেকলায়ের সাথে দেখা করতেন এবং সহকারি পাল-পরোহিত ফাদার থেথিউস এর সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেক কিছু আলোচনা করতেন। তৎকালীন সময়ে মরিয়ম নগর মিশনে রাঙ্গামাটিয়া মিশনের চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু, মি আলবার্ট পি. কস্তা, হারবাইদ এবং মি আন্তনী ডায়েস, চট্টগ্রাম ও আন্তনী পিউরিফিকেশন, করান; তারা সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতেন।

এখানে উল্লেখ্য যে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ (চার) ছাত্র নেতা যথা: (১) শাহাজাহান সিরাজ (২) নূরে আলম সিদ্দিক (৩) আসম আবদুর রব এবং (৪) আব্দুল কুদ্দুস মাখন তাদের সাথে মি পিউরিফিকেশন, Liaison Maintain করে উক্ত চার নেতার সাথে আগরতলায় শ্রীধন ভিলায় সব সময় যোগাযোগ রাখতেন। মি আন্তনী পিউরিফিকেশন, টঙ্গীর শাহাজান (কমান্ডার) তারা দুইজনে মিলে একসাথে হানাদার বাহিনী অর্থাৎ পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সরাসরি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করে।

দেশ মুক্ত এবং স্বাধীনের পর দেশে প্রথম করানের কেলু কাকার কাছে জানতে পারলাম যে, আমাদের আন্তনী কাকা আর নেই। ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র জমা দেওয়ার সময় গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। এখানে উল্লেখ্য এবং স্মরণীয় যে প্রয়াত আন্তনী পিউরীফিকেশন বীর মুক্তিযোদ্ধা শুধু আমাদের করান গ্রামের গৌরব নয়। প্রয়াত শহীদ আন্তনী পিউরীফিকেশন সমস্ত বাংলাদেশের গৌরব। আজকের দিনে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সকলের পক্ষ থেকে তার বিদেহী আত্মার পাশাপাশি তার পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করি।

জন্মশতবর্ষের স্মরণে ও অভিজ্ঞানে
বাংলা গদ্যের লেখক ও যিশুসংঘের যাজক: দুইয়ের সার্থক সমন্বয়ক পল দ্যতিয়েন

ফাদার প্রদীপ পেরেজ এসজে

বঙ্গদেশে এসে অনেক মিশনারিজ বাংলাভাষা শিখেছেন, বাংলা ভাষায় অনুবাদ, গবেষণা ও লেখালেখি করেছেন। তবে বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম টান ও দরদ থেকে যিনি এই ভাষাকে মগজ ও অন্তরে ধারণ করে নিজের ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতাসমূহের বাহন হিসাবে লেখনীকে প্রয়োগ করে খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন; তিনি ফাদার পল দ্যাতিয়েন। সংক্ষেপে ফাদার দ্যতিয়েন। 'খাঁটি বাংলা লেখক' বলে যদি কোনো অভিধান বা প্রকাশভঙ্গি থাকে, তবে সেটা ফাদার দ্যতিয়েনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর মৌলিক রচনাবলি কিংবা গ্রন্থসংখ্যা কম হলেও সেগুলো ভাষার উৎকর্ষে অভূতপূর্ব। সাহিত্যগুণে কালোত্তীর্ণ। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের এমন রসাল ও চৌকস ব্যবহার খুব কম লেখকই করতে পেরেছেন। স্বনামধন্য অনেক বাঙালি লেখকের কাছে এক ঈর্ষণীয় নাম ফাদার দ্যতিয়েন। অথচ আদতে তিনি একজন ফরাসিভাষী বেলজিও যিশুসঙ্গী যাজক।

ইউরোপের ছোট্ট দেশ বেলজিয়ামের রসফর নামক জায়গায় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন পল দ্যতিয়েন। তাঁর বাবা ফেরনোঁ দ্যতিয়েন ছিলেন বন বিভাগের সরকারি কর্মচারি। অত্যন্ত সৎ এবং একজন রাশভারী লোক। অন্যদিকে মা এলজা দ্যতিয়েন ছিলেন সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। তবে বাবা ও মা দু'জনের জীবনই দ্যাতিয়েনকে প্রভাবিত করে। তাঁর নিজের কথায়, "মা ছিলেন ধর্মপ্রাণ মহিলা। সব মানুষের প্রতি তাঁর মমতা ও ভালোবাসা ছিল অসীম। আমার শৈশব ও যৌবনের জীবনযাপনে মা ও বাবার বিরাট ভূমিকা ছিল। ... সন্ন্যাস-জীবন নেওয়ার পিছনে পারিবারিক প্রভাব ছিল। আমরা পাঁচ ভাই-ই খ্রিস্ট-সন্ন্যাসী। পরিবারটাই তো ধর্মপ্রাণ।" পারিবারিক পরিবেশ ও শক্ত কাথলিক মনোভাবের জন্য তিনি রসফরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাঁ শহরে যিশুসঙ্গীদের পরিচালিত 'নত্র-দাম দ্য বেলভ্যু' নামক স্কুলে ও কলেজে পড়াশুনা করেন। বাবা-মার প্রেরণা এবং জেজুইট ফাদারদের সান্নিধ্যে তিনি দিনাঁ থাকতেই মনের গভীরে ধর্মযাজক হবার আহ্বান শুনতে পান। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের, ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি আলোঁ শহরের কাছাকাছি গির্শ নামক গ্রামে যিশুসংঘের নব্যালয়ে প্রবেশ করেন। তার দুই বছর পরে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর নাম্যুর শহরের উপকণ্ঠে লা পেরেল নামক আশ্রমে যিশুসংঘে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। পরের দুই বছর তিনি এগেন হোভেন কলেজে ভারতত্ত্ব ও ইংরেজি ভাষা চর্চা করেন। তারপর ১৯৪৬-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেলজিয়ামের বিখ্যাত লুভ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কলকাতা আসার পর তাঁকে উইলিয়াম কেরির স্মৃতি-বিজড়িত শ্রীরামপুরে পাঠানো হয় বাংলাভাষা শেখার জন্য। ফাদার দ্যতিয়েনের বাংলা শিক্ষক ছিলেন অন্দ্রে দোঁতেন নামে আরেক ফরাসিভাষী যিশুসঙ্গী। বাংলা রপ্ত করার পর

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাসন্তী সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক হিসাবে রিজেন্সি করেন। তারপর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে হিমালয়ের পাদদেশে কার্সিয়াঙ সেন্ট মেরিস্ কলেজে ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন শেষে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ সেপ্টেম্বর সেখানেই যাজকপদে অভিষিক্ত হন। ফাদার দ্যতিয়েন ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেন। সেখানে থাকতেই তিনি একদিন খেয়ালের বশে 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বনেদি পত্রিকা 'দেশ'-র দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। সম্পাদক সাগরময় ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে এই বিদেশি আগন্তুকের বাংলা রচনার মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর লেখার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। দুই বছরে তিনি ১০০টি কিস্তি সম্পন্ন করেছেন। সেখান থেকে ৩৬টি রচনা নিয়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ পাবলিশার্স 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করে।

তারপর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'অমৃত' পত্রিকায় 'রোজনামচা' নামে কলাম লেখা শুরু করেন ফাদার দ্যতিয়েন। চলে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সেখান থেকেও ৩৩টি রচনা বাছাই করে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে অনন্য প্রকাশন প্রকাশ করে 'রোজনামচা' নামে গ্রন্থ। 'রোজনামচা' মূলত ফাদার দ্যতিয়েনের বাংলাদেশ ভ্রমণের ওপর লেখা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানে যান। তিনি প্রায় ছয় মাস সময় সেখানে কাটান। বাংলাদেশে তিনি লক্ষ্মীবাজার গির্জায় এবং রমনার বিশপ ভবনে থাকতেন। সেই সময় তিনি প্রায় সারা বাংলাদেশেই ঘুরে বেড়িয়েছেন। রচনার রসদ তিনি পেয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় ও নানা মানুষের সান্নিধ্যে। ফাদার দ্যতিয়েন যখন বাংলাদেশের বিষয়ে অভিনিবেশ করেন, তখন তাঁর ভাষা পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন তিনি আরবি-ফারসি শব্দাবলী মিশ্রিত এক মজার গদ্য রচনা করেন। 'রোজনামচা'য় তাঁর রচিত নিবন্ধগুলোর মধ্যে 'বিবিরা ভোট দেবে না', নজরানা চাই ... গান করুন', 'জাকির মিয়ার আস্তানায়', 'খুদা হাফিজ', 'ঢাকার কড়চা', 'ইউসুফ ও জোলেখা', 'কমল ও কামাল', 'বেহেস্তি সাহিত্যের কথা', 'আল্লাহ আকবর', 'শামিম আরা', 'বিদেশিনী' প্রধান। এসব রচনার মধ্যে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ, মাটি আর সংস্কৃতির এক অপরূপ আলেখ্য আবিষ্কার করি। সেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধ মিলেমিশে রচনাগুলিকে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, সৈয়দ মুজতবা আলির পরে ফাদার দ্যতিয়েনের মতো আরবি-ফারসি শব্দ সমাহারে বাংলা সাহিত্য রচনা করার মতো লেখক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মানবিকবিদ্যায় ভারতের জাতীয় আচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ফাদার দ্যতিয়েনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন: "ফাদার দ্যাতিয়েন বিদেশি হইলেও বাংলাভাষার এক অদ্ভুত শক্তিশালী লেখক। ... আমাদের মাতৃভাষা বাংলার অন্তর্নিহিত এই সমস্ত লুক্কায়িত শক্তি তিনি আবিষ্কার করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি ফরাসিভাষী বিদেশি, মানুষের প্রতি তাঁহার অপরিসীম

অনুকম্পা ও সহানুভূতি, মনের মধ্যে ব্যথায় যে মানুষ গুমরিয়া উঠিতেছে তাহার সম্বন্ধে তাঁহার এই অপরূপ দরদ আর ধর্ম-বিষয়ে তাঁহার সাধারণ মানবিকতাবোধ, সবপ্রকার গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে তিনি মানুষের সেবায় এবং ধর্ম নির্বিশেষে সর্বভূতে তাঁহার মৈত্রীর জন্য এবং বিশেষ করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গে তাঁহার বঙ্গভাষার সেবার জন্য, আমি তাঁহাকে ... সাধুবাদ দিতেছি।"

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট হাজারিবাগে যিশুসংঘে পরম ব্রত গ্রহণের প্রস্তুতির পর 'আমাদের জীবন' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। পত্রিকাটি যিশুসংঘের পরিচালনায় কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের কাথলিকপন্থী খ্রিস্টানদের মুখপত্র হিসাবে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেছিলেন প্রথিতযশা বাংলাভাষাবিদ ফাদার অঁদ্রে দোঁতেন এস. জে.। ফাদার দ্যতিয়েন দায়িত্ব নেবার পর থেকেই পত্রিকার গুনগত মান বেড়ে যায়। সেখানে নানা বয়সের মানুষের জন্য নানা ধরণের রচনা প্রকাশিত হতো। সেগুলো মূলত খ্রিস্টীয় জীবনাচরণের নানা দিক, খ্রিস্টীয় ইতিহাস ও বিশ্বাসের বিভিন্ন কাহিনি ও তত্ত্ব নির্মল হাস্যরসের আধারে পরিবেশিত হতো। ফাদার দ্যতিয়েন একাই অধিকাংশ রচনা লিখতেন। তাই তাঁকে একাধিক ছদ্মনাম ধারণ করতে হয়েছে। তাঁর নিজের পারিবারিক নাম পল দ্যতিয়েনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যতীন পাল নামে লিখেছেন। আবার একইভাবে তিনি উৎপল দত্ত রায় নামটি নিয়েছিলেন, তবে সেটা তাঁর নিজের নামের অনুসারী, কিন্তু নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তকে বাদ দিয়ে। অন্যদিকে কলকাতা সেন্ট মেরিস্ স্কুলের মেয়েদের কথা ভেবে তিনি নিয়েছেন প্রভাতী রায় নামটি। এছাড়াও ফাদার দে, পল দ্যতিয়েন ইত্যাদি নামের ব্যবহার লক্ষণীয়। আমাদের জীবনে প্রকাশিত সেইসব রচনা থেকে ৬৮টি নিবন্ধ নিয়ে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গোথালস্ লাইব্রেরি প্রকাশ করে 'লালপেড়ে গল্পাবলি' নামে একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের গল্পগুলি কখনও ফাদার দ্যতিয়েনের চিরাচরিত রম্যরচনা, আবার অত্যন্ত মননশীল ও বিশ্লেষণধর্মী ভারী নিবন্ধ। আবার কতগুলো যেন গির্জায় প্রদত্ত রবিবাসরীয় উপাসনার উপদেশ। এগুলোর মধ্যে দিয়ে তিনি নিজে যেন প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন। আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তিনি কোনো রচনাতে হয়তো কিশোর-কিশোরীদের প্রার্থনা করার প্রেরণা দিচ্ছেন, আবার কোনো কোনো রচনায় তাদের সামনে নীরব ধ্যানের পদ্ধতি তুলে ধরছেন। আসলে ফাদার দ্যতিয়েন শৈশব ভালো বুঝতেন। তাই কিশোর-কিশোরীদের মনে খ্রিস্টবিশ্বাস সুদৃঢ় করার লক্ষে, তাদের মধ্যে খ্রিস্টীয় নীতি-নৈতিকতা জাগ্রত করতে তিনি গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজের অজান্তেই খ্রিস্টীয় সাহিত্য রচনার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যিক সমরেন্দ্র লরেন্স মণ্ডল বলেছেন, "খ্রিস্টীয় সাহিত্যকে কতটা পাঠকপ্রিয়, হৃদয়গ্রাহী ও হৃদয়দ্রাবী করে তোলা যায়, 'লালপেড়ে গল্পাবলি' তার প্রকৃত উদাহরণ।"

বাংলাভাষার একজন বিখ্যাত লেখক হয়েও ফাদার দ্যতিয়েন খ্রিস্টীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। এইক্ষেত্রে যাজকীয় দায়বদ্ধতাই কাজ করেছে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে শুরুতে বাইবেলের নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলীর এক সাবলীল অনুবাদ 'পত্রাবলী ও প্রত্যাদেশ' নাম দিয়ে কলকাতার বঙ্গীয় কাথলিক সাহিত্য সমিতি থেকে প্রকাশ করেন। আবার বাংলা খ্রিস্টীয় ভক্তিগীতির ক্ষেত্রে শ্রী সুনীল দত্তের অবদানকে তুলে ধরতে ব্রাহ্মমিশন প্রেস থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ১১৬টি গান নিয়ে প্রকাশ করেছেন 'গীতশতক'। একইভাবে, 'কবিতা' পত্রিকায় বাইবেলের 'পরম গীত'-র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা 'গানের সেরা গান' পড়ে পাঠকেরা তাঁকে বৈষ্ণব কবিদের ভাবশিষ্য বলে মনে করেন। বড়দিন উপলক্ষে তিনি রচনা করেন মর্ত্যে জাত খ্রিস্ট আমাদের জন্য আগত'। আর পুণ্য শুক্রবার উপলক্ষে তাঁর রচিত কথিকা 'মধ্যেকার লোকটি' ও 'তবে পার্থক্য কোথায়'। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'ভারতকোষ' গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ডে 'বাইবেল' শীর্ষক নিবন্ধে বাইবেল বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সবার দৃষ্টি কেড়েছে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দাশগুপ্ত প্রকাশনা থেকে ফাদার দ্যতিয়েন সম্পাদিত ও অমলকান্তি ভট্টাচার্য অনুদিত 'সামসঙ্গীত' আজও রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। সেই গ্রন্থকেই আকড়ে ধরে ফাদার খ্রিষ্টিয়াঁ মিঙোঁ মঙ্গলবার্তা বাইবেলের সামসঙ্গীত অনুবাদ করেছেন। কলকাতা সেন্ট তেরেজা বাইবেল কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'জননী মন্ত্র' কুমারী মারীয়ার প্রতি এক সশ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বাংলাদেশে প্রচলিত খ্রিষ্টীয় পরিভাষা', 'বাংলা ভাষার প্রবেশিকা' এবং 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাথলিক মিশনকেন্দ্রের ইতিকথা'।

অনুবাদক হিসাবে ফাদার দ্যতিয়েনের সিদ্ধি প্রশ্নাতীত। তিনি মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষা প্রয়োগের গুরুত্ব দিতেন। আক্ষরিক অনুবাদ কোনোভাবেই ফাদার দ্যতিয়েনের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না। ফাদার দ্যাতিয়েন একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "বাংলাভাষার ধ্বনিমাধুর্য, সঙ্গীতময়তা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলা গদ্যের সুরের মূর্ছনা আমার কানে বাজে।" আঁতোয়ান দ্য স্যাঁতেকসুপেরি রচিত বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি রূপকথা 'ল্য প্যতি প্র্যাঁস' ফাদার দ্যতিয়েন 'ছোটো রাজকুমার' নামে অনুবাদ করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থটি মূলত ছোটদের জন্য লিখিত হলেও বড়দের মধ্যেও ছিল সমান জনপ্রিয়তা। বই পৃথিবীতে প্রায় ছয়শোরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ফাদার দ্যতিয়েনের অনুবাদ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে খুবই সমাদৃত ২০১০ খ্রিস্টাব্দে লালমাটি প্রকাশন পুনরায় প্রকাশ করে। পরের বছর তিনি প্রকাশ করেন বিশ্বখ্যাত আরেকটি বই 'খ্রিষ্টানুকরণ'। হল্যাণ্ডের সন্ন্যাসী সাধক টমাস কেম্পিস (১৩৯৮-১৪৭১) মূল লাতিন ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন। ফাদার দ্যতিয়েন লেখকের মৃত্যুর ৫০০ বছর পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মূল থেকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করে। এই মহার্ঘ্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থের প্রতি আমাদের ভাষার দায় ও ঋণ স্বীকার করেছেন। মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিষ্টের বাণী, জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি আলোচ্য বইয়ের সুবিশাল ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বাইবেলের পরে যদি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভাষায় কোনো গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে সেটা 'খ্রিষ্টানুকরণ'। এই বইটি খ্রিস্টধর্মের ধর্মসাধক মাত্র নয়, সবার কাছেই সমাদৃত। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ নিজে এই বইয়ের অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের জন্যও বইটি পাঠের ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের জন্য সুপারিশ করেন। তবে ফাদার দ্যতিয়েনের অনুবাদ প্রাঞ্জল।

গবেষকদের নিয়ে ফাদার দ্যতিয়েনের তির্যক মন্তব্য রয়েছে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় গবেষকদের একনিষ্ঠতার ও গভীরতার অভাব খেয়াল করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সেই ধারার কিংবা মাপের গবেষক হতে চাননি। তবে গ্রন্থ গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি একেবারে নিজস্বতা তুলে ধরেছেন। মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের খ্রিষ্টভক্ত ও খ্রিষ্টীয় প্রতিষ্ঠান' ফাদার দ্যতিয়েনের লেখা এমনই একটি গ্রন্থ। বইটি পাঠ করলে মনে হয় না যে তিনি ঘরে বা গ্রন্থাগারে বসে সেই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন, উপরন্তু তিনি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এখানেই ফাদারের পরিশ্রমী ও সত্যানুসন্ধানী গবেষক-সত্তার পরিচয় বিমূর্ত হয়ে ওঠে। উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থটি নিয়ে ফাদারের ভীষণ আগ্রহ ছিল। মানুষ জেনে এসেছে যে, ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থের লেখক ছিলেন স্বয়ং উইলিয়াম কেরি। তবে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার দ্যতিয়েন দেখালেন যে, সেই বই কেরির লেখা নয়, তিনি সংকলক মাত্র। সেইসঙ্গে বইটি নিয়ে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ আলোচনা সবাইকে হতবাক করে দেয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে

ড. সুকুমার সেন 'ইতিহাসমালা'র ইংরেজি অনুবাদ করেন। সেই গ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করলেন ফাদার দ্যতিয়েনকে। সেই বইয়ের ভূমিকায় ড. সেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, ফাদার দ্যতিয়েনের আগে ইতিহাসমালার যথার্থ মূল্যায়ন অন্য কেউ-ই করেননি। তিনিই হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থটিকে আবিষ্কার করে নতুনভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় এনে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর অবদান বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ও গবেষকগণ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। তবে বাংলাভাষা সাহিত্যে ফাদার দ্যতিয়েনের গবেষণার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল হচ্ছে 'গদ্যপরম্পরা' গ্রন্থটিকে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই মহাগ্রন্থে একইসঙ্গে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস ও গদ্যশৈলির অনন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। এই গ্রন্থে ৮৫ জন বিশিষ্ট বাঙালি লেখকের গদ্যরচনা থেকে একটি করে পৃষ্ঠা তিনি বাংলাগদ্যের নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করেছেন। বাংলা গদ্যের আদিযুগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত বাঙালি গদ্যলেখকদের প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রেষ্ঠ গদ্যের উদাহরণ তিনি এই মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এই কাজে তিনি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গদ্যের উদাহরণ আহরণ করেছেন। দোম আন্তোনিও থেকে আনোয়ার পাশা পর্যন্ত তাঁর গদ্য সংগ্রহের বিস্তৃতি। তাই ফাদার দ্যতিয়েনের 'গদ্য পরম্পরা' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে পরিগণিত।

বহুভাষাবিদ ফাদার দ্যতিয়েন প্রাচীন ধ্রুপদি ভাষার মধ্যে লাতিন, গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করেছিলেন। আর আধুনিক ভাষার মধ্যে মাতৃভাষা ফরাসি ছাড়াও তিনি ফ্লেমিস, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' গ্রন্থের জন্য ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন 'নরসিংহ দাস পুরষ্কার'। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে নিজের দেশ বেলজিয়াম থেকে পান ষোড়শ শতকের এক বিখ্যাত মুদ্রাকরের নামে প্রবর্তিত 'ক্রিস্তফ প্ল্যাত্যাঁ পুরষ্কার'। আর ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি পক্ষ থেকে অর্জন করেন 'রবীন্দ্র পুরষ্কার'। ফাদার দ্যতিয়েনের 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তাঁর 'গদ্য পরম্পরা' কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে। ফাদার দ্যতিয়েন নিজে ছিলেন বাংলাভাষার এক শক্তিশালী সাহিত্যিক। তিনি সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই জানতেন এবং বোঝতেন। তিনি অন্যদের দিয়েও সাহিত্য রচনার ও অনুবাদের দুরূহ কাজটি কৌশলে করিয়ে নিয়েছেন। কলকাতা জেজুইট ফাদারদের পরিচালিত প্রাচ্যজ্যোতি সিরিজ থেকে বিখ্যাত খ্রিস্টান সাহিত্যিক টলস্টয়, ওয়ঙ্গার, বারেট প্রমুখের বেশকিছু বিখ্যাত তরুণ লেখকদের দিয়ে অনুবাদ করান। সেসব গ্রন্থের মধ্যে আমরা খ্রিস্টীয় জীবনযাপনের ও আদর্শের উদাহরণ দেখতে পাই। সেইসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মঞ্জুলা মিত্র অনূদিত– 'কালো ঘোমটার নিচে', 'নদীর ডাক', 'ওরা তিনজন, 'নির্বাসিতা', 'খামারে খুন, 'ছেলেটা', 'টেক্কার দুঃখ; অমলকান্তি ভট্টাচার্য অনূদিত– 'যেখানে বিরাজে প্রেম', 'ভবঘুরে', 'মুখোশের আড়ালে মুখ'; সুব্রত বল অনূদিত– 'মধুর চেয়েও মধুর', 'বেনেদিক', 'উপেক্ষিত স্ফুলিঙ্গ', 'অনাম পুরী', 'অরণ্য নন্দিনী', 'বিদ্যেধরী', 'সবুজ দ্বীপ', 'প্রান্তরের লিলিফুল', 'মলিনা'; সুকান্ত চৌধুরী অনূদিত– 'বহুরূপী'। এ ছাড়া তিনি

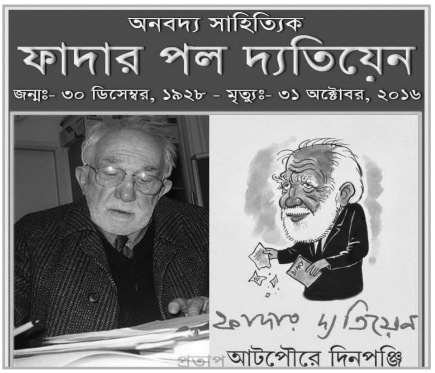

নিজে বিখ্যাত রোমানীয় দার্শনিক মির্সেয়া এলিয়াদের লেখা 'লা নুই ব্যাঁগালি' গ্রন্থের 'বঙ্গযামিনী' নামে অনুবাদ করেন।

ফাদার দ্যতিয়েন ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দেশে ছুটি কাটাতে যান। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে তিনি আর কলকাতা ফিরে আসেননি। ১২ বছর কলকাতার কারও সঙ্গে কোনো ধরণের যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখেননি। নিজেকে অন্য কাজের মধ্যে নিমগ্ন করে দিলেন। লুভ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধু লুকের হাসপাতালে রোগীদের ধর্মীয় সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। হাসপাতালের কাজ থেকে অবসর নেবার পর অজানা প্রেরণায় তিনি আবার কলকাতা ফিরে এলেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি তাঁর বিমান কলকাতার মাটি স্পর্শ করল। তিনি পুরনো সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করলেন। তাঁর পুরনো বই নতুনভাবে প্রকাশ করলেন। 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' ও 'রোজনামচা' বই দু'টো ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বইমেলায় সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইয়ের তালিকায় স্থান পেল। দীর্ঘ ১৩ বছর পর পুনরায় দেশ পত্রিকায় লেখা শুরু করলেন। কলম যেন আগের মতোই বাধাহীন। লিখতে লাগলেন নতুন নতুন গল্পের কথামালা। ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তাঁর 'আটপৌরে স্মৃতি'। সেসব রচনা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করল 'আটপৌরে দিনপঞ্জি'।

বেলজিয়াম ফিরে গিয়েও তাঁর কর্মচাঞ্চল্য এতটুকু কমেনি। এতো সমৃদ্ধশালী দেশে থেকেও জীবনের শেষপর্বে একটু আরামে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি বেছে নিলেন দীনদরিদ্র মানুষের জীবন। খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসব্রতী তিনি। নিঃস্বতার ব্রত পালনে কোনোদিন পিছু-পা হননি। এমনকি ভোগবাদী দুনিয়ার সঙ্গে কখনও আপোষও করেননি। তাই ব্রাসেল্‌স শহরের উত্তরে গরিব প্রবাসী মুসলমানদের মধ্যে বসবাস শুরু করলেন তিনি। সেখানে মুসলিম জনগণের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি তাদের মাগ্রেবীয় ভাষা রপ্ত করেছিলেন। এমনকি একসময় আরবি ভাষা শেখারও চেষ্টা করেছেন। একইসঙ্গে তিনি রাজা বোদুয়্যাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রমে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিচর্যা চালিয়ে গেছেন। আবার ব্রাসেল্‌সে যিশুসঙ্গীদের পরিচালিত ঐশতত্ত্বকেন্দ্রের খ্যাতনামা পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। যিশুসঙ্গীদের চতুর্থ ব্রতের মাহাত্ম্যে তিনি কয়েকটি স্কুলে বাচ্চাদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্যও সময় বের করতেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ৩১ অক্টোবর বেলজিয়ামে প্রয়াত হন ফাদার দ্যতিয়েন। তার আনুমানিক এক বছর আগে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের পহেলা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন' ও অমর একুশে গ্রন্থমেলায় তিনি আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছিলেন। ঢাকায় এক সপ্তাহেরও বেশি সময় অতিবাহিত করেন। ঢাকা থেকে ফেরার পথে তিনি কলকাতা যান। সেই সময়ে লেখা 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর শেষ পর্যায়ের নিবন্ধগুলো নিয়ে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ছোট একটা বই প্রকাশ করে আনন্দ পাবলিশার্স 'সাদাসিধে খসড়া' নামে। এক বছর আগে মৃত্যুবরণ করার ফলে বলা যায় আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশনার শ্রদ্ধা নিবেদন ফাদার দ্যতিয়েনের প্রতি।

যিশুখ্রিস্টের সত্যিকারের অনুগত শিষ্য ছিলেন ফাদার দ্যতিয়েন। বাংলাভাষার স্বনামধন্য লেখক হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্ট-সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি কখনও তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে কখনও নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। ঐশতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য কার্সিয়াঙে থাকার সময়ে কলকাতার জন্য মন খারাপ করতো। সেই মায়া কাটাতে তিনি কলম ধরেন। মাদার তেরেজা যেমন বলেছেন, 'আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের হাতে একেকটা কলম।' ফাদার দ্যতিয়েনও লেখক ও লেখনীর ব্যাখ্যায় তাঁর ঐশানুভূতির কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

বাকি অংশ ৮৫ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

প্রেমতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, পাপতত্ত্ব ও স্বর্গতত্ত্ব

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যে শব্দটি তা হলো **'প্রেম' বা 'ভালোবাসা'**। মনে হয় পৃথিবীর সব কৃষ্টি-সংস্কৃতিতেই শব্দটি খুবই প্রিয় ও অতি মধুর। খ্রিস্টধর্মে তো প্রেম বা ভালোবাসাকে সকল গুণের রাজা বা রাণী রূপে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রেরিতদূত সাধু পল তো প্রেমের মাহাত্ম্য গেয়ে বলেছেন যে, মানব জীবনের মূল ভিত্তিই হলো প্রেম বা ভালোবাসা। এই ভালোবাসা ছাড়া মানুষের জীবনে বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-দৌলত, রূপ-সৌন্দর্য, প্রাবক্তিক শক্তি, তথা অন্য সবকিছু অর্থহীন ও মূল্যহীন *(দ্র: ১ করিন্থীয় ১৩:১-৪)*। প্রেরিতদূত যোহন প্রেমের আরো গভীরে প্রবেশ করে বলেছেন যে, স্বয়ং "ঈশ্বর হলেন প্রেম বা ভালোবাসা" *(১ যোহন ৪:১৬)*। তাঁর মঙ্গলসমাচার ও ধর্মপত্রগুলোর মূলকথা বা মূলসুর হলো 'ভালোবাসা'। কেউ কেউ আবার সাধু যোহনের সাথে সুর মিলিয়ে বলে থাকে: "প্রেমই স্বর্গ।" আবার কবি এমনও বলেছেন যে, 'ভালোবাসার জয়' হলো শ্রেষ্ঠ জয়।

কিন্তু কেউ কেউ প্রেম বা ভালোবাসাকে সুনজরে দেখে না এবং প্রেমের এত গৌরব, এত মাহাত্ম্য গ্রহণ করতে পারে না। তারা বরং প্রেম বা ভালোবাসাকে জীবন ধ্বংসের কারণ বলে মনে করে। একবার খাগড়াছড়ি থেকে রামগড় হয়ে ঢাকা আসার পথে রামগড়ের এক হাইস্কুলের শিক্ষকের সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আমার আলাপ হচ্ছিল। আমি যখন বললাম যে, খ্রিস্টধর্মের মূল কথা বা মূল ভিত্তি হলো 'ভালোবাসা', তখন সেই শিক্ষক যেন রীতিমত ক্ষেপে গেলেন। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন: "প্রেম বিষয়টি মন্দ। কেননা এই প্রেম করে করেই অনেক যুবকযুবতী জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে; এই প্রেমের কারণে কেউ বা ঘর ছেড়ে বাবা-মা, ভাইবোন ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে; কেউ বা আবার প্রেমের কারণে বিবাহিত জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।" অনেক বৃদ্ধ বাবা-মা ও প্রাচীনপন্থীদের কাছেও প্রেমের নামে অনেক কুৎসা শোনা যায়।

তাহলে প্রেম বা ভালোবাসা কি? এই প্রেম নিয়ে আবার কতজন কত্তো রঙ-বেরঙের সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছে। কেউ বলছে: "প্রেম হলো এক টুকরা আগুন।" আবার কেউ বলছে: "প্রেম হলো কচুপাতার জল।" কেউ বা আবার বলছে: "প্রেম হলো একটি মরীচিকা" বা "প্রেম হলো একটি মায়া বা ছলনা।" কেউ বলছে: "প্রেমই স্বর্গ" "লাভ ইজ হ্যাভেন", ইত্যাদি আরো কতো কি। তাহলে প্রেম বা ভালোবাসার আসল সংজ্ঞা কি?

'ভালোবাসা' - এই শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এর সংজ্ঞা লুকায়িত রয়েছে। অর্থাৎ, ভাল+বাসা বা ভাল+বাসনা=ভালোবাসা। পরিষ্কার করে বলতে গেলে 'ভালোবাসা'- এর অর্থ হলো: অপরের জন্য মঙ্গল বাসনা; পরের জন্য মঙ্গল কামনা। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন: পরের জন্য মঙ্গল কামনা যথেষ্ট নয়, বাস্তবে কারো মঙ্গল করাই হলো সত্যিকার ভালোবাসা। নতুবা, প্রেম বা ভালোবাসা শুধু যদি কারো মঙ্গল কামনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা 'লিপ সার্ভিস' (lip service) বা ঠোঁটের বা মুখের ভালোবাসা হতে পারে। প্রেরিতদূত যোহন সত্যিকার ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন: "যদি কেউ বলে ,'সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে' অথচ সে তার খ্রিস্টবিশ্বাসী কোন ভাই ও বোনকে ঘৃণা করে তবে সে মিথ্যাবাদী" *(১ যোহন ৪:২০ক)*। ঠিক যেমন "কর্মহীন বিশ্বাস মৃত" *(যাকোব ২:২৬)*, তেমনি কর্মহীন ভালোবাসাও মৃত। স্বয়ং যিশু এই ভালোবাসাকে সবার উপরে স্থান দিয়ে বলেছেন: "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাস" *(যোহন ১৫:১২; দ্র:১৭ পদ)*।

বড়দিন ভালোবাসার উৎসব: বড়দিনের প্রাক্কালে এই ভালোবাসার কথা কেন? কেননা, পবিত্র বাইবেল আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, বড়দিন হলো ভালোবাসার উৎসব। পবিত্র বড়দিন উৎসবের মূলে বা উৎসে রয়েছে এই ভালোবাসা - প্রেমময় ঈশ্বরের হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা। মহান ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানুষের পাপে পতিত হওয়ার ফলে অনিবার্য শাস্তি, তথা জীবনের মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে দয়ার হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাঁর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অসীম প্রেম তাঁরই অতি প্রিয় সৃষ্টি মানুষের জন্যে অকাতরে উন্মুক্ত করে দিলেন। পাপে পতিত ও স্বর্গসুখ বঞ্চিত মানুষের চরম দুর্দশা অনুভব করার জন্যে তাঁর সত্তা এক তীব্র হৃদয়-বেদনায় হাহাকার করে উঠলো। এ যেন কেঁদে-উঠা প্রাণের শিশুটির জন্যে স্নেহময়ী মায়ের এক গভীর আর্তনাদ। তাই প্রেমের ঈশ্বর স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে নেমে এলেন তাঁর প্রাণের প্রিয় ও নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষকে উদ্ধার করতে; আবার তাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। তিনি এলেন পৃথিবীতে মানুষের রূপ নিয়ে, তুচ্ছ-নগন্য অধম পাপীকে উদ্ধার করতে। "কেননা ঈশ্বর জগতকে এতোই ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর এক মাত্র পুত্রকে দান করলেন, যাতে যে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন বিনষ্ট না হয় বরং লাভ করে অনন্ত জীবন" *(যোহন ৩:১৬)*। তাই তো বড়দিন হলো একটি ভালোবাসার উৎসব অধম পাপীর জন্যে প্রেমময় ঈশ্বরের মহান প্রেমের উৎসব উদ্‌যাপন।

সাধু পল ভালোবাসাকে সবার উপরে তুলে ধরে এই সত্যই তুলে ধরেছেন যে, খ্রিস্টধর্ম প্রেম বা ভালোবাসার ধর্ম। তাই তিনি খ্রিস্টীয় ভালোবাসার মহিমাকে স্থান দিয়ে বলেছেন: "আমি যদি মানুষের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালোবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই। বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা, এই তিনটি থেকে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভালোবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ" *(১ করিন্থীয় ১৩:১,১৩)*।

ঈশ্বর কে? এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। ঈশ্বর এত মহান যে, কেউ এর কোন সহজ উত্তর দিতে পারে না। মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিকে বিরাট ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। তাই মানুষ যুগে যুগে এই সুমহান ঈশ্বরকে নিয়ে কত চিন্তা-ধ্যান করেছে, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা করেছে যা জগতের শেষ দিন পর্যন্ত চলতেই থাকবে। মানুষ কত নামে ঈশ্বরকে ডাকছে; কত ভাবে তাঁকে পূজা-আরাধনা করছে; কত রকমের দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে। কেউ বা তাঁকে দেখছে নিরাকার রূপে, কেউ বা আকার রূপে অথবা আকার-নিকারার উভয় রূপেই। কেউ বা তাঁকে দেখছে অনেক দূরে ধরা-ছোয়ার বাইরে; আকার কেউ বা দেখছে তাঁকে একান্ত অতি কাছে নিজ অন্তর গভীরে অন্তর্যামী রূপে।

খ্রিস্টধর্ম বলছে: "ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ" *(১ যোহন ৪:৮,১৬)*; অর্থাৎ, ঈশ্বর স্বয়ং ভালোবাসা। ঈশ্বর মানুষের জন্যে বিরহ-বেদনায় কাঁদেন, চোখের জল ফেলেন অন্যদিকে, মানুষও ঈশ্বরের জন্যে বিরহ-বেদনায় কাঁদে, চোখের জল ফেলে; প্রেমময় মমতাময় স্রষ্টা-ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষের হৃদয়-মনের উজার করে দেওয়া ভালোবাসার জন্যে, তাকে একান্ত কাছে পাবার জন্যে তৃষ্ণার্ত, তেমনি মানুষও তার পরম স্রষ্টাকে একান্ত কাছে পাবার জন্যে চরম তৃষ্ণার্ত। এ যেন এক অমর প্রেমের চিরন্তন খেলা। শুধু মানুষই বা কেন, স্রষ্টা নিজেই যেন সমস্ত সৃষ্টিই সাথে এক প্রেম-খেলায় মত্ত। তাই তো আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন: "খেলিছ এই বিশ্ব লয়ে/বিরাট শিশু আনমনে---।" যেখানে সত্য ও খাঁটি প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর। অন্য কথায়, যেখানে প্রেম বা ভালোবাসা নেই, সেখানে ঈশ্বরও নেই সেথা নরক তুল্য। সত্য সুন্দর প্রেমের মধ্যেই ঈশ্বর জীবন্ত উপস্থিত পরম শান্তিতে, পরম পবিত্র আনন্দে। সেই প্রেমানন্দে মহা প্রেমিক স্রষ্টা ঈশ্বর পরম আনন্দে নিত্য বিরাজিত। তাই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ সেই মহা

প্রেমের গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পরম উল্লাসে গেয়ে উঠেছেন: "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর---।" তাই এই অপূর্ব সুন্দর প্রেম ছাড়া খ্রিস্টধর্ম অস্তিত্ববিহীন, প্রাণহীন বা মৃত। এই অপূর্ব সুন্দর প্রেমই খ্রিস্টধর্মের প্রাণ; এই মহান প্রেমের জন্যেই স্বর্গের ঈশ্বরের মানবজন্ম গ্রহণ যিশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে; কেননা আমাদের মুক্তিদাতা মহাপ্রেমিক "ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ" (১ যোহন ৪:৮, ১৬)।

পাপতত্ত্ব: পাপ কি বা পাপের সংজ্ঞা কি তা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে, কৃষ্টিতে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে, যা কখনো কখনো সকল ধর্মে ও সকল কৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয়। ফলে বিভিন্ন ধর্মে ও কৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য নিয়ে ভিন্ন ধরণের নৈতিকতা গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ খ্রিস্টধর্মে অগ্রহণীয় ও পাপ; কিন্তু কোন কোন ধর্মে তা গ্রহণীয় এবং তা পাপ নয়। ইউরোপ-আমেরিকার নারীদের হাঁটুর উপর ম্যাক্সি-স্কার্ট পরা কোন অপরাধ নয়, অসুন্দরও নয়। কিন্তু কোন কোন ধর্মে ও কৃষ্টিতে নারীদের হাঁটুর উপর কাপড় পরা অসুন্দর ও অপরাধ। বর্তমান যুগে কোন কোন কৃষ্টিতে বিবাহের পূর্বে বিবাহ উপযুক্ত নারী-পুরুষ এরকম আরো অনেক ব্যাপারে পাপ-বোধ ও পাপ-চেতনা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মে, কৃষ্টিতে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। তা সত্তেও অনেক ক্ষেত্রেই পাপ-বোধ ও পাপ-চেতনা সম্বন্ধে সকল ধর্ম, কৃষ্টি ও ভৌগোলিক অঞ্চলে অনেক সামঞ্জস্য ও অভিন্নতা রয়েছে।

ছোটবেলা প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের প্রস্তুতি-ক্লাসে আমরা শিখেছি: "জেনে শুনে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করাই হলো পাপ"; অর্থাৎ, স্বজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় মন্দ কিছু করা হলো পাপ। তাই আমরা অনেকেই 'ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা' ও 'মণ্ডলীর ছয় আজ্ঞা' সমূহের কোন একটি অমান্য করাকেই পাপ বলে জেনেছি ও মেনেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, উপরোক্ত পাপের সংজ্ঞা ও পাপের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে যিশুর শিক্ষা পুরোপুরি ফুটে ওঠে না। বরং যিশুর শিক্ষার দিকে গভীর ও স্পষ্ট দৃষ্টি দিলে আমরা পাপ-বোধ ও পাপ-চেতনা সম্বন্ধে এক নতুন সংজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ করি। যিশুর শিক্ষা অনুসারে, জেনে শুনে মন্দ কিছু করা শুধু 'পাপ', তা বুঝায় না; বরং সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জেনে না জেনে ভাল কিছু, সুন্দর কিছু না করাটাও হলো পাপ। অপব্যয়ীর পুত্রের কাহিনীতে *(লূক ১৫ অধ্যায়)* বড় ছেলে বাবার বিরুদ্ধে খারাপ কিছুই করেনি, এমন কি, ছোট ভাইয়ের সাথে খারাপ কোন আচরণও করেনি। কিন্তু তবুও সে পিতার আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে নি, কেননা, সে তারই আপন অনুতাপী ভাইকে 'ভাই' বলে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তার প্রতি কোন ভালোবাসাও প্রকাশ করেনি। তেমনিভাবে, দয়ালু সমরীয়ের কাহিনীতে যাজক ও মন্দিরের সেবক আহত সমরীয়ের প্রতি খারাপ কোন আচরণ করে নি, কিন্তু কষ্টভোগী মানুষের কষ্ট দেখেও মানব-সেবার মহৎ ও সুন্দর কাজটি তারা মোটেই করে নি, দারুণভাবে তারা তা অবহেলা করেছেন আর এটিই ছিল তাদের অপরাধ বা পাপ। তাই যিশুর শিক্ষা অনুসারে, শুধু মন্দ কিছু করাই শুধু পাপ নয়, বরং ভাল কিছু না করাটাই হলো পাপ। আর আমি-আপনি প্রতিদিন কত সুন্দর সুন্দর কাজ করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখি, পাপ করে চলেছি এক দিকে কিছু করে, অন্যদিকে ভাল অনেক কিছু না করে।

স্বর্গতত্ত্ব: বড়দিনের প্রাক্কালে আমরা খ্রিস্টানগণ প্রায়ই বলে থাকি যে, যিশুখ্রিস্ট আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন; তিনি আমাদের জন্যে মানুষ হয়েছেন, যেন আমরা তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গুণে স্বর্গে যেতে পারি। স্বর্গের সাথে মুক্তি বা পরিত্রাণের একটি গভীর সুসম্পর্ক রয়েছে। পাপ থেকে মুক্তি না পেলে কেউ-ই স্বর্গে যেতে পারে না।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, 'স্বর্গ কি?' বা 'স্বর্গ কোথায়?' 'স্বর্গ কি'- এর উত্তরে আমরা অনেকেই হয়তো বলবো: "স্বর্গ হলো পরম সুখের স্থান।" আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, 'স্বর্গ কোথায়?'- এর উত্তরে আমরা অনেকেই হয়তো আকাশের দিকে তাকিয়ে বলবো, "স্বর্গ আকাশের উপরে।" আরেকটি মজার প্রশ্ন যদি করা যায়, 'মানুষ কখন স্বর্গে যায়'- এর উত্তরে ঝটপট বলবো, "মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গে যায়।"

খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা অনুসারে, স্বর্গ শুধু মানুষের মৃত্যুর পরের কোন বিষয় নয়, বরং তা এখনকার বিষয় এবং চিরকালীন তা উভয়ই। কাজেই যে মানুষ 'এখন' অর্থাৎ এই জগতে স্বর্গে প্রবেশ করে না, সে স্বর্গে যেতে পারে না। কেউ অধম পাপী হলেও তাকে এই জগতেই তার পাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে এবং এই জগতেই পাপের ক্ষমা পেয়েই তাকে স্বর্গে যেতে হবে। কাথলিক খ্রিস্টানদের বিশ্বাস মতে, কেউ ছোট পাপের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে মধ্যস্থানে পাপের জন্যে শাস্তি ভোগ করে এবং পরিশুদ্ধ হয়েই স্বর্গে যেতে হবে।

স্বর্গ-এর আরেকটি উত্তম নাম হলো 'ঈশ্বরের রাজ্য' *(মথি ৫:৩-১০)*। যেখানে ঈশ্বর থাকেন বাস করেন, তা-ই স্বর্গ বা ঈশ্বরের রাজ্য। আর এই স্বর্গ বা ঈশ্বরের রাজ্য শুধু মানুষের মৃত্যুর পরে নয়, তা তার ইহলোকের জীবনকালেও বিদ্যমান। তাই 'প্রভুর প্রার্থনাতে' যিশু আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করতে শেখান এই বলে: "স্বর্গে বিদ্যমান হে আমাদের পিতা,---তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক---*(দ্র: মথি ৬)*। "আমাদের" বলতে যিশু এখানে মোটেই মৃত লোকদের জন্যে স্বর্গীয় পিতার রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বুঝান নি; বরং তিনি এই পৃথিবীর লোকদের মধ্যে স্বর্গীয় পিতার রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বুঝিয়েছেন।

তাহলে 'ঈশ্বরের রাজ্য' বা 'স্বর্গ' কোথায়? যিশু নিজেই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "কেউ যদি বলে, স্বর্গ এখানে" বা "স্বর্গ ওখানে" তবে তা বিশ্বাস করো না; কেননা স্বর্গরাজ্য তোমাদের মধ্যেই। অর্থাৎ যিশু পরিষ্কারভাবে আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে, যেখানে ভালোবাসা, যেখানে শান্তি, যেখানে ক্ষমা, যেখানে মানুষে মানুষে মিলন। সেখানেই স্বর্গ সেখানেই ঈশ্বর বাস করেন। তাই প্রেরিত দূত যোহন তাঁর দিব্য দর্শনে বলেছেন: এই দেখ, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের আবাস। আর পুরাতন নিয়মে মানুষের মাঝে ঈশ্বরের বসবাসকে বলা হয়েছে: "ইম্মানুয়েল"- অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের মধ্যে, স্বর্গ আমাদের মধ্যে *(দ্র: যিশাইয়া ৭:১৪)*। পবিত্র বাইবেলের শিক্ষায় সুর মিলিয়ে বাংলার কবিও বলেছেন:

"কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহু দূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক
মানুষেতেই সুরাসুর।

স্বর্গ নিয়ে কাড়াকাড়ি: একদল খ্রিস্টান যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছে এবং বলে আসছে যে, স্বর্গ বা ঈশ্বরের রাজ্য শুধু খ্রিস্টানদের জন্যে। তাই যে কেউ যিশুতে অবগাহন বা বাপ্তিস্ম হয়নি, সে কিছুতেই স্বর্গে যেতে পারবে না। এরূপ বিশ্বাসের ফলে স্বর্গ বা ঈশ্বরের রাজ্যকে শুধুমাত্র খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্যে কুক্ষিগত করে দখল করে রাখা হয়েছে। আবার অন্য কোন কোন ধর্মেও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি সেই ধর্মকে গ্রহণ না করে, তবে সেই ব্যক্তি স্বর্গে যেতে পারবে না। স্বর্গ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে এরূপ বিশ্বাসের ফলে স্বর্গ নিয়ে রীতিমত একটা কাড়াকাড়ি বা হৈচৈ পড়ে গেছে। অন্তরে প্রশ্ন জাগে, অন্য ধর্মের লোক যদি সুন্দর সুন্দর কাজ করে ও পবিত্র জীবনযাপন করে, তবে সে স্বর্গে যাবে না কেন?

এক্ষেত্রে যিশুর শিক্ষা অতি সুন্দর ও পরিষ্কার: কোন ব্যক্তি সে যেই ধর্মেরই হোক না কেন, সে যদি সুন্দর কাজ করে এবং পবিত্র জীবন যাপন করে, তবে সে অবশ্যই স্বর্গে যাবে অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তাকে সে লাভ করবে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে পূর্ণ মিলনে একাত্ম হতে পারবে। তাই যিশু বলেন: "যারা আমাকে 'প্রভু', 'প্রভু' বলে, তারা প্রত্যেকেই যে স্বর্গে যাবে তা নয়। বরং যে কেউ আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে" *(মথি ৭:২১)*।

পৃথিবীর যে কোন ধর্ম-কৃষ্টি-বর্ণ-দেশের প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন যিশুকে, তথা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে নিয়ে সর্বদা আনন্দে মেতে উঠুক, তাঁকে একান্ত আপন করে পেয়ে সর্বদা ভালোবাসার উৎসব পালন করুক। তাই শুভ বড়দিন হয়ে উঠুক সব মানুষের জন্যে প্রেমময় ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা উদ্‌যাপনের উৎসব - বড়দিন হোক ভালোবাসার উৎসব। সবাইকে শুভ বড়দিন!

সংস্কৃতিবান ব্যক্তি মাত্রই শিক্ষিত, শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃতিবান নন

জাসিন্তা আরেং

সামাজিক জীব হিসেবে একজন ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রেই সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু সংস্কৃতিকে ধারণ করতে নিজের মনোভূমিকে চাষের জন্য উপযোগী করে নিতে হয়। সেই মনোভূমি চাষে শিক্ষা একটি মাধ্যম মাত্র। সংস্কৃতিবান হতে গেলে সমাজের বসবাসের জন্য যা যা গুণাবলি রপ্ত করা প্রয়োজন, তা সবই করা আবশ্যক। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সাংস্কৃতিক ও বিনোদন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হলেই সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না। সংস্কৃতি চেতনার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সংস্কৃতি অধ্যয়ন, আয়ত্ত্ব এবং প্রতিনিয়ত চর্চা এবং প্রচলিত রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে সম্মান ও মর্যাদাদানের মধ্যদিয়ে একজন ব্যক্তি সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠেন। তবে, শিক্ষার সাথে নিজস্ব সংস্কৃতির সংযোগ থাকা আবশ্যক, তা না হলে সেই শিক্ষা পরিপূর্ণতা পায় না। শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির সংযোগেই ছোটবেলা থেকেই একজন ব্যক্তি আত্মপরিচয়ের শিকড়ের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। যে শিক্ষা সংস্কৃতিহীন তা নিষ্ক্রিয় ও শুষ্ক পাতার মতোই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে ব্যক্তি জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি বিচার-বিশ্লেষণ, দায়িত্ব সচেতন নাগরিক এবং মানুষের অর্জন-অবদান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করে। সংস্কৃতিবিহীন একক শিক্ষাদান কখনও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি তৈরিতে সক্ষম নয়।

প্রতি বছর দেশের নামী-দামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে অগণিত ব্যক্তি শিক্ষা সনদ নিয়ে বের হন। সনদধারী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই যে সংস্কৃতিবান ও রুচিবান হবে তা অনুমান করার অবকাশ নেই। কারণ, দেশীয় প্রেক্ষাপটে, শিক্ষিত ব্যক্তি শনাক্ত করা হয় তাদের উচ্চতর পড়াশুনার সনদ কিংবা সাফল্য দ্বারা। বর্তমান সমাজে সংস্কৃতিবান ব্যক্তির পরিমাপক হিসেবেও শিক্ষা সনদের তথাকথিত মূল্য ও যৌক্তিকতা কতটুকু তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। মূলত, শিক্ষা ও সংস্কৃতি একে-অপরের পরিপূরক এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তির মধ্যেও এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই, শিক্ষিত হলেই যে ব্যক্তি সংস্কৃতিবান হবে তা ভাবার অবকাশ নেই। উচ্চশিক্ষা সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, পূর্ণাঙ্গ বিষয় নয়। সংস্কৃতিতে নিহিত আছে সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, মানবিক আচরণ ও মানসম্পন্ন রুচিবোধ, যা একজন ব্যক্তি দীর্ঘ অনুশীলনের পর স্বশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গতই মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "শিক্ষার লক্ষ্য হলো, দেহ, মন, আত্মার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সু-সামঞ্জস্য বিকাশ সাধন করা।" প্রকৃতপক্ষেই, ব্যক্তির কায়া, মন ও আত্মার সুপ্ত ও শ্রেষ্ঠ গুণগুলি চর্চার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে, সেটাই একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হিসেবে গড়েও তোলে।

শিক্ষা হচ্ছে ধনাগার ও সংস্কৃতি হলো তার প্রকাশ, যার মৃত্যু নেই। সুতরাং, সংস্কৃতির আলো বিকিরণ করতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠার মধ্যদিয়েই তার ব্যক্তিত্ব আরও দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। কথায় বলে, সংস্কৃতি ছাড়া শিক্ষা অপূর্ণ। অনেকেই শিক্ষাজীবনে অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে সেই জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হোন। যারা শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পারে না, তাদের মধ্য থেকে কখনই বিদ্যারূপী কমল হীরের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটবে না। যিনি সংস্কৃতি অনুরাগী, উন্নত মননশীলতা, আত্মসংযম, সৃজনশীল ও সুরুচির অধিকারী, তিনি শুধুমাত্র বিদ্যারূপী কমল হীরেই নন, তিনি সংস্কৃতিরূপী আলোর ধারকও বটে। বিবেক-বুদ্ধি বিবর্জিত ব্যক্তি কখনই সংস্কৃতির সুষ্ঠু চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারে না। শিক্ষিত ব্যক্তি যদি অশিক্ষিতের মত আচরণ করে, তাহলে তার দ্বারা কোন উৎকর্ষতাই সাধন হবে না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়েই একজন ব্যক্তি সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থার স্থান করে নেন এবং সেইসাথে সংস্কৃতিমনা সভ্যতার রূপায়ন ঘটাতেও অসাধারণ ভূমিকা রাখেন।

সংস্কৃতিবান হতে হলে মানসম্পন্ন শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সুরুচিসম্পন্ন জাতি গঠনে মানসম্পন্ন শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ শিক্ষা গ্রহণের মধ্যদিয়েই সামাজিক মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যবোধ এবং সহনশীলতার চর্চা করে থাকে। সংস্কৃতিবান হতে হলে নান্দনিক ও সৃজনশীলতা এবং মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করতে হবে। একই সাথে দায়িত্বশীল ও মনুষ্যত্ববোধের অধিকারী এবং সুষ্ঠু মননশীলতার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই সংস্কৃতিবান হয়ে উঠতে পারে। সাংস্কৃতিক সক্ষমতা প্রকাশ করলেই সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না। নাট্যকলা, নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি প্রভৃতির মতো বিষয়াদি সংস্কৃতির অংশ মাত্র, সামগ্রিক সংস্কৃতি নয়। কাজেই, শুধুমাত্র সংস্কৃতি চেতনার অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট নয়, সকল গুণাবলি অর্জন ও যথাযথ চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতিবান হয়ে সমাজে স্বমহিমায় স্থান করে নিতে হয়। সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্য আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নেই বলেই হয়তো শিক্ষা ও সংস্কৃতি একে-অপরের ওপর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্য সত্তা। মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণের মধ্যদিয়েই সংস্কৃতিবান হওয়ার পাঠদান করা হয়। সংস্কৃতি সর্বদাই পরিশীলিত জীবনবোধ ও জীবনাচারকে উৎসাহিত করে। তাই, সংস্কৃতিবান হতে গেলে মানবিক সকল গুণাবলি চর্চা করা যেমন অতি আবশ্যক, তেমনি, জৈবিক চাহিদার উর্ধ্বে ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য ও সৌজন্যতার অন্বেষণ করাও এখন সময়ের দাবী। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ব্যক্তির সামগ্রিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

স্বশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি সমাজের সম্পদস্বরূপ। সংস্কৃতিবান হতে শিক্ষাই মানুষকে সহায়তা করে এবং সংস্কৃতি অনুশীলনের মধ্যদিয়ে স্বশিক্ষিত মানুষ গড়ে ওঠে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন রয়েছে যা একে অপরকে একত্রে বেঁধে রাখে। শিক্ষার দ্যুতি ছাড়া কোন ব্যক্তি সভ্য ও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এর ভাষ্যমতে, "তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় মানুষ।" প্রকৃতপক্ষেই, মানুষ হতে হলে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার উর্ধ্বে গিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের পরেই একজন মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে ওঠে। মানুষকে মানবিক মূল্যবোধ চর্চা, মনোদৈহিক বিকাশ ও ইতিবাচক চিত্তের প্রসার ঘটাতে হয়, তবেই মানুষ স্বশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতি মানব জীবনে একটি পরিশোধন প্রক্রিয়ার মতো যার মধ্যদিয়ে মানুষ প্রকৃত শিক্ষা লাভের পাশাপাশি সংস্কৃতিবান হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে, পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনের মুখে পড়ে দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাঝে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। এবিষয়টি আঁচ করতে পেরেই হয়তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর

"শিক্ষা ও সংস্কৃতি" নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি।" সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে শিক্ষা কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাঝে এই বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান থাকলে কখনই কোন ব্যক্তি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হতে পারবে না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা একজন ব্যক্তি পরিশোধিত হয়, মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণতা পায়; নিঃস্বার্থভাবে মানব সেবায় মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করে। মানবিকতা, নৈতিকতা, উদারতা, দেশপ্রেম ও পরোপকারিতার মনোভাব না থাকলে কখনও সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব নয়। সুশিক্ষা ও সংস্কৃতির যথার্থ চর্চা নিজেকে যেমন স্বশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে তোলে, তেমনি অন্যকেও সংস্কৃতিবান হতে অনুপ্রাণিত করে।

বর্তমানে, বেশির ভাগ মানুষই স্বার্থপরতার বেড়াজালে বন্দী। বৃহত্তর পরিসরে নিজেকে যোগ্যরূপে উপস্থাপন করার মতো গুণাবলি নেই বললেই চলে। শিক্ষা সনদ রয়েছে অনেক, কিন্তু সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা সীমাহীন। ফলশ্রুতিতে, নিজেকে প্রচার করতে ও নিজের পৃথিবীকে নিয়ে ব্যস্ত মানুষ। সবকিছুতে নিজের স্বার্থ হাসিল ও লাভের মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ ও পরিমাপের প্রবণতা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এসব কিছুর জন্য দায়ী মানসম্মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অভাব। শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির পাঠ যুক্ত না হলে এই জৈব তাড়না ও মনের অন্ধকার কখনও দূর হবে না। শিক্ষা যদি প্রদীপ হয়, তবে সংস্কৃতি শিখা। যে ব্যক্তি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান; তিনি আলোকিত মানুষও। তিনি নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দিতে পারেন দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে।

এছাড়াও, একটি জাতি তখনই সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে ওঠবে, যখন তারা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে ও শিখবে। গুণগত শিক্ষাদান ও মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের। এসব দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গের অবহেলাতো আছেই ও পাশাপাশি গুণগত শিক্ষার মান বাস্তবায়নের অবনমন ঘটেছে তা নিয়ে ভাবার অবকাশ থেকেই যায়। ফলে, অমানবিক ও দেশপ্রেমহীন শিক্ষার্থীরা দেশের মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশ ও জাতির সম্মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হলো তারা সংস্কৃতিমনস্ক জাতি হিসেবে গড়ে ওঠতে পারেনি। যদি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান জাতি হতো, তবে, হয়তো দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। তাছাড়া, প্রতিনিয়তই অসাম্প্রদায়িক ও নিন্দনীয় কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে সংস্কৃতিবিহীন শিক্ষিতরা। এসব কিছুই দেশের অকেজো শিক্ষানীতি ও সংস্কৃতি বিবর্জিত শিক্ষা বাস্তবায়নের ফলাফল। অপ্রত্যাশিত যা কিছু ঘটছে, তা সংস্কৃতি নয় বরং অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে অদূর ভবিষ্যতে একটা অসুস্থ প্রজন্মের উত্থান হবে। অবিলম্বে অপসংস্কৃতি নির্মূল করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করা হোক। এর বিপরীত হলে জাতি আগামীতে প্রগতির মুখ দেখবে কিনা তা নিয়ে পুনরায় ভাবতে হবে।

উচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তি হলেও অনেকেই পুরানো ধ্যান-ধারণা পোষণ করে থাকে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তারা মুক্তমনে সমাজের পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে পারে না। অন্ধবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে-থাকতে এক সময় তা দৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্মে পরিণত হয়। এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন চিন্তা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে, সমাজমানসে কার্যকরী কোন অবদান রাখতে পারে না। অন্ধবিশ্বাস কিছু মানুষের গভীর বিশ্বাসের রূপ নেয়ার ফলে, তারা প্রকৃত আদর্শ থেকে সরে এসে বিকৃত মন-মানসিকতার সমাজ গড়ে তোলে। এবিষয়ে আলবার্ট আইনস্টাইন যথার্থই বলেছেন, "একটি পরমাণু ভাঙ্গার চেয়ে কুসংস্কার ভাঙ্গা আরও কঠিন।" দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং নেতিবাচক আদর্শগুলো প্রতিরোধ করার ভাবনা ও যুক্তি অনুপস্থিত। ফলশ্রুতিতে, দেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জঙ্গীবাদী ও চরম ধর্মপন্থীদের উত্থান হচ্ছে। এসব প্রতিরোধ করতে হলে অবশ্যই সংস্কৃতির সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম গড়ে তোলতে হবে। সেইসাথে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ অনুকূলে আনয়ন করাও দরকার যেন শিক্ষার্থীরা বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা ও কুসংস্কারমুক্ত দেশ গড়তে বদ্ধপরিকর হয়। দেশের প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম সংস্কার করতে হবে, নতুবা ধরে নিতে হবে যে, মন্থর গতিতে আমরা অন্ধকারের দিকেই ধাবমান হচ্ছি। এই সংস্কৃতিবিহীন শিক্ষাকে সম্বল করে বড়জোর সাফল্য অর্জন করা যাবে, তবে আলোকিত মানুষ হওয়া কঠিন।

মূলত, সংস্কৃতি হলো নদীর মতো বহমান একটি প্রক্রিয়া। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অনুশীলন ও চর্চার মধ্যদিয়ে একজন ব্যক্তি সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে। নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখে সুকুমার বৃত্তির বিকাশের মধ্যদিয়ে সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠতে হয়। সংস্কৃতিবিহীন যে কোন জাতিই দুর্বল, কারণ সংস্কৃতিই জাতির ভিত্তি। শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদণ্ড, তেমনি সংস্কৃতি জাতির মূল ভিত্তি। ইমারত তৈরিতে যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনি বাহ্যিক উন্নয়নও প্রয়োজন। তেমনিভাবে, জাতির সামগ্রিক ও আনুষঙ্গিক উন্নয়ন একান্তই জরুরি। তাই কেবলমাত্র জাতির বাহ্যিক উন্নতি সাধন করে সামগ্রিক অগ্রগতি সম্ভব নয়, অন্তজগৎ উন্নয়নে সংস্কৃতি ও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সংস্কৃতিবিহীন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে গুরুত্বারোপ করার কারণে জাতি বর্তমানে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বর্বরতা, দুর্নীতি, বাল্যবিবাহ, জঙ্গীবাদ, লোভ, সহিষ্ণুতা ও মনুষ্যত্বের অভাবের মতো সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। এসব সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করতে অবশ্যই শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে একসাথে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে, দেশের নীতি নির্ধারকদেরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। এদিকে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আরোপ করাই যথেষ্ট নয়, সংস্কৃতির আলোয় আত্মবিকাশ ঘটানোও অতি আবশ্যক। কারণ, সংস্কৃতি বিবর্জিত শিক্ষা আলোকিত ও আদর্শ মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

পরিশেষে, সংস্কৃতি মানবীয় বিষয়। কাজেই, সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠা একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীর মধ্যে সংস্কৃতিবান হওয়ার সক্ষমতা ও গুণাবলি অনুপস্থিত। মানুষ তার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি, ভাব-চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নের প্রয়াস এবং প্রগতিশীলতা, ন্যায়বোধ এবং সর্বজনীন কল্যাণবোধের কারণেই সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে। কারণ মানুষের জীবন-যাত্রা, চিন্তা-চেতনা ও স্বাভাবিক আচরণের মধ্যদিয়ে সংস্কৃতিমানতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্মিলিতভাবে মানবজাতিকে সংস্কার করে এবং সংস্কৃতির শক্তিতে বলিয়ান করে তোলে। মূলত, আত্মসংস্কারের মধ্যদিয়েই মানুষের অন্তরের দরিদ্রতা ও ব্যক্তিগত অজ্ঞানতা দূর হয়। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সংস্কৃতিকে জাগ্রত ও জীবন্ত রাখে, তবে, জনজীবনে উত্তরণশীলতা ও উৎকর্ষমানতার বিকাশ ঘটবে নির্বিঘ্নে এবং বৈষম্য-শোষণ ও অন্যায়-অবিচারমুক্ত হবে সমাজ। নিঃসন্দেহেই, সংস্কৃতি ও শিক্ষা উভয়ই একে-অপরকে পূর্ণতা দান করে এবং সামষ্টিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। সুতরাং, সর্বদা স্মরণ ও উপলব্ধি করতে হবে যে, সংস্কৃতিবান ব্যক্তি মাত্রই শিক্ষিত, শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃতিবান নন॥

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : দৈনিক আমাদের সময় ; দৈনিক কালের কণ্ঠ

অনুশোচনা

কবিতা কস্তা

চরিত্রসমূহ

১। সরুজ পাল চৌধুরী: (উচ্চবিত্ত গ্রামবাসী)

২। শংকর চৌধুরী : ঐ

৩। স্বরসতী : শংকর চৌধুরীর স্ত্রী

৪। বেপারী : কৃষক (গরীব গ্রামবাসী)

৫। সোমন্ত : ঐ। দুরসম্পর্কে ভাইপো

৬। স্বরূপ : গরীব দিনমজুর

৭। সন্ধান : হতদরিদ্র গ্রামবাসী।

৮। স্থবির : শংকরের সহযোগি

৯। সুলেখা : স্বরসতীর সহযোগি

খেদ/নির্বেদ

(উত্তরপাড়ার কয়জন হেঁটে যাচ্ছে গ্রামের রাস্তা ধরে। বেশিরভাগই হতদরিদ্র ও কৃষক ঘরের সন্তান। পরস্পর আলোচনা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে)

বেপারী : দেখছস্ গতকাল মোদক কাকার খেত আর আইলডা সরুজ মিয়া, বড় মিয়ার গরু-ছাগলে কি করছে?

সোমন্ত : কি করছে কাকা?

বেপারী : বেটা হোন তবে। (সবাই কান পেতে মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য উদগ্রীব) মইদ্যা কাকার খেতের পাশে সরুজ চৌধুরীর পাট খেত। কাকার খেতের আইলডাই বড়মিয়ার জমির পাশে। কামলারা উনার দেয়া নির্দেশে নাকি কাকার হেই খেতের ভিতর পাট খেত বাছার সব আবর্জনাই ফালাই রাইখা গেছে।

স্বরূপ মিয়া : তাই নাকি, বেপারী ভাই?

সন্ধান মিয়া : বড় বাড়াবাড়ি!

সোমন্ত : মাইন্যা নেয়া যায় এতো অন্যায়, কও তোমরাই?

বেপারী : (কিছুটা উত্তেজিত) আবার যেই বিদু ভাই বড় মিয়ার এসিস্ট্যান্ট বকর মৃধারে জিজ্ঞেস করতে গেলো, তা বলে কি? ভাইজান নাকি ফাও প্যাচাল পারে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে নাকি চৌধুরীরে বইলা আমাগোর তেরোডা বাজাই ছাড়বো!

স্বরূপ : এই কইছে বেটায়?

সোমন্ত : আসলে এরা না মাইনষেরে মানুষ বইলাই মনে করেনা।

গেলো হপ্তায় আমার ভাতিজা রোশন গেছিলো হেগো বাড়ি একটা কামে। বেচারা কানতে কানতে বাড়ি ফিরা আইছে।

ব্যাপারী : কেন্? কেন্? বেচারারে মাইর-টাইর অ খাওয়াইছে নাকি?

সোমন্ত : খালি মারলেই কি মারা অয় বেপারী? কতোভাবে মানুষরে দাবাইয়া, পিশ্‌শা ফেলন যায়!

স্বরূপ : কথাডা মিছা কও নাই, সোমত্ত। খালি সরুজ চৌধুরী না। শংকর পাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। গেল বছর ধানের জমিন বিক্রি করছে একজন হের (শংকর পালের) কাছে।

বেচারা টাকা পাওন লইয়া শংকর মহাজনের বাড়িতে গেছিলো। তায় বাড়ির মানুষ তারে এমন অপমান কইরলো! বেচারা। টাকার চাইতে মান বড়!

ব্যাপারী : তাই? তারপর সেই লোকের টেকা দেয় নাই?

স্বরূপ : তারপর আর কি? নিজের জানে কষ্ট অইলেও অত কষ্ট পাইতনা। রাস্তায় যাইতে আমার লগে দেহা অইচে পর কইতে কইতে সে কি বিলাপ পারলো!

সোমন্ত : এরা যে মানুষের লগে এতো আজে-বাজে ব্যবহার করে, মানুষের কষ্টের বস্তু লুইটা পুইটা খায়, পরকালের ডর নাই পরানে? মানুষ কি কইরা এমুন গন্ডারের চামড়া পালে, আমার মাতায় ধরেনা।

(এভাবে পরস্পর নানা অসংগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে যাবে।)

২য় দৃশ্য

(মঞ্চে ঢুকবে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শংকর পাল ও তার স্ত্রী স্বরসতী।

শংকর পাল : কই রে স্থবির, কই গেলি? আইজ যে তুই আমার পান-তামাক সাজাইলি না বেডা?

স্থবির : এই যে আব্বাজান, এইহানে আমি। আসলে, আইজ আমার শরীরডা বড্ড নিম নিম লাগতেছে। সুলেখারে কইতাছি আপনের তামাক সাজাই, পান-সজ্জা দিতে।

শংকর : কি বললি? তোগোর তো বাহানার শেষ নাই দেহি। খালি খালি আদেখাইল্যা রোগ বাধানোর ফন্দি, তাইনা? জমিদারী কায়দায় আমরা চলতে পারি চাইলেই। তাও তো অমন রোগা রোগা ভাব নিয়া বইসা থাহি না কোনোদিন। হাজার সমস্যায়ও দিব্যি কাম-কাইজ পইরা থাহেনা!

(সুলেখা নেপথ্যে)

সুলেখা : আব্বাজান, পানে কি খয়ের দিমু?

শংকর : কেন, স্থবিরা কি জানেনা আমি কি পছন্দ করি? এইসব কুড়া দিয়া বাগুন পাড়ার কামও, কিন্তু একদম জুইত লাগেনা কইলাম! দেক পারলে থাকবি, না পারলে চইল্যা যাবি। বাত ছিডাইলে কাকের অবাব অইবোনা, বুজলি?

(নেপথ্যে কারও ডাকে শংকর ব্যবসায়ী বের হয়ে যায় হন্তদন্ত)

স্থবির : (ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখটা বিষন্নতায় ছেয়ে যায়। নিজের অসুস্থ শরীরকেই মনে মনে দোষারূপ করে চোখের আর্দ্রতায় ভাসতে থাকে। চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়।)

স্বরসতী : (এতোক্ষণ স্বামীর কর্মকান্ড পরখ করছিলো। এমন জায়গায় বলার কিছু থাকেনা, যেখানে কথার কোনো মূল্যই নেই।)

এই অসময়ে কে আবার আসলো, কোথায় যে গেলো কে জানে? (স্বরসতির স্বগতোক্তি)

৩য় দৃশ্য

(সরুজ পাল চৌধুরী ও শংকর চৌধুরী, পাড়া প্রতিবেশি। দুইজনই প্রতিপত্তি সম্পন্ন। শংকর চৌধুরীর বাড়ির উঠানে পাশাপাশি বসে গভীর মনোযোগের সাথে কিছু একটা বিষয়ে আলোচনা করছেন।)

শংকর : তা এতো হন্তদন্ত হইয়া কি এমন জরুরি তলব পড়লো, বাই? পান-তামাক সাজানোরও সময় পাইলামনা!

সরুজ : হ মিয়াবাই, একটা জব্বর কতা। তাই নিজেরে সামলাইতে না পাইরাই আপনের স্মরণ তড়িঘড়ি। পাড়ায় তো নামী-দামী বলতে এই আমরাই, আর কারেই বা কমু?

শংকর : তা কও, কি এমন তাজ্জব ব্যাপার?

সরুজ : তাজ্জব না অজ্জব জানিনা। তবে গজব তো আইছেই, আর আমাগো চাষা-ভূষারা আর হেগো গরীব পোলাপাইনে এই ডজব থিক্কা এইবার যে বাঁচান বাঁচাইলো, তা রীতিমতো বিস্ময়!

শংকর : তা, হেইডা কেমন করে মিয়া ভাই?

সরুজ : আমি আর আপনেতো অনেকদিন পর আইলাম এলাকার বাইরে থেইকা। গেরামে ছিলাম না তাইনা?

শংকর: হুম। তা!

সরুজ : ৫ দিন আগের ১০ নং বিপদ সংকেতের ঝড়-তুফানের সময় আমার আর আপনের কলাবাগান, সেগুনের ছোডো ছোডো চারাগাছের বাগান ও ধানক্ষেত আমাগো অনুপস্থিতিতে গরীব ঐ চাষী ও গ্রামবাসী সকলে মিল্যা অভিনব কায়দায় রক্ষা করছে জীবনের মায়া ত্যাগ কইরা, জানেন হেই খবর? কলা গাছে ও কাঁদিতে ঠেকনা, সেগুন চারায় ঠেকনা আর ধান ক্ষেতে বাধ বাইন্ধা পানি সরাইয়া তা করছে সবাই।

শংকর : না তো? জানিনা! আমিতো বাড়ির কর্মচারীর কাছে জানতে চাইছিলাম, কি অবস্থা? সে বললো, সব ঠিক আছে আব্বাজান। আমাগো কোনো ক্ষয়ক্ষতি অয় নাই!

সরুজ : আমারও একই অবস্থা। তা যা হোক, এবার কিন্তু অনেক বড় বাঁচা বাঁচছি ভাইজান। সবসময় আমরা যাদের শুধু অবহেলা করি, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি তারাই নিজেরা নিজেরা আইজ আমাগো এতো বড় উপকার করবো, স্বপ্নেও ভাবি নাই।

(আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বরসতী সব কিছুই শুনছিলো। ভিতরে প্রবেশ করে)

স্বরসতী : (সুরুজ চৌধুরীকে লক্ষ করে) আদাব ভাইসাব।

(স্বামীর দিকে মনোযোগ দিয়ে) দেখছো, আইজ এই দেশের হত-দরিদ্র মানুষরাই আমাগো সবচে' আপন। আর তোমরা কেবল তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো, তাদের অবহেলাই করো। এইডা কি ঠিক?

শংকর ও সরুজ : (একসাথে) ঠিক কথাই তো! আসলে ওদের মন খুব নরম, মানুষরে ওরা মন থেকেই দয়া করে, ভালোবাসে।

শংকর : আমি যে এতোদিন ওদের সাথে যাচ্ছে তাই ব্যবহার করেছি তার জন্য ওদের ডেকে নিয়ে আসি ভাইজান। গায়ের ঐ খেটে খাওয়া মানুষগুলারে বড় একটা আয়োজনের সাহায্যে ধন্যবাদ জানাই। আর ওদের কাছে টেনে নেই।

সরুজ : সত্যই, যা কইছো আমার ভালো লাগলো খুব।

শেষটা

(গায়ের মানুষজন উৎসবের আয়োজনের মতো আনন্দ করছে, উচ্চশ্রেণীর ধনিক শ্রেণীও তাদের সাথে একাত্ম হয়ে স্ফূর্তিতে মেতে উঠতে দেখা যাবে)

নেপথ্যে গান- আমি সেই দেশ খুঁজেছি কতো..... রাজার মতো)

৭৯ পৃষ্ঠার পর পড়ুন

তাঁর নিজের ভাষায়, "কলকাতার জন্য নস্টালজিয়া থেকে 'লেখকের লেখনী' বলে একটা লেখা লিখি। লেখক মানে ঈশ্বর, আর লেখনী আমি।" ফাদার দ্যতিয়েন ঈশ্বরের ভক্ত সেবক। সারাটা জীবন প্রভুর ইচ্ছেমতো চলবার আকাঙ্খা ও বাসনা তাঁকে তাড়িতে করেছে। তিনি নিজের কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিজের জন্য নির্ধারণ করেননি। তাইতো তাঁর সহজ সরল স্বীকারোক্তি: "জীবনদেবতার কথাই তো শুনতে চেয়েছি আমি।" ঈশ্বরের বাণী অন্তরে শুনতে পেয়েই তিনি লেখনীর মাধ্যমে নিজের মহৎ গুনাবলি তাঁর মহিমার জন্য নিবেদন করেছেন। ফাদারের একান্ত নিজের কথায় "আমার অস্তিত্বে একটা মুহূর্তও নেই যখন নিজেকে ঈশ্বরের কাছে কিংবা অন্যের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে চাইনি।" ঈশ্বরের প্রতি ফাদারের কী উদার আত্মসমর্পণ! মানুষকে সেবা করার সে কী অনাবিল আকাঙ্খা! সত্যিকারের সাধক সন্ন্যাসী ছাড়া এমন অকুণ্ঠ ঐশানুভূতি ও মানবপ্রেমের আকুতি দুর্লভ। তাই নিজের লেখালেখি ও যাজকীয় কর্মযজ্ঞের সমন্বয় সাধনের লক্ষে ফাদার দ্যতিয়েন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন, "সাহিত্য সৃষ্টি করা, বিশেষত হালকা ধরণের সাহিত্য কি যাজকের কাজ? খ্রিস্টধর্ম সব সংস্কৃতির অনুরাগী, বাঙালি সংস্কৃতির ও নিজের সংস্কৃতি নেই। খ্রিস্টানের সাহিত্য এবং খ্রিস্টীয় সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। ডায়েরির ছেঁড়াপাতা প্রচারধর্মী সাহিত্য নয়, সারা গ্রন্থে 'খ্রিস্টীয় চৈতন্য' পরিব্যাপ্ত, যা 'দরদ' নামে অভিহিত করেছেন সমালোচকেরা।"

ফাদার দ্যতিয়েনের সহপাঠী ও ঘনিষ্ট বন্ধু এবং আরেকজন প্রখ্যাত বাংলাভাষা সাধক ফাদার ম্যাথ্যু শিলিংস তাঁর যে মূল্যায়ন করেছেন, সেটা এই নিবন্ধের উপসংহারে তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেছেন: "ফাদারকে প্রধানত একজন খাঁটি জেজুইট সন্ন্যাসী খ্রিস্টানুগামী হিসাবে দেখেছি আমি। নিঃস্ব একজন সন্ন্যাসী, যাঁর জীবনে কোনো প্রাচুর্যতা, লেশমাত্র সৌখিনতা, কোনোও রকম নেশাও নেই। তাঁর অন্তরের গভীরে অন্তঃসলিলের মতো ধ্যান-প্রার্থনাময় জীবন বইয়ে যায়। যাজকীয় ও সন্ন্যাসজীবনে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যধিক। তাঁর একটিমাত্র বাসনা যিশুর আদর্শ ও প্রেম অন্যদের মধ্যে পৌঁছে দিতে বিশেষত লেখার মাধ্যমে। তাঁর চোখে-মুখে একটি গাম্ভীর্য, শক্তি ও দীপ্তিময়তা সব সময় খেলত, যার উৎস সেই ঐশসান্নিধ্যবোধ। তিনি হেসে বলতেন: "প্রশান্তি, মহানুভবতা ও ঔদার্য আমার বিপ্লবী মন্ত্রত্রয়।" ফাদার দ্যতিয়েনের জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই!

পরিবার: সেকাল - একাল

মারলিন ক্লারা

সংসার তথা পরিবারের আবাসস্থল হচ্ছে গৃহ। এই গৃহ বা ঘর কুঁড়ে ঘরও হতে পারে, হতে পারে অট্টালিকা। তবে জনমানবহীন ঘর কখনো সংসার হতে পারে না। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে নানা সম্পর্কের সূতো দিয়ে বুনন করে সংসার রূপ বন্ধন।

একক পরিবার অথবা যৌথ পরিবার রচিত হয় স্বামী-স্ত্রী-সন্তান এবং আরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নিয়ে। এই গৃহ বা ঘরের পিলার/ খুঁটি হচ্ছেন স্ত্রী আর ছাঁদ হচ্ছেন স্বামী। মজবুত পিলারের উপর মজবুত ছাঁদ ঘরটিকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখে। পিলার যদি দুর্বল হয় তাহলে ছাদ যতই শক্তপোক্ত হোক না কেন, তা ভেঙ্গে পড়ে, পক্ষান্তরে ছাদবিহীন দেয়াল আর পিলার একটা আশ্রয় নির্মাণ করলেও তা নিরাপদ হয় না।

সহজে করে বলতে হলে বলা যায় একটা পরিবার সুন্দর ও শান্তিময় করে গড়তে হলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। ইদানীং অধিকাংশ পরিবারেই একতা এবং শান্তির অভাব দেখা দিচ্ছে। সমাজে দেখা দিয়েছে শান্তি-শৃঙ্খলার অভাব। মানুষের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে কী যে হচ্ছে! একজন আরেকজনের পেছনে লাগছে, গুরুজনে ভক্তি আর ছোটদের প্রতি স্নেহ যেন উধাও হয়ে গেছে। আমরা আমাদের বড়দের সাথে কখনো তর্ক করিনি, চোখ তুলে কথা বলিনি আর আজকালকার ছেলেমেয়েদের দ্যাখো.. ..

অভিযোগের যেন শেষ নেই। তাই বলে এটাও বলা যাবে না যে, আগের যুগে চারিদিকে কেবল শান্তি সুখের বন্যা বয়ে যেতো। নানাবিধ সমস্যা সে আমলেও ছিলো। কিন্তু বিংশ এবং একোবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনগুলো অনেক চোখে পড়ার মতো। ছোট একটা লেখায় সেসব বিস্তারিত করে বলার সুযোগ সীমিত।

গত ৩০/৪০ বছর যাবৎ 'দু'টির বেশী সন্তান নয়, একটি হলে ভালো হয়' শ্লোগান চলছে। আমাদের দেশে আগে ধনী গরীব নির্বিশেষে ৫/৭/১০টি সন্তানের পরিবার হামেশাই দেখা যেতো। সকলে সমান খাদ্য-বস্ত্র না পেলেও পরস্পর মিলেমিশে চলার শিক্ষাটা পেতো। বড় ভাই-বোন ছোটদের দেখাশোনা করতো, ছোটরাও বড়দের মান করতো। এখন একটি দু'টি সন্তানের পরিবারে পরমতসহিষ্ণুতা প্রায় নেই বললেই চলে। অনেক পরিবার স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মজীবী বলে দীর্ঘ সময় তারা গৃহে অনুপস্থিত থাকেন। একক পরিবারে দাদা-দাদী বা অন্য কেউ না থাকায় সন্তানেরা অনেকটা সময় স্বাধীনভাবে থাকার সুযোগ পায়। বয়সের আগেই এই স্বাধীনতা তাদেরকে বিপথে যেতে সাহায্য করে। ক্লান্ত বাবা-মা ফিরে এসে তাদেরকে যথেষ্ট সময় দিতে না পারায় সন্তানের সাথে সুন্দর, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না।

অনেক সময় সন্তানদের সামনেই বাবা-মা কলহে লিপ্ত হয়। এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে সন্তানদের উপর। শিশুদের সামনে অন্যের নেতিবাচক সমালোচনা শিশুদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তারা যদি দেখে মা কিংবা বাবা তাদের শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে খারাপ মনোভাব প্রকাশ করে তখন তারাও সেটা শিখে এবং পরবর্তীতে সেই সব কুদৃষ্টান্ত নিজেদের পরিবারে চর্চা করে।

মনে রাখা জরুরী যে, মা-বাবা কী বলেন তার চেয়ে মা-বাবা কী করেন শিশুরা সেটাই বেশি অনুসরণ করে। তাকে যদি শিখানো হয়- সত্য কথা বলবে।

বড়দের মুখে মুখে কথা বলবে না, অথচ বাবা-মা মিথ্যা বলেন কিংবা দাদা-দাদীর মুখে মুখে কথা বলেন তখন সন্তানদের মনে এবং চিন্তায় তারা আহত হয়।

আজকাল সমাজে পারিবারিক অশান্তি ও বিবাহ বিচ্ছেদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ। বিয়ের আগে অবিবেচনা মায়েরা মেয়ের সাথে সঠিক আচরণ করেন না। তিনি নিজে গৃহিনী হয়েও মেয়েকে সংসার সম্পর্কে স্বাভাবিক ও সুস্থ শিক্ষা দান করেন না। সন্তানের ঘুম, বিশ্রাম ও ঘুম থেকে ওঠার স্বাভাবিক অভ্যাস গঠনে সাহায্য করেন না। ফলে বিয়ের পর শ্বশুড়বাড়ি গিয়ে নতুন বউ যদি অনেক দেরিতে জাগে এবং শ্বাশুড়ির কোন কাজে ভালোবেসে সাহায্য না করে তখন কী রকম অশান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?

এভাবে মা তার মেয়ের সাথে শত্রুতা করেন বলে আমার মনে হয়, অথচ ভাবটা এমন থাকে যেনো ভালোবেসেই করছেন। আমার এ লেখা পড়ে দয়া করে পাঠক আমায় ভুল বুঝবেন না। এইসব বিষয় নিয়ে ভাবতে বসে আরও অনেক কিছু মনে পড়েছে কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্যে তা লেখা সম্ভব হলো না।

আমি যা লিখছি, সবাই যে এমন করে তা মোটেই নয়। যারা তাদের সন্তানের গঠন দানে সচেতন তারা সুন্দর সন্তানের গঠন দানে সচেতন আর তারা সুন্দর সংসার রচনা করেন। সেজন্যই অনেক সুখী পরিবারের দেখা পাওয়া যায়। তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যারা অসচেতন তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস এই লেখাটা। লেখা সম্পর্কে আপনাদের মতামত আশা করছি।

বড়দিনে আহ্বান

পলিন কাম্পু

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট
পৃথিবীতে এসেছেন।
তিনি আমাদের সবার প্রিয়
তিনি মোদের ভালোবাসেন।
তাঁর দয়াতে বেঁচে আছি
আমরা সবাই
এসো আমরা তার-ই নামে
বন্দনা গান গাই।
আমরা সবাই পরস্পরকে
ভালোবাসার কথা বলি।
যিশুর নামে চলবো মোরা
যাব ঈশ্বরের গৃহে।
ঈশ্বর যেমন বাণী
সবাইকে দিয়েছেন পরিত্রাণ
ঈশ্বরের কৃপা দেখে ভরে গেল
মোদের মনপ্রাণ।

বড়দিন সান্নিধ্য

সুইটি পিরীজ

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বিছানায় গেলাম। বিছানায় যাওয়ার সাথেই ঘুমিয়ে পরলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন সন্ধ্যা। বাইরের দিকে তাকাতেই দেখি কেমন গাঢ় ঘুটঘুটে অন্ধকার। মোবাইল হাতে নিয়ে দেখলাম সময় বেশি হয়নি। মাত্র সাড়ে পাঁচটা। এখনই মনে হয় বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি আমার অনেক প্রিয়। ব্যালকনিতে কাপড় রয়েছে। তাই তড়িঘড়ি করে কাপড় আনতে ব্যালকনিতে গেলাম। এর মধ্যে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে। আমি এমনভাবে অবাক হয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছি মনে হচ্ছে এর আগে কখনও তা দেখিনি। ব্যালকিনির গ্রীলটা ধরে দাঁড়িয়ে আছি বাইরের বড় রাস্তাটার দিকে। মুষলধারে বৃষ্টি, মনে হয় আজ আর বৃষ্টি থামবে না। রঙ বেরঙের ছাতা নিয়ে লোক যাতায়াত করছে, মাঝে মধ্যে প্রাইভেটকার, রিক্সার টুংটাং শব্দ। আমার কেন এমন কান্না পাচ্ছে। কান্না পাওয়ার মত এমন কোন ঘটনাতো আজকে ঘটেনি। তাহলে কেন এমন হচ্ছে। দু'চোখ গড়িয়ে জল পরছে। বৃষ্টির জল আর চোখের জল একাকার হয়ে যাচ্ছে। বারবার মনে পড়ছে ত্রিশ বছর আগের কথা। রুমে এসে কাপড় চেঞ্জ করে চায়ের পানি বসালাম। কড়া করে এক কাপ চা বানালাম। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ফিরে গেলাম ত্রিশ বছর পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোতে; যে দিন ওর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো।

মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত এক সুদর্শন যুবক। প্রথম দেখাতেই যে কোন মেয়ে তার প্রেমে পরে যাবে। সুঠাম দেহের অধিকারী। আমাদের বিয়ের কথা আগেই হয়েছিল তবে পাকা কথা হয়নি। ছেলেকে না দেখে পাকা কথা দেওয়া হবে না। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী। সেদিন ছিলো মনোবিজ্ঞান ১ম পত্র পরীক্ষা। হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতাম। মায়ের সঙ্গে বাড়ীতে গেলাম। তখনকার রাস্তা ঘাট এত উন্নত ছিলো না। ফেরীতে নদী পার হতে হতো। বর্ষাকাল; তাই নদীতে ভরা যৌবন। বাস থেকে নেমে দেখি আমাদের কাজের ছেলেটা নদীর ঘাটে নৌকা নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। বাড়ীতে গিয়ে কারো সঙ্গে তেমন কথা হয়নি। শুধু খাবার খাওয়ার সময় যতটুকু কথা হলো। আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পরলাম। পরের দিন ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে বসলাম, কাল আবার পরীক্ষা।

আমার দিদিমা এসে আমাকে বললো, ছেলের বাড়ী থেকে লোকজন আসবে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। আমি দিদিমাকে বললাম রেডি হতে হবে না; যেভাবে আছি এভাবেই যাব। দিদিমা বললো এভাবে যাওয়া যাবে না, সালোয়ার কামিজ পর। কারণ আমি তখন স্কার্ট আর শার্ট পরতাম। যথাসময়ে ছেলে, ছেলের দাদাবাবুরা সঙ্গে মামা এবং দুইজন বন্ধু আসলো। ছেলের ছোট দাদাবাবু ছেলেকে এমন জায়গায় বসিয়েছে যাতে আমি যখন বারান্দায় ঢুকবো তখন ওই যেন আমাকে প্রথম দেখে। আর তাই হলো, ঢুকতেই দুজনের চোখে চোখ পড়লো। বুকের ভিতরটা কেমন ধক্ করে উঠলো। মনে হচ্ছে কেউ খুব জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছি। এক অজানা ভয়ে শরীর কাঁপছে। তখন কেউ একজন বললো, এই চেয়ারটাতে বসো। এরপর চেয়ারটায় খুব শান্ত হয়ে বসলাম। তখন আমার নাম জিজ্ঞেস করা হলো, পরীক্ষা কেমন হয়েছে, বাকী পরীক্ষা শেষ হতে কত'দিন লাগবে। চা-খাওয়ার পর্বটা শেষ। তখন ওর দাদাবাবু বললো, আমরা বাইরে গিয়ে একটু আলাপ সেরে আসি। বাইরে থেকে এসে ওর দাদাবাবু সবাইকে জানালো মেয়ে আমাদের পছন্দ। তোমাদের সম্মতি থাকলে আজকেই নাম লেখা হবে। তাই হলো, এক মাসের মধ্যে সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দেড় মাস পর ও চলে গেল কর্মস্থলে। বেশ ভালই কাটছিলো দিনগুলো।

আমাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা এত মধুর ছিলো যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। দু'জনের বোঝাপড়াটা ছিলো এমন এক বিশ্বাসের জায়গায়, ভালোবাসার ভিতটা ছিলো এত শক্ত, যা কোনদিন কেউ ভাঙতে পারেনি আর পারবেও না। বিয়ের দশ বছরের মধ্যে আমি দুই ছেলের মা হলাম। সবাইকে নিয়ে ভালই চলছিলো। বড়দিন আসলেই ছেলেরা জিজ্ঞেস করতো মা, বাবা আসবে না। সবার বাবা বড়দিনের সময় বাড়ীতে আসে শুধু আমার বাবা আসে না। আমিও ওদের মত অপেক্ষায় থাকতাম; হয়তো এইবার ছুটি পাবে। কিন্তু আঠারো বছরেও তা পূরণ হয়নি।

এক সময় বড়দিন আমার কাছে মনে হত হাজার রঙে মেলা শুধু ঝিকিমিকি রঙ। শুধু আনন্দ কোন দুঃখ, কষ্ট কিছু থাকবে না। একে অপরের কাছে যাব, রাগ-অভিমান ভুলে যাব। বড়দের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিবো, ছোটদের আশীর্বাদ করবো। বড়দিনের দিন যখন গির্জায় যেতাম তখন মনে হতো বিদেশী পারফিউমের সুগন্ধে গির্জা ঘরের ভেতরটা মৌ মৌ করছে। বিয়ের আঠার বছর বয়সে একবারও আমরা একসঙ্গে বড়দিন করতে পারিনি। যখন ছুটিতে আসতো অনেক ভালোবেসে জড়িয়ে ধরে বলতো বোকা মেয়ে এভাবে কেউ মন খারাপ করে, এই যে আমি ছুটিতে বাড়ীতে এসেছি এটাই আমার বড়দিন। ছুটির প্রত্যেকদিন আমাদের বড়দিন। এই যে বিদেশ থেকে জামা-কাপড় নিয়ে আসি, তা একসেট করে তুলে রাখ সামনে বড়দিনে পরবে বলে। আমি তো তোমাদের মধ্যে এইভাবেই জড়িয়ে থাকি। আরতো কয়েকটা বছর তার পরতো চলেই আসবো। যখন চাকুরীতে ছিলো তখন বড়দিনের সময় কার্ডের অপেক্ষায় থাকতাম। ডাকপিয়নকে দেখলে ছুটে যেতাম আমার বড়দিনের কার্ড এসেছে কিনা। অনেক সময় বড়দিন পার হয়ে যেত তারপর পেতাম। তারপরেও অনেক খুশী হতাম। এরপর এলো ফোনের যুগ, ওকেই আগে ফোন করতে হবে, তা না হলে কান্নাকাটি করে অভিমান করে বসে থাকতাম।

এক বড়দিনে এরকম একটা ঘটনা হলো, ওর ফোন আসছে না, এত দেরি করার কথা তো না। কোন কিছুতেই মন বসছে না, তাই আমিই বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলাম কিন্তু লাইন পাচ্ছি না। অনেক বার চেষ্টা করার পর হঠাৎ লাইন পেলাম। হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে কান্নার সুর ভেসে আসছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে তোমার? অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আমি জানি আজ বড়দিন, ফোন করার কোন সুযোগ ছিল না। আমরা যে জাহাজে করে মুক্তের দ্বীপে ফিরছি ঝড়ে সেই জাহাজ ডুবে যাওয়ার অবস্থা হয়ে গিয়েছিলো। হয়তো কোনদিন আর তোমাদের সাথে দেখা হতো না। জানিনা এখানে এমন কোন পুণ্যবান মানুষ আছেন কিনা যার কারণে ঈশ্বর আজ আমাদের সবাইকে রক্ষা করেছেন। ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিলো। আমি জানি না আমি ওকে কতটা ভালবাসি, কিন্তু আমি জানি, আমি ওকে যতটা ভালোবাসি ও তার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসে আমাকে। যার কোন পরিমাপ হয় না।

লিখতে লিখতে আনোয়ারা বেগম, শেলী ম্যাম এর কথা অনেক মনে পরছে। শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি ম্যামকে। ম্যামের লেখা যখন পড়তাম মনে হতো আমাদের কথাই ম্যাম উনার লেখার মাধ্যমে লিখেছেন। কি অসাধারণ ছিলো উনার লেখা।

আঠার বছর পর যখন একসঙ্গে বড়দিন করবো তখন কি যে আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছি

না। সিদ্ধান্ত হলো দুই ছেলেকে নিয়ে ঢাকা যাব কেনাকাটা করতে। ডিসেম্বর মাস দিন ছোট, তাই সকালবেলাই বেরিয়ে পরলাম কেনাকাটা করতে। ছয়টা বেজে গেছে। ঢাকায় থাকবো তেমন কোন আত্মীয় নেই। তাই বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কোন সিএনজি পাচ্ছিলাম না। মিশুকে করে গুলিস্থান গেলাম। তারপর বাসে করে বাড়ী। বাড়ি যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। ছেলেরা যে যার মত শুয়ে পরেছে। আমি ব্যাগগুলো গুছিয়ে রাখছিলাম। ব্যাগ গোছাতে দিয়ে দেখি আমার কাপড়ের ব্যাগটা নেই। রাতে ওকে আর কিছু বললাম না। পরের দিন সকালবেলা চা খেতে খেতে বললাম ব্যাগটা পাচ্ছি না। দু'জনে মিলে আবার খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। আমাকে কিছু না বলে ও রেডি হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছ বললে ও জানালো ঢাকায় যাচ্ছি, আরেকটি শাড়ি নিয়ে আসি। কাল হয়তো কারো হাত থেকে ব্যাগটা পরে গেছে। এরই নাম কি ভালোবাসা?

আরেকটা ঘটনা হয়তো কাকতালীয়। বড়দিন, নতুন বছর সব শেষ। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার জন্মদিন। আমি রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি আমার বাবা আমাকে বলছে তুই আমাকে খেতে দিলি না, আমি বাবাকে উত্তর দিলাম বাবা কেকতো শেষ হয়ে গেছে। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এর কয়েকদিন পর সন্ধ্যার সময় আমার ভাই, ভাইয়ের বউ, ভাস্তি ওরা আমার বাড়িতে আসে। সন্ধ্যার সময় সবাই একসঙ্গে চা খাই। এরপর টেবিল থেকে কোন কিছু না গুছিয়ে শুধু ঢেকে রাখলাম। দুই ছেলে যেহেতু বাইরে তাই দরজাটা শুধু চাপিয়ে রাখলাম।

আমার অনেক ক্লান্ত লাগছিলো, তাই আমি বিছানায় শুয়ে পরলাম। ও একটা বালিশ টান দিয়ে আধো শুয়া অবস্থায় শুয়ে মোবাইলে কিছু একটা চেক করছে। বিছানা থেকে উঠে জ্যাকেট পরতে পরতে আমাকে বলছে, উঠ দরজাটা বন্ধ কর। আমি বললাম, তুমি যাও। বারান্দায় পা রাখতেই আমাকে বলছে তাড়াতাড়ি উঠ দেখ, এটা কে? আমি ভাবছি কুকুর বা বিড়াল হবে। ঐ দৃশ্য মনে পড়লে এখনো আমার গায়ে কাটা দেয়; শিউরে উঠি। উঠে দেখি অপরিচিত এক লোক কাপে চা ঢেলে কেক হাতে নিয়ে খাচ্ছে। লোকটাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আপনি কে, ঘরে ঢুকছেন কেন, বাইরে যান; অমনি লোকটা তেড়ে আসছে আমাদের দিকে। অনেক কষ্টে লোকটাকে ঘর থেকে বের করা হলো। ভীষণ ভয় পেয়েছি। ও আমাকে বললো, দেখে আসি লোকটা কোথায় গেল।

বাজার, দোকান সবই আমাদের বাড়ির কাছে, কোথাও লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। আজও রহস্যই রয়ে গেল। কে এই লোক? আমাদের বাড়িতে বড়দিনে সবার ঘরে একদিন করে চায়ের নিমন্ত্রণ থাকতো সকালবেলা। এখন কেউ আর কাউকে এভাবে নিমন্ত্রণ করে না। সবাই খরচের হিসাব করে। এইবার আমি ঠিক করেছি বড়দিনে সবাইকে সকালবেলা চায়ের নিমন্ত্রণ দিবো। যেন এবারের বড়দিনটা আবার হাজার রঙের মেলা হয়ে উঠে।

নারীর ক্ষমতায়ন বিবর্তনে দৃশ্যমান

অসীম বেনেডিক্ট পামার

১। উৎসর্গ, আবেগ, আত্মবিশ্বাস, সাহস, ভালো পাবলিক বক্তা, জীবনে জেগে থেকে স্বপ্ন দেখাতে বিশ্বাসী, একটি মুক্তমনা, সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র হিসাবে জ্ঞান এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিফলন নারী স্বয়ং নিজেই। নারী লাস্যময়ী, নারী শক্তিশালী, নারী ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিচ্ছবি যেখানে রয়েছে সত্যমিথ্যার মাননির্ণয়ের সাহসিকতার প্রতিফলন।

২। অধিকারকে ক্ষুন্ন করে এমন ঐতিহ্যবাহী অভ্যাসজনিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে নারী সর্বদাই সোচ্চার। শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক নারী। নারীরা প্রমাণ করেছে দক্ষতা তৈরির সুযোগে আত্মবিশ্বাসী হওয়া এবং মূল লক্ষ্য অনুসরণে শিক্ষার মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমতা অর্জন। অবিসংবাদিত উদাহরণ; মালালা ইউসুফজাই বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।

৩। কিছু উল্লেখযোগ্য মহীয়সী নারীদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, প্রথমেই যে নামটি আসে তিনি হলেন মানবতার প্রতীক মাদার তেরেসা শান্তির জন্য ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে, প্রধান চরিত্রে জেন ফন্ডা সেরা অভিনেত্রী ছবি কামিং হোম ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার সেলমা লেগারলফ, এলিনর অস্ট্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যিনি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিবিদ অলিভার উইলিয়ামসনের সাথে অর্থনীতিতে মর্যাদাপূর্ণ নোবেল মেমোরিয়াল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম নারী, ১৯০৩ ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মারিই স্ক্লদওস্কা কুরিই পোলিশ-ফরাসি পদার্থবিদ এবং রসায়নবিদ প্রথম নারী যিনি দু'টি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাছাড়াও রাজনীতিতে দুই লৌহ মানবির আবির্ভাব ঘটেছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মারগারেট থেচার উল্লেখযোগ্য।

৪। নারীরা সুযোগ পেলে হয়ে উঠে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী। নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি স্কুল প্রেমিক হয়ে থাকে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। প্রতীয়মান হয় তালেবান চরমপন্থী থেকে শুরু করে আফ্রিকার বোকা হারাম এবং সর্বশেষ দেখতে পাই ইস্রায়েলের আগ্রাসন ফিলিস্তিনে। একটি শান্ত জীবন স্থির করার পরিবর্তে প্রতিটি নারী চায় দেশ, সমাজ এবং নিজের পরিবারের স্বার্থে তার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য। কখনই যেন তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হন।

৫। পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে নারীর মুখ্য পদচারণ বা সম্পৃক্ততা নেই। শিক্ষা, রাজনীতি, আর্থিক খাত, মানব সম্পদ, আইন প্রয়োগকারী খাত, সশস্ত্র বাহিনী, নার্সিং পেশা, মানবাধিকার সংস্থা এবং পুরুষের পাশাপাশি নিজ পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা পালন। এর প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা বিশ্বখ্যাত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অক্সফোর্ড, কলম্বিয়া, এম আই টি বোস্টন, কেমব্রিজ এবং আমাদের দেশে বাংলাদেশে প্রাচ্যের খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার মধ্য দিয়ে।

৬। নারীরা এখন দুস্থ সকল মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান, নিরাপদ আশ্রয়স্থল, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য, যুদ্ধ, লিঙ্গ বৈষম্য, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। মূল কথা হল, সকল নারীর জন্য শিক্ষা এবং সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই মূল লক্ষ্য। দেশ ও সমাজের অন্তরের অন্তঃস্থলে নারীরা চিরকাল থাকবে প্রতিবাদী নারীর প্রতিকৃতি হয়ে।

৭। ইউএন উইমেন হল লিঙ্গের জন্য নিবেদিত জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা, এটি বিশ্বব্যাপী নারী ও মেয়েদের চাহিদা মেটাতে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য ইউএন উইমেন কাজ করে যাচ্ছে তন্মোধ্যে নারীর নেতৃত্ব বৃদ্ধি, নারীর প্রতি সহিংসতার অবসান, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে যোগ্যতা ভিত্তিতে সমর্থন। নারীর ক্ষমতায়ন একটি চমৎকার এবং সক্রিয়তায় পরিপূর্ণ যা সমাজে সব নারীকে তাদের পথ প্রশস্থতে দৃশ্যমান।

Bangladesh Christian Association, Australia (BCAA) Inc.

বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান এসোসিয়েশন, অস্ট্রেলিয়া (বিসিএএ) ইন্ক

Reg:Inc9894894, Email:info.bcaa@yahoo.com.au, Facebook:bcaaustralia

Executive Committee 2024-2026

JEWEL PALMER
PRESIDENT

HUBERT GHARAMI
VICE PRESIDENT

AKASH GOMES
GENERAL SECRETARY

NIEL ROZARIO
ASST G.SECRETARY

LORETTA FRASER
TREASURER

SUDHON CRUZE
ORGANISING SECRETARY

ASHIT GOMES
ENTERTAINMENT SECRETARY

STELLA S GOMES
RELIGIOUS SECRETARY

TONMOY M ROZARIO
EDUCATION & PUBLICATION SECRETARY

ELIZABETH GOMES
WOMEN & CHILDREN AFFAIR

ANTHONY GOMES
SPORTS SECRETARY

SHOHEL C PALMA
CULTURAL SECRETARY

PANKAJ GREGORY
ASST. CULT. SECRETARY

BONOFACE CORRAYA
EXECUTIVE MEMBER

STANLEY ROZARIO
EXECUTIVE MEMBER

ADVISORY PANAL

FR.YACUB BARKAT
SPIRITUAL ADVISOR

JOSEPH GOMES

JEROME D'ROZARIO

GABRIAL GOMES

SWAPAN COSTA

DILIP ROZARIO

GERALD GOMES

DAVID CHOWDHURY

THEOPHIL ROZARIO

VINCENT ROZARIO

RATAN PERERA

SUPRITY ROZARIO

Bangladesh Christian Association Europe

BCAE
BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION EUROPE
EST: 2021

Registration number 9146 75 90 377

কার্যনির্বাহী পরিষদ (কার্যকাল ২০২৪ থেকে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ)

সনেট পি রোজারিও
সভাপতি
ইতালি

মার্ক কস্তা
সহ-সভাপতি
ফ্রান্স

রনি রোজারিও
সহ-সভাপতি
ফ্রান্স

অনুপ রোজারিও
সাধারণ সম্পাদক
ফ্রান্স

রান্টু গোমেজ
যুগ্ম সম্পাদক (১)
ইতালি

চার্লি বিশ্বাস
যুগ্ম সম্পাদক (২)
ফ্রান্স

শাওন কস্তা
সাংগঠনিক সম্পাদক
ফ্রান্স

জিসান পালমা
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
মাল্টা

তন্ময় রোজারিও
কোষাধ্যক্ষ
মাল্টা

হিমেল ডি'কস্তা
সহ-কোষাধ্যক্ষ
ফ্রান্স

ল্যানি রড্রিক্স
শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক
সুইডেন

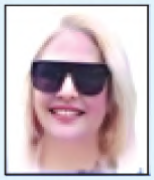
লাভলি ম্যান্ডেজ
সহ-শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক
ইতালি

ক্যামিলা রোজারিও
সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা
ফ্রান্স

জেনেভি রোজারিও
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা
ফ্রান্স

জেরি গোমেজ
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
ইংল্যান্ড

ডীন রোজারিও
সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
ফ্রান্স

অনল গোমেজ
ধর্মীয় সম্পাদক
ইতালি

এন্ড্রু দাস
সহ-ধর্মীয় সম্পাদক
ইতালি

এরিক ডিমেল
দপ্তর সম্পাদক
ডেনমার্ক

রিচার্ড পাপ্পু
সহ-দপ্তর সম্পাদক
ইতালি

বিকাশ পিউরীফিকেশন
ক্রিড়া সম্পাদক
ফ্রান্স

র‍্যাকিট কস্তা
সহ-ক্রিড়া সম্পাদক
পোল্যান্ড

প্রাঙ্গন রোজারিও
প্রচার সম্পাদক
ইংল্যান্ড

ষ্ট্যানলি গোমেজ
সহ-প্রচার সম্পাদক
পোল্যান্ড

প্রণতি রোজারিও
নির্বাচিত সদস্য
ইতালি

বাধন রোজারিও
নির্বাচিত সদস্য
ফিনল্যান্ড

সেতু কস্তা
নির্বাচিত সদস্য
ইতালি

প্রণয় পিউরীফিকেশন
নির্বাচিত সদস্য
ফ্রান্স

ডমিনিক রিবেরু
নির্বাচিত সদস্য
ইতালি

সম্মানিত উপদেষ্টা মণ্ডলী

কমল রোজারিও
উপদেষ্টা
ইতালি

ক্যান্টন হেনরী কস্তা
উপদেষ্টা
ফ্রান্স

তাসু কোড়াইয়া
উপদেষ্টা
ইতালি

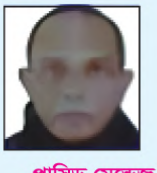
প্লাসিড মেন্ডেজ
উপদেষ্টা
ইতালি

শরৎ কস্তা
উপদেষ্টা
ইতালি

দীপক রোজারিও
উপদেষ্টা
জার্মানী

বাবু সরকার
উপদেষ্টা
ইতালি

প্রদীপ কস্তা
উপদেষ্টা
ইতালি

অনন্তধামে যাত্রার দ্বিতীয় বছর

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে
স্মৃতি যেন আমারই হৃদয়ে বেদনা রং বেরংয়ের ছবি আঁকে

প্রয়াত গাব্রিয়েল পেরেরা

জন্ম: ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাবা দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। কিভাবে যে একটি বছর পার হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। বাবা তোমার অভাব এখন ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছি।

বাবা, তোমার অভাব পূরণীয় নয়। তোমার অসীম ভালোবাসা কেবলই তোমার কথা মনে করিয়ে দেয় বার বার। তুমি ছিলে আমার কাছে বট বৃক্ষের মতো, যে বৃক্ষের ছায়া ছিল আমার মাথার উপর। বাবা আমি বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গধামে ঈশ্বরের কাছে ভালো আছ। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো এবং আশীর্বাদ করো।

পরিবারবর্গ –

স্ত্রী : হাসি দেশাই
ছেলে : পলাশ পেরেরা
নাতি : আকাশ গাব্রিয়েল পেরেরা
অনিত্য মাইকেল পেরেরা

ছেলের বউ : জেনেভি দেশাই

গ্রাম: বাগবাড়ী
মঠবাড়ী মিশন
গাজীপুর।

অনন্তধামে যাত্রার তৃতীয় বছর

প্রয়াত সিলভেস্টার দেশাই

জন্ম: ২৫ নভেম্বর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
২৫ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও
ঢাকা-১২১৫

**"শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো,
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো"**

আমার সাধ না মিটিল আশা না ফুরাইল, তবু-সকলই ফুরাইয়া গেল। বাবা বলে ডাকার সাধ, বাবাকে নিয়ে একসাথে বেঁচে থাকার আশা সবই শেষ হয়ে গেল। সেই দিন, যে দিন আমার বাবা আমাকে ছেড়ে এই ধরণী থেকে চিরকালের মত পিতা পরমেশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গধামে চলে গেলেন। আমার বাবা শুধু বাবাই ছিলেন না বরং মায়ের মত সাড়াটা জীবন আমাদের পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ দিয়েছেন।

বাবা তোমাকে কোনভাবেই ভুলতে পারছি না। তোমার সেই নাম ধরে ডাকা, আমার দিকে নিরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, তোমার ভালোবাসা, আদর ও ছোঁয়া আমি সারাক্ষণ অনুভব করছি।

বাবা তুমি শুধু আমার বাবা ছিলে না আমার বড় সন্তানও ছিলে তুমি। সন্তান মাকে ছেড়ে চলে গেলে যেমন কষ্ট হয় আমি ঠিক তেমনই কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে হারিয়ে। তোমার স্মৃতি আমার সমস্ত মন জুড়ে, ঘর জুড়ে রয়েছে।

আমার বাবা সিলভেস্টার দেশাই গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৫:৫৫ মিনিটে আমার বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। বাবার ইচ্ছা ছিল বাবার সবকিছু যেন আমার বাসাতে হয় এবং বাবা চেয়েছিলেন তার অবস্থা যখন খারাপ হয় সেই সময় যেন আমি বাবার সামনে থাকি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার বাবার এই ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দেয়ার জন্য।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের সকলের হাতে পবিত্র পানি পান করে, আমাদের প্রার্থনা শুনতে শুনতে, গির্জার সন্ধ্যা কালীন ঘণ্টা শুনে, দূত সংবাদ প্রার্থনা শেষে আমাদের ও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছো। ওপারে থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মেয়ে: জেনেভি দেশাই (শিপ্রা)
মেয়ে-জামাই: পলাশ পেরেরা
নাতি: আকাশ গাব্রিয়েল পেরেরা ও
অনিত্য মাইকেল পেরেরা

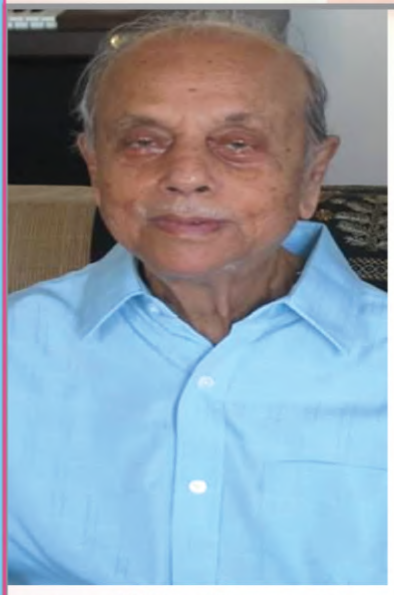

বাবা: সিরিল ডি রোজারিও
জন্ম : ৩ মার্চ, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ধনুন, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১০ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

মা: মারীয়া রোজারিও
জন্ম : ৭ আগস্ট, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : তিরিয়া, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

মাস পেরিয়ে, বছর ঘুরে সময়ের দীর্ঘতায় বাবা চলে যাওয়ার ৪ বছর আর মা চলে যাওয়র ৩ বছর হয়ে গেলেও মনকে মানাতে পারছিনা যে এটাই জগৎ সংসারের চিরন্তন রীতি। একদিন আমাদের সবাইকেই চলে যেতে হবে, কিন্তু বাবা মায়ের চলে যাবার পর যে শূন্যতা, তা যে ক্রমশই বাড়ছে – বই কমছে না।

আমাদের বাবা-মা, ধর্মপরায়ণ ছিলেন, জীবনের অভিজ্ঞতায় সব সময়ই বলতেন, 'কর্মই আসল ধর্ম' "সরল জীবন-যাপন করে ভালো কর্ম করো, তাহলেই জীবনে শান্তি পার্বে"। তোমাদের এই আদর্শ মেনে চলছি বলে কষ্টের মাঝেও সুখ খুঁজে পাই।

বাবা-মা, স্বর্গ থেকে তোমাদের সন্তান, নাতি-নাতনীদের আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের সরলতা ও প্রার্থনাপূর্ণ পবিত্র জীবনের সততায় আমাদের সন্তানদের, তোমাদের নাতি-নাতনীদেরকে গড়ে তুলতে পারি।

আশীর্বাদ প্রত্যাশী তোমাদের স্নেহের সন্তানগণ

সমর, স্বপন, সুবাস, সুধীর ও চিত্রা

WE WISH YOU A
Merry Christmas
HAPPY NEW YEAR 2025
Nepal
4 days/ 3 nights
BDT 44,900/-
Maldives-Sri Lanka
7 Days/6 Nights
BDT 85,900/-
Thailand- Malaysia- Singapore
10 Days/ 9 Nights
BDT 109,900/-
USA
7 Days/ 6 Nights
BDT 5,95,000/-
Canada
7 Days/ 6 Nights
BDT 5,95,000/-
Europe
7 Days/ 6 Nights
BDT 3,95,000/-
Package Booking Hotline
01917-915989
01610-997704
Dominic
Explore Holidays
The Smoothest Way!
Jubilee Visa Processing
01610-997722
01610-997720
Office address: Holding No. 32 (3rd Floor) Road 11, Block G, Banani, Dhaka 1213, Bangladesh
ATAB
IATA
PATA
VISA
BANK TRANSFER

তুমি আছো আমাদের হৃদয় মন্দিরে

প্রয়াত রেক্সি বাবু রোজারিও

জন্ম: ২৯ মার্চ, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

পৃথিবীর আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের মাঝে, অতি আপনজন হয়ে। তেমনিভাবে ভালোবাসা, মায়া-মমতার সকল বন্ধন ছিঁড়ে চলে গেছ আমাদের একা করে বহুদূরে। ১০ জুলাই সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের তোমার এই অকালমৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হয় যে তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে। তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তোমার অপরিসীম ভালোবাসাকে সম্বল করে আমরা বেঁচে আছি। আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গধামে ঈশ্বরের কাছে ভালো আছো। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।

পরিবারবর্গ
বাবা : মুকুল রোজারিও
মা : অনিমা কোড়াইয়া
বোন : কবিতা, পুরবি, ছন্দা

দড়িপাড়া মূলকারবাড়ি পূর্বপাড়া
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়

প্রয়াত আগষ্টিন কস্তা
জন্ম: ১২ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৬ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রভা ক্লারা কস্তা
জন্ম: ২৪ অক্টোবর
মৃত্যু: ৬ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা,

তোমরা আমাদের মাঝে নেই এ কথা বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়। তোমাদের প্রতিটা কাজ, তোমাদের স্পর্শ আমাদেরকে আজও ঘিরে রেখেছে। তোমরা ছিলে ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, সাহায্যকারিনী, ঈশ্বর নির্ভরশীলা। মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে, নিরবে নিভৃতে অন্যকে সাধ্যমত সহযোগিতা করেন। তোমাদের যেতে দিতে না চাইলেও তোমরা চলে গেলে!

এ মর্তে যারা পড়ে রইলাম, তোমাদের আদর-স্নেহ, তোমাদের স্পর্শ পাওয়ার একটা আর্তি রয়েই গেল। বিশ্বাস করি পরজনমে আবার তোমাদের কাছে পাবো সেই আনন্দলোকে। তোমাদের অনন্ত শান্তি কামনা করি।

শোকার্তচিত্তে,
ছেলে : জয়ন্ত কস্তা
ছেলে বউ: চামেলী কস্তা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: সেন্ডি ও পৃথিবী রোজারিও
ছেলে: অর্নব আগষ্টিন কস্তা

কস্তা বাড়ী
বড়ইহাজী, শুলপুর ধর্মপল্লী।

বাবা আমার শ্রেষ্ঠ বাবা

জোনাস সুনীল গমেজ
জন্ম: ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সকলের বাবাই সন্তানের পথ প্রদর্শক এবং আদর্শ শিক্ষক। আমি জানি না বাবার আত্মা অসীম আকাশে কিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার বাবা ছিলেন একজন সৎ, সহিষ্ণু এবং নিরলস মানুষ। বাবাকে দেখে আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সততা তৈরী হয়েছে। বাবার প্রতিদিনের কাজকর্ম থেকে আমরা ধর্মীয় এবং সামাজিক শিক্ষা পেয়ে বেড়ে উঠেছি। বাবার আদর্শে আমরা পাঁচ ভাইবোন বড় হয়ে শিখেছি কিভাবে সীমিত আয়ে পরিমিত ব্যয়ে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ভালো থাকা যায়।

আমাদের প্রিয় বাবা বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন বাবার পাশে আমি এবং মা বেশী থেকেছি। বাবার সেই গম্ভীর মুখখানি কেমন অসহায় হয়ে গিয়েছিল যা ভাবলে হৃদয় নিংড়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। ফুলে ফুলে ঢাকা বাবার নিথর দেহটি যেন ঘুরে ফিরে আমাদের স্মৃতিতে আসে। বাবা আর কোনদিন আমাদের মাঝে স্বশরীরে আসবে না। বাবা আছে আমাদের হৃদয়ের মাঝে-মনের মণিকোঠায় রইবে চির অমলীন।

জীবনে অনেক কিছু লিখতে হয়েছে। বাবার হাত ধরে লেখা শিখেছি, স্কুলে গিয়েছি। বাবার মৃত্যু সময়টা লিখতে কেমন যেন কলম আটকে যাচ্ছে, তবুও তার চলে যাওয়ার ক্ষণটি সকলকে জানাতে ইচ্ছে করছে। গত ১৫ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ১ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার বিকাল ৪:৩০ মি: স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমাদেরকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

আমাদের বাবার অসুস্থতার সময় শ্রদ্ধেয় ফাদার লেনার্ড বাবাকে রক্ত দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। উনাকে ধন্যবাদ এবং আমাদের পরিবার উনার কাছে চির কৃতজ্ঞ। সেসাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই অন্যান্য ফাদার এবং সিস্টারদের, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের যারা আমাদের সাহায্য করেছেন এবং সমবেদনা জানিয়েছে। আমরা বাবার আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

বাবা, তুমি যেখানেই থাক, আমরা বিশ্বাস করি তোমার আশীর্বাদের হাত আমাদের উপর সর্বদা থাকবে।

তোমারই স্নেহধন্য
স্ত্রী, কন্যা, পুত্রগণ,
পুত্রবধুরা, নাতী, নাতনীগণ।

তোমাকে স্মরিব চিরদিন

জীবন বহতা নদীর মতো ছুটে চলে। বাঁকে বাঁকে কিছুটা এদিক সেদিক হয়। জীবন চলার পথেও আসে নানা রকম বাঁধা বিপত্তি, সমস্যা আবার সমাধানও চলে আসে। আমি লিলা দোহার নবাবগঞ্জের ছোট্ট একটি গ্রামে জন্ম আমার। গ্রামটি আমার বড়ই প্রিয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আমি সবে কিশোরী, স্কুলে যাই। গ্রামের দু'জন ছেলে আমার থেকে বয়সে বেশ বড় হবে। আমার প্রতি দু'জনেরই কুনজর পড়ে। আমার কোন ভাই নেই। বাবার বয়স হয়েছে। মা ও বাবা বেশ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমিও ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। তখন মা আমাকে সিস্টার সমাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিস্টার এসে আমাকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার কথা হয়। কিন্তু অনেকদিন হয়ে যায়, সিস্টার আসে না। শেষে মা বাবা আমাকে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং পাত্র খুঁজতে থাকেন। সেসময়ের প্রেক্ষিতে সুন্দর কিশোরী মেয়ের জন্য উপার্জনক্ষম শিক্ষিত পাত্র বেশ সহজেই মিলে যেত।

হয়তো আমার মা-বাবার আগের জন্মের কোন ভালো কাজের প্রতিদান করেছেন। সুনীলের বাড়ী আমাদের গ্রামেই। বিয়ের পর তাকে দুই চারবার দেখেছি, কিন্তু কখনও কথা হয়নি। বেশ ধুমধামের সাথে আমার বাগদান হয়ে যায়। ঘটনাটি এখনও আমার মনে পড়ে, আবার হাসিও পায়। যে ছেলেরা আমার পেছনে লেগেছিল তাদের এক আত্মীয়া আমাকে অনেক আদর করে ডেকে নিয়ে জোর করে এক গ্লাস দুধ খেতে দেয়। আর তারপরই আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাকে ঢাকায় পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। তখন সুনীল আমার চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করেছিল। এক বছর পর খুব ধুমধামের সাথে হাসনাবাদ জপমালা রাণীর গির্জায় আমাদের বিয়ে হয়। বিয়েতে আনা হয়েছিল দু'টো পালকি, ২২টা ঘোড়া। ঐসময়ে গ্রামের বাড়ীতে কেকও কাঠা হয়েছিল। আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার সলোমন। বিয়ের তারিখ ছিল ২৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার। আবার ঐদিন সুনীলের জন্মবারও ছিল। সুনীল মানুষটা যে এত ভালো, এত মানবিক, এত ধার্মিক বা এত হৃদয়বান তা বুঝতে সময় লেগেছে। সেই ছোট্ট কিশোরী সীলাকে আদর, যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে সংসার, সামাজিকতা, সভ্যতা, সুন্দর আচার-আচরণ, এমনকি ভালো মা হাবার শিক্ষা দিয়েছেন। সুনীলের ভালোবাসায় সিক্ত আমি। তাকে ভালোবাসি এবং সম্মান করি। সেসময় বেড়ানোর মত কোন জায়গা আমাদের ছিল না। আমার নানা শ্বশুরের মস্ত একখানা বাড়ী ছিল, দেখলে মনে হতো জমিদার বাড়ী। বাড়ীর পেছনে ছিল অনেক বড় বাগান। সেখানে ফলজ, বনজ ঔষধী গাছ ছিল। ছিল একটা বড় পুকুর। সে এক নয়ন কাড়া দৃশ্য যা উপভোগ করা যায়। খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গতো পাখির কল-কাকলীতে আর কোকিলের মিষ্টি সুরে যেন আজও কানে বাজে। বড়দিনে আমরা প্রায়ই সেখানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যেতাম। শুধু আমরাই না, আমরা ভাসুর, জ্যা এবং তাদের ছেলেমেয়েরাও যেত। তারাও আনন্দে মেতে উঠত। সেসব আমাদের জীবনের সুখ স্মৃতি।

প্রায় ৬০ বছরের যুগল জীবন আমাদের । যাপিত জীবনে আমরা পাঁচটি সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছি। তারা সকলেই সুশিক্ষিত এবং সাবলম্বী। দেশে এবং বিদেশে বসবাস করছে। বিবাহিত জীবনের এই ৬০টি বছর যেন ভালোবাসার চাদরে মোড়া, সে মোড়ক কখনও খুলবে না, যার স্থান হৃদয়ের মণিকোঠায়।

আমার ভালোবাসার মানুষটি বেশ কয় বছর প্রায় শয্যাশায়ী ছিল। শেষে দিকে বিনা কারণে অঝোর ধারায় কান্নাকাটি করতো। খেতে চাইতো না, কথাও বলতো অনেক কম। কিন্তু আমাকে ছাড়তো না, মনে হতো সারাক্ষণ আমাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকবে। হয়তো অনেক না বলা কথা আছে যা সে বলতে চায়, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো। একমাত্র কন্যা স্বপ্নাকে বড় বেশী আদর করতো। মেয়ে খাইয়ে দিলে প্রফুল্ল চিত্তে খাবার খেত। অসুস্থতার কারণে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে যেতে হয়েছে। প্রতিবার হাসপাতাল থেকে নিজের ঘরে ফিরে যেন প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতো। মেয়ের দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি ছড়িয়ে মেয়েকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতো, খুশীতে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়তো কপোল বেয়ে।

এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছি। সময়ে পরে আমাদেরকে পরপারে চলে যেতে হবে। বিষয়টি সকলেই জানি, কিন্তু মানতে কষ্ট হয়।

সেদিন ছিল রবিবার, ২৬ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে সুনীল।

তাড়াতাড়ি আমরা এ্যাম্বুলেন্স করে স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে আসি। অন্যান্যবার ৪/৫ দিনেই ছাড়া পেয়ে যেত। এবার আর তা হলো না, টানা ২০দিন হাসপাতালে। আমরাও বুঝতে পারছিলাম এইবার বুঝি আমাদের মায়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কোন ঔষধই কাজ করছিল না। ১৫ জুন, শনিবার বেলা ৪:৩০ মিঃ ছেলেমেয়েরা চারপাশ ঘিরে। সকলের দৃষ্টি তার দিকে। হয়তো সুনীলেরও খুব কষ্ট হচ্ছিল আমাদের চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে। কিন্তু মুখে কথা ছিল না, জোরে ২/৩ বার শ্বাস নিল। তারপরই নিথর হয়ে পড়ে। সুনীল আমাকে আমাদেরকে ছেড়ে অসীম সুনীল আকাশে পাড়ি দিয়েছে। তার আত্মা চলে গেল, আমরা কেউ বুঝতেও পারলাম না।

সুনীল তোমাকে কখনও চিঠি লেখা হয় নাই। দেখতে দেখতে ছয়মাস হতে চললো। তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। তোমার বিয়োগ-ব্যাথা আমাকে চিঠি লিখতে বাধ্য করেছে। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর কোলে তোমাকে স্থান দেয়। যেখানেই থাক, ভালো থেকো। পত্রের শেষ প্রান্তে এসে কিশোর কুমারের সেই গানটি বড় মনে পড়ছে, যা আমরা দু'জনে জোছনা রাতে বেলকনিতে বসে শুনতাম। আজ তোমার জন্য তার প্রথম কলি পাঠিয়ে দিলাম।

'এইতো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়
স্বপ্ন মধুর মোহে
এই জীবনে যে ক'টি দিন পাবো
তোমায় আমায় হেসে খেলে
কাটিয়ে যাবো দোঁহে
স্বপ্ন মধুর মোহে'।

তোমারই ভালোবাসায় ধন্য

লীলা

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু!

চিত্রা রোজারিও

আমি আমার অবস্থান থেকে কখনো ভাবতেই পারি নাই যে, আমি যা মনে মনে আশা করছি বা চাই তা যে বাস্তবে পেতে পারি আর কল্পনাও করিনি যে, ঈশ্বর আমার মত ক্ষুদ্র সন্তানের আশা, স্বপ্ন পূর্ণ করবেন, তাও ভাবতে যেন আরো একটা স্বপ্ন দেখতে হয়! তবে আমি ছোটবেলা থেকে ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাস আর আশা নিয়ে প্রার্থনা করতাম আর তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা বলতাম, বলাবাহুল্য, আমার কাছে প্রার্থনা মানে ইশ্বরের সাথে কথা বলা।

যাইহোক, আমার এই বিশ্বাসের ধাপ শেয়ার করার অর্থই হলো, যারা আমার এই লেখাটি পড়বে, তাদের ভিতর ঈশ্বরের ভিত কতটুকু শক্ত অথবা ঈশ্বরের উপর তাদের আস্থা কতখানি তা আরেকবার যেন নিজেরাই মূল্যায়ন করতে পারে। আমি বলবো আমরা যেমনই হই না কেন, যেভাবেই তাঁকে ডাকিনা কেন, তাতে যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে আর তিনি যদি মনে করেন, তা আমার জন্য মঙ্গল, তাহলে সেই আশা, স্বপ্ন সফল হবেই হবে।

ছোটবেলা থেকেই আমি গল্প করার চেয়ে গল্প শুনতে ভালোবাসতাম; আর যখন কেউ ভ্রমণের কথা বলতো, সেখানে তো আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতাম আর ভাবতাম যেমন করে বর্ণনা দিচ্ছে আমিই যেন সেখানে স্বপ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছি! গির্জায় যখন কোন ফাদার উপদেশে ইস্রায়েল বা ইতালির কথা বলতো, তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতাম আর ভাবতাম যিশু স্বয়ং ইস্রায়েল জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেছেন, সেই গেৎশিমানী বাগান, জৈতুন পর্বতে তাঁর রূপান্তর, জর্ডন নদীতে যিশুর বাপ্তিস্ম, তাঁর যাতনাভোগের যাত্রা অবাক বিস্ময়ে শুনতাম আর ছোট্টমনে আশা করতাম, ইস! আমিও যদি যাওয়ার সুযোগ পেতাম! বাংলাদেশে পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সিল দেখলাম, যে কোনো দেশে যেতে পারবো ইস্রায়েল ব্যতীত! কি যে মন খারাপ হয়েছিল!

আসলে আমার কয়েকটা দেশে যাওয়ার বাসনা জাগে বিভিন্ন কারণে, যেমন ইস্রায়েল যাবার বাসনা হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্ম বেড়ে উঠা, মৃত্যু স্বর্গারোহন এসব ঘটনা কোনো কল্পনা নয় স্বয়ং প্রভুর আগমন হয়েছিল এই পৃথিবীতে তাই সেই ইস্রায়েল যাবার বাসনা; কলকাতায় বান্ডেলের গির্জা, যিশুর প্রতিনিধি যেখানে অবস্থান করছেন সেই রোম নগরী, সাধু আন্তনীর জন্ম/মৃত্যুর স্থান, জার্মানি আর ফাতিমা যেখানে ফ্রান্সিসকা, লুসি এবং জাসিন্তাকে মা মারীয়া দেখা দিয়েছিলেন ও ফ্রান্স এ লুর্দের রাণী গির্জা, যেখানে সাধী বার্নাডেট দেখা দিয়েছিলেন।

এসব স্বপ্নের কথা শুধু মাকেই বলতাম, কেননা এসব আশা করাও যেন একটা দুঃস্বপ্ন ছিল আমার কাছে! কেননা গায়ের রং ময়লা হওয়ার কারণেই হোক অথবা

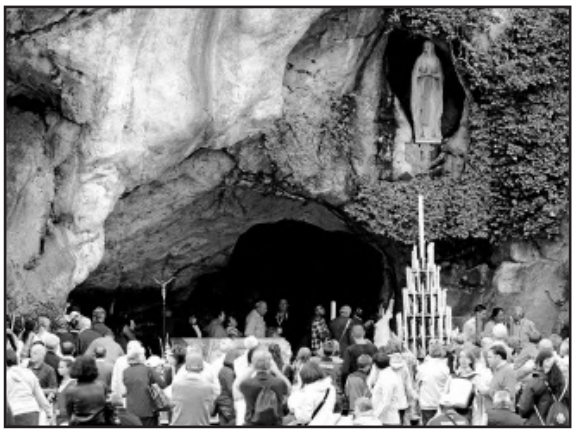

স্বল্প বুদ্ধির জন্যই হোক, বিয়ের আগে কি পরে কটাক্ষ কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত ছিলাম, শৈশব এ তাই নীরবে যখনই কোনো ইচ্ছা, আশা মনে উঁকি দিতো সেসব গোপন ইচ্ছা অথবা সুখ দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, সবই ঈশ্বরের কাছে বলতাম, আগেই বলেছি আমার কাছে প্রার্থনা মানে ঈশ্বরের সাথে কথা বলা, নীরবে বসে সময় কাটানো, সুখের জন্য ধন্যবাদ আর কষ্ট পেলে কেঁদে কেঁদে ক্রুশ মূর্তির দিকে তাকিয়ে সব শেয়ার করে হালকা হতাম।

যখন কোলকাতার বান্ডেল এর চার্চের গল্প শুনলাম, কিভাবে নাবিক ঝড়ের কবল থেকে তার জাহাজ এবং জাহাজের মূল্যবান মালামালসহ সকল মানুষকে রক্ষা পেয়েছিল, কুমারী মারীয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বান্ডেল চার্চ নির্মাণ ও সেই জাহাজের মাস্তুল এখন গির্জাতেই রাখা আছে। এসব গল্প শুনে শুনে খুব ইচ্ছে হয়েছিল, সেই গির্জাতে যাওয়ার, জানি তখন কলকাতা যাওয়ার সামর্থ ছিল না। মা কে এই কথা বলার পর, মা বললো, "বান্ডেলের মায়ের কাছে প্রার্থনা করো, তিনিই ব্যবস্থা করে দিবেন।" মা এর কথা মতো সেই থেকে প্রার্থনা শুরু, একদিন মাকে বললাম, "কুমারী মা তো উত্তর দিলোনা।" মা বললো, "বিশ্বাস হারিও না।" তখন আমি ওয়ার্ল্ডভিশন এ কাজ করি, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মা এর সাথে কথা বলার ১৫ দিনের মাথায় অফিস থেকে চিঠি পেলাম আমিসহ ৩ জন কে ইন্ডিয়ার হায়দরাবাদ ১ সপ্তাহের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ এ ট্রেনিং এর জন্য পাঠানো হচ্ছে। আর তখনি আমার কলিগদের সাথে পরামর্শ করে, বান্ডেল যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম এবং মা মারীয়া সেই আশা শুধু পূরণই করেন নি, মাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে এসেছিলাম যেন পরিবার নিয়ে যেতে পারি আর গিয়েছিলামও, একবার নয় ২ বার!

এরমধ্যে আর এক ঘটনা হলো ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে আমার ছেলে ব্লাড সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, ডাক্তার বললো একমাত্র ঈশ্বর পারে তাকে ভালো করতে। আমার মা তখন আমেরিকাতে, শুনে বললো "মাদ্রাজে ভেলেঙ্কিনী কুমারী মারীয়ার কাছে মানত কর।" আর আমি মানত করে বললাম, আমার ছেলে ভালো হলে, সেখানে গিয়ে আমি মানত পূর্ণ করবো। আর সত্য সত্যিই ট্রিটমেন্ট শুরু হওয়ার ১৫ দিনের মাথায় ডাক্তার জানানো প্লাটেলেস সেল গড়ছে। আর ১ মাসের মধ্যে ভালো হওয়ার পর আমি অফিস জয়েন করে প্রথম দিন চিঠি পেলাম আমাকে মাদ্রাজ ট্রেনিং এর জন্য পাঠানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্কুটার নিয়ে ধানমন্ডি হেডঅফিসে গিয়ে প্রয়াত মিস্টার সিলভেস্টার হালদার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টরকে আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে ঘটনা খুলে বললাম, যে এটা আমার প্রতি ভেলেঙ্কিনী কুমারী মারীয়ার বিশেষ আশীর্বাদ। সব শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন; আমি আমার কলিগদের সাথে মাদ্রাজে গিয়ে প্রথম দিনই আমার মানত পূর্ণ করতে সেই valunkini গির্জায় যাই আর ধন্যবাদ দেই।

আমার আমেরিকাতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা কখনই ছিলনা। অথচ আমিই কিনা কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকাতে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করলাম ২০০৩ থেকে, সেও ঈশ্বরের আশীর্বাদে এসাইলাম পাশ, লটারিতে অফিসের কাছে এপার্টমেন্ট পাওয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতানুযায়ী চাকরিতে পজিশন, আবার নতুন করে গির্জার গান পরিচালনা করা এই সবই যেন স্বপ্নের মতো ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্তি।

যাহোক, আমার ৪ স্থানে তীর্থে যাওয়ার সুযোগ হলো বিশ্বাসের পূর্ণতায়! ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার স্ট্যানলি গমেজ এর নেতৃত্বে পূণ্যভূমি ইস্রায়েল এ যাবার প্রথম সুযোগ হয়, যে স্বপ্ন আমি দেশে দেখেছিলাম তা আমেরিকাতে এসে পূর্ণ হলো! ভাবাই যায়না আমাদের ত্রাণকর্তার জন্মস্থান, তাঁর বেড়ে উঠা, তাঁর অলোকিক কার্যের সেই স্থান, জর্দান নদী যেখানে যিশুর বাপ্তিস্ম হয়েছিল, কানান নগর বিয়ে বাড়িতে যিশুর প্রথম আশ্চর্য কাজ; যিশুর বিচার মৃত্যু, যে সমস্ত স্থান দিয়ে যিশু হেঁটেছেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই ষষ্ঠ স্থানে আমি "চিত্রা' হেঁটে বেড়িয়েছি, দু'চোখ দিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি, ফাদার স্ট্যানলি বলতেন, "অর্থ বিত্ত থাকলেও পুণ্যভূমিতে সবাই আসতে সুযোগ পায়না।" কিন্তু সেখানে আমি পেয়েছি! এ যে প্রভুর কত বড় আশীর্বাদ তা বলাই বাহুল্য।

অতঃপর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ফাদার স্ট্যানলি গোমেজের নেতৃত্বে আবারো ইতালি, পোপের রাজ্য রোম নগরী, সাধু পিতরের গির্জা, সাধু আন্তনীর পাদুয়া নগর। ১০ দিনের তীর্থে গিয়ে আমার আরো একটি স্বপ্ন পূরণ হলো!

ছোটবেলাতে, আমার বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গল্প শুনাতেন, বাবা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের সময়ে টঙ্গীতে একটি ক্যাম্পে কাজ করতেন, বাবার স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা স্থান, কাল, তারিখসহ উল্লেখ করে গল্প বলতেন। হিটলারের অমানবিক অত্যাচারের কথা, জার্মানিতে নিরীহ মানুষদের অত্যাচার, গ্যাসচেম্বারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা, ব্যারাকে/ক্যাম্পে হাজার হাজার মানুষকে আটকে রেখে নির্যাতন আর শিশু নারীদের নির্মমভাবে অত্যাচার করে মেরে ফেলার কাহিনী যখন বলতেন, তখন আমি শুধু কল্পনাই এসব ভাবতাম। কারণ এসব স্থানে যাওয়ার সুযোগ তো কখনোই হবেনা। কিন্তু অদম্য ইচ্ছা হয়েছিল বলেই ঈশ্বর আবারো আমার আশা পূরণ করেছেন। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে ২ সপ্তাহের জন্য আমি জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফোর্ট এবং বার্লিনে এসব ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করে, নিজের চোখে দর্শন করেছি, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছি! মনটা তখন খুবই খারাপ হয়েছিল এই ভেবে যে ঈশ্বর মানুষকে কত ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন আর মানুষই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে মানুষকেই হত্যা করে। কি পেলো তাতে! ইতিহাসই স্বাক্ষ্য বহন করছে।

আর শেষের স্বপ্নটা ছিল স্পেন মাদ্রিদ, ফাতিমার গির্জা, ফ্রান্সের লুর্দের রাণী গির্জা ও সাধু আন্তনীর জন্মস্থান; লক্ষ্মীবাজার ফাতিমার গ্রোটোতে ফাদার দত্ত ফাতিমাতে তিন শিশু সন্তানকে কুমারী মারীয়া দেখা দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছিল। আর তখন থেকেই আমার পর্তুগালের ফাতিমাতে যাওয়ার ইচ্ছা জাগে। বাংলাদেশ থেকে একদল ফাতিমাতে তীর্থে গিয়েছিলো, তখন সামর্থ ছিলনা আবার আমেরিকাতে আসার পর ফাদার স্ট্যানলি গমেজ একদল নিয়ে তীর্থে গেলো। কিন্তু আমার গ্রীনকার্ড না থাকতে যেতে পারিনি; কষ্ট থাকলেও আফসোস ছিলনা। আমার মায়ের কথা মনে রেখে ফাতিমা রাণী এবং লুর্দের রাণীর কাছে প্রার্থনা করে মা মারীয়াকে বলতাম যে, "তোমার যদি ইচ্ছে হয় আমাকে একবার সুযোগ দিও।" এর মধ্যে আরো একটা ঘটনা শেয়ার না করলেই নয়, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে বাড়ি কেনার চেষ্টা করছিলাম আর ফাতিমা রাণীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম আর মনে মনে বললাম, যদি ঘর হয় আমি মাকে ঘরের সামনে স্থাপন করবো। আর এই কথা আমি মাদার তেরেসার আশ্রম এর সিস্টার টোনিয়াকে শেয়ার করলাম, তিনি বললেন আমি তোমাকে ফাতিমার মূর্তি দিবো। তুমি এ বছরে বাড়ি পাবে আর সত্যি সত্যিই একমাসের মধ্যে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে বাড়ি কিনলাম। সিস্টার ফাতিমার মূর্তি দিলো আর সেই মূর্তির কাছে আমার শেষ আশার কথা বলতাম; ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ফাদার স্ট্যানলি গমেজ স্পেন মাদ্রিদ, ফাতিমা আর লূর্দে তীর্থের কথা জানান, আমি নাম দিলেও একটু চিন্তিত ছিলাম অর্থ নিয়ে। কিন্তু মা মারীয়ার অশেষ কৃপায় ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে ১৬ দিনের তীর্থে যাবার সুযোগের সাথে আমার জীবনের সবচাইতে বড় আশা আর জীবনের স্বপ্ন হলো পূরণ হলো। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর" ঈশ্বরের কাছে আর কিছু চাওয়ার নেই, এখন বয়স ৬০ হয়ে গেছে, কোনো অভিযোগ, অনুযোগ নেই। ছোটবেলাতে পড়েছিলাম "ঈশ্বর চান আমরা যেন স্বর্গে তাঁর সাথে বসবাস করতে পারি" তাই তারই প্রতীক্ষায় প্রস্তুতি নিচ্ছি এইটুকু শেষ মিনতি আমার প্রভুর কাছে, এই পৃথিবীতে আমার নিরূপিত সময় পর্যন্ত আমাকে যেন ঈশ্বর ভালো রাখেন।

সুখবর, সুখবর, সুখবর!!

সুলেখক ফাদার দিলীপ এস. কস্তা এবারে বড়দিনে আমাদের সকলকে উপহার দিচ্ছে তার নতুন বই যিশুর জন্মদিন : শুভ বড়দিন।

স্বল্প পরিসরে বড়দিনের আদ্যোপান্ত জানতে পারবেন এই বইটিতে। খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের জন্যই এই বইটি তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার হতে পারে। তাই দেরী না করে সংগ্রহ করুন বইটি এবং পড়ে ফেলুন আজই। বইটি পাবেন আপনার হাতের নাগালেই।

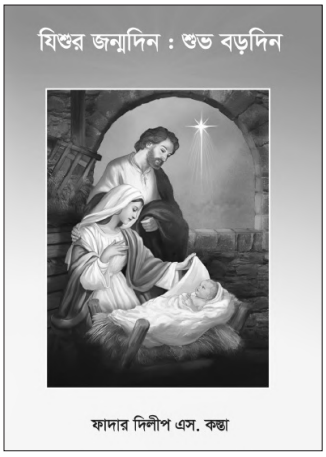

বইটির প্রাপ্তিস্থান: প্রতিবেশীর প্রকাশনীর সকল বিক্রয় কেন্দ্র।
খ্রিষ্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী।
বনপাড়া ধর্মপল্লী, নাটোর।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে তারুণ্যের স্মার্টনেস হোক মেধা ও দক্ষতার সৌন্দর্যে

উজ্জ্বল এ গমেজ

৯০ দশকের কথা। প্রতি শুক্রবার বিকেল তিনটায় সাদা-কালো টেলিভিশনে বাংলাদেশ টেলিভিশন চ্যানেলে বাংলা সিনেমা দেখানো হতো। যে বাড়িতে সিনেমা দেখাতো, সেখানে সারা গ্রামের মানুষ আসতো। যারা আগে আসতো তারা ঘরের ভেতরে, পরে আসলে মাটির ঘরে বারান্দায়। আর এর পরে আসলে উঠানে বসে বা দাঁড়িয়ে দেখতে হতো। মাঝে মাঝে ডিশ লাইনে কারিগরি সমস্যার কারণে টিভির পর্দায় নায়ক-নায়িকাদের স্পষ্টভাবে দেখা যেতো না। তখন গিয়ে ডিশ অ্যান্টেনা নাড়ানো হতো। ওই সময়ে শুধু বিটিভির প্রোগ্রাম দেখে তরুণরা বিনোদন উপভোগ করেছে। এর আগে জনপ্রিয় ছিল রেডিও। তরুণরা রাত জেগে রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুনতো। সময়ের পালা-বদলে ভিসিপি, ভিসিআর এবং সবশেষে ক্যাবল টিভি চ্যানেল দেখেছে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে দেশে আসে বোতাম টেপা মুঠোফোন। সেটিও তারা ভালো চালাতে জানতো না। তবে তাঁরা ল্যান্ডলাইন ফোনের সাথে বেড়ে উঠেছে।

মানব সভ্যতার প্রতিটি প্রজন্মেরই একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। আলাদা ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকে। তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির স্বকীয়তা থাকে। এর জন্যই প্রত্যেকটি প্রজন্ম একটা থেকে অন্যটা আলাদা। তবে প্রতিটি প্রজন্মই আগের প্রজন্ম থেকে নানা দিক দিয়ে এগিয়ে থাকে। বিশেষ করে উদ্ভাবনী প্রাযুক্তিক জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতায়।

বদলে যায় তরুণ প্রজন্মের মানসিকতা

একবিংশ শতাব্দীতে এসে তথ্যপ্রযুক্তি অভাবনীয় উন্নতির সুবাদে বদলে গেছে মানুষের জীবনের দৃশ্যপট। পরিবর্তনশীল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ হয়ে যাচ্ছে আপডেটেড। প্রতিদিনকার জীবন-যাপন, কাজ-কর্মে আসছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। আর সে ছোঁয়ায় জীবন-যাপন স্টাইল ও মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির হচ্ছে পরিবর্তন। স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। আজ বাসার সাহায্যকারী রহিমা ও রিকশাচালক করিমের হাতেও রয়েছে একটা স্মার্টফোন। ব্যবহার করছেন সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক, টিকটক। ভিডিও কলে কথা বলেছেন মেসেঞ্জার, ইমু, হোয়াটসঅ্যাপে। স্মার্টলি টাকা লেন-দেন করছেন মোবাইলে থাকা বিকাশ, নগদ, উপায়, রকেট অ্যাপে।

অন্যদিকে, দেশের তরুণদের নিত্যদিনের জীবনকে যাদুর মতো প্রভাবিত করছে বিশ্বের নতুন নতুন প্রযুক্তি। এসব প্রযুক্তির ছোঁয়ায় তরুণ প্রজন্ম হয়েছে স্মার্ট। এখন তাঁরা সবকিছু প্রযুক্তির সাহায্যে করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। প্রযুক্তির ভাষায় ভাবতে, চিন্তা করতে ও সেগুলো প্রকাশ করতে পছন্দ করে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের তাঁদের দেওয়া নাম 'জেন-জি' ডাক শুনতেও ভাল লাগে। তরুণ প্রজন্মের মানসিকতার এই রূপান্তর নতুন প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার পূর্বাভাস দেয়।

জেন-জি কারা, কি তাঁদের পরিচয়?

কেয়ারগিভার্স অব আমেরিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধের তথ্যমতে, ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে এবং ২০১০ এর দশকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণকারীদের বলা হয় 'জেনারেশন জেড' বা সংক্ষেপে 'জেন জি'। আরও সুস্পষ্ট করে বলতে গেলে ১৯৯৭ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যারা জন্মগ্রহণ করেছন তারা এই প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের হিসেবে সবচেয়ে বড় জেড সদস্যের বয়স ২৭, আর সবচেয়ে ছোটদের বয়স ১২ বছর। এদের আগের প্রজন্মের ক্যাটাগরি 'জেনারেশন ওয়াই', যাদেরকে বলা হয় 'মিলেনিয়াল'। এদের জন্ম ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

জেন জির আরও একটি নাম হচ্ছে 'জুমার্স'। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে জেডের পূর্বসূরিদের নাম। এখানে 'জেড' অক্ষরের সঙ্গে মূলত 'বুমার্স' শব্দের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। 'বুমার্স' হলো বেবি বুমার্সের সংক্ষিপ্ত রূপ, যে প্রজন্মের আগমন ঘটে ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে । এদের পরে আসে 'জেনারেশন এক্স'। সেই অর্থে বুমারদের বলা যেতে পারে জেন জিদের প্রপিতামহ। জেন জি'র উত্তরসূরিরা 'জেনারেশন আলফা' নামে অভিহিত, যাদের জন্মকাল ২০১০ থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ।

জেড প্রজন্মের অন্যান্য নামের মধ্যে রয়েছে 'আই' বা 'ইন্টারনেট জেনারেশন', 'হোমল্যান্ড জেনারেশন', 'নেট জেন', 'ডিজিটাল নেটিভস' বা 'নিও-ডিজিটাল নেটিভস', 'প্লুরালিস্ট জেনারেশন' ও 'সেন্টিনিয়াল্স'। ইন্টারনেট ও পোর্টেবল ডিজিটাল প্রযুক্তির মধ্যে বেড়ে ওঠার কারণে প্রযুক্তিগতভাবে অক্ষর-জ্ঞান না থাকলেও এরা ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে অভিহিত হয়। আগের প্রজন্মের চিন্তা- চেতনা যেখানে আটকানো ছিল বইয়ের মাঝে, সেখানে এই প্রজন্মের প্রত্যেকেই ইলেক্ট্রনিক ও স্মার্ট ডিভাইসের প্রতি আসক্ত।

যে কারণে সাধারণ মানুষ থেকে জেন-জিরা আলাদা

জেন-জিরা তাদের কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুবই উৎফুল্ল থাকেন। অন্যান্য জেনারেশনের সঙ্গে কাজ করতে তাঁদের অনেক বেগ পেতে হয়। তাঁদের দক্ষতা ও কাজ করার প্রক্রিয়া অন্যান্যদের তুলনায় আলাদা হয়। জেন জিরা সাধারণত কোনো নিয়ম মেনে চলতে আগ্রহী নয়। তারা সবার সঙ্গে একই রকম আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে চায়।

প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, জেন-জির মূল বৈশিষ্ট্য হলো তারা কর্মদক্ষতার চেয়ে বুদ্ধিমত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তারা কোনো ধরনের সমালোচনাকে ভয় করে না। তারা সবসময় বাস্তবসম্মত শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়। আগের প্রজন্ম যেখানে ৫-১০ বছরের দীর্ঘ মেয়াদি পড়ায় অভ্যস্ত ছিল, সেখানে এই প্রজন্ম সর্বোচ্চ ৪ বছর মেয়াদি স্নাতকে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁদের নিজস্ব কাজের ধরন থাকে। তাঁরা তাদের মতো করে কাজ করতে পছন্দ করে। কর্মক্ষেত্রেও যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্নতা।

জেন-জিদের স্মার্টনেস

তাঁরা প্রতিদিনকার জীবনযাপনে পৃথিবীর সেরা ও আলোচিত প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত। তাঁদের রয়েছে প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের এবং পৃথিবীকে উন্নত করার দক্ষতা। এই প্রজন্মের স্মার্টনেস বলতে মূলত, প্রযুক্তি-বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ দক্ষতা, উন্নত মানসিকতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতাকে বোঝানো হয়। এ প্রজন্মের স্মার্টনেসকে উপলব্ধি করতে তাদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, দুনিয়ার সবশেষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা ও জীবনধারা বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা

জেন-জিরা প্রযুক্তির যুগে জন্মগ্রহণ করে প্রযুক্তিবেষ্টিত পরিবেশে বেড়ে উঠেছে। তাঁরা

জন্মের পর থেকেই ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন স্মার্ট টুলস, যেমন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) চ্যাটবট ও অ্যাপের সাথে পরিচিত। তাই তাঁদের বিশ্বের নতুন নতুন ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্রুত শেখা এবং ব্যবহার করার দক্ষতা অনেক বেশি। ফলে তাঁরা ইন্টারনেট বিশ্বে অন্যান্যদের চেয়ে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। একইসঙ্গে স্মার্টফোন, পাওয়ার ব্যাংক, ট্যাবলেট, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্ট ওয়াচ, হেডফোন, এয়ার বাড, স্মার্ট স্পিকার, স্মার্ট ফিটনেস ডিভাইস এবং অন্যান্য আধুনিক ডিভাইস তারা সাবলীলভাবে ব্যবহার করতে পারে। প্রত্যেকের ঘরে অবাধ ও সহজলভ্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট থাকার কারণে তাঁরা ছোটবেলা থেকেই অনলাইনে ও ইউটিউবে বিভিন্ন স্মার্ট ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ও আইটি প্রফেশনালদের তৈরি ভিডিও দেখে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, কোডিং, এথিক্যাল হ্যাকিং, ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং গেম ডেভেলপমেন্টের কাজ শিখছেন।

বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষকদের ভাবনায় যোগ হলো নতুন পালক

বিশ্বজুড়ে এখন চ্যাট-জিপিটির জয়জয়াকার। চ্যাটজিপিটি একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক চ্যাটবট বা সার্চ টুলস। এটিকে বলা হয় 'লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল টুলস'। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর আমেরিকান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ওপেন এআই কর্তৃক এটি চালু করা হয়। শক্তিশালী মেশিন লার্নিং মডেলটি কয়েক সেকেন্ডে হাজারো শব্দ লিখতে বা নিমেষে জটিল কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। এর মধ্য দিয়ে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, উকিল, গবেষক, ফ্রিল্যান্সার, সব শ্রেণির মানুষের জীবনে যোগ হলো নতুন পালক।

চ্যাট-জিপিটির প্রম্পটে সঠিক ও স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারলে এটি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দ্রুত ও নির্ভুলভাবে জানাতে সক্ষম। ব্যবহারকারীর প্রম্পট অনুসারে ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট, প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্টের মডিউল, প্রোগ্রামারের প্রয়োজনীয় কোডিং শ্যাম্পল, শিল্পীর গান, কবির কবিতাও লিখে দেয় এ চ্যাটবট। চ্যাট-জিপিটি ব্যবহার করে কেউ ইচ্ছা করলে গোটা উপন্যাসই লিখিয়ে নিতে পারেন। টেক্সটভিত্তিক প্রোগ্রাম হওয়ায় চ্যাট-জিপিটি গবেষণা ও শিক্ষা খাতে অনেকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলটি তরুণদের কাছে বেশি জনপ্রিয়। কারণ তারা প্রতিদিনকার জীবনের প্রয়োজনীয় সব কাজই কয়েকটি প্রম্পট লেখার মাধ্যমে সহজে সেরে নিতে পারছেন।

সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা

তাঁদের মধ্যে রয়েছে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনা। তাঁরা নতুন ও অভিনব পন্থায় চিন্তা করতে সুদক্ষ। তাঁরা ইউটিউব, টিকটক, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে নিত্যনতুন রিলস বানিয়ে সেগুলো শেয়ার করতে পারদর্শী। তাঁরা সবসময় সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করতে ভালোবাসে, যা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ব্যাপক আলোচনার ঝড় তোলে। এভাবে ভিজ্যুয়াল ও ডিজিটাল প্লাটফর্মে নিজের ব্র্যান্ডিং করে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করতে ভালোবাসেন।

জেন-জিরা উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনার জন্য বেশি পরিচিত। তাঁরা উদ্ভাবনী স্টার্টআপ শুরু করা, নতুন অ্যাপ তৈরি করা বা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উন্নয়নের দিকে বেশি আগ্রহী। তাঁদের মধ্যে রয়েছে মাল্টিটাস্কিং দক্ষতা। তাঁরা একই সময়ে একাধিক কাজ করতে সক্ষম। যেমন, একদিকে অনলাইন ক্লাস করছে, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়াতে স্ক্রল করছে বা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করছেন। অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে জন্ম হওয়ায় তাদের মধ্যে রয়েছে তথ্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ। তাদের তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের সক্ষমতা অসাধারণ। যেকোনো বিষয়ে দ্রুত রিসার্চ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে বের করার ক্ষমতা তাদের অন্যতম শক্তি। ফ্যাক্ট-চেকিং টুলসের সাহায্যে তাঁরা খুব সহজে ফেক নিউজ বা ভুয়া তথ্য খুঁজে বের করে তথ্যের সঠিকতা যাচাই করতে পারেন।

নতুন সমস্যার দ্রুত সমাধান দেন জেন-জিরা

তাঁরা উদ্ভাবনী চিন্তা করতে ভীষণ ভালোবাসেন। চলমান সমাজের সৃষ্ট নতুন সমস্যার জন্য দ্রুত সমাধান বের করার দক্ষতা তাদের অসাধারণ। প্রথাগতভাবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চাকরি করার বদলে স্টার্টআপ, এন্টারপ্রেনিউরশিপ এবং সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকেন তাঁরা।

জেন-জিরা সব সময় ব্যতিক্রমী শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে তাঁরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে নতুন শিক্ষামাধ্যম এবং প্রক্রিয়ার দিকে ঝুঁকছেন। যেমন, ই-লার্নিং ও অনলাইন কোর্স। ইউটিউব কোর্স এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে শিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তাঁরা। একাডেমিক ডিগ্রির পাশাপাশি তারা বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনে বা স্কিল ডেভেলপমেন্টে মনোযোগী। যেমন, ডিজিটাল মার্কেটিং, কনটেন্ট রাইটিং, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট।

সময়টা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্যমতে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়ায় পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মূলত, প্রযুক্তির বিপ্লব, যা পৃথিবীর মানুষকে এক লাফেই ১০০ বছর সামনে নিয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এ পরিবর্তন সব মানুষের জীবনমান উন্নত করবে, আয় বাড়াবে সব শ্রেণির মানুষের। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা কাজে লাগিয়ে পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত হবে শিল্প ও অর্থনীতির সব ক্ষেত্র। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পৃথিবীকে আক্ষরিক অর্থেই গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রামে রূপান্তরিত করবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে অভাবনীয় উন্নত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হবে পাড়া-মহল্লায় দোকানে কেনা-বেচার মতোই সহজ। মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বেশির ভাগ সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা বিশ্লেষণ, সমস্যার সমাধান, মেশিন টু মেশিন যোগাযোগ, ইন্টারনেট অব থিংস, সম্মিলিতভাবে এসবকেই একত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হিসেবে বোঝানো হচ্ছে।

জাদুকরী শক্তির নাম আইওটি

সকালে অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙার পর একজন ব্যক্তি ঘড়ির স্টপ বোতামে চাপ দিলেন। ঘড়িটি তখন ঘরের অন্যান্য যন্ত্রে (ডিভাইস) ব্যক্তির ঘুম থেকে ওঠার বার্তাটি পৌঁছে দেবে। এ বার্তা পেয়ে ঘরের বাতি জ্বলে উঠবে, জানালার পর্দা খুলে যাবে, আবার খাবার ঘরে থাকা কফি মেশিনও নির্দিষ্ট সময় এক কাপ কফি বানিয়ে ফেলবে। আবার দেখা যাবে, ওই ব্যক্তি বাসা থেকে বের হওয়ার আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে গ্যারেজে থাকা গাড়িও। এ ঘটনায় যত যন্ত্র ব্যবহার হয়েছে, তার সব মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত ছিল। আর এ পুরো প্রক্রিয়াই হলো ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)। এ যুগে আমরা এখন বাস করছি।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিশেষত্ব

অন্যান্য শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লব শুধু মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে যন্ত্র ও প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে দ্রুততর করেছে; কিন্তু চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রমকে আরো বেশি গতিশীল ও নিখুঁত করে তুলছে। ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সময়

তথ্যপ্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হলে বিশ্বের গতি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ম্যানুয়াল জগৎ ছেড়ে যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আসছে এ ভার্চুয়াল জগতেরই আরো বড় পরিসর নিয়ে।

ক্লাউস সোয়াব চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে নিজের লেখা প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমরা চাই বা না চাই, এত দিন পর্যন্ত আমাদের জীবনধারা, কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনা যেভাবে চলেছে, সেটা বদলে যেতে শুরু করেছে। এখন আমরা এক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।'

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বাস্তবতা

এ বিপ্লব অর্জনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। মেশিন ডিভাইস, সেন্সর, মানুষের পরস্পরের মধ্যে ইন্টারনেট অব থিংস অথবা ইন্টারনেট অব পিউপলের (আইওপি) মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন, বিগ অ্যানালিটিকস, গ্রাহক ইন্টারঅ্যাকশন এবং গ্রাহক প্রোফাইলিং, অগমেন্টেড রিয়ালিটি/ওয়্যারেবল টেকনোলজি, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, থ্রিডি প্রিন্টিংসহ আধুনিক প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী সেবাদান প্রক্রিয়া বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অটোমেশনের দিকে ধাবিত করছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং স্বয়ংক্রিয়করণ এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

কম দক্ষতার চাকরি বিলুপ্ত, তৈরি হবে নতুন কর্মজগত

তথ্যপ্রযুক্তি গবেষকদের তথ্যানুযায়ী, আগামী দুই দশকের মধ্যে মানবজাতির ৪৭ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে হতে পারে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমনির্ভর এবং তুলনামূলকভাবে কম দক্ষতানির্ভর চাকরি বিলুপ্ত হবে। এর বিপরীতে তৈরি হবে নতুন ধারার বিভিন্ন কর্মজগত। তৈরি হবে উচ্চ দক্ষতানির্ভর নতুন কর্মবাজার। নতুন যুগের এসব চাকরির জন্য প্রয়োজন উন্নত ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে কারিগরি দক্ষতা। ডাটা সায়েন্টিস্ট, আইওটি এক্সপার্ট, রোবটিকস ইঞ্জিনিয়ারের মতো আগামী দিনের চাকরিগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী হবে জেন-জি প্রজন্মের জনগোষ্ঠীরা।

কল-কারখানায় মানুষের জায়গা দখল করছে যন্ত্রমানব

অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির জোয়ারে ভাসছে পুরো বিশ্ব। উন্নত বিশ্বে কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে মানুষের জায়গা দখল করে নিচ্ছে এআই-নির্ভর রোবটিকস বা যন্ত্রমানব। চাকরি থেকে শুরু করে ব্যবসার ক্ষেত্র, কৃষি কাজে, স্কুল-কলেজ, উদ্ভাবন, গবেষণা, হাসপাতালে চিকিৎসায়, সব জায়গায় রোবটিকসের মতো প্রযুক্তি জায়গা করে নিচ্ছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে এ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তৈরি পোশাক শিল্প বড় পরিসরে স্বয়ংক্রিয়করণের দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অর্থনীতি, উন্নয়ন, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে। প্রথম সম্ভাব্য প্রভাব হবে লাখ, লাখ শ্রমজীবী দিনমজুরদের চাকরি হারানো। তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস এবং অটোমেশনের দিকে এর স্থানান্তর হলে বর্তমান শিল্পে নিযুক্ত বড়সংখ্যক শ্রমিক উল্লেখযোগ্য চাকরি হারাতে পারেন। বিভিন্ন গবেষণায় বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে চাকরি হারাবেন লাখ লাখ তৈরি পোশাক কর্মী।

বিশ্বের কর্মবাজারে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে কর্মবাজারে। অটোমেশন প্রযুক্তির ফলে ধীরে ধীরে শিল্প কল-কারখানা হয়ে পড়ছে যন্ত্রনির্ভর। মার্কিন টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সন এরই মধ্যে হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে বেছে নিয়েছে। পোল্যান্ডের বিখ্যাত এক বহুজাতীয় পানীয় সংস্থা, ডিক্টেডার ঠিক করেছে প্রতিষ্ঠানের চাকরি দেওয়া বা নেওয়ার বিষয় দেখভাল করবে এআই। রোবটকে দেওয়া হয়েছে কোম্পানির সিইওর দায়িত্ব। সংস্থার সম্পূর্ণ লাগাম তুলে দেওয়া হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হাতে। ওই বহুজাতিক পানীয় সংস্থার ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখন থেকে লাভ-ক্ষতি, মার্কেটিং কৌশল, বিজনেস স্ট্র্যাটেজিসহ যাবতীয় বিষয় দেখবে এআই। এছাড়াও বিগত বছরগুলোয় চীনের কারখানাগুলোয় রোবট ব্যবহারের হার বেড়েছে বহুগুণে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ চাকরি হারাবে।

দুনিয়াজুড়ে যেসব প্রযুক্তির জয়-জয়কার

প্রযুক্তির দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত ও দ্রুত পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তন মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) থেকে শুরু করে নবায়নযোগ্য শক্তির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে প্রযুক্তি। একসঙ্গে দেশগুলোতে ৫জি নেটওয়ার্ক, টেকসই ও সবুজ প্রযুক্তি, ক্রিপ্টোকারেন্সির, ব্লকচেইন, এজ কম্পিউটিং, মেটাভার্স, জৈবপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, সাইবার নিরাপত্তা, মহাকাশ গবেষণা, দূরবর্তী শিক্ষা সিস্টেম, ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি, অ্যাডভান্স টেকনোলজি, ইন্সট্রাকশনাল টেকনোলজি রোবটিকস, আইটি/আইটিএস, ক্লাউড কম্পিউটিং, ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (ভিএলএসআই), নেভিগেশন (ভেহিকেল), হার্ডওয়্যার নেভিগেশন, ই-কমার্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিশ্বের কোন দেশের জেন-জির সংখ্যা কত

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই জেন-জি। এ দেশের কর্মসংস্থানেও তাঁদের ভূমিকা রয়েছে অসামান্য। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের তথ্যমতে, জেন-জি জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ভারতে ৩৫ কোটি ৬০ লাখ, চীনে ২৬ কোটি ৯০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ৬ কোটি ৭০ লাখ, যুক্তরাষ্ট্রে ৬ কোটি ৫০ লাখ, পাকিস্তানে ৫ কোটি ৯০ লাখ এবং বাংলাদেশে রয়েছে ৪ কোটি ৭৬ লাখ। এই জেন-জিরাই বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে। ইতিহাস সৃষ্টি থেকে প্রতিটি স্তরে সেই জেন-জিরাই জোগান দিয়ে আসছে। আজও বাংলাদেশের সব অভূতপূর্ব সৃষ্টিগুলোর জন্মই দিচ্ছে তাঁরা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আগামী ৩০ বছরজুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে।

বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা তিন কোটি

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি। প্রতি ১০০ জন স্নাতক ডিগ্রিধারীর মধ্যে ৪৭ জনই বেকার। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা তিন কোটি। প্রতিষ্ঠানটি আভাস দিয়েছে, কয়েক বছরে তা দ্বিগুণ হয়ে ছয় কোটিতে দাঁড়াবে, যা মোট জনসংখ্যার ৩৯ দশমিক ৪০ শতাংশ হবে। আইএলওর হিসাবটিকেই পর্যবেক্ষকেরা বাংলাদেশের প্রকৃত বেকারের সংখ্যা বলে মনে করেন। ইউরোপীয় ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এক পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায়, বাংলাদেশে ৪৭ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত হয় বেকার, নয়তো তিনি যে কর্মে নিযুক্ত এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। প্রতিবছর বাংলাদেশে

২২ লাখ কর্মক্ষম মানুষ চাকরির বাজারে প্রবেশ করছেন। এই বিশালসংখ্যক কর্মক্ষম মানুষের মাত্র সাত শতাংশ কাজ পাবেন। এর অর্থ হচ্ছে, দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বেকারের তালিকায় নাম লেখাচ্ছেন।

দেশে সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার

অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, অনলাইন শ্রমশক্তির সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী হচ্ছে ভারত; যাদের প্রায় ২৪ শতাংশ গ্লোবাল ফ্রিল্যান্সার ওয়ার্কার আছে। এর পরের অবস্থানটিই বাংলাদেশের, অনলাইন শ্রমশক্তিতে যাদের অবদান হচ্ছে ১৬ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যাদের ফ্রিল্যান্সার হচ্ছে ১২ শতাংশ। তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং খাতে নিয়মিত কাজ করছে পাঁচ লাখ ফ্রিল্যান্সার। আর মোট ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা ৬ লাখ ৫০ হাজার। প্রতি বছর ফ্রিল্যান্সররা ১০ কোটি ডলার আয় করে থাকেন।

বাংলাদেশে এখন অনেক শিক্ষিত নারী সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ঘরে বসেই ফ্রিল্যান্সিং কাজ করছে। তারা প্রথাগত সাংসারিক দায়িত্বের গণ্ডি পেরিয়ে ফ্রিল্যান্স কাজকে ক্যারিয়ার সংকটের সমাধান হিসেবে দেখছে। গবেষণা বলছে, বাংলাদেশের নারীরা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে এখন পুরুষের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। আর নারীদের অংশগ্রহণে এ সেক্টর আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

চাকরি নয়, ব্যবসাতেই বেশি আগ্রহ জেন-জিদের

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের এক ব্যাংকের সমীক্ষায় দেখা গেছে, জেন-জি প্রজন্মের বেশির ভাগ মানুষ ধরাবাঁধা চাকরির চেয়ে ব্যবসা করতেই বেশি আগ্রহী। স্যানট্যানডার ব্যাংক যুক্তরাজ্যের সমীক্ষায় জেন-জি প্রজন্মের তরুণদের এ প্রবণতা উঠে আসে। সমীক্ষার তথ্যানুসারে, ৭৬ শতাংশ জেন-জি কারও অধীনে কাজ করতে আগ্রহী নন। ৯টা-৫টার একঘেয়ে কর্মজীবন তাঁদের পছন্দ নয়। জেন-জিদের ৭৭ শতাংশ বিশ্বাস করেন, তাঁদের ব্যবসা শুরু করার যোগ্যতা আছে। ইয়াহু ফাইন্যান্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগের প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে এখানে জেন-জিদের বড় ধরনের ব্যবধান দেখা যায়। তাঁরা নিজেই নিজের বস বা কর্তা হতে চান। অথচ মিলেনিয়ালদের মধ্যে এই প্রবণতা ছিল ৫৭ শতাংশ। জেনারেশন এক্সের মধ্যে ৩৬ শতাংশ ও বেবি বুমারদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশের মধ্যে এ প্রবণতা দেখা গেছে।

ফ্রিল্যান্সিংকেই বেশি পছন্দ করেন জেন-জিরা

চলতি বছর সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক অনলাইন মার্কেটপ্লেস 'আপওয়ার্ক' যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ৭০ জন 'জেন-জি' প্রজন্মের মানুষের ওপর আরেকটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সবাই ছিলেন ফ্রিল্যান্সার। দেখা যায়, ৫৩ শতাংশ জেন-জি সপ্তাহে গড়ে ৪০ ঘণ্টা অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করেন। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জেন-জি কর্মী দুই বছরের বেশি সময় ধরে ফ্রিল্যান্সিং করছেন। তাঁরা সেটাই করে যেতে চান। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, পেশা বলতে এতকাল মানুষ যা বুঝেছে, সেই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চান তাঁরা।

জেন-জিরা আর্থিকভাবে অনেক বেশি প্রভাবশালী

দ্য ইকোনমিস্টের এক প্রতিবেদন অনুসারে, সময়ের পরিবর্তনে জেন-জিরা বড় হচ্ছে। তাঁদের অনেকেই এখন দায়িত্বশীল নানা পদে কাজ করছে। উন্নত দেশগুলোতে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমপক্ষে ২৫০ মিলিয়ন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের প্রায় অর্ধেক এখন বিভিন্ন খাতে কাজ করছে, অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন অর্থনৈতিকভাবে। যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজারের বেশি জেন-জি এখন প্রধান নির্বাহী। সহস্রাধিক রয়েছেন রাজনীতিতে। তার মানে এটাই দাঁড়ায়, এই প্রজন্ম আগের প্রজন্মের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

দেশের ১৮-২৪ বছর বয়সী ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২ কোটি

পৃথিবীতে কয়েকশ সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক আছে। ব্লগভিত্তিক, ছবি ও ভিডিওভিত্তিক কিংবা চ্যাট বা বার্তাভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া অহরহ। যার মধ্যে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম, টুইটারই সবচেয়ে জনপ্রিয়। চ্যাটভিত্তিক সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যেমন, টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ইত্যাদি। আবার ব্লগভিত্তিক বিভিন্ন সাইট আছে যেমন, ফেসবুক, টাম্বলার, টুইটার (বর্তমানে 'এক্স' নামে পরিচিত) ইত্যাদি। ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, ইউটিউবও কম জনপ্রিয় নয়। বর্তমানে সবচেয়ে সক্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ৩০-এর অধিক।

সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম মানুষের অন্যতম যোগাযোগমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সরাসরি মিথস্ক্রিয়া না হলেও পৃথিবীজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে কয়েক কোটি মানুষ। এখানে চাইলেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। তাইতো স্মার্টফোনে বুঁদ হয়ে থাকা বেশিরভাগ মানুষই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন। এ মাধ্যম ঘিরে এক আলাদা জগৎ তৈরি হয়েছে মানুষের। প্রায় সবাই দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করতে পছন্দ করেন। পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে; যা সব ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর মধ্যে সর্বোচ্চ। এর প্রায় সব ব্যবহারকারীই সক্রিয়। এর পরই রয়েছে ইউটিউব; প্রতি মাসে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৫০ কোটির মতো। ৩ নম্বরে রয়েছে ফেসবুকেরই আরেকটি সাইট হোয়াটসঅ্যাপ, ব্যবহারকারী ২০০ কোটি।

পোল্যান্ডভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যানালিটিকস প্ল্যাটফর্ম নেপোলিয়নক্যাটের অক্টোবরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমান ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ৩৯ লাখ ৫৫ হাজার ১০০, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশেরও বেশি। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ফেসবুক ব্যবহারকারী (৬৭ দশমিক ৯ শতাংশ) পুরুষ। এছাড়া বাংলাদেশের ১৮-২৪ বছর বয়সী ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২ কোটি। মোট ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দশম। ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ একবারের জন্য হলেও ফেসবুকে প্রবেশ করেছে। পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে; যা সব ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর মধ্যে সর্বোচ্চ।

জেন-জিদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের চ্যালেঞ্জ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে জেন-জিদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে রয়েছে অফুরান সম্ভাবনা। তাঁরা অনেক স্মার্ট, মেধাবী, কঠোর পরিশ্রমী, দূরদর্শী, অধ্যবসায়ী ও সৃজনশীল। সময়ের পরিবর্তনে ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রগুলো অনেক বৈচিত্র্যময় হবে। তাঁরা ভবিষ্যতের কর্মজগতে প্রযুক্তি এবং সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে বড় পরিবর্তন আনতে পারবে। তাঁরা প্রযুক্তি, পরিবেশ, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক সচেতনতা সবকিছু মিলিয়ে কর্মজীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। তবে তাঁদের জন্য ক্যারিয়ারের প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে দ্রুত পরিবর্তিত নতুন প্রযুক্তি, মানসিক চাপ, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা অর্জন। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদের মনকে শক্ত করতে হবে। পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে নতুন দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে।

তারুণ্যের স্মার্টনেস হতে হবে মেধা ও দক্ষতার সৌন্দর্যে

বাকি অংশ ৯৭ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমঃ কেমন আছি কেমন থাকব

ফাদার শিশির কোড়াইয়া

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের আধুনিক জীবনে এক নতুন বাস্তবতা। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর গ্রামের চায়ের দোকানে মানুষজন তথ্যের জন্য এখন আর পত্রিকার পাতা ঘাঁটাঘাঁটি করে না। তার বদলে এসেছে স্মার্টফোন বা আইফোন নির্ভরতা। গণমাধ্যমে তথ্যের বিপণনের সাবেকী পুরাতন প্রথা আর নেই। চারপাশে দেশে-বিদেশে, কী ঘটছে সেগুলো ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, গুগুলপ্লাসসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যাচ্ছে সবাই। জীবনযাত্রা ও যোগোযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটছে। সর্বোপরি, পৃথিবীটা যেন ক্রমশঃই ছোট হয়ে আসছে এবং সবকিছু এখন মানুষের আয়ত্ত্বে বা নাগালের মধ্যে। এই সুযোগটি করে দিচ্ছে ইন্টারনেট। সারা বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৭০ ভাগ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। তরুণদের মধ্যে এ হার প্রায় ৯০ ভাগ। বাংলাদেশে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের রয়েছে ফেসবুক এ্যাকাউন্ট। ইন্টারনেটের সুযোগে সামাজিক যোগাযোগের মাত্রা অতীতের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে। ইন্টারনেটে চালু হওয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ মানবীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দূরত্বকে পুরোপুরি অকার্যকর করে দিচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবঃ

মানবজীবনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এর ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক এর কল্যাণে দূর হয়েছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। ফেসবুকের মাধ্যমে এর সদস্যরা নির্দিষ্ট কাউকে তার বন্ধু হিসাবে বেছে নিতে পারেন। ফেসবুকের মাধ্যমে শেয়ার করা ছবি, ভিডিও, মতামত ইত্যাদির ওপর মন্তব্য করা যায়। আবার চলে পাল্টা মন্তব্য। ব্যক্তিগত বার্তা পাঠানো যায়, যা কেবল যাকে পাঠানো হয় সে-ই পড়তে পারে অন্যরা নয়। তাছাড়া নতুন বা পরিচিত বন্ধু খোঁজার জন্য ফেসবুকে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক। নিজের পছন্দ অনুযায়ী গ্রুপ করে নেয়া যায়। ফেসবুকে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে চ্যাটিং। প্রিয় বন্ধুর সাথে চলে বাক্য বিনিময়।

বর্তমান সময়ে গণমাধ্যমের চরম উৎকর্ষ ও ভূমিকার কারণে মানুষ অনেক বেশী গণমাধ্যমমুখী হয়ে পড়েছে। ফলে জনগণ প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। গণমাধ্যম বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত রাখে। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছে। মানুষের ও সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব এত বেশী যে গণমাধ্যম চাইলেই মানুষের যেকোন বিষয় ইতিবাচক দৃষ্টিতে প্রকাশ করতে পারে আবার নেতিবাচকভাবেও প্রকাশ করতে পারে। গণমাধ্যম মানুষের মধ্যে গণজাগরণ তুলতে পারে। আবার গণমাধ্যম ভুল ও বিকৃত তথ্য দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের ধর্মীয় জীবনও গণমাধ্যমের প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারে নি। গণমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে, জাগতিকতায় মত্ত হয়ে উঠার জন্য বর্তমানে অনেকের মধ্যেই উপাসনা, প্রার্থনা, পারিবারিক বন্ধন বিষয়ে অনীহা দেখা দিয়েছে। বর্তমান যুবসমাজ যারা একদিন পরিবার,সমাজ, মণ্ডলী, দেশকে পরিচালনা দিবে তারাও এই গণমাধ্যমের মন্দ দিক থেকেও দূরে নেই। তাদেরও সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমের নেতিবাচকতা গ্রাস করে ফেলছে। বিভিন্নরকম সমস্যার বেড়াজালে তারাও আটকে যাচ্ছে। যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম; আমরা কেমন আছিঃ

জীবনে এনেছে বেগ কেড়ে নিয়েছে আবেগ। বিজ্ঞানের বদৌলতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের তথ্য-প্রযুক্তির জীবনকে অনেক সহজ করে তুলেছে। খুব সহজে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার সংবাদ আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন-বন্ধু বান্ধব আমাদের থেকে দূরে থাকে তাদের সাথেও আমরা কথা বলতে পারি, তাদের চেহারা দেখতে পারি। তাদের সাথে তাৎক্ষণিক সকল বিষয় সহভাগিতা করতে পারি। গণমাধ্যমের কল্যাণে জীবনে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বিষয় জানার সুযোগ তৈরী হচ্ছে। গণমাধ্যমের বদৌলতে মানুষ পরস্পরের কাছে অতি নিকট এসে পড়েছে। এই আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন, মানব সভ্যতা বিকাশে, শিক্ষার আলো বিস্তারে, জাতি-গোষ্ঠীর, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মানব মনের বিকাশে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই সামাজিক গণমাধ্যমের জন্য আমাদের পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয়-সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোতে দূরে থেকেও আত্মীস্বজন, শুভাকাঙ্খীরা দেখতে পায় এবং তারা অংশ নিতে পারছে অনুষ্ঠানগুলোতে। কারও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া'র মত অনুষ্ঠানগুলোতে দূরে থেকে তারা যুক্ত হতে পারছে। সামাজিক গণমাধ্যমের এরকম ইতিবাচক দিক অনেক রয়েছে। যা আমরা আমাদের জীবনে লাভ করছি। কিন্তু এর সাথে, পাশাপাশি এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রয়েছে নেতিবাচক দিকও। যেদিকটি আমাদের সুনামকে ক্ষুন্ন করছে, আমাদেরকে নানাভাবে হেয় করছে।

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী ৮০ ভাগ মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে। ফেসবুক একটি জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এই ফেসবুক যেমন আমরা নানারকম ভাল কাজে ব্যবহার করছি তেমনি মন্দ কাজেও ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে যারা ফেসবুক ব্যবহার করে তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ প্রয়োজনের চেয়েও অধিক সময় ব্যয় করছে এই সামাজিক মাধ্যমে। যার ফলে তিনি বা তারা তাদের দায়িত্ব সঠিক মত পালন করতে পারছে না। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বড় একটা অংশ তাদের মূল্যবান সময় পড়াশোনায় ব্যবহার না করে এই সামাজিক মাধ্যমে অপচয় করছে। পড়াশোনায় দুর্বল হচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সামাজিক মাধ্যমগুলো দুর্বল করে ফেলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোষ্ট দেখে মনে হয় আমাদের ব্যক্তিগত প্রাইভেসি নাই বললেই চলে। অনেকে বলতে পারেন আমার যা খুশী তা আমি আমার ফেসবুক একাউন্টে পোষ্ট করব এটাতো কোন সমস্যা নয়। কিন্তু আমাদের সকলেরই প্রাইভেসি বা ব্যক্তিগত কিছু বিষয় আছে যা অন্যের সাথে সহভাগিতা করা যায় না বা করা উচিত নয়। যেমন আপনি কি খাচ্ছেন বা কি রান্না করছেন এমন পোষ্ট দেয়াটা কি অনেক গুরুত্বপূর্ণ? এই রকম পোষ্ট করতে আমাদের সময় ব্যয় হচ্ছে, বুদ্ধির অপচয় হচ্ছে। বর্তমানে অনেক সময় হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুকে আমরা অনেকেই অন্যের বা যারা আমার মতাবলম্বী নয় তাদের সমালোচনা করতে দ্বিধা করি না। কিন্তু এটা বুঝি না যে আমার এই পোষ্ট শুধু আমি না, আমার বিপরীত মতাবলম্বীরাও নয়, এই পোস্টটি দেখছে সারা বিশ্বের মানুষ, বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই দেখছে। তাহলে আমার পোষ্টের মধ্য দিয়ে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর নিকট সমালোচিত হচ্ছি আমরাই, অন্যেরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। এটা কি আমাদের জন্য ভাল কিছু? আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কেমন থাকব:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে আছে। আমাদের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে আমরা যেন তাকে গ্রহণ করি। বর্তমান বাস্তবতাও আমাদের সেই দিকে ঢেলে দিচ্ছে। অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার না করে থাকার আর কোন সুযোগ নাই। তাই এখন আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা-অভিজ্ঞতা'র আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কেমন করে ব্যবহার করব যেন এর ইতিবাচকতাগুলো আমরা পেতে পারি। আমার ব্যক্তিগত কিছু চিন্তা-ভাবনা সহভাগিতা করলাম:

১) আমরা বেশি সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যয় করব না। যার ফলে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ব না। বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সঠিক ব্যবহার করে সেই দিকে আমরা যারা অভিভাবক আছি তারা খেয়াল রাখব।

২) সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমের ভাল বা ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করে এর মন্দ বা নেতিবাচক দিকগুলো পরিহার করব।

৩) সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে আমি-আমরা যেসকল পোষ্ট করি সেই বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হব। আমার পোষ্ট বা মন্তব্যের জন্য যেন অন্যে কষ্ট না পায় বা আঘাত না পায়।

৪) সামাজিক যোগযোগ মাধ্যম কোন সমাধানের প্লাটফর্ম না। যদি কোন বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকে তাহলে সেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নেয়া।

৫) আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে আরও বেশি সচেতন হব অন্যদেরকেও সচেতন করে তুলব।

৬) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহারে ছেলে-মেয়েরা ও যুবক-যুবতীরা যেন অভ্যস্ত হতে পারে এবং এ ব্যাপারে পারিবারিক, সামাজিক, মাণ্ডলীক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক উদ্যোগ নিতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহারের উপকারীতা বা মঙ্গলকর দিকটি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক চেতনা দান ও দিক-নির্দেশনা দিতে হবে।

গণমাধ্যমের প্রতি মানুষের রয়েছে প্রবল আগ্রহ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যেমন রয়েছে ইতিবাচক দিক তেমনি রয়েছে এর নেতিবাচক দিক। ঈশ্বরের সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে আমাদেরও বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে আমরা যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার করতে পারি তবে এর সুফল আমরা পরিপূর্ণভাবে লাভ করব। অন্যথায়, এর নেতিবাচকতার স্রোতে আমরা ভেসে যাব। এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী, রাষ্ট্রকে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রেখে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

৯৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) সর্ব শেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১৩ কোটি ১৯ লাখ। মোট ইন্টারনেট গ্রাহকের ৯০ দশমিক ৭৯ শতাংশ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। গ্রাহকদের ১১ কোটি ৯৭ লাখের বেশি মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১ কোটি ২১ লাখ। সারা দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকলেও মোবাইল ইন্টারনেট সহজলভ্য। সবার হাতে রয়েছে একটা করে স্মার্টফোন। কারো কারো আবার দুটি বা তিনটিও রয়েছে। তরুণরা চাইলে শুধু এই স্মার্টফোনে মোবাইল ইন্টারনেটের সাহায্যে নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন শুধু আন্তরিক সদিচ্ছা, দৃঢ় মনোবল, সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ। আগামী ৩০ বছর সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে যেসব প্রযুক্তি, সেগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বৈশ্বিক বিশ্বের প্রযুক্তির প্রভাব বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে পড়া শুরু করেছে। আগামীতে আরও পড়বে। তাই, এখন যারা স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন, তাদের সারা বিশ্বের চাকরির বাজারের চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে, সে অনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আর যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে, তাদেরও চলমান সময়ের প্রযুক্তি বিশ্বের খবরগুলো পড়ে, ভাল মতো জেনে-বুঝে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার-ভিত্তিক বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এর জন্য তাদের দিক-নির্দেশনা দিতে অভিভাবকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিত্যদিনের বিভিন্ন ধরনের নজরকাড়া স্ট্যাটাস, নিজের আকর্ষণীয় ছবি পোস্ট দেওয়াকে তাঁরা স্মার্টনেস মনে করেন। প্রকৃত স্মার্টনেস তো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আর পোস্টে ফুটে উঠে না। সোশ্যাল মিডিয়া স্মার্ট যুগের একটা অংশ মাত্র। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সবশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে, প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে সেটি বিশেষ কোন ক্যারিয়ারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো স্মার্টনেস। তারুণ্যের অফুরান মেধাকে প্রকৃত অর্থে প্রাযুক্তিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সদ্ব্যবহার করে আলোকিত ব্যক্তিত্ব গড়ার নাম হতে পারে স্মার্টনেস। তারুণ্যের স্মার্টনেস হতে হবে মেধা ও সৃজনশীল ভাবনার সৌন্দর্যে।

লেখক: উজ্জ্বল এ গমেজ, লেখক ও সাংবাদিক, তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ।

ডেটা সুরক্ষা

ড্যানিয়েল দীপ পেরেরা

প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ও প্রসারের ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রযুক্তির ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে যে, আমরা আমাদের তথ্য অনলাইনে দিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে প্রায়ই সচেতন থ াকিনা। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে, হয়ত অজান্তেই, আমরা বিভিন্ন সাইবার ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছি। একটি সামান্য অসাবধানতা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

৭০% ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জানেন না যে, তাদের ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে এবং কোন উদ্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের সাধারণ অভ্যাস, যেমন: সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করা, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা বা ওয়েব সাইটে ফর্ম পূরণ করা, প্রায়ই আমাদেরকে অজান্তেই তথ্য চুরি ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ ছবি যেটিতে আপনার অবস্থান এবং সময় দেখানো থাকে, অপরাধীরা এর মাধ্যমে আপনার গতিবিধি নির্ধারণ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে পারে।

ডিপফেক প্রযুক্তি, যা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ভিডিও বা অডিও পরিবর্তন করতে পারে, মিথ্যা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে ক্ষতি করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ৪,০০০ টিরও বেশি ডিপফেক ভিডিও অনলাইনে পাওয়া গেছে, যা ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ৩০০% বেশি। এ ধরনের ভিডিও বা ছবি শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, বরং রাজনৈতিক বা সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে ও ব্যবহার হতে পারে।

ডিপফেক হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি এমন ভিডিও বা অডিও, যা বাস্তবের মতো মনে হয় কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ ভুয়া। এটি বিভিন্ন ফটো এবং ভিডিও থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মুখ ও কণ্ঠস্বরকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করে যে, দেখে বোঝাপ্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ডিপফেকের মাধ্যমে সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকেও নানা বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্যের শিকার করা সম্ভব। এর ফলে ব্যক্তিগত সম্মান হানি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং ভুয়া তথ্যের প্রচার বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় এর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। ডিপফেকের ঝুঁকি এড়াতে সাধারণ মানুষের উচিত যে কোনো ভিডিও বা অডিওর সত্যতা যাচাই করা এবং সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকা। এআই এর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এখন আমাদের নিরাপত্তাকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

বর্তমানে, প্রতি ৩৯ সেকেন্ডে একটি সাইবার আক্রমণ ঘটে। ডেটা চুরির ঘটনা ব্যক্তিগত এবং আর্থিক তথ্যকে আরও ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই ১৪.৪ মিলিয়ন মানুষ

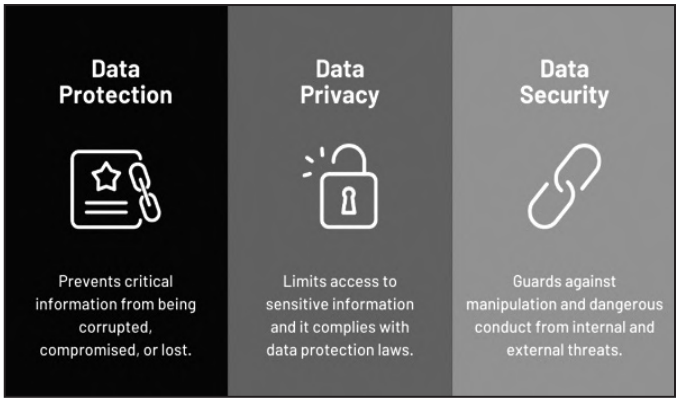

পরিচয় চুরির শিকার হয়েছেন। অপরাধীরা ফিশিং, ইমেল, ম্যালওয়্যার এবং বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তথ্য চুরি করে।

কিভাবে ডেটা চুরি ঘটে:

১) ফিশিং ই- মেল: ভুয়া ই-মেল ব্যবহার করে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়া।

২) ম্যালওয়্যার: আপনার ডিভাইসে ক্ষতিকারক সফটওয়্যার ইনস্টল করে তথ্য চুরি।

৩) অ্যাপ অনুমোদন: অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার সময়, আমরা অসচেতনভাবে বিভিন্ন অনুমতি দিয়ে থাকি যা আমাদের ডেটা চুরির পথ খুলে দেয়।

আমাদের চারপাশের স্মার্ট ডিভাইস যেমন: স্মার্টফোন, স্মার্ট স্পিকার এবং অন্যান্য এ আই-ভিত্তিক ডিভাইস প্রায়ই আমাদের কথোপকথন শুনে এবং সেই অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে। প্রায় ৪৩% স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহারকারী এ ব্যাপারে সচেতন যে তাদের ডিভাইস ব্যাকগ্রাউন্ডে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু বাকিরা এই ব্যাপারটি সম্পর্কে জানেন না। এসব তথ্য বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছে বিক্রি করা হয়, যা প্রাইভেসির জন্য একটি বড় হুমকি।

ডেটা সুরক্ষা নিশ্চিত করার ৫টি কার্যকরী উপায়:

১) সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করার সময় সতর্ক থাকুন: অনলাইনে ছবি বা ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার আগে নিশ্চিত হন যে তা কীভাবে ব্যবহার হতে পারে।

২) শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন: প্রায় ৮০% সাইবার আক্রমণ সহজ পাসওয়ার্ডের কারণে ঘটে। প্রতি তিন মাসে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন।

৩) দুই ধাপ যাচাইকরণ চালু করুন: এতে একাধিক স্তরের নিরাপত্তা থাকে যা আপনার তথ্যকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

৪) প্রাইভেসি সেটিংস চেক করুন: আপনার ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েবসাইটের প্রাইভেসি সেটিংস নিয়মিত আপডেট রাখুন।

৫) বিশ্বস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন: শুধু মাত্র নিরাপদ এবং বিশ্বস্ত উৎস থেকে ডাউনলোড করুন।

ডেটা সুরক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নিয়ে আমাদের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত। প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু এর অপব্যবহার আমাদের জীবনকে বিপদে ফেলতে পারে। সচেতনতা, সঠিক তথ্য ও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে পারি এবং আমাদের ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষিত রাখতে পারি।

তথ্য উৎস: গুগল

ভ্রমণকাহিনী

আমার দেখা আমেরিকা ও কানাডা

প্যাট্রিক রবিন গমেজ

গতবছর জুলাই ২৩ তারিখে ঢাকার শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা প্লেনে যাত্রার পর স্ত্রী ও আমি যখন নিউইয়র্ক JFK ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরে প্লেন থেকে অবতরণ করলাম। স্থানীয় সময় তখন নয়টা। দীর্ঘ যাত্রার পর শরীরটা ক্লান্ত লাগছিলো। ইমিগ্রেশনের সমস্ত ফর্মালিটিস্ শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি বড় মেয়ে রিংকি, মেয়ের জামাই হৃদয়, দুই নাতনী গ্লোরিয়া ও ফিওনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের দেখেই ওরা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। অদ্ভুত এক শান্তি নিজের মধ্যে অনুভব করলাম। যে ক্লান্তির ভাবটা ছিলো ওদের স্পর্শে তা উধাও হয়ে গেলো। আমাদের সব লাগেজ্, ব্যাগ ওরাই গাড়িতে উঠালো। গাড়িতে বসে দুই নাতনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চাইলো প্লেনে আমাদের কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা, ঠিকমতো খেয়েছি কিনা, ঘুমিয়েছি কিনা, দেশে কে কেমন আছে ইত্যাদি। নানান গল্পে আর রাস্তার দু'পাশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ওদের বাসায় পৌঁছে গেলাম।

দেশে থাকতে মেয়ে ও জামাইয়ের সাথে আলোচনা হয়েছিল আমরা আমেরিকা এলে সবাই মিলে কানাডা ঘুরতে যাবো। কানাডায় ছোট শালিকা জয়েস, তার স্বামী স্বপন ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসবাস করে ওদের বাড়িতে। তাছাড়া জয়েস ও স্বপনের বিবাহবার্ষিকী ১৯ আগস্ট সে উপলক্ষ্যে ওরা আমাদের আগে থেকেই দাওয়াত দিয়ে রেখেছিল যেনো ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি। কানাডা যাওয়ার আগে সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে মেরীল্যান্ডে যাবো। স্ত্রীর বড়ভাই (সম্বন্ধী) হিলারী পরিবার নিয়ে ওখানে সিলভার স্প্রিং এলাকায় থাকে। ৩০ জুলাই হৃদয় ওর গাড়ি করে স্ত্রী ও আমাকে মেরীল্যান্ড হিলারীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসলো। ওয়াশিংটন ডিসি, ন্যাচারেল মিউজিয়াম, কাথলিক ইউনির্ভাসিটি অফ আমেরিকা নানান রকম ফলের বাগান সব ঘুরে দেখালো। সবচেয়ে ভাল লাগলো সৌন্দর্যে ভরপুর দৃষ্টিনন্দন এখানকার প্রাকৃতিক রূপ। গাঁঢ় সবুজ হরেক রকম গাছে ঘেরা পাহাড়। পাহাড় ঘেঁষে রাস্তা এঁকেবেঁকে কোথাও পাহাড়ের ঢালু বেয়ে একেবারে নিচে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘর-বাড়ি। রাতে যখন এই ঘর-বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠে তখন সত্যিই অপূর্ব লাগে দেখতে। একদিন হিলারী ও বৌদির সাথে অনেক দূরের একটা চার্চ দেখতে গেলাম। জঙ্গলে ভিতরে খুব সুন্দর চার্চ। ফেরার পথে একটা আপেলের বাগানের কাছে গাড়ি থামিয়ে হালকা নাস্তা সেরে নিলাম। দিগন্ত জোড়া এই আপেল বাগানটিতে আপেলের এতো ফলন যে গাছগুলো আপেলের ভাড়ে নুয়ে পড়েছে। আপেল বাগানের উল্টোদিকে ক্রিস্মাস ট্রির বাগান, এখান থেকে বড়দিনের আগে হাজার হাজার ক্রিস্মাস ট্রি লরী বোঝাই করে আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায় বিক্রি করার জন্য। এখানে বড়দিনের সময় সব জায়গায় জীবন্ত ক্রিস্মাস ট্রি সাজানো হয়।

মেরীল্যান্ডে বিশেষ করে এই সিলভার স্প্রীং এলাকায় আঠারোগ্রাম ও ভাওয়ালের প্রচুর খ্রিস্টান লোকের বসবাস। ইছামতি নামে একটা বড় সংগঠন রয়েছে। ধর্মীয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে এদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে।

মেরীল্যান্ড থেকে ঘুরে আসার পর হৃদয় কানাডা যাওয়ার জন্য ১২ আগস্ট আমেরিকান এয়ারলাইনসের সবার জন্য টিকেট বুকিং করলো। ১২ আগস্ট নিউইয়র্ক ডিসিতে অবস্থিত লাগোয়ার ডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে রাত পৌনে এগারোটায় আমরা আমেরিকা এয়ারলাইনসের একটা ফ্লাইটে কানাডার পিয়ারসন এয়ারপোর্টের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ৫৭ সিটের খুব ছোট প্লেন। ভিতরে মাত্র একজন এয়ার হোস্টেস্। যাই হোক, ৫০ মিনিট যাত্রার পর প্লেন পিয়ারসন এয়ারপোর্টে অবতরণ করলো। এয়ারপোর্টের সমস্ত কাজ শেষ করে বাহিরে এসে দেখি জয়েস, স্বপন ও ছেলে অগ্রিম ফুল নিয়ে আমাদের স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিন পর ওদের কাছে পেয়ে ভীষণ আনন্দিত হলাম। ওরাও খুব খুশী আমাদের পেয়ে। রাতের আঁধারে আমাদের নিয়ে গাড়ী ছুটে চললো। রাত বলে রাস্তার দু'পাশের খুব বেশি কিছু দেখতে পেলাম না, তবুও অনুমান করতে পারছিলাম চতুর্দিকে অনেক সবুজ বনরাজি। মাঝে মাঝে বড় বড় বিল্ডিং। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাংলোর মতো বাড়িগুলো রাতের আলো আঁধারিতে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি দ্রুত চলছে কোন ঝাকুনি ও ট্রাফিক জ্যাম ছাড়া। গল্প করতে করতে এক ঘন্টার গাড়ির পথ পেরিয়ে স্বপনদের বাড়ী অন্টারিওর এজেক্স এসে গেলাম। নিয়নের আলোয় আশেপাশের বাড়িগুলো ছবির মতো দেখাচ্ছে। বাড়িগুলোর সামনের রাস্তার দুইদিকে বড় বড় গাছের সারি। রাত বেশি হওয়াতে বেশি কিছু ঘুরে দেখা হলো না। আমরা ফ্রেশ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্প-গুজবের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুতে গেলাম।

পরেরদিন সকালে ওদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। বেশ বড় বাড়ি। বাড়ির পেছনের দিকে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম ওদের শাক-সবজি আর ফুলের বাগান দেখে। কি নেই সেখানে! বাংলাদেশী অনেক শাক-সবজি আবাদ করেছে। কাজের শেষে বাসায় ফিরে ওরা যে প্রচুর শ্রম দিয়ে এই সুন্দর পরিপাটি বাগান তৈরি করেছে তা দেখলেই বুঝা যায়।

আমরা আসবো বলে জয়েস ও স্বপন বেশ কিছুদিন ছুটি নিয়েছে। আমাদের কোথায় কোথায় ঘুরাতে নিয়ে যাবে এবং কবে কোন আত্মীয়ের বা বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে রেখেছে সেসব বিস্তারিত আলাপ করলো। মেয়ে, মেয়ের জামাই ও দুই নাতনী এক সপ্তাহ থেকে আবার নিউইয়র্কে ফিরে যাবে। তাই আর দেরী না করে আমাদের ঘুরাঘুরি ও খাওয়া-দাওয়া চলতে লাগলো।

প্রথম দিন গেলাম লেক অন্টারিও দেখতে। লেক দেখে মনে হলো এতো লেক নয় যেন সমুদ্র। এই লেকে নায়েগ্রা জলপ্রপাত থেকে অনবরত পানি প্রবেশ করে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। লেক আন্টারিওর দৈর্ঘ্য ১৯৩ মাইল, প্রস্থ ৫০ ফুট এবং পানির গভীরতা গড়ে ৮০২ ফুট। সাগরের মত নীল জলরাশি দেখে দু'চোখ প্রশান্তি নেমে আসে। লেকের পিছনদিকে ঘন জঙ্গল। দুরে কয়েক'টা হরিণ দেখতে পেলাম।

পরেরদিন গেলাম সিএন টাওয়ার দেখতে সিএন টাওয়ার টরেন্টো সিটির প্রধান আকর্ষণীয় স্থান পর্যটকদের জন্য। ১৪৭ তালা বিশিষ্ট ১৮১৫ ফুট উঁচু এক বিশাল ভবন। টরেন্টো টাউনের চোখ ঝলসানো অপরূপ দৃশ্য দেখে মোহিত না হয়ে পারা যায় না, সেই সুযোগটা পেলাম ফেরী থেকে। যখন টরেন্টো সিটির উল্টো দিকে পার্কে যাচ্ছিলাম তখন মাঝ নদী থেকে রাতের বেলা নানান রঙ্গিন বাতির আলোতে এই দৃশ্য আরো মোহনীত হয়ে উঠে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিলো অরলিয়া আইল্যান্ডের কাওচিচিং বিচ। এদিক আমাদের সাথে সহযাত্রী হলো মিনিকের ডি. ক্রুজ এবং পরিচয় দিয়ে রাখি, সে আমাদের তুইতাল গ্রামের বহুগুণের অধিকারী প্রয়াত হেবল ডি. ক্রুজের যোগ্য সন্তান। বাবার মতো ছেলেও অনেক গুণে গুণান্বিত। একাধারে সে

গানের রচিয়তা, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পী। অন্যদিকে হস্তশিল্পে ও রয়েছে তার সমান দক্ষতা এবং পাইন ও ম্যাপল এই দুই গাছের কাঠের সমন্বয়ে খুব সুন্দর ক্রুশ বানাতে পারে। পরবর্তীতে যখন সে আমাদের তার স্কারবোরোর বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলো সেইদিন আমাকে একটি আকর্ষণীয় ক্রুশ উপহার দিয়েছিলো। তাছাড়াও তার বানানো রয়েছে গানের রেকর্ডিংয়ের ছোট একটি স্টুডিও (যেখানে সে তার নিজের গান রেকর্ডিং করে) তার সুরেলা কণ্ঠের গান শোনার ভাগ্য সেদিন হয়েছিলো। তার সুরোপিত গান আমাদের ধর্মীয় গীতাবলীতে আছে। গীতাবলীর "প্রভু তোমার ক্রুশ আছে বলে" গানটিও ডমিনিকের সুরোপিত। পাঠক ইউটিউবে থেকে গানটি শোনে দেখতে পারেন কত সুন্দর সুর করেছে। এবার যে কানাডায় খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সিলভার জুবলী হলো তার থিম গানটিও তার লেখা ও সুর দেওয়া। এতোসব গুণের অধিকারী সর্বদা হাসি খুশী ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে এমন আনন্দ বেড়ে গেল।

যাত্রা পথের দু'পাশে কোথাও ঘন সবুজ বন, কোথাও মাইলের পর মাইল ভূট্টা ও আলুর ক্ষেত, কোথাও আঙ্গুর, আপেলের বাগান। মাঝে মাঝে কৃষকের বাড়ি এবং প্রতি বাড়িতে বড় বড় শষ্যের ভান্ডার, কোথাও আবার বিস্তীর্ণ জলরাশি। সবকিছু ছবির মত মনে হচ্ছে। পাহাড়ী রাস্তার গাড়ি একবার উঠে যাচ্ছে, আবার নিচে নেমে যাচ্ছে। অনেক উপভোগ্য একটা যাত্রার শেষ করে প্রায় তিন ঘন্টা গাড়ির রাস্তা পেরিয়ে আমরা অরলিয়া ওচিচিং বিচে পৌঁছালাম। চারিদিকে সুন্দর পরিবেশ। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা নাস্তা সারলাম। এখানে আসার যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো তা হলো বরশি দিয়ে মাছ ধরা। বিকেলে বরশি দিয়ে অনেকগুলো মাছ ধরা হয়েছে। এরপর বিচের আশপাশ এলাকাটা ঘুরে বিকেলের চাচক্র শেষে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম ফেরার উদ্দেশে। অনেক হৈ পুল্লোড় করে দিনটা কাটালো।

পরেরদিন আমাদের ভ্রমণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে একটু এগিয়ে যেতেই প্রথমে চোখে পড়লো নায়েগ্রা নদীর ওপারে আমেরিকান ফলস্। কি বিশাল এর পরিধি। প্রচণ্ড বেগে আর গর্জনে সাদা ফেনিল পানি আছঁড়ে পড়ছে নিচে। আরেকটু এগিয়ে ডানদিকে তাকালেই অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলাম কানাডিয়ান সৃষ্টি। দু'চোখে আমাদের অপার বিস্ময়। ছোটবেলা শুধু নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কথা বইয়ে পড়েছি, বাস্তবে যে এতো দৃষ্টিনন্দন অপূর্ব সুন্দর তা চিন্তাও করিনি। আজ স্বচক্ষে দেখে মন-প্রাণ-চোখ জুড়িয়ে গেলো। হাজার হাজার পর্যটক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এ অপার সৌন্দর্য্য দেখতে। বছরে প্রায় তিন কোটি মানুষ এখানে আসে নায়েগ্রা ফলস্য়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে। আস্তে আস্তে আমরা ফলস্য়ের একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালাম। অনেক দূর থেকে নিল জলরাশি ধেয়ে এসে বিশাল এলাকাজুড়ে দুধ সাদা রূপ ধারণ করে প্রচণ্ড বেগে গভীরে নিমজ্জীত এই জল নিচে পড়ার আগেই বাষ্প হয়ে ধুয়োর আচ্ছন্ন করে ফেলছে এবং এই ধূয়োয় সূর্যের আলো পড়ে সৃষ্টি হচ্ছে মহোনীয় রংধনু। প্রপাতের পানি শব্দ এতো তীব্র যে অন্যকোন শব্দ শুনতে পারছিনা। নায়েগ্রা জলপ্রপাত কোন একক জলপ্রপাত নয় এটা মূলত তিনটি জলপ্রপাতের সমষ্টি। এই জলপ্রপাতের তিন ভাগের দুইভাগ রয়েছে কানাডায় এবং একভাগ আমেরিকায়। আমেরিকার বড় অংশের নাম ফলস্ এবং কানাডার বড় অংশের নাম হর্সশু আর ছোট অংশের নাম রাইডাল ভেইল ফলস্। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের এটা সবচেয়ে ছোট ফলস্। হুর্সশু অংশটিতে ২৬০০ ফুট চওড়া এবং ১৬৭ ফুট উঁচু থেকে তীব্র বেগে মিনিটে প্রায় ৬০ লক্ষ ঘনফুট পানি আছড়ে পড়েছে নিচে। আমেরিকা অংশের চওড়া ১৬০০ ফুট এবং উচ্চতা ৭০ ফুট।

উপর থেকে যেমন জলপ্রপাত দেখা যায় তেমনি বোটে (BOAT) করে খুব কাছ থেকে দেখার ও সুব্যবস্থা রয়েছে। মেইড অব দ্য মিস্ট নামে একটা জোট পর্যটকদের এই অপার সৌন্দর্যের সানিধ্য নিয়ে যায়। আমরাও এ সুযোগ হাতছাড়া না করে টিকেট কেটে নিচে নেমে গেলাম। সিকিউরিটি রুম থেকে আমাদের ছবি তুলে রাখলো ওদের রেকর্ডের জন্য এবং সবাইকে একটি করে লাল রংয়ের রেইনকোর্ট দিলো পরিধানের জন্য যেনো জলের ঝাঁপটায় ভিজে না যাই। আমরা সেই রেইনকোর্ট পরিধান করে বোটে (boat) গিয়ে উঠলাম। সময়মতো বোট ছেড়ে দিলো। যতই জলপ্রপাতের কাছে, উপর থেকে তীব্রভাবে আছড়ে পড়া জলের ফলে ঝড়ের মতো বাতাস বইছে আর সেই বাতাসে ভেসে আসা জলের ঝাঁপটায় সবাইকে ভিজিয়ে দিচ্ছে । প্রপাতের চারদিকে দলবাধা সিগালের উড়াউড়ি তীব্র বাতাস আর জল পড়ার শব্দ এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করছে। মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙ্গে জগতের সব বৃষ্টি ঝড়ে পড়ছে। এ ভয়ংকর সৌন্দর্য্যে অনুভূতি লিখে বুঝানো যায় না শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। বিশ্বাসই হচ্ছে না যে নায়েগ্রার জলে ভিজছি। সত্যিই নায়েগ্রা জলপ্রপাত মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে এর বৈচিত্রময় রূপ দেখার পরেও এখান থেকে ফিরে যেতে মন চায় না। তবুও ফিরে যেতে হচ্ছে কারণ বোটের (boat) নির্ধারিত ৩০ মিনিট সময় কেমন করে শেষ হয়ে গেলো বুঝতেই পারলাম না। বিদায় নায়েগ্রা। জীবন আর হয়তো দেখা হবেনা। ফিরে এলাম নায়েগ্রা জলপ্রপাত থেকে আর সাথে নিয়ে এলাম জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য দেখার অভিজ্ঞতা।

যতদিন কানাডা ছিলাম জয়েস আর স্বপন আমাদের অনেক ঘুরিয়েছে, বিশেষ করে অন্টারিওর মিডল্যান্ডে অবস্থিত MARTYR'S SHRINE দেখে খুবই পুলকিত হয়েছি। উঁচু পাহাড়ের উপর সুদৃশ্য গির্জা। চারিদিকে ঘন সবুজ বন। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছের সারি তার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে মসৃণ রাস্তা। এই রাস্তা ধরেই গাড়ি চলে যায় গির্জার আঙ্গিনায়। গির্জার ভিতরটাও খুব সুন্দর। বেদীর ডানপাশে দেখলাম অনেক লাঠি-ক্র্যাচ রাখা আছে। যারা এখানে এসে প্রার্থনা করে সুস্থ্য হয়ে ফিরে গেছেন তারা সাক্ষ্য হিসেবে এগুলো রেখে গেছেন। অনেক দর্শনার্থী এসেছেন নির্জনে প্রার্থনা করতে, খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে। টরেন্টো ডানফোর্থ এভিনিউর বাঙ্গালী এলাকা এবং এরপাশেই শহীদ মিনার দেখে মনটা জুড়িয়ে গেলো। অনেক দেশীয় দোকান, রেস্টুরেন্ট, অফিস রয়েছে এখানে। সাইনবোর্ড সব বাংলায় লেখা।

একদিন কান্টা ববিন ও তার ছেলে এসে আমাদের ওর বাড়িতে নিয়ে গেলো। সম্পর্কে সে আমার কম্পার্দী। কিন্তু আমরা দু'জনকে 'রবিদা' বলে সম্বোধন করি, সেই গ্রামে থাকাকালিন সময় থেকে। সারাদিন ওর ও কুমার্দীর সাথে খোশ গল্প-গুজব করে কাটালাম। কমার্দীর হাতের গরম গরম ভাপা পিঠা ছিলো বাড়তি গাওনা। রবিন আর আমি একই গ্রামের ছেলে। বাল্যকাল একসাথে কেটেছে। মধ্যপ্রাচ্যের আবুধাবীতে আমরা অনেক বছর একসাথে কাটিয়েছি। ভীষণ সুন্দর মনের পরোপকারী একজন মানুষ। আবুধাবী ন্যাশনাল কেটারিং কম্পানীতে যারা চাকুরী করতেন, বিশেষ করে আঠারোগ্রামের তাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যারা ওর কাছ থেকে কোন না কোন সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছে। এমনও দেখা গেছে সে নাইট ডিউটি করে এসে একটু ঘুমিয়েছে, এমন সময় কেউ এসে ডাকলে হয়তো একটু হাসপাতালে যেতে হবে না হয় এম্বাসিতে যেতে হবে কিংবা কোন চিঠি বা এপ্লিকেশন লিখে টাইপ করে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সে কোনরকম বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করে কাজগুলো সানন্দে করে দিতো। তো এসব স্মৃতিচারণ ছাড়াও গ্রাম নিয়ে, ক্লাব নিয়ে অনেক গল্প হলো। বিকেলে কর্মাদী ও রবিদা আমাদের অন্টারিও হ্রদ দেখাতে নিয়ে গেলো। পড়ন্ত বিকেলে লেকের ধার ঘেষে হাঁটা সে এক অন্যরকম ভাললাগা। শীত অনুভূত হওয়ায় ওদের বাসায় এসে রাতের খাওয়া-দাওয়া সারার পর রবিদা ও কমার্দী আবার স্বপনদের

বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলো।

দীর্ঘ একমাস কানাডায় কাটিয়ে সবার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, ৮ সেপ্টেম্বর ফিরে যাচ্ছি নিউইয়র্কে। যে সুহৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার এবং তাঁদের আপ্যায়ন গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমরা অতিশয় আনন্দিত। পরিশেষে স্বপন, জয়েস, আগামী ও এন্দ্রিয়া তোমাদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও সঙ্গ দেওয়ার জন্য। আবার সেই আমেরিকান এয়ার লাইন্সের ফিরে এলাম নিউইয়র্কে।

নিউইয়র্ক কয়েকদিন থেকে বোষ্টন মামাতো বোনের বাড়ী গেলাম বেড়াতে। মামাতো বোন জেসিকা ও তার স্বামী সঞ্চয় আর মামি থাকে বোষ্টনের মেছাসুসিটাস এলাকায়। এখানে শুরু ৩/৪ টি খ্রিস্টান পরিবার ছাড়া আমাদের অঞ্চলের আর কেউ নেই। বেশ ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন এবং নিরিবিলি পাহাড়ি এলাকা। নিরিবিলি বলে দিনের বেলায় হরিণের দল বন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসে। মাঝে মাঝে পাশের জলাশয় থেকে রাজহাঁস, বুনো হাঁস রাস্তা পারাপার হয়। সঞ্চয় বিন্দাজ ছেলে। কোন অহমবোধ নেই। খুব মিশুক এবং আমোদ প্রিয়। এককালে বাংলাদেশে ছাত্র কল্যাণ সংঘের সঞ্চলকের ভূমিকা পালন করতো। ছন্দে ছন্দে কথা বলা ওর একটা বাতিক। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভীষণ প্রকৃতিপ্রেমী। প্রায় প্রতিদিনই কাজের পর বাসায় ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে দু'জন বেরিয়ে পড়ে প্রকৃতির কোলে। কোথায় সুন্দর সুন্দর লেক কোথায় ঝর্ণা কোথায় হরিণ বেশি দেখা যায় এমন অনেক খুঁজে আছে ওদের কাছে। কখনো কখনো মামিকেও সঙ্গী করে এসব জায়গায় সময় কাটায়। যতদিন ছিলাম ওদের কাছে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও নিয়ে যেত এবং সব জায়গায়ই উপভোগ্য। ওদের এদিকটায় বন-বাদাড়, খাল-বিল এসব প্রাকৃতিক জায়গায়ই বেশী। আরো আছে বেশ কয়েকটা গির্জা। এসব গির্জায়ও আমাদের নিয়ে গেছে। ফাতেমা রাণীর গির্জার পাশে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জপমালা। বড় বড় পাথর আর মোটা শিকল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে জপমালাটি। পাহাড়ের উপর থেকে শুরু হয়ে নেমে এসেছে। সমতলে বিরাট মাঠ জুড়ে এই জপমালা। প্রতিটি পাথরে বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দূতের বন্দনা প্রার্থনাটি তামার পাতে খোদাই করে লিখে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। এই জপমালাটি প্রদক্ষিণ করতে আমাদের পাঁচ মিনিট সময় লেগেছে তাই সহজেই অনুমেয় কত বড় এই জপমালাটি। শত শত আপেল পড়ে আছে কিন্তু কেউ কুড়ায় না। নানান রকমের আপেল যেমন মিষ্টি তেমনি রসালো। ইচ্ছে মতো যত ইচ্ছা খাও কেউ কিছু বলবে না। শুধু সাথে করে নিয়ে গেছে যেগুলির দাম দিতে হবে। তাও আবার অনেক সস্তায়। বাগানে প্রবেশ করার সময় অভ্যর্থনা ডেক্স থেকে ব্যাগ বা ঝুড়ির সাইজ অনুসারে দাম পরিশোধ করতে হবে। ৫, ১০, ১৫ অথবা ২০ ডলারের নানান সাইজের ব্যাগ বা ঝুঁড়ি পাওয়া যায়। যে কয়টা ইচ্ছে নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো গাছ থেকে আপেল ছিঁড়ে ব্যাগ/ঝুঁড়ি বোঝাই করে নিয়ে যান। এটাও আমাদের কাছে এক দারুন অভিজ্ঞতা। আমরাও ১৫ ডলারের এক ব্যাগ ভর্তি করে আপেল নিয়ে এলাম। বাসায় এসে ওজন করে দেখি ৮ কেজি। এক সপ্তাহ বোষ্টন থেকে আবার ফিরে এলাম নিউইয়র্কে। এখানে সপ্তাহে পাঁচদিন কাজের চাপে কেউই দম ফেলানোর সময় পায় না। তাই শনি-রবিবার দুইদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ অন্য যেকোন ছুটির দিনে মেয়ে-জামাই ও দুই নাতনীসহ আমরা নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়তাম। এই শহরে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টাই বিভিন্ন দোকান, রেস্টুরেন্ট, বার, মেট্রোরেল সবকিছুই খোলা থাকে। মনে হলো এ শহর কখনো ঘুমায় না। যখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে ভ্রমণ করা যায়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই হয়তো এমনটি হয়। এখানে আবহাওয়ার ও কোন গ্যারান্টি নেই রাতে একরকম তো সকালে অন্য রকম।

এখন রোদ তো কিছুক্ষণ পরই শুরু হলো বৃষ্টি। অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় আবহাওয়া পরিবর্তন হয়। কাজেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখা এখানকার মানুষের নিত্যদিনের রুটিন এবং সেই অনুযায়ী তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন।

মেয়ের বাসায় যেখানে থাকি তার কাছেই বাঙালি কমিউনিটির মিলনমেলা জ্যাকসন হাইটস্ এবং ডাইভার্সিটি প্লাজা। আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে যত বাঙালী নিউইয়র্ক ঘুরতে আসন এখানেই তারা আড্ডা দেয়। অনেকে এই জায়গাকে নিউইয়র্কের ফার্মগেটও বলে। পান সুপারি থেকে শুরু করে এমন কোন জিনিস নেই যা এখানে পাওয়া যায়না। মার্কিন সরকার এখানে বাংলাদেশ স্ট্রীট একটা রাস্তার নামকরণ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের জন্য যা গর্বের বিষয়।

বাংলাদেশীদের ঈদের মেলা, পূজার মন্ডপ, বিভিন্ন রকম মেলা, বাংলাদেশ থেকে আগত কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন রাজনেতিক দলের সভা সমাবেশ এখানেই হয়ে থাকে। পরিতাপের বিষয় রাজনৈতিক সভায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার বিষয়ও মাঝেমধ্যে হয়ে থাকে যা অতিশয় গর্হিত কাজ। মার্কিন সরকার এই জায়গায়টা বাংলাদেশীদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাই এর রক্ষনাবেক্ষণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটা ও বাংলাদেশীদের দেখা উচিত বলে মনে করি। কিন্তু এখানে এসেও দেখি কোন পরিবর্তন হয়নি। দেশের মতো এখানেও জুসের ক্যান, পানির বোতল, খাবার প্যাকেট, সিগারেটের শেষাংশ এমনকি পানের পিক চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নোংরা করে রেখেছে। রোজ সকাল ছোট নাতনীকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছি স্থানীয় বৃদ্ধ পরিচ্ছন্ন কর্মী সেগুলো পরিস্কার করছে। এখানকার বাঙালী কমিউনিটি কি এদিকে নজর দিবেন?

নিউইয়র্কে অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে যেমন টাইমস্ স্কায়ার, রকি ফিলার সেন্টার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, টুইন টাওয়ার নেব-নির্মিত্য, নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী, ব্রুকলিং ব্রীজ, সেন্টাল পার্ক, রোজভেল্ট আইল্যান্ড, কনি আইল্যান্ড, করোনা পার্ক ইত্যাদি। ইতিমধ্যে এগুলোর কিছু কিছু দেখা হয়েছে। বাকীগুলো ও দেখার আশা করছি। দর্শনীয় স্থান দেখার পাশাপাশি বড়দিন, নববর্ষ, থেংস গিভিং ডে, হেলোইনসহ কয়েকটি অনুষ্ঠান রয়েছে সেগুলো নাতিনদের সাথে পালন করতে হবে। আমাদের কাছে পেয়ে ওরা কিছুই মিস করতে চাচ্ছে না।

এরই মধ্যে এক শনিবার আমরা সবাই গেলাম স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে। নিউইয়র্কের ব্যাটারি পার্ক থেকে ফেরীতে ইস্ট রিভার ও হাউসন রিভারের সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম লিবার্টি দ্বীপের স্ট্যাচু অব লিবার্টির কাছে। এই এক দারুন অনুভূতি। প্রচুর লোকের সমাগম। এখান থেকে সামনে তাকালে দেখা যায় ম্যানহার্টনের সব আকাশ ছোঁয়া ইমারত। দেখার মতো দৃশ্য। লিবার্টি দ্বীপের বামদিকে একটু দূরে রয়েছে এলিস দ্বীপ। যারা আগে জাহাজে করে আমেরিকা আসতেন তাদের ইমিগ্রেশনের কাজ এখানে সম্পন্ন করতে হতো। এখানে মূর্তির একটি বড় যাদুঘর রয়েছে।

প্রতিবছর প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ পর্যটক স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে আসেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের একশত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ফ্রান্স দুই দেশের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে স্ট্যাচুটি আমেরিকাকে উপহার হিসেবে দেয়। নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়ের মুখে লিবার্টি দ্বীপে স্ট্যাচু অব লিবার্টি স্থাপন করা হয়েছে। ভাস্কর্যটির ডান হাতে রয়েছে প্রজ্বলিত মশাল আর বাম হাতে আইনের বই। স্ট্যাচুর মাথার মুকুট রয়েছে ৭টি কাঁটা যা সাত সমুদ্রকে ও সাত মহাদেশকে নির্দেশ করে। মূল ভাস্কর্যটির উচ্চতা ১৫১ ফুট ১ ইঞ্চি তবে মাটি থেকে মূল বেদীসহ এর উচ্চতা ৩০৫ ফুট ১ ইঞ্চি। স্ট্যাচুর নাকের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং এর এক কান থেকে অন্য কানের দূরত্ব ১০ ফুট এবং তামার তৈরি সমগ্র মূর্তিটির ওজন প্রায় আড়াই লক্ষ কেজি। স্ট্যাচু অব লিবার্টি সম্পূর্ণ তৈরি করা হয়েছে ফ্রান্সে। লোহার ফ্রেমের উপর তামার পাত দিয়ে ৩০০ টি খণ্ডে

তৈরি করা হয়েছে এটি। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ২১৪ টি বাক্সে ভরে জাহাজে করে ভাস্কর্যটি ফ্রান্স থেকে পাঠানো হয় আমেরিকায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ অক্টোবর তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ট স্ট্যাচু অফ লিবার্টি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আমরা এখানে দুইঘন্টা কাটিয়ে ফেরী করে এলিস দ্বীপে গিয়ে দেখলাম সেই মূর্তি দিয়ে ভর্তি লিবার্টি মিউজিয়াম। অজানাকে জেনে দেখে মনে প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এলাম বাসায়।

নিউইয়র্ক সিটিতে বেড়ানোর আরেক নান্দনিক ও নয়নাভিরাম জায়গা ম্যানহাটনে অবস্থিত সেন্ট্রাল পার্ক। এখন ফলস্ এর সময় তাই একেক গাছ সেজেছে একেক রঙে। কোনটি টকটকে লাল, কোনটি হলুদ, কোনটি কিছুটা বেগুনি আবার কোনটি সবুজ। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ঝিলের দু'পাশের ভরে দেখে নিলাম। এখান থেকে গেলাম সেই বিখ্যাত টাইমস্ স্কয়ারে। লোক লোকারণ্য এখানে সবসময় হাজারো পর্যটকের ভিড় লেগেই থাকে। সব বিল্ডিংয়ে বড় বড় বিলবোর্ড, নানান ব্যান্ডের জিনিসের চোখ ঝলসানো বিজ্ঞাপন যা মূলত পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। আলোক সজ্জার ঝলকানির খেলা-সব মিলিয়ে এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এরপর ম্যানহাটনের রাতের রূপ দেখতে দেখতে রাত এগারোটায় মেট্রোতে চেপে বসলাম বাসার উদ্দেশে।

ঘুরাঘুরির মধ্যেই চলে এলো হ্যালোইন। নাতিনদের ও তাদের বন্ধুদের সাথে দোকানে দোকানে ঘুরে চকলেট সংগ্রহ করাটা ছিলো দারুন অভিজ্ঞতা। যে যার মতো করে সেজেছে। মুখে রং মেখে, মুখোশ পড়ে সেই ছোটবেলার যেমন খুশী তেমন সাজোর মতো। খুবই উপভোগ্য ছিলো সন্ধ্যাটা। থেংকস্ গিভিং ডে ও কাটালো খুব ঘটা করে ক্রেনবেরী সস্ সহ রোস্ট টার্কি, ম্যাশ পটেটো উইথ গ্রেভী এবং পাম্পকিং পাই। থেংকস্ গিভিং ডে'র প্রধান ট্রেডিশনাল খাওয়া হলেও এদিন নানান রকম উপাদেয় খাদ্যে খাওয়ার টেবিল ভরপুর থাকে এবং আমেরিকান সবাই বছরের অন্যান্য সময়ের থেকে বেশি খায়।

দেখতে দেখতে বড়দিন এসে গেলো। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই এখানে বড়দিনের আমেজ শুরু হয়ে যায়। নিউইয়র্ক সিটি তখন বর্ণিল সাজে সাজতে থাকে। বাড়ি-ঘর, রাস্তা সবকিছু আলোক সজ্জায় ঝলমল করে উঠেছে। নিউইয়র্ক সিটিকে আরো বেশি আকর্ষণীয় ও সুন্দর লাগছে। রাত পোহালেই বড়দিন। আমরা বড়দিনের (নাতাল রাতের) খ্রিস্টযাগে যোগদান করার জন্য উডসাইডে অবস্থিত কুইন্স অব এন্জেল চার্চে গেলাম। এখানে ফাদার মিন্টু জের্ভাস রোজারিও বাংলায় খ্রিস্টযাগ অর্পন করবেন। ফাদার মিন্টু বাড়ি, বাংলাদেশে পাবনা জেলায়। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্কে কার্পাস খ্রিস্ট চার্চে স্থানীভাবে সেবাদান করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে যেমন প্রতিটি গির্জায় বড়দিনের সময় ভিতরে-বাইরে সুন্দরভাবে সাজানো হয় এখানেও তার কিছুই দেখলাম না শুধু একটা গোশালা ঘর ছাড়া। নিউইয়র্ক ছাড়াও লংআইল্যান্ডে, মেরীল্যান্ডে, নিউজার্সি এবং কানেকটিকা থেকে প্রচুর খ্রিস্টভক্ত এসেছেন নাতাল রাতের মাতৃভাষায় এই খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার জন্য। গানের দলে বেশকিছু পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। চিত্রা রোজারিও পরিচালনায় খ্রিস্টযাগে খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু একটা বিষয় মনে খুবই দাগ কাটলো। খ্রিস্টযাগ শুরু হওয়ার পূর্বে ফাদার যখন গির্জা ঘরের পিছন থেকে এসে বেদীতে উঠলেন তখন ফাদারের সাথে একমাত্র পত্র পাঠক ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। না আছে একজন সেবক, না আছে আরতি দেবার কেউ। বড়দিনের মতো এমন একটা মহা খ্রিস্টযাগে সেবক আর আরতি কন্যা থাকা বাঞ্চনীয়। অথচ গির্জায় দেখলাম সেবক এবং আরতি দেবার মতো অনেক অনেক ছেলে- মেয়ে। এটা কি আগে থেকে প্রস্তুত করা নাকি এখানে সেবক হওয়া বা আরতি দেওয়ার নিয়ম নেই। সারা খ্রিস্টযাগে একজন সেবকও দেখলাম না ফাদারকে সাহায্য করার জন্য।

খ্রিস্টযাগের পর পরিচিত একজনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এখানে খ্রিস্টান কমিউনিটিতে কিছুটা সমন্বয়ের অভাব রয়েছে যার জন্য এমনটা হতে পারে। পরে গির্জার নিচ তলায় সবাইকে বড়দিনের কেক ও পিঠা দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হলো। পরিচিত অনেক মুখ দেখতে পেলাম। কারো কারো সাথে ৪০/৪৫ বছর পর দেখা, সে এক অন্যরকম অনুভূতি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হাসনাবাদের কার্যাটের সাথে পাক্কা তিপান্ন বছর পর দেখা হলো। এতো বছর পর দেখা হলেও একে অন্যকে চিনতে অসুবিধা হলো না। আমি যখন বান্দুরা স্কুলের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করি তখন সে ওখানে কর্মরত ছিলো। আমাকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলো। কার্যাট বাক প্রতিবন্ধী তাই আকারে-ইঙ্গিতে অনেক কথা হলো। ওর বাসায় ঠিকানা দিলো যাওয়ার জন্য কিন্তু ওর বাসায় আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। মেয়ে-জামাই ও নাতিদের মনে অনেক বছরের লালিত স্বপ্ন ছিলো। আমাদের নিয়ে একসাথে বড়দিন করার আজ ওদের পূর্ণ হলো সেই স্বপ্নের প্রতিক্ষা।

নিউইয়র্কে বড়দিনের প্রধান আকর্ষণ রকি-ফিলার সেন্টারের ক্রিসমাস ট্রি দেখা। বড়দিনের পরেরদিন সন্ধ্যায় গেলাম ক্রিসমাস ট্রি দেখতে। রকিফিলার সেন্টার এবং এর আশেপাশে লক্ষ মানুষের ভিড়। পা রাখারও জায়গা নেই। একবার ভাবলাম না এলেই হয়তো ভালো হতো। এই প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে আমরা একজন অন্যজনের হাত ধরে চলতে লাগলাম। একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে এই প্রচণ্ড ভিড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক জায়গায় এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে যে কিছু দেখবো তার উপায় নেই। আমাদের হাঁটতে হচ্ছেনা মানুষের ধাক্কা-ধাক্কিতেই এগিয়ে যেতে লাগলাম। মেইন রাস্তা থেকে ক্রিস্মাস ট্রির কাছে আসতে সাধারণত সময় লাগে দেড় থেকে দুই মিনিট কিন্তু এই দুই মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লাগলো চল্লিশ মিনিট। ক্রিসমাস ট্রির একেবারে কাছে ভিড়ের জন্য যেতে পারলাম না। একটু দূর দিয়ে মানুষের ধাক্কায় বের হওয়ার রাস্তা দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম পঁচাত্তর ফুট উঁচু, পঁয়তাল্লিশ ফুট প্রস্থ, এগারো টন ওজন আর পঞ্চাশ হাজার এলডি লাইট দিয়ে মন মুগ্ধ করা ক্রিসমাস ট্রি। এটা এক বিরল ভাল লাগার অভিজ্ঞতা। এই ক্রিস্মাস ট্রি প্রতিবছর কর্তৃপক্ষ আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যে ক্রিস্মাস ট্রি'র বাগান আছে সেসব বাগান ঘুরে ঘুরে যে গাছটি পছন্দ হয় সেই গাছটি নিয়ে আসে এবং তা বাগানের মালিক সানন্দে বড়দিনের উপহার হিসেবে দান করে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন।

আমেরিকা ও কানাডা ঘুরতে এসে অনেক কিছুই দেখা হলো শুধু বাকি ছিলো স্নোফলস্ দেখা, সেই স্নোফলস্ ও প্রত্যক্ষ করলাম দুইদিনে। একদিন কম অরেকদিন একটু বেশি। অনেক সিনেমায় দেখেছি বরফ পড়ে পড়ে গাছ-পালা, রাস্তা-ঘাট সব সাদা হয়ে গেছে আজ সেইসব প্রত্যক্ষ করে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো।

এবার ফেরার পালা। কেমন করে প্রায় ছয় মাস কেটে গেলো বুঝতেই পরলাম না। ১৩ জানুয়ারী রাত এগারোটায় এমিরাটস্ এয়ারলাইন্সে ফিরে যাচ্ছি বাংলাদেশে। মেয়ে, হৃদয় দুই নাতনী আমাদের নিয়ে JFK এয়ারপোর্টে এলো বিদায় জানাতে। সবার মন ভারাক্রান্ত। ওদের ছেড়ে যেতে মন চাইছিলো না, খুব কষ্ট লাগছিলো। ওদের কান্না দেখে নিজের চোখও জলে ভরে উঠলো। ওরা আমাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। এ বিদায় বড় বেদনাদায়ক। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম বোডিং ডেস্কের দিকে। ওরা সংরক্ষিত এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। লাগেজ ওজন দিয়ে বোডিং কার্ড নিয়ে পিছন ফিরে দেখি ওরা এখনো ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ দেখা যায় পিছন ফিরে ওদেরকে দেখে নিলাম। একসময় ওরা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। ভিতরটা হাহাকার করে উঠলো শূন্যতায়। আবার কবে কোথায় ওদের কাছে পাবো কে জানে।

যথাসময়ে এমিরাটস্য়ের এয়ার বাস ভীষণ গর্জন করে বিশাল ডানা মেলে আমাদের নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে আকাশে উড়াল দিয়ে মেঘের রাজ্যে ঢুকে গেলো। পিছনে পড়ে রইলো স্বপ্নের দেশ কানাডা আর আমেরিকা।

ঘুরে এলাম কলকাতায় মাদার তেরেসা হাউজ

মালা রিবেরু

অনেকদিন থেকেই স্বপ্ন ছিলো কলকাতায় মাদার তেরেজা হাউজ পরিদর্শন করতে যাওয়া। আর সেই সুযোগটা এলো যখন আমার ননদ আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে আসবে এবং বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার সময় ভারতে কলকাতা, দিল্লী ও মুম্বাই হয়ে আবার আমেরিকা চলে যাবে এই সিদ্ধান্ত হয়। কারণ কলকাতায় আমার ননদের ননদ আমেরিকা থেকে আসবে তার ছেলের বিয়ে শপিং করতে। আমার ননদ বাংলাদেশে থেকে ভারতের কলকাতায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অপেক্ষা করবে আর ননদের ননদ খ্রিস্টিন দিদি ও তার স্বামী সঞ্জয় দাদা আমেরিকা থেকে আগের দিন দিল্লী এসে পরেরদিন সকালে কলকাতায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরে দেখা করবে। এরপর একসঙ্গে কলকাতা থেকে দিল্লী যাবে এবং দিল্লী থেকে খ্রিস্টিন দিদি ও সঞ্জয় দাদা আমেরিকা চলে যাবে। আর ননদ মুম্বাই তার বান্ধবীর সাথে কয়েকদিন ঘুরে বেড়িয়ে তারপর আমেরিকায় চলে যাবে।

বিয়ের আট বছর পরে এই প্রথম ননদের সাথে দেখার উত্তেজনায় চোখের ঘুম হারাম, এরপর যখন শুনলাম যে দিদি কলকাতা যাবে আমার মনের সুপ্ত বাসনাটা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম ইস্ দিদির সাথে যদি কলকাতা ঘুরে আসতে পারতাম। কারণ আমার অনেকদিনের শখ কলকাতার মাদার তেরেসা হাউস পরিদর্শন করা। আমার স্বামী আমার নাড়ি-নক্ষত্র সবই বুঝে। তাই আমি কিছু বলার আগেই ভাব দেখে বুঝে নেই। তাই আমি কোন কিছু বলার আগেই আমাকে বলে, "আমি জানি তোমার ভারত যাওয়ার খুব শখ। আমিতো বিভিন্ন সমস্যার কারণে তোমাকে নিয়ে ভারত যেতে পারছিনা, তুমি দুই দিদির (আমি আমার ননদকে দিদি) সাথে ভারতে যাও, বিশেষ করে তোমার খুব শখ কলকাতায় মাদার তেরেজা হাউজ দেখে আসো। পরবর্তীতে আমি আবার তোমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবো।"

আমার সরকারী পাসপোর্ট থাকায় ভিসার দরকার ছিলোনা, তাই দিদি বাংলাদেশে আসা পরে কবে কোন বিমানে কলকাতায় যাবে সবখবর সেই নিয়ে টিকেট কেটে রেডি। আর আমি আমাদের অধিদপ্তরেই কাজ করি, তাই ছুটি পেতেও কোন ঝমেলা নেই। তাই দিদি আসার ও কলকাতা যাওয়ার আনন্দ আমি পুরাই বিভোর।

দিদি ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ আটলান্টা, জর্জিয়া, ইউএসএ থেকে রওনা দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারী,২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ভোর পাঁচটায় বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়। আমি আর আমার স্বামী দিদিকে বিমানবন্দরে রিসিভ করতে যাই। রাতে উত্তেজনায় একটুও ঘুমাতে পারি নি। কারণ এতদিন শুধু দিদির সাথে ফোনে কথা হয়েছে, ভিডিও কলে দেখেছি, এই প্রথম সরাসরি দেখা হবে।

দিদির সাথে দেখা থেকে পুরোটা সময় খুবই সুন্দরভাবে আনন্দের সাথে কাটিয়েছি। দিদির সাথে ঘুরে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় দাওয়াত খেয়ে দশ কেজি ওজন বাড়িয়েছি।

যাহোক, দিন গড়িয়ে রাত পড়িয়ে সেই বহু অপেক্ষিত দিন এসে উপস্থিত হলো ১৫ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৭:৫০ মিনিটে বাংলাদেশ বিমান কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস, বাংলাদেশ সময় ৮:২০ মিনিটে পৌঁছাবো। সুতরাং, আগের রাতে সবকিছু গুছিয়ে রাখলাম যেন সকালে আমাদের কোন ঝামেলা না হয়। আমি যতবার দেশের বাহিরে গিয়েছে আগের দিন রাতে কমপক্ষে দশবার চেক করি আমার পাসপোর্ট ঠিক আছে কিনা। আর এবার আরেক অহেতুক চিন্তা যোগ হয়েছে। ভিসা ছাড়া আমি কি সত্যিই কলকাতা যেতে পারবো কিনা, আরও সাথে যোগ হয়েছে ছুটির কাগজ নিয়েছে কিনা? পাশাপাশি দিদিরও ঘুম হারাম, জিনিস এতোই বেশী যদি বিমানবন্দরে কোন জিনিস রেখে কোনটা নিবো। আমাদের সাথে এক কেজি খাঁটি ঘি তা নিবো কিভাবে? অনেক চিন্তাভাবনার পরে সিদ্ধান্ত নিলাম এবং দিদিকে বললাম,"দিদি চিন্তা করো না তুমি পাসপোর্টধারী আর আমি সরকারী পাসপোর্টধারী দেখি অনুরোধ করে কিছু একটা করা যায় কিনা। তা না হলে গাড়ীর ডাইভার সাহেবকে অপেক্ষা করতে বলবো অতিরিক্ত জিনিস বাসায় নিয়ে আসতে।

সিকিউরিটি পাস করে বুকিং যে অফিসার সামনে গিয়ে, দিদি সালাম দিয়ে আমাদের ল্যাকেজ দিয়ে কথা বলছে আর আমি পাশে দুরু দুরু বুক নিয়ে অপেক্ষা করছি কখন বলবে আপনাদের অতিরিক্ত জিনিস বের করুন। ওমা! অফিসার ল্যাকেজে ট্যাগ লাগিয়ে দিয়ে বললো ওকে, নেক্টস্ প্লিজ। আমি যেন ঘাম ছেড়ে বাঁচালাম। কিন্তু এই চেয়ে বেশী আমি চিন্তায় থাকি যখন ইমিগ্রেশন পাস করি। কোনবারই সমস্যা হয়না, কিন্তু বারবার মনে হয় বলবে আপনার ছবির সাথে চেহারার মিল নাই। কিন্তু প্রতিবারই সুন্দরভাবেই ইমিগ্রেশন পার হতে পেরেছি।

কিন্তু এইবারতো আমার ভয়াবহ অবস্থা, সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা লাইন। ভোর তাই লাইন পুরোই ফাঁকা, যা হোক ইমিগ্রেশনে অফিসার যখন পাসপোর্ট চাইলো, দুরদুর বুকে পাসপোর্ট দিলাম। অফিসার অনেক পাসপোর্ট দেখে বললো ছাড়পত্র দেন, কেন ভারত যাবেন? আমি বলার পরে সিল দিয়ে বললো ঠিক আছে যান। এতক্ষণে হাফ ছেড়ে বাঁচালাম। দিদির কাজ আগেই শেষ তাই সে আমার জন্য অপেক্ষায় ছিলো। সমস্ত ফরমালিটি সম্পন্ন করে আমি আর দিদি স্বল্প সময়ে বিমানে খুবই মজার ভ্রমণটা ৩০ মিনিটে শেষ করে বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম।

বিমানবন্দরে আগেই দিল্লী থেকে খ্রীস্টিন দিদি ও তার স্বামী সঞ্চয় দাদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো আর বিমানবন্দরের বাইরে রুমা দিদি মানে আমার ননদের স্বামী গাইডেন দাদার কলকাতার বন্ধুর গাড়ী ড্রাইভার নুন্দু অপেক্ষা করছিলো। বিমানবন্দরের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে শহরের যাওয়ার উদ্দেশে গাড়ীতে উঠতেই আমার চোখে রাজ্যের ঘুম চলে আসছিলো, মনে হচ্ছিলো বিছানা পেতে দিলে আমি ঘুমিয়ে পড়বো। জোর করে চোখ খুলে রেখেছি যেন স্বপ্নের কলকাতাকে দুইচোখ ভরে দেখতে পাই। অফিসের সময় রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম থাকায় প্রায় ১ঘন্টায় আমাদের জন্য নির্ধারিত হোটেল সামিল্টন এসে পৌঁছালাম।

হোটেল জিনিস রেখে শুরু হলো আমাদের মাকেটিং আর আমার ঘুম যেন বেড়েই যাচ্ছে। যাহোক, দুই দিদি ও দাদার সাথে খুবই আনন্দ করে সারা দিন শপিং ও খাওয়া করলাম। বিকালে গেলাম গাইডেন দাদার বন্ধু অরুণদাদার বাসায়। অরুণদাদার স্ত্রী রুপকথা দিদি কলকাতার খুবই বিখ্যাত মেয়েদের স্কুল লা মার্টিনিয়ার প্রিন্সিপাল। স্কুলের ভিতরে কোয়ার্টারেই তারা থাকেন।

কলকাতায় মানুষ সম্পর্কে আমাদের রিউমার আছে, যে তারা খুবই কৃপণ, অতিথি গেলে খাবার মেপে দেন, কতদিন থাকবে জানতে চান। কিন্তু অনুপম দাদা ও রুপকথা দিদির সংস্পর্শে তিনদিন থেকে দেখলাম মানুষের মন কতটা বড় হয়, ব্যবহার কতটা সুন্দর হয়। আসলে এই দম্পতির গুণের কথা বলে শেষ করা যাবেনা। তাদের আতিথেয়তায় আমার পূর্বের সমস্ত ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনদিন ২৪ ঘন্টার জন্য আমাদেরকে তাদের ব্যক্তিগত গাড়ীটা সাথে নুন্দু ড্রাইভার সাহেবকে দিয়েছে আমাদের ব্যবহারের জন্য। দুইদিন দুই জন শিক্ষককে দিয়েছে

গাইড হিসেবে মার্কেটিং সহযোগিতা করতে। প্রথমদিন আমরা হালকা নাস্তা খেয়ে পরের দিন অর্থাৎ শনিবার দুপুরের খাবার খাওয়ার দাওয়াত খেয়ে বিদায় নিলাম। রুপকথা নামটা যেরকম মধুর দিদি মানুষটা অত্যন্ত ভালো। দিদির হাতের লুচি, আলুর দম, বিরিয়ানী, খাসির মাংস, পাপড় ও আচারে রবিবার দুপুরের খাবারের স্বাদটা মনে পড়লে মনটা আবার কলকাতায় চলে যেতে মন চায়।

রবিবার ছিলো আমাদের কলকাতার শেষদিন। পরের দিন সকালে তারা চলে যাবে দিল্লী আর আমি চলে আসবো বাংলাদেশে। রুমাদিদিকে তাই সকালেই মনে করে দিলাম দিদি আজকে কিন্তু যেকোন ভাবেই মাদার তেরেজা হাউজে যেতে হবে। দিদি বললো আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও মাদার তেরেজা হাউজে অবশ্যই যাবো।

সারাদিন ঘোরাঘুরি শেষে কলকাতায় বিখ্যাত আরসালান রেস্টুরেন্ট এন্ড ক্যাটারার লাঞ্চ করে যখন সন্ধ্যায় মাদার তেরেজা হাউজে গেটে গেলাম, তখন সিস্টাররা সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা করছিলেন। আমরা ভিতরে যেতে চাইলে একজন সিস্টার বললো আজ তো আপনারা ভিতরে যেতে পারবেনা, আজতো সন্ধ্যা হয়ে গেছে কাল আসুন। আমারতো কান্না করে দেওয়ার মতো অবস্থা। রুমা দিদি তখন সিস্টারকে অনুরোধ করে বললো, "দেখুন, সিস্টার আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছে, আগামীকাল ভোরে চলে যাবো, আমাদেরকে অল্প সময়ে যাওয়ার অনুমতি দিলে খুব ভালো হয়।" যাহোক, সিস্টার অনুমতি দিয়ে বললো, তাঁড়াতাঁড়ি চলে আসবেন, কিন্তু কোন ছবি তোলাতে পারবেন না। আমরা খুব দ্রুত সময়ে মাদার তেরেজা থাকার রুম, অন্যান্য রুম দেখলাম। যেখানে সব সিস্টার ও বহিরাগতরা প্রার্থনা করছে আমিও প্রার্থনা করে আমার কষ্ট মনে মনে মাদার তেরেজার কাছে বলেছি, আমার দুইচোখ বয়ে পানি পড়ে যাচ্ছে আর রুমাদিদি আমার কাছে আসলো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে জোরে জোরে কান্না করতে থাকলাম। যখন মাদার তেরেজা হাউজ থেকে বের হয়ে আসলাম আমার মনে একবার পরিস্কার, খুবই প্রশান্তি অনুভব করলাম। বাহিরে এসে রুমাদিদি আমাকে বললো মালা প্রার্থনা রুমে তোমার যেরকম কান্না পেয়েছে আমারও কিন্তু সেইরকম কান্না আসছিলো। কি অদ্ভুত, তাইনা!

পরেরদিন খুবই ভোরে নুন্দুসাহেব আমাদের বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে গেল। কারণ দিদিরা ৭:২০ বিমানে দিলী যাবে। আর অন্য বিমানে আমি বাংলাদেশে চলে আসবো। বিমানবন্দরে দুইদিদি জড়িয়ে ধরে খুবই কান্না করে বিদায় নিয়ে নিজের গন্তব্য চললাম। কিন্তু এই চারদিন দিদি, দাদা ও কলকাতার সবার সাথে কাটানো দিনগুলো সারাজীবন স্মৃতির পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আমার মুম্বাই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

বাতিস্তা এনসন হেমব্রম

আমি অনেক বার বিদেশে গেছি, তবে এটি ছিল আমার প্রথম একা বিদেশ ভ্রমণ। একদিন মনস্থির করলাম, এবার আমি একা ভ্রমণ করতে যাবো এবং সেই ভ্রমণটি হবে ভারতের মুম্বাই শহরে। কারণ মুম্বাই ভারতের অন্যতম উন্নত শহর এবং এখানে বলিউডের অধিকাংশ অভিনেতারা থাকেন। এছাড়াও ভারতের অনেক বিখ্যাত ও ধনী ব্যক্তিরাও মুম্বাইতে থাকে। যেহেতু একজন গ্রামের ছাত্র সেহেতু খুব একটা ঘুরাঘুরির, ছুটি আমি পাই না। তবুও ঠিক করলাম ২০২৪ এর মার্চ মাসে মুম্বাই ঘুরতে যাবো। তাই ভারতীয় ভিসিট ভিসার জন্য আবেদন করলাম এবং ভিসা পেয়েও গেলাম। তখন থেকেই আমি প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম।

আমার পরিকল্পনা ছিল যে, প্রথমে বাসে করে ঢাকা থেকে কলকাতা যাবো, তারপর কলকাতা থেকে ট্রেনে মুম্বাইয়ের উদ্দেশে রওয়ানা দেবো। আমার ট্রেন ছিল শালিমার ষ্টেশন থেকে এবং ট্রেনটি একটি দীর্ঘ যাত্রা হবে ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা এবং আরো অনেক রাজ্য পেরিয়ে মুম্বাই পৌঁছাবে।

ঢাকা থেকে কলকাতা পর্যন্ত বাসে আমি যাত্রা শুরু করলাম। বাসের যাত্রা একটু দীর্ঘ হলেও, পথে দেশের নানা জায়গা দেখতে দেখতে সময়টা কাটলো। কলকাতা পৌঁছানোর পর, আমি বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী ট্রেন যাত্রার প্রস্তুতি নিলাম। কলকাতা থেকে মুম্বাই যাওয়ার ট্রেন ছিল বিশাল এবং আরামদায়ক, তবে এটা ছিল অনেক ঘন্টা ধরে চলা এক দীর্ঘ যাত্রা। প্রথমবারের মতো ট্রেনে দীর্ঘ সময় বসে থাকা, রাজ্যের প্রতি রাজ্য পেরিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা খুবই রোমাঞ্চকর ছিল। দেশের নানা অঞ্চলের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, ছোট ছোট গ্রাম, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতি দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

যাত্রার পথে বিভিন্ন শহর এবং রাজ্যের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার সুযোগ হয়েছিল। ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা ও অন্যান্য রাজ্যগুলোর মধ্যে পারাপার করার সময় আমি সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করলাম। ট্রেনের জানালা দিয়ে যখন মাটি ও আকাশের সীমাহীন দৃশ্য দেখছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করেছি।

মুম্বাইতে, আমি প্রথমে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া দেখতে গেলাম। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই স্মৃতিসৌধটি ব্রিটিশদের ভারতের শাসন শেষ হওয়ার পর তৈরি করা হয় এবং এটি মুম্বাইয়ের অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র। সেখানে দাঁড়িয়ে ভারতের ইতিহাসের এক অমলিন অধ্যায় অনুভব করলাম।

এরপর মুম্বাইয়ের আরও অনেক বিখ্যাত জায়গায় গেলাম। মেরিন ড্রাইভের সমুদ্রতীর ছিল আমার ভ্রমণের একটি বিশেষ মুহূর্ত। সমুদ্রের নীল জল, মুম্বাই শহরের অদ্ভুত আলো এবং বাতাসে মিশে থাকা এক অন্যরকম অনুভূতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মনে হচ্ছিল মুম্বাইয়ের এই নিরবতা ও প্রাণবন্ত জীবনধারা এক অন্য জগৎ।

পরে আমি জুহু সৈকতেও গিয়েছিলাম। জুহু সৈকত মুম্বাইয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকতগুলোর একটি। এখানে অনেক মানুষ সকাল-বিকেল হাঁটতে আসে এবং যারা সমুদ্রের কাছাকাছি কিছু সময় কাটাতে চান, তাদের জন্য এটি আদর্শ স্থান। সৈকতের নরম বালি এবং ঠান্ডা সমুদ্রের পানি ছিল খুবই প্রশান্তিদায়ক। সেখানে কিছু সময় কাটানোর পর মনে হচ্ছিল, এই শহরটা যেন এক আধুনিক এবং পুরোনো বিশ্বের এক মিশ্রণ। এছাড়া মুম্বাইয়ের বিখ্যাত খাবার বড়া পাও আমার খেতে খুব সুস্বাদু লেগেছে। যেহেতু আমি একজন ইংরেজি ভার্সনের ছাত্র তাই তাদের ইংরেজি ও তাদের হিন্দি বলতে ও বুঝতে কোন অসুবিধাই হয়নি।

মুম্বাইতে ১০ দিন কাটানোর পর, আমি আবার ট্রেনে করে কলকাতায় ফিরে আসলাম। কলকাতা পৌঁছে আবার বাসে করে ঢাকা ফিরে এলাম। এটি ছিল একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা, যেখানে আমি শুধুমাত্র দেশের বিভিন্ন জায়গা দেখিনি বরং ভারতের একটি বড় শহরের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনও অনুভব করেছি।

এই ভ্রমণের মাধ্যমে আমি অনেক কিছু শিখেছি। প্রথমত, একা ভ্রমণ আমাকে আত্মবিশ্বাসী এবং স্বাধীন করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হওয়া আমাকে জীবনে অন্যভাবে দেখার সুযোগ দিয়েছে। তৃতীয়ত, মুম্বাইয়ের মত একটি মহানগরের দ্রুততা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাকে চমকে দিয়েছে।

এছাড়া, ট্রেনে দীর্ঘযাত্রা আমাকে প্রকৃতি এবং পৃথিবী সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। একেবারে মানুষদের সাথে কথা বলা, তাদের জীবনযাত্রার কাহিনী শোনা ও দেখা এগুলো ছিল এক অমূল্য অভিজ্ঞতা। এভাবে, আমার প্রথম একা বিদেশ ভ্রমণ শেষ হলো, কিন্তু সেই যাত্রার স্মৃতিগুলো আজও আমার মনকে আলোড়িত করে।

একজন 'লবদিদি' হয়ে ওঠার কথা

ফাদার সঞ্জয় ইগ্নাসিউস চিসিম

মিসেস লবদিনী চিসিম, পিতা মৃত নবেন্দ্র পাস্কাল ম্রং এবং মাতা শর্মিলা এলিজাবেথ চিসিম। মরিয়মনগর ধর্মপল্লীর অধিনস্থ পশ্চিম গজারীকুড়া গ্রামে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক সূত্রে তিনি মি. প্রমোদ প্লাসিড রেমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাদের সংসারে একজন কন্যা সন্তান রয়েছে। সম্প্রতি পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক তিনি বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হন, যে সম্মাননার নাম *'Pro Ecclesia et Pontifice'*। তার বিশেষ কোন্ কাজের জন্য পুণ্যপিতা তাকে এই সম্মাননা দিয়েছেন? সমাজে ও মণ্ডলীতে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে কী অবদান রেখেছেন, সে সম্পর্কে ক্ষুদ্র পরিসরে এই লেখনীতে তুলে ধরা হলো।

মণ্ডলীর এই সম্মাননা কাদের জন্য ও কী উদ্দেশ্যে

'Pro Ecclesia et Pontifice' এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় এরকম: 'Pro Ecclesia' (For the Church), 'et Pontifice' (For Pope)। এর বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় "মণ্ডলীর জন্য এবং পোপের জন্য,"। অর্থাৎ মণ্ডলী ও পোপের জন্য যে সকল নর নারী উল্লেখযোগ্য সেবাকাজ করেন, বিশেষত মণ্ডলীর প্রৈরিতিক কর্মে, বিশ্বাস বিস্তারে, পরিবার ও সমাজের উন্নয়ণে যারা বিশেষ অবদান রাখেন, তাদের সেই নিঃস্বার্থ সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা দেওয়া হয়। এই সম্মাননা প্রদানের রীতি শুরু হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপ ত্রয়োদশ লিও কর্তৃক। সেই বছরের পর পরবর্তীতে সংস্কার করে, সংশোধন ও পরিমার্জন করে বর্তমান রূপে আনা হয়। আর এই সংশোধন ও পরিমার্জনে পুণ্যপিতা ষষ্ঠ পৌল, পুণ্যপিতা দ্বিতীয় জন পল এবং সর্বশেষ পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এটি মূলত স্বর্ণের তৈরি একটি ক্রুশাকৃতির মেডেল, যার কেন্দ্রে বা মধ্যস্থলে প্রেরিতদূত পিতর ও পৌলের প্রতিচ্ছবি খোদাই করা আছে এবং ক্রুশের দু'পাশে ডানে ও বায়ে লেখা রয়েছে *'Pro Ecclesia'* ও *'et Pontifice'*। মিসেস লবদিনী তেরেজা চিসিম, যিনি সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে আসছেন, মণ্ডলীর সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের মানুষকে, বিশেষত পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে বলীয়ান ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে নিরলস সেবা দিয়ে আসছেন। এমন একজন স্বার্থহীন, নির্লোভ, নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে পোপীয় এই সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে মণ্ডলী আজ আবারো প্রমাণ করলো যে মণ্ডলী সর্বদাই তাদের সঙ্গে, তাদের পাশে থাকে যারা সত্যিকার অর্থেই হৃদয় থেকে মণ্ডলীর ত্রাণকর্মে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকতে সচেষ্ট থাকেন।

মিসেস লবদিনী একজন আদর্শ ক্যাটেখিস্ট, আদর্শ শিক্ষক

৯ ভাইবোনের মধ্যে তিনিই সবার বড়। পরিবারের প্রথম সন্তান হিসেবে তার কাঁধের ওপর সংসারের দায়ভার ন্যস্ত হয় অল্প বয়সেই। এই কারণে তিনি নিজে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু, কলেজ জীবনে পদার্পণ এর আগেই সংসারের হাল ধরার জন্য, ছোটভাইবোনদের ভরনপোষণ ও দেখাশুনা করার জন্য পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবাকে সাহায্য করার জন্য হাল ধরেন। সেই থেকে শুরু তার জীবন সংগ্রাম, সামনের দিকে এগিয়ে চলার অদম্য যাত্রা। এরই মধ্যে প্রমোদ পাস্কাল রেমার সাথে তার বৈবাহিক বন্ধন। তাদের কোল আলো করে একমাত্র মেয়ে লিপা চিসিম এর আবির্ভাব। ১৯৭৭ থেকে সেই উনার কর্মজীবন শুরু একজন সাধারণ ক্যাটেখিস্ট হিসেবে, আজ অবধি সেই সেবা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন নিঃস্বার্থভাবে। অতি অল্প পারিশ্রমিক, কিন্তু, অসাধারণ তার নিবেদন ও দায়বদ্ধতা। দায়িত্বে পালনের ক্ষেত্রে উনার আন্তরিকতা, একাগ্র নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা অসাধারণ, অকল্পনীয় উনার মানসিক শক্তি।

তৎকালীন সমাজব্যবস্থা নারীদের প্রতিকূলে ছিল। ঘরের চারদেয়াল অতিক্রম করা যেখানে কঠিন ছিল, সেই সমাজ ব্যবস্থায় অবস্থান করে একজন অল্পবয়সী নারী হয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক পাড়া থেকে আরেক পাড়া ঘুরে মিসেস লবদিনী শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে গেছেন। তিনি পরিবার পরিদর্শন করে শান্তি ও ঐক্যের বাণী শুনিয়েছেন। যে পরিবারে দাম্পত্য কলহ, অশান্তি বিরাজমান, সেই পরিবারে গিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুণর্মিলণের কাজ করেছেন, একতার সূতোয় আবার বেঁধে দিয়েছেন। নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনায় সহায়তা সহ নানাবিধ কাজেও তিনি সমানতালে ব্যাপৃত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা, প্রার্থনানুষ্ঠান, রবিবাসরীয় প্রার্থনা, বাইবেল সহভাগিতা প্রভৃতির আয়োজন করেছেন। ছেলেমেয়েদেরকে প্রস্তুত করেছেন পবিত্র সাক্রামেন্ত এর জন্য। মণ্ডলীর শিক্ষা ও নির্দেশনা তিনি যেমন নিজের জীবনে পালন করেছেন তেমনি, অন্যদেরকেও মণ্ডলীর যথার্থ শিক্ষা দান করেছেন। মাণ্ডলিক শিক্ষা, আইন কানুন, ও নির্দেশনা পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অবিচল, অনড় ও দায়বদ্ধ। মাণ্ডলিক শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কোন অপব্যখ্যা, ভ্রান্ত মতবাদ, ও অপচর্চা মোকাবেলায় তিনি কোন কম্প্রোমাইজে যেতেন না। ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশীয় যে কোন পালকীয় কর্মশালা, সভা সেমিনার, মিটিং এ তার সরব উপস্থিতি মণ্ডলীর প্রতি তার আনুগত্যকেই প্রকাশ করে। সুতরাং, বলাই বাহুল্য যে, মিসেস লবদিনী চিসিম ছিলেন মণ্ডলীর শিক্ষার ধারক ও বাহক, একনিষ্ঠ সেবক ও রক্ষক।

সমাজসেবার উজ্জ্বল আদর্শ মিসেস লবদিনী চিসিম

তিনি গারো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একজন সদস্য হয়েও তার সমাজসেবার পরিধি সর্বস্তরের, সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের ও

গোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপৃত। এলাকায় তিনি একনামে পরিচিত, তিনি সবার "লবদিদি"। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলিম- সকলের কাছেই তিনি 'লবদিদি' নামেই সুপরিচিত ও গ্রহণযোগ্য। মূলত এটি সম্ভব হয়েছে তার বিনম্রতা, সহৃদয়তা, কোমলতা ও সকলের প্রতি সমান মনোযোগীতার কারণে। ওনার কাছে যে কেউই আসেন না কেন, তিনি সকলের জন্য সময় দিতেন, পরামর্শ দিতেন, দিক নির্দেশনা দান করতেন, হাস্যমুখে সকলের কুশল বিনিময় করতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি অন্যের সুখ, দুঃখের, আনন্দের কথা শুনতেন, এবং সম্ভব হলে, সাধ্যানুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়ে স্কুলে ভর্তি করিয়ে শিক্ষার পথ করে দিয়েছেন পিতৃ-মাতৃ হারা অনেক অনাথ ছেলেমেয়েকে। দরিদ্র, অসহায়, পিছিয়ে পড়া মা ও মেয়েদেরকে আশ্রয় দিয়ে, আর্থিক সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে দেখিয়েছেন সামনে এগিয়ে চলার পথ, পুনঃজাগ্রত করেছেন তাদের জীবনের আশা।

প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুশীলনের স্বপক্ষে মিসেস লবদিনী ছিলেন সর্বদাই অগ্রগামী। শিশুরা যারা আগামী দিনের ভবিষ্যত, যারা আগামী দিনের পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রের কাণ্ডারী, তারা যেন নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে নিয়মিত সেগুলো অনুশীলনে ব্রতী থাকে, নিজের ভাষায় শিক্ষা অর্জন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে মিসেস লবদিনী শিশুদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। ক্যাটেখিস্ট হিসেবে লবদিদিকে প্রায়শই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামগুলোতে যেতে হতো। তাই তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই মায়েদের, বোনদের, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের আলোকে তাদের দিক নির্দেশনা ও শিক্ষা দান করেন। তিনি যেন পিছিয়ে পড়া নারী জাতির অগ্রপথিক, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। অন্যায়, অশুভ শক্তি, মিথ্যাচারিতা, হঠকারিতা, দুর্নীতি, অন্যায্যতার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার তার কণ্ঠ, তার পদক্ষেপ। সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, কোমলতা, ন্যায্যতা, সহানুভূতিশীলতা, সহমর্মিতাই তার এক একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। তিনি স্বপ্ন দেখেন আমাদের দেশ, রাষ্ট্র, পরিবার ও সমাজ একদিন হয়ে উঠবে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, সকল ধর্মের, বর্ণের, স্তরের মানুষের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দেশ। ব্যক্তিজীবনে, আজীবন এই সাম্যের, সম্প্রীতির, ঐক্যের, শান্তির গান করেছেন, কাজ করে এসেছেন। আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ তিনি চালিয়ে গেছেন নিজের এলাকায়, আশপাশের সকল মানুষের ও ধর্মের লোকদের সাথে। তাই নির্লোভ, নিবেদিতপ্রাণ সাধারণ লবদিনী চিসিম হয়ে উঠেছেন সকলের প্রিয় লবদিদি'তে।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও যাজকীয় আহ্বান পরিচর্যায় নিবেদিতপ্রাণ লবদিদি

জন্মসূত্রে লবদিনী শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী থানাধীন সাধু জর্জের ধর্মপল্লী, মরিয়মনগর এর সাধারণ একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী। মরিয়মনগর ধর্মপল্লীর অধিনস্থ পশ্চিম গড়ারিকুড়া গ্রামের বাসিন্দা হয়েও তিনি সমগ্র ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ছোট বড় সবার কাছে সমানভাবে সুপরিচিত। মণ্ডলীর শিক্ষার প্রতি তিনি শুধুমাত্র অনুগতই ছিলেন না, বরং সেই সত্য শিক্ষা পালনেও তিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস পরিচর্যায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ সেবিকা। এমনকি, মণ্ডলীর প্রৈরিতিক কর্মে, দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজের জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে সেমিনারীতে, ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করাতেন, সেমিনারীতে, গঠন জীবনে শিক্ষালাভে, যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে এগিয়ে যেতে, তাদের পথ সুগম রাখতে তিনি সর্বদা তাদের খোঁজ খবর রাখতেন। অর্থাভাবে কোন সেমিনারীয়ান, কিংবা ব্রাদার, সিস্টার প্রার্থী যেন গঠনগৃহ থেকে বের হয়ে না আসে, সেদিকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। উল্লেখ্য, মরিয়মনগর ধর্মপল্লী থেকে যতজন ফাদার, সিস্টার হয়েছেন, সবার জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে লবদিদির। তার নিজের ছোট ভাই ফাদার যোসেফ চিসিমকে সেমিনারীতে তিনিই পাঠিয়েছেন, তার যাবতীয় খরচ, ব্যয়ভার বহন করেছেন। ইতোমধ্যে মরিয়মনগর ধর্মপল্লী থেকে ফাদার হয়েছেন আটজন, সিস্টার হয়েছেন সাতজন। প্রত্যেকের জীবনের সাথেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। কাউকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে, কাউকে পরামর্শ দিয়ে, কাউন্সিলিং দিয়ে লবদিদি প্রত্যেককে আহ্বান জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তাই, তিনি ফাদার, সিস্টার কিংবা কোন গঠনগৃহের পরিচালক না হয়েও, মণ্ডলীতে যাজকীয়, ব্রতীয় জীবনে আহ্বান যেন বৃদ্ধি পায়, যুবক যুবতীরা যেন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার হতে উৎসাহিত হয় তার জন্যেও নিরলস কাজ করেছেন।

আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ জননী লবদিনী চিসিম

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মি. প্রমোদ প্লাসিড রেমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের একমাত্র সন্তান লিপা চিসিম। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কেউ সুখী না হলে অন্য কারো মাঝে সুখ বিলাতে পারেন না; নিজের জীবনে ও পরিবারে একতা ও শান্তি না থাকলে অন্য কোন পরিবারে কেউ একতা ও শান্তির পথ দেখাতে পারেন না। লবদিনি তার বহুমাত্রিক সেবাকাজ সফলভাবে, নির্বিঘ্নে করে যেতে পেরেছেন কারণ নিজের পরিবারেই প্রথমত একতা, শান্তি, সুখ নিশ্চিত করেছেন। নয়ভাই বোন এর সংসার তিনি আগলিয়ে রেখেছেন, স্বামী ও সন্তানের প্রতি সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন, সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিত করেছেন, যে একমাত্র সন্তান নিজেও সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে কলেজের অধ্যাপক হিসেবে মায়ের আদর্শ অনুসরণ করে মায়ের মতো করেই শিক্ষার আলো বিলানোর কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাদের পিতার মৃত্যুর পরেও, সকল ছোট ভাইদেরকে নিজের সন্তানের মতো আগলে রেখেছেন এবং এখনও রাখছেন। বাইরের কোন ধরণের অশুভ শক্তি, হিংসা-প্রতিহিংসার আগুনের আঁচ তাদের একান্নবর্তী যৌথ পরিবারকে দূষিত করতে দেন নি তিনি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, লবদিনী বাবা মায়ের

আদর্শ সন্তান, পরিবারে আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ জননী। মণ্ডলীর এমন একজন বিশ্বস্ত সেবিকা, আদর্শ স্ত্রী ও জননী, আদর্শ শিক্ষক ও সমাজসেবক, বিশ্বাসের ধারক ও বাহক, আহ্বান এর প্রতিপালিকাকে পোপীয় দপ্তর থেকে তার বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র সেবাদান ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে কাথলিক মণ্ডলী তার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরে কাথলিক মণ্ডলীও কৃতার্থ ও আনন্দিত।

এবার যাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে, সেই লবদিদির অনুভূতি, বিশ্বাস পরিচর্যায় ও নারীদের অগ্রযাত্রায় তার দিক নির্দেশনা, তথা তার জীবন, সমাজ, ও মণ্ডলী বিষয়ক ভাবনার কথা উনার মুখেই শ্রবণ করি। তার ব্যক্তিগত অনুভূতি, তার ভাবনা, চিন্তা, দর্শন ও স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে ছুটে গিয়েছিলাম তারই আবাসে। তার কথা ও অনুভূতি তার মুখেই শোনা যাক:

১) লবদিদি'র অনুভূতি:

বিগত ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, সাধু জর্জের ধর্মপল্লী মরিয়মনগর খ্রিস্টরাজার মহাপার্বণের ওয়ানগালা অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্রথমত, সেই খ্রিস্টরাজাকে নতশিরে প্রণামসহ ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি। এই সুন্দর পর্বের দিনে ময়মনসিংহ ধর্শপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি (যিনি গারো জাতির প্রথম বিশপ) ওয়ানগালার খ্রিস্টযাগের পর জনসমাবেশে পোপীয় দপ্তর কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা প্রদানের বার্তাটি ঘোষণা করেন। সেই মুহূর্তে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি, যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সাথে সাথে আমি আমার অতীত স্মৃতিগুলো মনে করেও অনেক কিছু ভাবছিলাম। মনের ভেতরে সেই মুহূর্তে এই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল যে, আমি আসলে এই স্বীকৃতির যোগ্য নই; কোন কিছু প্রাপ্তির আশায় বা এ্যাওয়ার্ড লাভের আশায় মণ্ডলীতে, সমাজে কাজ করিনি। আমি আমার ভালোলাগা, ভালোবাসার জায়গা থেকে মণ্ডলী ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আজীবন কাজ করেছি এবং এখনো পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তবুও এই অযোগ্য আমাকে পুণ্যপিতার দপ্তর থেকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে, সেই জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই বিশেষক্ষণে, আমি আমার সহযাত্রী সকল শিক্ষক, অতীত ও বর্তমানের সকল পাল পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, আমার আচ্চু-আম্বি (নানা-নানী), আমার স্বর্গীয় বাবা, আমার স্বামী (মৃত), আমার পরিবার, ও আত্মীয়স্বজনসহ-সকলকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি; কারণ তাদের সকল সহযোগিতা, সমর্থন, প্রার্থনা ও আশির্বাদ, এবং অনুপ্রেরণার জন্যেই আমাকে মণ্ডলী ও সমাজে সেবামূলক কাজ করতে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। যারা আমাকে এযাবৎ কাজে কর্মে উৎসাহ দিয়ে গেছেন- শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয়, পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের প্রাক্তন ও বর্তমান প্রভিন্সিয়াল এবং অসংখ্য পালপুরোহিতগণ, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ২৪ শে নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. দিনটি সত্যিই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার জীবনের ইতিহাসের পাতায়। পরম করুণাময় ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন- এই শুভকামনা নিরন্তর।

২) নারী আগ্রযাত্রায় আমার চিন্তা, ভাবনা ও কিছু পরামর্শ

আমাদের গারো খ্রিস্টীয় সমাজে ও পরিবারে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে নারীরা। সে মা, দিদি, মাসি যেই হোক না কেন, প্রথম পর্যায়ে তা নারীকেই পালন করতে হয়। একজন নারীকে পরিবারের সন্তান ভরণপোষণ, সংসার সামলানো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সব কিছুরই ধারণা দিতে হয়। সেই জন্য নারীকে সকল শিক্ষায় ও গুণে গুণান্বিত হতে হয়। সাংসারিক যাবতীয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েদেরকে প্রার্থনা, শিশু সমাবেশে, ধর্মীয় সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে এবং নিজেরাও অংশগ্রহণ করতে সদা সচেষ্ট থাকতে হয়। শিশুদেরকে ঐসকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাতে পারলে আমরা আশাবাদী যে, মণ্ডলীর সেবার জন্য অনেক সাধারণ খ্রিস্টভক্তও মণ্ডলীর সেবাকাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত হবে।

৩) সিনোডীয় মণ্ডলী হয়ে উঠার প্রক্রিয়ায়, মণ্ডলীর প্রেরণা- 'মিলন, প্রেরণ ও অংশগ্রহণ'-এ নারীরা কিভাবে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারে?

মণ্ডলীর মিলন, প্রেরণ ও অংশগ্রহণমূলক সিনোডীয় মণ্ডলী গঠনে নারীরাও এগিয়ে আসবে, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। তাদেরকে মারীয়া সেনাসংঘ, মনিকা সংঘ- প্রভৃতির কার্যক্রমে আরও তৎপর হতে হবে। ধর্মপল্লীভিত্তিক বিভিন্ন প্রার্থনানুষ্ঠান, সভা সেমিনারে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য ধর্মপল্লীভিত্তিক বিচিত্র কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। মাঝে মাঝে অসহায় নারীদের পরিবার পরিদর্শন করতে হবে, অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত, বৃদ্ধ মায়েদের পরিদর্শন, তাদের বাড়িতে প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, প্রভৃতির আয়োজন করলে তারা আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে অপরিমেয় শক্তি ও সাহস পায়। তাই এ ধরণের কার্যক্রম সর্বদা সরব রাখতে হবে। আমি মনে করি, পরিবারে মায়ের ও স্ত্রীদের ভূমিকাই প্রধান। কারণ একজন নারী পরিবারে স্ত্রীর ভূমিকা পালনের পাশাপাশি মায়ের ভূমিকাও পালন করে। তাই আমি মনে করি, সর্বপ্রথমে তার দায়িত্ব, বা ভূমিকা বিশ্বস্তভাবে পালন করা, একজন আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা হয়ে উঠার সাধনা প্রত্যেক নারীকেই করতে হবে। বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী, আমরা বর্তমান যুগের মায়েরা সন্তানদের ঘিরে অনেক উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠছি, সেই কারণে আমাদের সন্তানদেরকে যান্ত্রিক করে তুলছি, যার কারণে আমাদের সন্তানেরা, তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, চেতনা হারাচ্ছে, দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। তাই পরিবারে একজন নারীকেই আদর্শ মায়ের ভূমিকা পালন করতে হবে যেন তার সন্তান আপন বিশ্বাসে, নৈতিকতায়, মূল্যবোধে, দায়িত্ববোধে, দায়বদ্ধতায়, সুশিক্ষার চেতনা, মনুষ্যত্বে- সব দিক দিয়ে বলীয়ান হয়ে উঠে। একজন আদর্শ বিশ্বাসী, উন্নত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অধিকারী মা-ই পারে তার সন্তানকে আদর্শ ও সমুন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তুলতে। তাই সকল মায়েদের, স্ত্রীদের প্রতি আহ্বান রইল: **আপনার সন্তানদেরকে আপন বিশ্বাসে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে শিক্ষা দান করুন, নিজে হাত ধরে সন্তানদেরকে গির্জায়, প্রার্থনানুষ্ঠানে, সভা সেমিনারে নিয়ে গিয়ে, ধর্মপল্লীর সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলুন।** আমি আশাবাদী, এতে করে আমাদের সন্তানেরাই হয়ে উঠবে আমাদের শক্তি ও প্রেরণা, আশা ও প্রত্যাশার কাণ্ডারী।

শেষ কথা

২০০২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের শ্রেষ্ঠ শিশু এনিমেটর নির্বাচিত হন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজে, নারীদের অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'জয়িতা'- সম্মাননা লাভ করেন। আর তিনি লাভ করলেন কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের জন্য সর্বোচ্চ সম্মাননা Pro Ecclesia et Pontifice। তার সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অর্জিত সকল সম্মাননা এই সত্যই তুলে ধরছে যে, ভালো মানুষের ভালো কাজের স্বীকৃতি ও কদর এই পৃথিবী দেবেই। মিসেস লবদিদি চিসিম সেই অতীব ভালো মানুষদেরই একজন, যিনি তার কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। আর এই ভালো মানুষটিকে মণ্ডলী ও সমাজের সকল স্তরের মানুষদের প্রতি তার বিচিত্র সেবাকাজের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা দিতে পেরে কাথলিক মণ্ডলীও আনন্দিত ও কৃতার্থ। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর অসংখ্য পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে মিসেস লবদিনী চিসিমকে অভিনন্দন।

সময়ের আলোকিত ব্যক্তিত্ব গাব্রিয়েল কস্তা

সুমন কোড়াইয়া

সমাজে কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব থাকেন যাদের দেখলেই সকলে সম্মান করেন। তার নিকট হতে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তেমনি একজন ব্যক্তি নাটোরের বড়াইগ্রামের কালিকাপুর গ্রামের গাব্রিয়েল কস্তা। তার এক অঙ্গের অনেক রূপ। তিনি কর্ম জীবনে একাধারে ছিলেন শিক্ষক, সমবায়ী কর্মী ও নেতা এবং উন্নয়ন কর্মী।

সাতাত্তোর বছর বয়সী নীরব কর্মী হিসেবে খ্যাত গাব্রিয়েল সেবা দিয়েছেন চোখ বন্ধ করে, কী পাবো কী পাবো না সেটা কখনো চিন্তা করেননি। তবে তার অবদানের জন্য তিনি তার সহকর্মী, প্রাক্তন ছাত্রদের যেমন ভালোবাসা পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন সমাজ থেকে স্বীকৃতি। খ্রিস্টমণ্ডলী ও পোপের জন্য সেবা কাজের স্বীকৃতি হিসাবে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কতৃর্ক পোপীয় সম্মাননা "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE " সম্মানে ভূষিত হন ২৩ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।। ("For the Church and Pope") also known as the Cross of Honor, the highest honor the Pope can give to Catholics. এই সম্মাননাটি দেশের হাতে গোণা কয়েকজনই পেয়েছেন। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিনিই হয়ত প্রথম। এছাড়া শিক্ষকতা জীবনে সততা ও পরিশ্রম এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজকে উন্নয়নের আলোতে আলোকিত করার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা কাউন্সিল সম্মাননা ২০০৭-এ ভূষিত হন তিনি।

কথোপকথনে তিনি জানিয়েছেন তার পিতা মৃত আগষ্টিন কস্তা ও মাতা মৃত: মাগ্দালেনা রোজারিও। তার জন্ম হয়েছিল ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হারবাইদ ধর্মপল্লীর গোয়ালগাও গ্রামে। তার পিতামাতার সাথে তিনি ১৯৫০ বা ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বড়াইগ্রামের কালিকাপুরে স্থানান্তরিত হন। তিনি পবিত্র বিবাহিত বন্ধনে আবদ্ধ হন। বীনা পিরিচের সাথে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগষ্ট। তার রয়েছে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। কর্মজীবনে বেশির ভাগ সময় তার কেটেছে পরিবার হতে দূরে, ফলে সে সময় স্ত্রী সন্তানরা পাননি তার সান্নিধ্য। সেটার জন্য রয়েছে তার আফসোস।

শৈশব থেকেই তার ছিল পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক। তাকে তার পিতা-মাতা কখনো বই পড়তে বসতে বলেননি তিনি নিজেই পড়াশোনা করতেন। তিনি পড়াশোনা করেন দিনাজপুরের সেন্ট ফিলিপস হাইস্কুলে

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মাধ্যমিক পাস করেন বান্দুরার গোবিন্দপুর হলিক্রস হাইস্কুল থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এরপর পড়াশোনা করেছেন খুলনায় ব্রজলাল কলেজে ও পরে ঢাকা কলেজে। তিনি বিএড করেন রাজশাহীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে। এছাড়া তিনি এমএ করেন লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে।

তিনি বলেন, 'পড়ালেখা করেছি আমি

আনন্দের সাথে। বাবা-মাকে আমাকে কখনো বলতে হয়নি পড়তে বস। আমি নিজের উদ্যোগেই আমার পড়াশোনা করেছি।'

গাব্রিয়েল কস্তা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কর্মজীবন শুরু করেন বড়াইগ্রামের বনপাড়ার সেন্ট যোসেফস্ হাইস্কুলে ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তীতে ইংরেজী শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক এর দায়িত্ব পালন করেন সেই স্কুলটিতে। তখন দিনাজপুর ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ একই ধর্মপ্রদেশ ছিল। তিনি ১৯৮৬ -১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের শিক্ষা কমিশনে সেক্রেটারী ও স্কুল সুপারিটেন্ডেন্ট হিসেবে দক্ষতার সাথে ৯ বছর সেবা দিয়েছেন। তার কর্মদক্ষতা, সততা দেখে তৎকালীন রাজশাহীর বিশপ পৌলিনুস কস্তা তাকে কাথলিক বিশপদের সামাজিক সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশের রাজশাহীর আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন। এই গুরু দায়িত্বে তিনি ছিলেন নয় বছর।

তিনি মিষ্টি হেসে বলেন, 'আমি খুব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছি। কিন্তু কখনো কোথাও চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে হয়নি। আমাকে সব জায়গাতে ডেকে নিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি নিজের সবটুকু উজার করে দিতে।'

কারিতাসে তার কর্মজীবন শেষ হওয়ার পর তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বড়াইগ্রামের বোর্ণী ধর্মপল্লীর সেন্ট লুইস হাইস্কুলে। তিনি সেই দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করেন তিন বছরের অধিক সময়। এরপর তিনি নিজ গ্রাম কালিকাপুরে চলে আসেন। সেখানেও তিনি বসে থাকতে পারেননি। সেন্ট পিটার্স একাডেমীতে তাকে অনুরোধ করা হয় এডমিনিস্টেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে। তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন ছয় বছরের মতো। এর পর তিনি পুরো সময় দিয়েছেন পরিবার, সন্তান ও নাতি-পুতিদের।

তিনি বলেন, আমি যখনই যে দায়িত্ব পেয়েছি, চেষ্টা করেছি সঠিকভাবে করতে। ফলে কর্তৃপক্ষ সব সময় আমার কাজে সন্তুষ্ট ছিল। এভাবে অনায়াসে আমি কর্মজীবন শেষ করেছি ও উপভোগ করেছি।

তিনি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পোপের নিকট থেকে PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

সম্মাননা পেয়েছেন, এই সম্মাননা পাওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করে তিনি বলেন, **'আমি তো আর সম্মাননা বা পুরস্কারের জন্য কাজ করিনি। সমাজের মানুষের জন্য কাজ করেছি। সেটার স্বীকৃতি হিসেবে আমাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তাই আমি খুব খুশি হয়েছি।'**

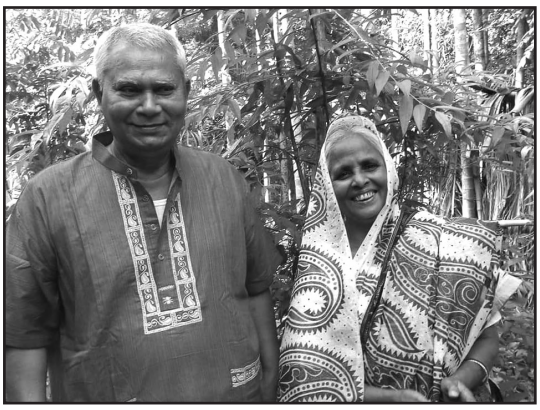

যুব সমাজ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি দেখি বর্তমান যুবকদের মধ্যে অনেক প্রতিভা। তাদের প্রতিভা ধরে রাখতে হবে। নিজেকে শানিত করতে হবে কর্মক্ষেত্রের জন্য, তাহলে তারা যেখানেই চাকরি বা ব্যবসা করুক না কেন তারা সেখানে ভালো করবে।'

তিনি মনে করেন, জেনারেল শিক্ষার পাশাপাশি বর্তমান কিশোর-যুবাদের কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে তাদের এই লাইনে পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা দক্ষ হয় এবং পড়াশোনা শেষে বেকার না থাকে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ বেকার থাকে না বলে তিনি মত দেন।

গাব্রিয়েল কস্তার সামাজিক জীবন বেশ বর্ণাঢ্য। তিনি বনপাড়া মিশন সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন নয় বছরের মতো। এছাড়া বনপাড়া ধর্মপল্লী ওয়াইসিএস এর এনিমেটর হিসেবে যুব গঠনে অবদান রেখেছেন। তিনি তার কর্মজীবনে বড়ো একটা অংশে অবদান রেখেছেন সমবায় অঙ্গণে। তিনি দীর্ঘ সময় বড়াইগ্রামের বনপাড়া খ্রীষ্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সেক্রেটারির (১৯৭৪-১৯৯১) দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সারা বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলোর কেন্দ্রীয় সমিতি ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্‌ব) এর সেক্রেটারি হিসেবে দক্ষতা ও সততার সাথে সেবা দেন ১৯৮৩-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি বনপাড়া খ্রীষ্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ও বরেন্দ্র চলন ক্রেডিট ইউনিয়ন চ্যাপ্টারের সেক্রেটারী হিসেবে সেবা দেন। সমবায় সমিতির ওপর 'মুক্তির সোপান' নামে তিনি একটি বই লিখেছেন যা দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। সমবায় আন্দোলনের এই একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা বলেন, **'আমরা যখন সমবায় সমিতিতে কাজ করেছি, নেতৃত্ব দিয়েছি তখন জণকল্যাণের জন্য কাজ করেছি, নিজে কিছু পাওয়ার জন্য নয়। কিন্তু বর্তমানে যারা সমবায়ের সাথে যুক্ত, তাদেরও এই ধরনের মনোভাব থাকা জরুরি বলে মনে করি।'**

বর্তমান সময়ে সমবায় সমিতিগুলোতে নির্বাচন নিয়ে অর্থ খরচ, বিভক্তি বিষয়ে একজন সমবায়ী নেতা হিসেবে তিনি বলেন, 'ফাদার চার্লস জে ইয়াং ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন এদেশে এনেছিলেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে, আর সেটা হলো মানুষের আর্থিক দীনতার মুক্তির জন্য। তবে আমরা লক্ষ্য করছি, ক্রেডিটের কারণে আর্থিক মুক্তির চেয়ে এর মাধ্যমে অনেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বসান্ত হচ্ছেন। নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল বাড়ছে। যা মোটেও কাম্য নয়। যারা সমবায়ী নেতা, তাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশি করে ভাবা উচিত ও সমাধানের জন্য কাজ করার প্রয়োজন বলে মনে করি।

উল্লেখ্য, তিনি দিনাজপুর ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন সময়ে যুব কমিশনের অধীনে যুব কার্যক্রম ও ট্রেনিং পরিচালনা করেছেন। জাতীয় খ্রিস্টান শিক্ষা কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। দিনাজপুর ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন সময়ে পোষ্ট এসএসসি ও পোষ্ট এইচএসসি কোর্স পরিচালনা করেন। কারিতাস বাংলাদেশে আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে 'কারিতাস বাংলাদেশ' এর সাধারণ পরিয়দ, কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং পে-কমিশনের সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারত, শ্রীলংকা, ব্যাংকক, ইতালি, ফ্রান্স, লন্ডন, নেপাল, ভূটান, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, সিংগাপুর, মালোশিয়া, জার্মানী, গ্রীস সহ বিশ্বের বিভিন্ দেশে সেমিনার ও প্রশিক্ষণ এ অংশগ্রহণ এবং ভ্রমণ করেন।

জীবন সায়াহ্নে এসে গাব্রিয়েল কস্তা, যাকে বনপাড়ায় সবাই স্যার বলে সম্বোধন করে থাকেন, তিনি বসবাস করছেন কালিকাপুর গ্রামে। তার প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অনেকে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবি, সাংসদ ও উন্নয়নকর্মী হয়ে সেবা দিচ্ছেন। রাস্তাঘাটে তাকে দেখলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকে তিনি সম্মান-শ্রদ্ধা পান। সভা সেমিনারে তার স্থান হয় সবার সামনের চেয়ারে।

আমরা শ্রদ্ধেয় গ্রাবিয়েল স্যারের প্রতি তার অবদানের জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বড়দিন
নিপেল কেরীকাম্পু

আসছে সামনে বড়দিন
মনটা হলো রঙ্গিন।
তাইতো আমি বাদ্য বাজাই
তাক-ধিন তাক-ধিন।
প্রভু যিশুর জন্মদিন
চারিদিকে আনন্দের বীন
নাচছে সবাই তালে তালে
তাক-ধিন তাক-ধিন।
পূর্ব আকাশে দেখে তারা
পণ্ডিতেরা হলো আত্মহারা
নয়ন ভরে তাকে দেখে
হলো তারা দিশেহারা।
সোনা ধূপ-ধুনো-মুক্তা-মানিক
সব তারই তরে প্রদান করি
ক্ষমা ও ভালোবাসার বাঁধন গড়ি
আনন্দ-মিলন সেবায়
পরস্পরের হাত ধরি।
স্বর্গালোক-ইহলোক
মেতেছে সবাই জয়গানে
প্রভু যিশুর জন্মদিনে
মিলেছে সবাই প্রাণে প্রাণে।

স্বাস্থ্য কথা

স্বাস্থ্যে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

বাংলাদেশে বর্তমানে ৭০% মৃত্যুর কারণ অসংক্রামক রোগ। নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করলে বেশ কিছু অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য উপকার পাওয়া যায়। যেমন: হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিকস্, ক্যান্সার ইত্যাদি।

এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য:

● কায়িক পরিশ্রম বা নিয়মিত ব্যায়াম করলে হার্ট, শরীর এবং মানসিক বিষয়ে উপকার হয়। এতে উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তের চর্বি কমে।

● কায়িক পরিশ্রম বা নিয়মিত ব্যায়াম করলে, বিষন্নতা বা হতাশা দূর হয়।

● চিন্তাশক্তি বাড়ে এবং বিচারবুদ্ধি ক্ষমতা বাড়ে।

● হাড়ের শক্তি বাড়ে।

● সুনিদ্রা হয়

● বর্তমানে প্রতি ৪ জন যুবক-যুবতীদের মধ্যে মাত্র ১ জন নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করেন, ৩ জন করেন না বিধায় তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশী। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরী, যুবক যুবতী, মধ্যবয়স্কদের মধ্যে মেদবহুলতা বাড়ছে। ৬.২% প্রাপ্তবয়স্করা এদেশে অধিক ওজনসম্পন্ন।

● বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, যারা কায়িক পরিশ্রম, নিয়মিত ব্যায়াম করেন এবং যারা তা করেন না তাদের ২০-৩০% এর অকালে মৃত্যুঝুঁকি বেশি।

● আজকের দিনে প্রায় ৮০% কিশোর-কিশোরী কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করেন না যা ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা প্রকাশ করে।

● ২০০১-২০১৬ এর মধ্যে উন্নত বিশ্বে ৫% মানুষের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম কমেছে, ফলে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়েছে ।

স্বাস্থ্যে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা:

নিয়মিত ব্যায়াম করার ১৫ উপকারিতা:

✓ ওজন নিয়ন্ত্রিত-সুঠাম দেহ-বেশী আয়ু।

✓ কম রোগ। স্বাস্থ্য খাতে ঔষধ ও হাসপাতাল বাবদ খরচ কম ।

✓ শরীরে মাংসপেশী ও হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর উন্নয়ন।

✓ ব্যায়াম শরীরের সক্ষমতা বাড়ায়-বেশী শক্তি দেয়।

✓ পারিবারিক বন্ধন বাড়ায়-যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

✓ ব্যায়াম নির্মল আনন্দ দেয়।

✓ প্রকৃতিতে হাঁটার ফলে শরীরে অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা বেশী হয়।

✓ শরীরে হাড়ের উন্নতি।

✓ উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিকস, বিভিন্ন প্রকারের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমবে।

✓ লেখাপড়ায় মনোযোগ বেশী হবে।

✓ জটিল বিষয়ে সমাধান তাড়াতাড়ি দিতে পারবে।

✓ মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

✓ হতাশা কম হবে।

✓ শরীরে চর্বি কম থাকায় শারীরিক মেদজনিত জটিলতা কমবে।

✓ রাতে ঘুম ভালো হবে।

প্রসূতি মা ও প্রসব পরবর্তী নারী/ মায়েদের এ বিষয়ে উপকার:

● রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

● প্রসূতিকালীন রক্তচাপ ও ডায়াবেটিকসের ঝুঁকি কম হবে।

● প্রসূতিকালীন ওজন বেশী হবে, যা সন্তানের জন্য ভালো হতে পারে।

● সন্তান জন্মদানে জটিলতা কম হবে।

● সন্তান জন্মদানে পরবর্তীতে হতাশা কম হবে।

● সন্তানের জটিলতা কম হবে ।

বসে বসে ক্রমাগত কাজ করার সমস্যা:

● ওজন বেড়ে যাবে। স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়বে এমনকি এর জটিলতায় মৃত্যুও হতে পারে।

● হৃদরোগ হতে পারে।

● ঘুম কমে যাবে।

কায়িক পরিশ্রম ও তা বাড়ানোর উপায়:

❖ হাটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি।

❖ কাজের জায়গায় বা স্কুলে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা।

❖ দলগতভাবে বা পরিবারের সদস্যরা একত্রে ব্যায়াম করা যেতে পারে।

❖ নিয়মিত খেলাধুলার ব্যবস্থা করা বা অংশগ্রহণ করা

❖ ডাক্তাররা তাদের রোগীদের ব্যায়ামের উপকারিতা বলতে পারেন ও তা মনিটরিং করতে পারেন।

❖ চিনিযুক্ত পানীয় কম খাওয়া, বর্জন করা।

❖ সাদা বিষ-চিনি, লবন, ভাত, দুধ, ময়দা, আটা ইত্যাদি সাদা রঙের খাবার না খাওয়া, কম খাওয়া বা বর্জন করা।

আসুন সাদা বিষ বর্জন করি

মেদবহুলতার কারণে যে সকল ক্যান্সার বেশী হয়:

- মূত্রথলির ক্যান্সার
- ব্রেস্ট ক্যান্সার
- অন্ত্রের ক্যান্সার
- জরায়ুর ক্যান্সার
- কিডনির ক্যান্সার
- ফুসফুস বা লাং ক্যান্সার
- পাকস্থলীর ক্যান্সার

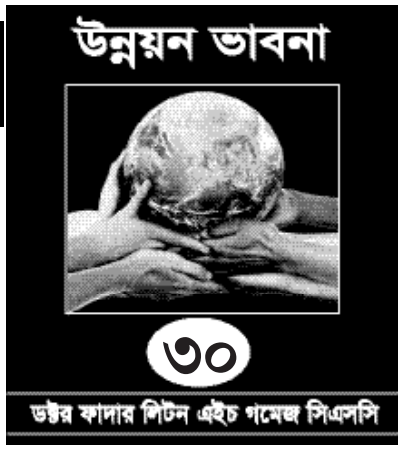

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সংস্কার এবং রূপান্তরমূলক পরিবর্তন

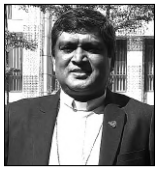

সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরে আসা 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান' যা 'অরাজনৈতিক' কোটা সংস্কার আন্দোলনের চারাটির মহিরুহ রূপ। এ গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম দিক হলো দেশজুড়ে জেন-জে এর আঁকা গ্রাফিতি। আর গ্রাফিতির মধ্যে কিছু কিছু প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল-রাষ্ট্র সংস্কার, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-আদিবাসী আমরা সবাই বাংলাদেশ, শোন মহাজন আমরা অনেকজন, বুক পেতেছি গুলি কর, কল্পনা চাকমা কোথায়?, সমতল মুক্ত হয়েছে, পাহাড় কবে মুক্তি মিলবে, পাহাড় কখন মুক্ত হবে, উই আর ওয়ান, গাহি সাম্যের গান, ছবিতে ছিল মসজিদ-মন্দির-গির্জা-পেগোডা পাশাপাশি, সকলধর্মের একফ্রেমে ছবি ইত্যাদি। যা বৈষম্যহীনতা, সম্প্রীতি, সহযাত্রী হওয়া, একত্রে পথ চলা, ন্যায্যতা, সমতা, গণমঙ্গল, সমদায়িত্ববোধ ও শান্তির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। নটর ডেম কলেজের প্রাচীরে শোভা পাওয়া কিছু গ্রাফিতি আন্তর্জাতিক সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হয়েছে, আরো কিছু গ্রাফিতিও প্রচার হয়েছে।

বিভিন্ন বৈষম্যের সম্মিলনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। খ্রিস্টান ঐতিহ্য মতে, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কোন প্রকার বাধাগ্রস্থ করে না, তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সামাজিক উদ্দেশের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সৃষ্ট সম্পদের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ব্যবহারের নীতি হলো 'সকল নৈতিক ও সামাজিক শৃংখলার প্রথম নীতি' *(ফ্রাতেল্লি তুত্তি-১২০)*। ব্যবসায়িক কার্যক্রম একটি মহৎ আহ্বান যা সম্পদ উৎপাদন এবং আমাদের পৃথিবীকে উন্নয়নের উদ্দেশে পরিচালিত। ব্যবসায়িক নৈপুণ্য হলো ঈশ্বর প্রদত্ত দান, তা সর্বদা সুস্পষ্টভাবে অন্যের উন্নয়নে এবং দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশে পরিচালিত করতে হবে, বিশেষতঃ বহুমাত্রিক কাজের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা *(ফ্রাতেল্লি তুত্তি-১২৫)* এবং গণমঙ্গলের চেতনা বিকাশ করা। আমাদের সামাজিক পরিসরে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে শক্তিশালী ক'রে এমন সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ, আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টি, ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পৃক্ত হওয়া, ক্রেডিট ইউনিয়নে নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন ও গণমঙ্গল অর্থনীতি বিস্তারে সক্রিয় হওয়ার চিন্তা অন্তরে লালন-পালন করা যায়। পোপ ফ্রান্সিস গণমঙ্গল অর্থনীতি বিস্তারের জন্য যুব-যুবতীদের অংশগ্রহণে 'ফ্রান্সিসের অর্থনীতি' নামক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, সেই চেতনা ও কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হওয়ায় সুযোগ এসেছে।

বাংলাদেশে বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সাফল্যের সাথে ষাট বছর অতিক্রম করেছে। বৈষম্যহীন সমাজ গঠন আন্দোলনে দীর্ঘ ষাট বছর সময় অতিবাহিত করে টিকে থাকাই যার এক প্রকার সাফল্য। অন্তরালে যাদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শ্রম, সময়, সৃজনশীল মনোভাব বিনিয়োজিত আছে। সংস্কার হওয়া, সংস্কার করা, বদলে যাওয়া, বদলে দেয়া, উন্নতি সাধন করা বর্তমানে অতি স্বাভাবিক একটি প্রত্যাশা। সংস্কার, বৈষম্যহীনতা এবং দলীয় আক্রোশের কারণে হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের গড়া সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং সদস্যদের কষ্টার্জিত আর্থিক মূলধনে বিনষ্ট করা গ্রহণযোগ্য নয়, যেকোনো মূলে তা প্রতিহত করতে হবে।

সংস্কার ও পরিবর্তনের চিন্তাচেতনা নিয়ে সংগঠন ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় গবেষকগণ সংযোজন করেছেন পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা (Change Management) নামে নতুন চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা। কারণ পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা যেকোন প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান সফলতার একটি অন্যতম অপরিহার্য কর্মকৌশল বা প্রক্রিয়া। সফল পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বিশেষ এক ধরনের সক্ষমতা। প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন ও অনন্য ধরনের দক্ষ নেতৃত্ব ও কৌশলগত পরিকল্পনা দরকার হয়। ক্রেডিট ইউনিয়নের নেতা ও কর্মকর্তাগণ পরিবর্তন ব্যবস্থপনা বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে যাচ্ছেন, তবে প্রতিষ্ঠালগ্নের মূল দর্শন কর্মপ্রচেষ্টা অক্ষুণ্ন রেখে 'ক্রেডিট ইউনিয়ন পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা' নিয়ে গবেষণা বিশ্লেষণে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজ গঠন আন্দোলন যদি হয় ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের জীবনমানের পরিবর্তন, তবে বিশ্লেষক অ্যাকারম্যান অ্যান্ডারসন ও অ্যান্ডারসন ডি. এর 'পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা' (২০০১ খ্রিস্টাব্দ) ধারণার আলোকে পরিবর্তন ধারণা তিন ভাবে চিন্তা করা যায়। যথা: ১. যুগসন্ধিমূলক পরিবর্তন (Transitional Change), ২. উন্নয়নমূলক পরিবর্তন (Developmental Change) ও ৩. রূপান্তরমূলক পরিবর্তন (Transformational Change)। উপর্যুক্ত তিন ধরনের পরিবর্তন ধারণা অনুধাবন করে ক্রেডিট ইউনিয়ন সদস্য, নেতা-নেত্রী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গবেষক-বিশ্লেষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সঠিক ও সৃজনশীল পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা পেতে পারেন।

১) যুগসন্ধিমূলক পরিবর্তন: এক যুগ বা সময় বা পর্যায় থেকে অন্য আরেক যুগ বা সময় বা পর্যায়ের সূচনা। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সনাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার পিছনে রেখে অধিকতর উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের সূচনা হয়েছে। অর্থাৎ এক অবস্থা বা পর্যায় থেকে আরও এক ধাপ উপরে উত্তীর্ণ হওয়া। এ পর্যায়ের পরিবর্তনে অজ্ঞান বা অচেতন থাকা সত্ত্বেও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ-সমাজ-সংগঠনে নতুন

কিছু উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যোগ হয়েছে। কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আমরা হারিয়েছি এছাড়া অনেক ডিভাইস সংযোগ হয়েছে। যেমন: কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মুঠোফোন, ফেইসবুক ইত্যাদি ব্যবহার আয়ত্ত করতে শিখেছি।

২) উন্নয়নমূলক পরিবর্তন: জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি দিক থেকে মানুষের জীবনযাপনের পরিবর্তন, যেমন: অবকাঠামো, খাদ্যাভ্যাস, যোগাযোগ, আবাসন, প্রযুক্তি, এমনকি আচার-ব্যবহার, চিত্তবিনোদন, চলাফেরায় যে নতুনত্ব সংযুক্ত হয়েছে। উন্নত ও আধুনিক ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সদ্ব্যবহার করে নিজেদের উন্নতি বা উৎকর্ষ লাভ করতে শিখেছি। যা মানুষ জীবনযাপনের সাথে আয়ত্ত করে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। এখানে নিজেদের দক্ষতা, পদ্ধতি, গুণগত কর্মনৈপুণ্য অর্জন ও আয়ত্ত করতে অভ্যস্থ হতে হয়েছি। এখানে দুইটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ: ১. আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্যক্তির সক্ষমতা, ২. ব্যক্তির আগ্রহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে যদি তা যুক্তিযুক্ত মনে করে ও ৩. প্রযুক্তি সহজলভ্য হয়, উদ্বুদ্ধ করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩) রূপান্তরমূলক পরিবর্তন: রূপান্তর হলো মৌলিক পরিবর্তন, মানুষের মনের পরিবর্তন, যা ব্যক্তিজীবন ও জীবনযাপনে অন্তর্নিবিষ্ট বা অন্তর্নিহিত পরিবর্তন। রূপান্তরের জন্য সদ্‌জ্ঞান, সক্ষমতা, দক্ষতা, মনোভাব ও কর্মপ্রচেষ্টা আবশ্যক। এটা মানুষের গোটা জীবনে এক পর্যায় থেকে অন্য এক উৎকর্ষ ও মৌলিক পর্যায়ে পদার্পণ করা। রূপান্তরের জন্য ব্যক্তিকে তার চারপাশের মানুষ, চলমান ব্যবস্থা, তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে পূর্ণ সজ্ঞান ও সচেতন মনন থাকতে হবে। এখানে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। প্রথমত, রূপান্তরিত পরিবর্তন হতে হবে মানুষের জন্য মানব মনের রূপান্তর; দ্বিতীয়ত, আর্থিক উন্নতি নামে মানবীয়, সামাজিক, ধর্মীয় ও পরিবেশগত দিকের কোনো অবক্ষয় আনা বা করা যাবে না।

রূপান্তরমূলক পরিবর্তন কৌশল: রূপান্তরিত পরিবর্তনের জন্য সুপরিকল্পিত তিনটি উপাদান প্রয়োজন। যথা: বিষয়বস্তু (Content), মানুষ (People), কর্মপ্রক্রিয়া (Process) আবশ্যক।

ক) মানুষ: ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আবেগ, আচার-ব্যবহার, মনোভাব, উদ্যম-উৎসাহ সম্পৃক্তকরণ। কে (Who) জড়িত থাকবে। মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব, মানুষকে বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না।

খ) বিষয়বস্তু: অভ্যন্তরস্থ মৌলিক বিষয় বা উপাদান, নীতি। কী কী (What) বিষয় আবশ্যক তা অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) কর্মপ্রক্রিয়া: কর্মকৌশল, পরিকল্পনা, কর্মসূচি, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি। কীভাবে (How) রূপান্তর প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হবে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। মানুষ কী প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুসমূহ বাস্তবায়িত করলে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপান্তর ঘটবে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের আলোকে ক্রেডিট ইউনিয়নে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন সকলের প্রত্যাশা কিন্তু বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান যুগসন্ধিমূলক পরিবর্তন ও উন্নয়নমূলক পরিবর্তন বেশি সমর্থন দিয়ে থাকে, কারণ উভয় পরিবর্তন অত্যন্ত দৃশ্যমান ও সহজতর। কিন্তু রূপান্তরমূলক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় নেতা ও নির্বাহীদের সক্ষমতা, যোগ্যতা ও দক্ষতা অপরিহার্য অন্যথায় পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রূপান্তরমূলক পরিবর্তন বিশেষভাবে দুইটি বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয়: ১. ভবিষ্যৎ অবস্থা অজানা, নেতা ও নির্বাহীগণ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান যুগলক্ষণ সম্পর্কে সজ্ঞান ও সচেতন থেকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা স্থির করতে হবে, ২. নেতা, নির্বাহী ও কর্মীদের নিজেদের মনের রূপান্তর অপরিহার্য, তাদের আচার-ব্যবহার ও সমবেত কাজ করার নব কৌশল আয়ত্ত্ব করতে হবে। রূপান্তর প্রক্রিয়ার উপর্যুক্ত দু'টি বিশেষত্ব কর্মপ্রক্রিয়া ও মানব কর্মস্পৃহাকে যুগসন্ধিমূলক ও উন্নয়নমূলক পরিবর্তন থেকে অনেক বেশি জটিল, অনিশ্চিত ও অনিয়ন্ত্রিত মনে হয়। তথাপি উপর্যুক্ত রূপান্তর কৌশল যথা-বিষয়বস্তু, মানুষ ও কর্মপ্রক্রিয়া রূপান্তরমূলক পরিবর্তনকে গতিময়, সুনিশ্চিত ও নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যাশিত রূপান্তর আনয়ন সহজ করে।

রূপান্তরমূলক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয় নেতা ও নেতৃত্বে, ক্রমধারায় প্রতিষ্ঠান তারপর সদস্য-সদস্যা ও ফলশ্রুতিতে সমগ্র ক্ষুদ্র সমাজ রূপান্তরিত হয়। রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সমবায় প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র সমাজের সামষ্টিক মূলধন বা দিক বিনিয়োজিত হয়। সামষ্টিক মূলধন, সম্পদের সমন্বয় যা চার প্রকার মানবীয়, সামাজিক, ধর্মীয় এবং আর্থিক দিক। সমবায় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক মূলধনের পাশাপাশি সদস্যদের মানবীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক মূলধনেরও বিনিয়োগ ঘটে যা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খুব স্পষ্ট নয়। মানবীয় দিক: জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মানবসম্পদের দিকসমূহ। সামাজিক দিক: পারস্পরিক বিশ্বাস, সুসম্পর্ক, বন্ধন, মিশ্র কৃষ্টি-সংস্কৃতি-নীতি, সুনাম। ধর্মীয় দিক: প্রথমত- সৃষ্টিকর্তার উপর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস, দ্বিতীয়ত- মানুষকে বিশ্বাস করা। আর্থিক দিক : সদস্যদের সঞ্চয় ও শেয়ার, কষ্টার্জিত অর্থের যথার্থ ব্যবহার। আর্থিক শেয়ার-সঞ্চয় মূলধনের সাথে সামাজিক, মানবিক, ধর্মীয় দিকসমূহ গুরুত্বসহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। নেতা-নেত্রীদের সমাজ সেবায় নিরত থাকতে হবে বাইবেলে বর্ণিত মার্থার মতো কিন্তু মারীয়ার মতো ঐশবাণী শ্রবণও করতে হবে। সমস্যা ও ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রবক্তাদের বাণী ও যিশু খ্রিস্টের শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে অন্যথায়, এম্মাউসের পথে ভগ্ন-হৃদয় দু'জন শিষ্যের মতো নির্বোধ থাকবো *(লুক ২৪:১৩-৩৫)*। পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিনোডাল শক্তিতে ঐক্য, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকর্মে সম্পৃক্ত হওয়ার এখন আরো অপরিহার্য। ক্ষমা ও ভালবাসার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠার মহান নীতি বড়দিন উৎসবে আমাদের অন্তরে অনুরণিত হয়। আসুন, অন্তরে যিনি আসবেন তাঁর কণ্ঠ শুনি, বড়দিন উৎসবে আনন্দ করি, উল্লসিত হই এবং ধ্বংস নয় গড়ার চেতনায় পথ চলি। শুভ বড়দিন।

কাটাকুম্ভঃ খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাক্ষ্যভূমি

০১. প্রেক্ষাপট কাটাকুম্ভ

যিশু খ্রিস্ট কর্তৃক মণ্ডলী *(দ্রষ্টব্য: মথি ১৬:১৫-২০)* প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তা স্বাধীনতা পেতে কয়েক শত বৎসর লেগেছিল। সাধু পিতর ও পলের শহীদ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নির্যাতনের যুগ শুরু হয় এবং তা শেয় হয় ৩০৬ খ্রিস্টাব্দে। ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে মহান সম্রাট কন্সন্টাইনের মিলান ধর্মচুক্তির (Edict of Milan) মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্ম অনুশীলনের স্বাধীনতা লাভ করে। রোমে ১০ বার খ্রিস্টানদের নির্যাতন করা হয় এবং নির্যাতনের যুগে (৬৪-৩১২) স্বাধীনভাবে প্রকাশ্যে ধর্মীয় উপাসনা করার বিধি-বিধান ছিল না। নির্যাতন যুগে গীর্জা-ব্যাসিলিকা নির্মিত হয়নি। খ্রিস্টীয় উপাসনা গোপন স্থানে, গুহায়, শহরের বাহিরে কাটাকুম্ভে, খ্রিস্টভক্তদের বাড়িতে, ঘরের বারান্দায় অনুষ্ঠিত হতো। রোম শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ৭৫২ অব্দে এবং শহরটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং ৭টি প্রবেশ দ্বার ছিল। রোমীয়দের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের আগ্রহ কম ছিল এবং খ্রিস্টানদের মৃত দেহ রোমের মধ্যে সমাহিত করাও বারণ ছিল। নির্যাতনের যুগে ১০ বারের নির্যাতনে অসংখ্য খ্রিস্টভক্ত শহীদ মৃত্যু বরণ করেন। ধর্ম শহীদের মধ্যে ছিলেন পোপ, বিশপ, ডিকন, প্রেরিত শিষ্য, প্রচারক, দীক্ষিত ও বিশ্বাসী পুরুষ-নারী সহ অসংখ্য ব্যক্তি। খ্রিস্ট ধর্মের নামে ২০ হাজার খ্রিস্টভক্ত রোমে শহীদ মৃত্যুবরণ করেন। নির্যাতন যুগের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন: সাধু পিতর ও পল (সাধু পিতর ও সাধু পল রোম নগরের প্রতিপালক), আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নাসিউস, সাধ্বী পের্পেতুয়া, সাধ্বী ফেলিসিতা, সাধু বারবারা, আগ্নেস, সাধু জাষ্টিন, সাধু পলিকার্প, সাধু ডিকন লরেন্স (প্রথম রোমীয় ধর্ম শহীদ), কিশোর তার্সিসিয়াস, পোপ সাধু ১ম সিক্সতাস, পোপ সাধু স্টেফান, সাধু কালিস্তুস, সেবাস্টিয়ান সহ আরো অনেকেই। তৎকালীন সময়ে খ্রিস্টভক্তগণ খ্রিস্টান কবরগুলির সংরক্ষণ করতো এবং চিহ্নিত করে নাম লিখে রাখতো।

০২. কাটাকুম্ভ খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্যভূমি

কাটাকুম্ভ হলো ভূ-গর্ভস্থ সুরঙ্গ যেখানে মরদেহ সমাধি দেওয়া এবং ছোট ছোট উপাসনা গৃহ নির্মাণ করা হতো। গ্রীক শব্দ (Kata and Kymbos) থেকে (Catacomb) শব্দটির উৎপত্তি। ল্যাটিন ভাষায় (Cat+at umbas) থেকে (Catacumbae) অর্থাৎ সমাধিগুলির মধ্যে বা খনির পাশে। কাটাকুম্ভ শব্দটি অর্থ দাঁড়ায় ভূ-গর্ভস্থ সুরঙ্গ যেখানে খ্রিস্টানদের কবরস্থ করা হয়। রোমের বাহিরে এবং রোম নগরের মধ্যে প্রায় ৫০টির মতো কাটাকুম্ভ রয়েছে। নির্যাতনের যুগে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ খ্রিস্টভক্তদের কাটাকুম্ভে সমাধি দেওয় হয়েছে। রোম নগরে পৌত্তলিক ও ইহুদীদেরও কাটাকুম্ভ রয়েছে কেননা প্রাচীন রোমে সামাধি দেবার নিয়ম ছিল না। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাটাকুম্ভ হলো: মাসোলিনাস এবং

সাধু কালিস্তুসের কাটাকুম্ভ, রোম।

পিটারের কাটাকুম্ভ; ডোমিটিলার কাটাকুম্ভ; কমোডিলার কাটাকুম্ভ, প্রিসিলার কাটাকুম্ভ, সাধু কালিস্তুসের কাটাকুম্ভ; সাধু লরেন্সের কাটাকুম্ভ, সাধু সেবাস্তিয়ানের কাটাকুম্ভ, সাধু প্যাক্রাসিউসের কাটাকুম্ভ; সাধু ভ্যালেন্টিনোর কাটাকুম্ভ ও সাধ্বী আগ্নেসের কাটাকুম্ভ ইত্যাদি। রোমের বাহিরে এবং রোমের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাটাকুম্ভগুলো রোমীয় ইতিহাস ও খ্রিস্টবিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিদিনই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থী ভীড় করে কাটাকুম্ভ দেখার জন্য। বর্তমানে সাধু কালিস্তুস ও সাধু সেবাস্টিয়ানের কাটাকুম্ভ তীর্থযাত্রা ও দর্শনার্থীদের দেখার অনুমোদন রয়েছে। কাটাকুম্ভগুলোর পথ সরু এবং স্যাত-স্যাতে তাই সব সময় আলোর ব্যবস্থা রাখা হয় এবং অবশ্যই গাইডের সহায়তা নিতে হয়। গাইডের সহায়তায় ঐতিহাসিক নির্দেশনগুলো দেখার জন্য অসংখ্য আগ্রহী দর্শনাথী প্রতিদিনই ভীড় করে।

০৩. রোমান সাম্রাজ্য এবং কাটাকুম্ভ

প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে রোমান সভ্যতা অন্যতম এবং রোমীয় সভ্যতার অবদান সবচেয়ে বেশী। রোম নগরীকে কেন্দ্র করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটে। রোমীয়গণ শিল্প-কলা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ল্যাতিন শ্রুতিমধুর সাহিত্য, প্রশাসন, ও যোদ্ধা হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন। রোমীয়দের আইন-কানুন নাগরিক জীবনে প্রভাব ফেলে। কাটাকুম্ভ হলো রোম নগরের বাহিরে কবর ভূমি যা খ্রিস্টীয় উপাসনার অন্যতম স্থান যেখানে গোপনে উপাসনা ও সমবেত হত খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ। 'খ্রিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাস' নামক বইয়ের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, "রোমীয়রা অত্যন্ত উন্নত শ্রেণীর ছিল। তারা প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকা, স্মৃতিরক্ষক তোরণ, সিংহদ্বার, সৌধ এবং সুন্দর গৃহাদি নির্মাণে দক্ষ ছিল। এ-সব নির্মাণ কাজের জন্য তারা রোমের ভূগর্ভ থেকে পাথর খনন করে সংগ্রহ করত। যার ফলে ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল। খনির এরূপ সুড়ঙ্গকেই বলা হত 'কাটাকুম্ব'। উৎপীড়কদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পক্ষে এরূপ গুপ্ত স্থানই ছিল নিরাপদ। এরূপ স্থানগুলিতে খ্রিস্টভক্তগণ রাত্রে সমবেত হয়ে নির্ভয়ে শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি ধর্মোপাসনা করত। খ্রিস্টযাগের বেদীরূপে ব্যবহৃত হত কোন ধর্ম-শহীদের সমাধি। সুদীর্ঘ ও গভীর সুড়ঙ্গ তদুপরি রাত্রির অন্ধকার, সেজন্য উপাসনাকালে জ্বালানো হত মোমবাতি। অতীতে প্রচলিত প্রথানুসারে বিজ্ঞানোন্নত বর্তমান যুগেও বেদীর উপর মোমবাতি জ্বালানো হয়। প্রায় তিনশত বৎসর ধরে কাটাকুম্ব-এর অন্ধকার গুহায় ধর্মোপাসনা করতে বাধ্য হয়েছিল খ্রিস্টের একনিষ্ঠ অনুগামীগণ। তারা খ্রিস্টযাগের সময় খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করত। প্রয়োজন হলে উপাসনায় অনুপস্থিত আত্মীয়-পরিজনদের জন্য খ্রিস্টপ্রসাদ বাড়িতেও নিয়ে যেত, অথবা কারাগারে বন্দী ভক্তদের কাছে পৌঁছে দিত!" *(পৃষ্ঠা-২৩)*।

০৪. কাটাকুম্ভ নেপথ্যের কাহিনী

নির্যাতন যুগের শুরু থেকেই রোম নগরে বসবাসরত খ্রিস্টান ও ইহুদীগণ শহরের বাইরে মাটির নীচে খননকৃত গুহায় মৃতদেহের সমাধি দিত। রোমের বাহিরে ভিয়া আপ্পিয়া, ভিয়া আর্দেয়াতিনার; ভিয়া তিবুর্টিনা, ভিয়া ওস্টিয়েনসিস কাটাকুম্ভগুলির অবস্থান ছিল। এই স্থানের মাটি ছিল নরম এবং মাটি

বাতাসের স্পর্শে শক্ত রূপ ধারণ করতো। 'খ্রীষ্টধর্মীয় শব্দার্থ' বইয়ে বলা হয়েছে, "এ মাটির নাম টুফুস। টুফুস খনন করতে খুব সুবিধাজনক। এই মাটির বৈশিষ্ট্য হল খননের পর বাতাসের সংস্পর্শে মাটি শক্তরূপ ধারণ করে। তাই রোমীয়রা ঘর তৈরী করতে টুফুস ব্যবহার করত। ক্রমাগত টুফুস খননের ফলে ক্যাটাকুম সৃষ্টি হয়। তাই ক্যাটাকুম হল টুফুসের অভ্যন্তরে খননকৃত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ বিশেষ। রোমের আদি খ্রিস্টানগণ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে তাদের ধর্মশহীদদের নিরাপদে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাধিস্থ করার জন্য ক্যাটাকুম ব্যবহার করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে ক্যাটাকুম্বে তারা উপাসনা করত। যখন তারা নির্যাতিত হত, তখন সেখানে তারা আশ্রয়ও নিত। তখন প্রথা ছিল ধর্মশহীদদের কবরের উপরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা। তাই ধর্মশহীদদের কবরের উপরে রাখা পাথরটি হয়ে উঠেছিল পুণ্য বেদীর মত। তাদের বিশ্বাস ছিল যাঁরা যিশুর জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁরা বিশেষভাবে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে অংশীদার হয়েছিলেন" *(টীকা-১০৫)*।

আরো "জানা যায় যে, চতুর্থ শতাব্দী থেকে রোম নগরে তীর্থ যাত্রীদের জন্য ক্যাটাকুম ছিল একটি আবশ্যকীয় পরিদর্শনের স্থান। এই জায়গাটি অত্যন্ত পবিত্র ও ভক্তিমূলক। এখানে অনেক ধর্মশহীদদের কবর পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, ক্যাটাকুমের কবরের পাথরের উপরে ও দেয়ালে অনেক লেখা ও চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। এই চিত্রগুলোতে আদি খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়। এই লেখা ও ছবিগুলোতে আমরা দেখতে পাই যিশুর প্রতি ও পুনরুত্থানের প্রতি তাদের অটল বিশ্বাস। সেখানে এখনও দেখা যায় খ্রিস্টধর্মের প্রথম ধর্মীয় ছবি। এসব ছবিতে তুলে ধরা হয় বাইবেল ভিত্তিক কিছু ঘটনা, যেমন- যিশু ও কুমারী মা মারীয়া, প্রার্থনারত ব্যক্তি এবং প্রভুর ভোজের অনুষ্ঠানের দৃশ্য" *(টীকা-১০৫)*।

০৫. কাটাকুম্ভ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য

কাটাকুম্ভে বিশেষভাবে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের সমাধী ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার ২য় শতাব্দী থেকে। রোমান আইনে রোম নগরের মধ্যে দাফন করা নিষিদ্ধ ছিল এবং কাটাকুম্ভগুলো ছিল রোম নগরের দেওয়ালের বাহিরে। উইকিপিডিয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে: "খ্রিস্টান ক্যাটাকুম্বগুলি শিলালিপি এবং প্রাচীর শিল্পের সাথে প্রাথমিক খ্রিস্টানদের সমাধিস্থল হিসাবে বিদ্যমান ছিল। যদিও প্রথম শতাব্দীতে ক্যাটাকুম্বগুলি ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিল, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ নাগাদ সেখানে ৬০ টিরও বেশি খ্রিস্টান ক্যাটাকুম্ব ছিল। এই ক্যাটাকুম্বগুলি শিল্পের মধ্যে দেখানো আর্থ-সামাজিক অবস্থার অন্তর্নিহিত ধারণাগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য একটি সংযোগকারী হিসাবে কাজ করেছিল। উপরন্তু, শিল্পটি প্রথম কয়েক শতাব্দীতে খ্রিস্টানরা কীভাবে বিশ্বকে দেখেছিল এবং এটি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাদের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি গল্প দেখায়। এল, মাইকেল হোয়াইটের মতে, খ্রিস্টধর্মের প্রাথমিক বিকাশ কীভাবে হয়েছিল তার রোমান্টিক ইতিহাস রচনায় রোমের ক্যাটাকুম্বগুলির একটি স্থান রয়েছে। এর কারণ প্রথমেই বলা হয়েছে যে এই ক্যাটাকুম্বগুলি লুকানোর জন্য ভাল জায়গা ছিল এবং যখন খ্রিস্টানরা রোমান সাম্রাজ্য দ্বারা নির্যাতিত হত, তারা সেখানে তাদের উপাসনা করতে যেত"। কাটাকুম্ভ বিষয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে এবং ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকেই কাটাকুম্ভগুলো আবিষ্কৃত। শুধু রোম নগরের বাইরে নয় রোম শহরের মধ্যেও অনেকগুলো ছোট ছোট কাটাকুম্ভ বা কবর খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্বাসের দৃষ্টিতে কাটাকুম্ভগুলো অবশ্যই খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে। দমিতিল্লাসহ অনেকেই খ্রিস্টানদের সমাধি দেওয়ার জন্য জমি দান করেছেন যা পরবর্তী সময়ে কাটাকুম্ভ হিসেবেই বিবেচিত হয়।

০৬. খ্রিস্ট বিশ্বাসের চিহ্ন, প্রতীক ও চিত্রে কাটাকুম্ভ

কাটাকুম্ভের খ্রিস্টীয় শিল্পকলা তথা মঙ্গলসমাচার ও বাইবেলের বিভিন্ন দৃশ্য সম্বলিত চিত্র শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রার্থনারত চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব-কীর্তনের অর্থ প্রকাশ করা হতো। কাটাকুম্ভে খোঁদায় চিত্র, উত্তম মেষপালক, দেবদূত, মাছ-কবুতর, নোঙ্গর, জলপাই গাছ ইত্যাদি। শিল্পকর্মে দেখা যায়- যা খ্রিস্টীয় জীবনের বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে। গ্রীক শব্দের (Christos) বানানের প্রথম দুটি অক্ষর (XR) অথবা গ্রীক ভাষায় প্রথম ও শেষ অক্ষর আলফা-ওমেগা চিত্র দেখা যায়। এছাড়া খোদায়কৃত মাছ যা গ্রীক ভাষায় বলা হয় (IXTHYS)- (Iesus Christos Theou Uios Soter) অর্থাৎ খ্রিস্ট যিশু ঈশ্বরের পুত্র, এাণকর্তা, খ্রিস্টের নামে তিনি এ জগতে জীবন-যাপন করেছেন এবং খ্রিস্টেতে আনন্দ মুক্তি লাভ করে। কাটাকুম্ভে প্রায় প্রতিটি কবরেই বাতি রাখার ছোট জায়গা ছিল। দীক্ষাস্নান ও খ্রিস্টযাগের ছবি অনেক দেওয়ালের মধ্যে অংকিত আছে। খ্রিস্টীয় উপাসনার বাতি বা প্রদীপ, ধূপের ব্যবহার আসে কাটাকুম্ভের থেকেই। কাটাকুম্ভের কবর ছোট ছোট গীর্জা-চ্যাপেল এখন পর্যন্ত বিদ্যমান যা খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে। তাই কাটাকুম্ভ শুধু কবরভূমি নয় কিন্তু খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাক্ষ্যভূমি।

০৭. কাটাকুম্ভ খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাক্ষ্যভূমি

কাটাকুম্ভ শুধুমাত্র মৃতদের সমাধি ক্ষেত্র নয় কিন্তু বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান কারি স্মৃতি-স্মারক ঐতিহাসিক ভূমি। জীবিত এবং মৃত সকলেরই মিলনস্থান হলো কাটাকুম্ভ এবং চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিকট তীর্থস্থান পরিগণিত হয়েছে। ফাদার শিপন পিটার রিবেরু'র 'সাধু কালিস্তুস কাটাকুম্ভে কিছুক্ষণ' নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে "বিশেষভাবে, চতুর্থ শতাব্দীতে যখন খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ তাদের ধর্মচর্চার স্বাধীনতা লাভ ক'রে তখন খ্রিস্টবিশ্বাস আরো দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। গড়ে উঠে অনেক মহামন্দির ও স্থানীয় খ্রিস্টভক্তদের জন্য ছোট-বড় গির্জা। এসময় মৃত খ্রিস্টভক্তদের দেহ দূরে কাটাকোমে না নিয়ে, গির্জার ভিতরেই কবর দেয়া শুরু হয় (বাংলাদেশে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পুরাতন গির্জায় তার কিছু নমুনা দেখা যায়)। ফলে কাটাকোমে খ্রিস্টভক্তদের কবর দেয়া আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই সময় বিশ্বাসীগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে কাটাকোমগুলোতে পরিদর্শন করতেন, একা বা অনেকে মিলে তীর্থ করতে যেতেন। সেখানে গিয়ে নিজেদের পরিশুদ্ধ করার নতুন প্রেরণা লাভ করতেন। বিশ্বাসের নবায়ন করতেন। তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার চিরশান্তি কামনা এবং একই সাথে নিজেদের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন"।

রোম নগরী হলো শহীদের রক্তে স্নাত শহর যেখান থেকে খ্রিস্ট ধর্ম পরিপক্কতা লাভ এবং খ্রিস্ট ধর্ম হয় রোমান কাথলিক ধর্ম। ২০২৪ বছর প্রার্থনা বর্ষ এবং ২০২৫ তীর্থবর্ষ হিসেবে পোপ মহোদয় ঘোষণা দিয়েছেন। রোমের প্রধান দুটি ব্যাসিলিকা হলো: সাধু পিতরের ব্যাসিলিকা; সাধু পলের ব্যাসিলিকা (দেওয়ালের বাহিরে), সাধু যোহনের বাসিলিকা এবং মেরী মেজর বাসিলিকা। তীর্থযাত্রা বিভিন্ন দলভুক্ত তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন করবে। কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ অষ্টম বনিফাস ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম 'পবিত্র বর্ষ বা জুবিলী ঘোষণা' দেন এবং প্রতি ২৫ ও ৫০ বছর পর পর জুবিলী উৎসবের আয়োজন করা হয়। পবিত্র পুরাতন নিয়মের লেবীয় ২৫ অধ্যায় জুবিলীর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা 'অনুগ্রহের বর্ষকাল' *(দ্রষ্টব্য লুক ৪:২১)* হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দকে 'প্রার্থনা বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা দেন। প্রার্থনা বর্ষটি মূলত আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির বর্ষ এবং 'বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা'য় অংশগ্রহণের জন্য। জুবিলী উপলক্ষে সাধু পিতরের মহামন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং তীর্থযাত্রীগণ হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে সেই মহামন্দিরে প্রবেশ করেন। জুবিলী বর্ষে তীর্থযাত্রীগণ আধ্যাত্মিক নবায়ন অনুগ্রহ লাভের জন্য রোমে সমবেত হয়। প্রধান চারটি বাসিলিকাসহ কাটাকুম্ভগুলো তীর্থযাত্রীদের জন্য ঐশ অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের স্থান হয়ে উঠে। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের তীর্থ বর্ষের জন্য কাটাকুম্ভ পরিদর্শন ও খ্রিস্টযাগ, ব্যক্তিগত পাপস্বীকার, উপবাস, ত্যাগস্বীকার ও দান দেবার মাধ্যমে তীর্থযাত্রা পুণ্য অর্জন করবে। কাটাকুম্ভের ঐতিহাসিক স্মারক চিহ্ন শুধু দর্শনীয় স্থান নয় কিন্তু প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাসের সাক্ষ্য ভূমি হয়ে উঠেছে।

গল্প

সামাজিকতা

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

রাজুর মামাকে আমরা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি। রাশভারী, মেজাজী লোক। তবে বদ-মেজাজী নয়। দেখা হলেই এমন কিছু প্রশ্ন করেন যেগুলোর উত্তর দিলেও বিপদ, না দিলেও বিপদ। তিনি হঠাৎ কেন আমাকে ডেকে পাঠালেন, বুঝতে পারছি না। রাজুর মামার মতো লোককে এড়িয়ে যাওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা। তাই এক সন্ধ্যায় তার সাথে দেখা করতে গেলাম।

তিনি বাড়ির উঠানে বসে ছিলেন। আমাকে দেখেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলতে লাগলেন, তোরা কে কোথায় আছিস্? দেখে যা, আমার গুণধর ভাগ্নের বন্ধু এসেছে। উনাকে বসার জন্য কিছু একটা এগিয়ে দে।

মুরুব্বী মানুষ। যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়ে কথা শুরু করবো ভেবেছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম কোথায়? মুখায়বে তাচ্ছিল্যের অভিব্যক্তিটি ধরে রেখে তিনি কথা বলা শুরু করলেন-

শোন সুমন, তোমার বন্ধু রাজু তো মানুষ হলো না। সারাটা জীবন আমি সমাজের জন্য কাজ করেছি। সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে এখনও আমার সহযোগিতা চাওয়া হয়। এ বয়সে যতটা সম্ভব আমি সহযোগিতা করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার ভাগ্নে হয়েও রাজু সমাজের কোন কাজেই অংশগ্রহণ করছে না। আমার চোখের সামনে আমার একমাত্র ভাগ্নের অসামাজিক হয়ে উঠা আমি কিভাবে সহ্য করি, বলো?

রাজুর মতো একজন নম্র, ভদ্র, সৎ ছেলের ব্যাপারে এমন মন্তব্য শুনে নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি। অস্থিরতার কারণে মাঝে মাঝে মানুষ সাহসী হয়ে উঠে। আমার বেলায়ও তাই ঘটলো। রাজুর মামার সাথে যা করতে সচরাচর কেউ সাহস করে না, আমি তাই করি। রাজুর মামার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম- কেন? রাজু কি জুচ্চোর? প্রতারক? লম্পট? দুর্নীতিবাজ? নাকি মস্তানী করে বেড়ায়?

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি একই সাথে বিরক্ত এবং অবাক হলেন। কারণ কথার মাঝখানে কোন প্রশ্ন করাটা তাঁর পছন্দ নয়। তাঁর বিরক্তি-মাখা মুখ দেখে আমার ভেতর হঠাৎ জেগে উঠা সাহস নিমিষেই উবে যায়। আমি মাথা নীচু করে বসে থাকি। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি খুবই স্বাভাবিক গলায় বললেন, না, রাজু এর কোনটাই না।

আমি বুঝতে পারলাম, আজ বেশ স্বাভাবিকভাবেই আলাপ এগোনো যাবে। লোকটির মেজাজ আজ ততোটা খারাপ নয়। আমাদের কথা এগোতে থাকে-

-তাহলে রাজুর ব্যাপারে এমন কথা বলছেন কেন?

-সাধে কি আর বলছি। ত্রিশ বছরের একজন টগ্‌বগে যুবকের অনেক বন্ধু-বান্ধব থাকবে, আড্ডা দিবে, বিভিন্ন সংগঠনে নেতৃত্ব দেবে, নির্বাচন করবে অথবা নির্বাচনের সময় কোন একটি প্যানেলের পক্ষ নেবে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিজের অবস্থান জানান দেবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এসবের কিছুই সে করে না। সে অফিস এবং পরিবারকে সময় দেয়া ছাড়া অন্য কোথাও সময় দেয় না, কোথাও যায় না, কারও সাথে যোগাযোগ রাখে না। এটা কোন কথা হলো? তুমিই বলো?

-কিন্তু মামা, রাজুর এ ধরণের আচরণের মধ্যে আমি তো কোন সমস্যা দেখছি না। একজন মানুষ নিজের মতো করে চলছে। যা করলে সে আনন্দ পায়, তা করছে। কারও কোন ক্ষতির কারণ তো সে হচ্ছে না।

-সমস্যা দেখছি না বললেই হলো নাকি? সমাজ বলে তো কিছু একটা আছে? নাকি নেই? সমাজে বাস করে ছন্ন-ছাড়া জীবনযাপন করলে চলে নাকি? সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতাও তো থাকতে হয়। সমাজ কি ও'কে কিছুই দেয়নি?

- আপনারা এসব বিষয় নিয়ে রাজুর সাথে কখনো কথা বলেছেন?

- হ্যাঁ, বলেছি তো।

- রাজুর নিশ্চয়ই কোন ব্যাখ্যা আছে।

- হ্যাঁ আছে। তবে খুবই ফালতু ব্যাখ্যা।

- রাজু তো ফালতু ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো লোক না, মামা। আপনাদের নিশ্চয়ই বুঝতে ভুল হচ্ছে।

- ভুল না, ঠিকই বুঝতে পারছি। তুমি শুনলে তুমিও একই কথা বলবে।

- তাহলে বলছেন না কেন? বলেন। শুনি ব্যাখ্যাগুলো। ব্যাখ্যাগুলো যদি ফালতু হয় তাহলে আমি নিজেই রাজুর সাথে কথা বলবো।

- বলছি, শোন তোমার গুণধর বন্ধুর ব্যাখ্যা। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সে আড্ডা দেয় না কারণ আড্ডাগুলোতে নাকি অধিকাংশ সময়ই মদ-সিগারেটের ছড়াছড়ি থাকে। তোমার বন্ধুতো আবার মদ-সিগারেট পছন্দ করে না। তাই সে এসব আড্ডাগুলো পরিহার করে চলে। আর মদ-সিগারেট ছাড়া বর্তমানে যেহেতু কোন আড্ডা হয় না তাই তার কোন আড্ডাতেই যাওয়া হয় না। তাছাড়া সে বলে, এসব আড্ডাগুলোতে নাকি অধিকাংশ সময় পর-চর্চা, পর-নিন্দা হয়। অথচ এ আড্ডা-বাজরা নিজেরাই অনেক নিন্দনীয় কাজ করে থাকে। নিজেদের নিন্দনীয় কাজগুলোর ব্যাপারে কারও মধ্যে কোন অনুশোচনা নেই, আত্ম-সমালোচনা নেই এ বিষয়টিও তোমার বন্ধুর ভালো লাগে না। আড্ডায় মদ্য-পানে অংশগ্রহণ না করে শুধু শুধু বসে থাকার জন্য তো কাউকে ডাকা যায় না। তাই অন্যরাও ও'কে এড়িয়ে চলে।

সামাজিক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে নিজে অংশ না নেয়া বা কোন প্যানেলের পক্ষে প্রচারণায় অংশ না নেয়ার ব্যাপারে তোমার বন্ধুর ব্যাখ্যা তো আরও চমকপ্রদ।

- নির্বাচনে কারও ইচ্ছে হলে অংশ নিবে, ইচ্ছে না হলে নিবে না। এতে আবার ব্যাখ্যার কি আছে? চমকেরই বা কি আছে?

- আছে সুমন, আছে। ধৈর্য্য ধরে শোন, তোমার বন্ধুর ব্যাখ্যা। তাহলে বুঝতে পারবে চমকটা কোথায়?

- বলেন মামা, শুনছি।

ইদানিং অধিকাংশ নির্বাচনী প্রচারণার সময় যে মদের প্লাবন সৃষ্টি করা হয়, টাকা অথবা উপঢৌকনের বিনিময়ে ভোটারদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়, নির্বাচনে জয়ী হলে এটা করবো ওটা করবো বলে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, তোমার বন্ধু রাজুর মতে এ ধরণের প্রতিটি কাজই অনৈতিক এবং সমাজ-বিরোধী। আর এসব সমাজ-বিরোধী এবং অনৈতিক কাজগুলো করার পরও যারা নিজেদের যোগ্য এবং সৎ বলে প্রচার করে ভোট চায় তারাও নাকি মূলত প্রতারণাকারী, অসৎ এবং ভণ্ড। বর্তমানে সমাজের উপর শক্তভাবে জেঁকে বসা এহেন নির্বাচনী অপ-সংস্কৃতির, জয়-জয়কারের সময়ে যোগ্য লোকদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সফল হওয়াটা প্রায় অসম্ভব। তাই এ ধরণের সকল নির্বাচন থেকে তোমার বন্ধু রাজু নিজেকে দূরে

সরিয়ে রাখে।

আচ্ছা মামা, বলেন তো, বর্তমান বাস্তবতায় নির্বাচন সম্পর্কে রাজুর যে বক্তব্য তা সঠিক, নাকি ভুল? না, রাজুর বক্তব্য সঠিক। কিন্তু আমরা চাই সে নির্বাচন করুক। বিজয়ী হউক। আমরা খানিকটা আনন্দ-ফুর্তি করি। ভাগ্নের নিকট মামার এ চাওয়াটা কি অনেক বড় কিছু হয়ে গেল?

অনেকের মতো রাজুও গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিক, এটাই কি আপনাদের চাওয়া? কিন্তু রাজুকে আমি যতটুকু চিনি সে কখনো এসব করবে না। যদি কখনো ইতিবাচক পরিবর্তন আসে বা ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহলে রাজু তাতে অংশ নেবে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি। আমি আজ উঠলাম মামা, বাজারে যেতে হবে মা'র জন্য ঔষুধ কিনতে।

ছয় মাস পরের ঘটনা। সকাল-বেলা বাজার করতে গিয়ে রাজুর মামার সাথে দেখা। আমাকে দেখে কাছে ডেকে বললেন, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। পলাশের হোটেলে চলো, বসে কথা বলি।

পলাশের হোটেলে আমরা মুখোমুখি বসে আছি। মামাকে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। চেহারায় রাগী রাগী ভাবটি নেই। হাসির ঝিলিক খেলে যাওয়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে কথা শুরু করি, কি বল?

- হ্যাঁ মামা, শুরু করেন। দীর্ঘ সময় হোটেলের টেবিল দখল করে রাখা ঠিক হবে না।

- আচ্ছা সুমন, তোমার বন্ধু যে এতো গুণের অধিকারী তা তো তুমি কখনো আমাদের বলোনি।

- কি বিষয়ে বলছেন মামা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

- বুঝিয়ে বলছি, শোন।

- তোমার বন্ধু অসুস্থ্য হয়ে বেশ কিছু দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলো, তা কি তুমি জানো?

- হ্যাঁ মামা, জানি। আমি একটি প্রকল্পের কাজে ছয়-মাস কক্সবাজারে ছিলাম তাই হাসপাতালে রাজুকে দেখতে যেতে পারিনি।

- তুমি দেখতে যেতে পারোনি, তাতে কি হয়েছে? শত-শত মানুষ আমার অসামাজিক ভাগ্নেকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলো।

- বুঝতে পারছি না, মামা। শত-শত মানুষ দেখতে গিয়েছিলো মানে? একটু খোলাসা করে বলবেন, মামা?

- বলবো না মানে? বলছি, শোন।

- তোমার বন্ধুর হঠাৎ ডেঙ্গু-জ্বর শনাক্ত হলো। ডাক্তার জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করাতে বললেন। প্রতিদিনই ডেঙ্গু-জ্বরে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিটি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর ভিড়, সিট পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারের চেম্বার থেকে সরাসরি হাসপাতালে যাবো ভাবছি। কিন্তু কোন্ হাসপাতালে যাবো? কোন হাসপাতালে সিট পাওয়া যাবে? ভেবে কোন কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। কিন্তু রাজু নির্বিকার। ভাবছি সিট এর সমস্যা নিয়ে রাজুর সাথে কথা বলবো। কিন্তু রাজুই আমাকে ইশারায় কাছে ডেকে বললো, "মামা, আমার হাসপাতালে ভর্তি করা নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমরা আমাকে ধানমন্ডি ৬ নম্বর রোডে নিরাময় আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে চলো। আমি মোবাইলে কথা বলেছি। সিটের ব্যবস্থা হয়েছে।"

ভাগ্নের কথা শেষ হয় না, একজন যুবক এসে ভাগ্নেকে বললো- "ভাই, আমরা এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছি। নীচে চলেন। আমি একবার ভাগ্নের দিকে একবার যুবকটির দিকে তাকাই। আমার তাকানো দেখে ভাগ্নে হেসে বলে- মামা, এখন থেকে তোমাদেরকে আর কিছু করতে হবে না, তারাই আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল কাজ করবে। যুবকটি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে- মামা, ভাই আমাদের জন্য কি কি করেছে তা বলতে চাই না। ভাইয়ের জন্য অনেক দিন পর আমরা সামান্য কিছু করার সুযোগ পেলাম। আপনার নিকট বিনীত অনুরোধ, এ সুযোগ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না, মামা। যদিও ভাই যা করেছে তার তুলনায় এটা কিছুই না।

রাজু পনেরো দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলো। সত্যিই আমাদের কিছুই করতে হয়নি। আমরা শুধু ভিজিটিং আওয়ারে রাজুর সাথে দেখা করেছি, কথা বলেছি এবং হাসপাতালের বিল পরিশোধ করেছি। ব্লাড-এর ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা করাসহ যাবতীয় কাজ এমন কিছু লোক করেছে যাদেরকে আমরা চিনি না, এমনকি কখনো দেখিওনি। তাছাড়া প্রতিদিন বিভিন্ন পর্যায়ের এত লোক রাজুকে দেখার জন্য হাসপাতালে ভিড় করতো যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ভিজিটরদের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছিলো।

এ লোকগুলো কারা? রাজুর সাথে এদের পরিচয়ই বা হলো কিভাবে? আপনারা তা জানতে চাননি?

চেয়েছি তো। রাজু বলতে চায়নি। জিজ্ঞেস করলে শুধু হেসেছে। কিন্তু আমি থামবার পাত্র নই। ঠিকই খুঁজে বের করেছি। রাজুর একটি বড় নেটওয়ার্ক আছে যাদের কাজ হলো বিপদের সময় ব্লাড ডোনেট করা। এ নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে রাজুরা শত শত রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে বিনামূল্যে ব্লাড সরবরাহ করে। তাছাড়া রাজুদের আরও একটি গ্রুপ আছে যারা সেবামূলক কাজ করে থাকে। এ গ্রুপ-এর মাধ্যমে রাজুরা শত শত পরিবারকে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করেছে এবং করে যাচ্ছে।

রাজুর অসুস্থ্যতার খবর শুনে এ লোকগুলোই রাজুর জন্য কিছু একটা করার মানসে হাসপাতালে ছুঁটে আসে। আমার তো মনে হয় এত মানুষের প্রার্থনা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং সহযোগিতা রাজুকে দ্রুত সুস্থ্য হতে সহযোগিতা করেছে। রাজু সুস্থ্য হয়ে উঠার পর এ মানুষগুলোর চোখে-মুখে আমি যে আনন্দ, উল্লাস এবং তৃপ্তি দেখতে পেয়েছি, সত্যিই তা কখনো ভুলবো না।

- আচ্ছা মামা, এত কিছু দেখার পরও কি আপনি আপনার ভাগ্নেকে অসামাজিক বলবেন? ছেলেটি মানুষ হলো না, বলবেন?

- তা আর কিভাবে বলি, বলো? বরং ও'র ব্যাপারে নেতিবাচক ভাবনাগুলোর জন্য আমার ভেতর অনবরত একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। কিন্তু আমার দুঃখটা কি জানো? রাজু কখনো আমাদের সাথে ও'র এসব সেবামূলক কাজের কথা বলেনি। ও'র এত যোগাযোগ, উন্নত ভাবনা এবং মহৎ কাজগুলোর কথা তুমিও কি জানতে না?

- জানতাম মামা, জানতাম। কিন্তু রাজু আমাকে নিষেধ করেছিলো কাউকে জানাতে। সে সব সময় বলে, সেবামূলক কাজ করে তা সকলকে বলে বেড়ানো উচিৎ নয়। এতে সেবা পাওয়া লোকগুলোকে ছোট করা হয়। তাছাড়া সে আরও বলে, কে কি কাজ করছে তা তো পিতা ঈশ্বর দেখছেন। ও'র কাজগুলোও যে পিতা ঈশ্বর দেখছেন তা ভাবতেই নাকি ও'র হৃদয়ে আনন্দের ঝরণা-ধারা বয়ে যায়।

- সত্যিই তাই। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সেবামূলক কাজের প্রচার করা উচিৎ নয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বড় বড় পদে বসে কাজ করা বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা মারাটাই যে শুধুমাত্র সামাজিকতা তাও কিন্তু নয়। দরিদ্র, অসহায় মানুষের পাশে থাকাটাও সামাজিকতা, যা আমি রাজুর নিকট থেকে শিখলাম।

আমরা কথা বলছিলাম রাজুর মামার ড্রইং-রুমে বসে। হঠাৎ উত্তর পাশের রাস্তায় কোলাহল শুনতে পাই। কোলাহলের উৎসের সন্ধানে জানালা দিয়ে তাকিয়ে যা দেখি তাতে আমি তাজ্জব হয়ে যাই। দীর্ঘদিন যাবৎ দু'টি গ্রুপের নেতৃত্ব দেয়া ধ্রুব আর তূর্যের নেতৃত্বে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীর এক বিশাল মিছিল নিয়ে রাজুর মামার বাড়ির দিকে আসছে।

রাজুও মিছিলের সামনে হাঁটছে। ধ্রুব আর তূর্য পাশাপাশি হাঁটছে, হেসে হেসে কথা বলছে, এমন দৃশ্য কখনো দেখতে পাবো তা সত্যিই ভাবিনি। গ্রামবাসীও ভেবেছে বলে মনে হয় না। মাত্র ছয় মাস গ্রামে ছিলাম না, এরই মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল? ভাবতে ভাবতে মিছিলটি রাজুর মামার উঠোনে হাজির হয়। মিছিল থেকে ধ্রুব, তূর্য আর রাজু ড্রইংরুমে প্রবেশ করে রাজুর মামার সাথে কথা বলতে। পারস্পারিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ধ্রুব কথা শুরু করে-

- কাকা, আপনি জানেন আমার আর তূর্যের মধ্যে অনেক দিনের বিরোধ। আমাদের এ বিরোধের কারণে গ্রামের মানুষও দু'টো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আছে দীর্ঘদিন যাবৎ। আর এ বিভক্তির কারণে গ্রামে অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে গ্রামের সকলেরই ক্ষতি এ ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। ক্ষমতার লোভে আমরা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই বিরোধ জিইয়ে রাখছিলাম। কিন্তু আপনার ভাগ্নে রাজু যাকে আমরা অসামাজিক বলতাম, যাকে নিয়ে আপনারাও চিন্তিত ছিলেন আমাদের আলোর পথ দেখালো। দিনের পর দিন পরিশ্রম করে সে আমাদেরকে এক ছাতার নীচে নিয়ে আসলো। কাকা, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা আর কখনো পদ-পদবীর জন্য দলাদলী করবো না। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কে কোন পদে দায়িত্ব-পালন করবে তা নির্ধারণ করবো। গ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো সকলের সহযোগিতায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ্য করতে চাইলে আমরা সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবো।

আমি রাজুর মামা'র দিকে তাকাই। বৃদ্ধ লোকটির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এ অশ্রু কষ্টের নয়, আনন্দের। তিনি দাঁড়িয়ে ধ্রুব, তূর্য্য এবং রাজুকে জড়িয়ে ধরে বলেন-

-আমরা অনেক চেষ্টা করেও গ্রামের মানুষকে একত্রিত করতে পারিনি। আজ বুঝতে পারছি আমাদের চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতার ঘাটতি ছিলো। হয়তো বা আমাদের কারও কারও চাওয়ার মধ্যেও গলদ ছিলো। কিন্তু, তোমরা বর্তমান প্রজন্ম দেখিয়ে দিলে, স্বচ্ছ হৃদয়ে লড়াই করা যোদ্ধারা পরাজিত হয় না। আমার ভাগ্নের কথা আর কি বলবো। ও'কে তো আমরা অসামাজিক ট্যাগ লাগিয়ে এক ঘরে করে দিয়েছিলাম। কিন্তু রাজুর যে কর্মকাণ্ডগুলো করেছে তাতে তাকে কি আর অসামাজিক বলা ঠিক হবে? কি বলো তোমরা?

সকলে সমস্বরে বলে ওঠে- না, ঠিক হবে না। রাজু মোটেও অসামাজিক নয় বরং আমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি সামাজিক।

অপূর্ণ আনন্দ

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই

সুন্দর সুখী পরিবারের স্বপ্ন কে না চায়। সবাই চায় জীবনটা সুখের হোক, আনন্দে কাটুক। কিন্তু মাঝে মধ্যে জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত, ঘটনা চলে আসে যা সকল সুখ- আনন্দকে ধূলিসাৎ করে দিতেও ভাবে না। হ্যাঁ, জানি জীবনের সংজ্ঞাটাই এমন যে, কঠিনের মাঝে, সমতলের মধ্যে, ঝড়ো হাওয়া সবটাই থাকবে তবুও এগিয়ে চলতে হয়। কারণ সহজ জীবন, কঠিনের উপলব্ধি না থাকলে জীবনের মানেটা পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে আসে না। তাই জীবন মানে লড়াই, বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্খা, ঘুরে দাঁড়ানোর মনোবল এবং সংগ্রামী জীবনে লড়াকু হওয়া। বলছি তেমনই এক পরিবারের গল্প যে পরিবারে অভাব ছিল তবুও ভালোবাসা ছিল। পারিবারিক বন্ধন ছিল। ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি আর্দশ পরিবার।

পরিবারে বাবা-ই ছিলেন একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি যার উপর নির্ভর করত অনেকগুলো মুখ। অনেকগুলো স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্খা। পরিবারে মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন প্রার্থনাশীল, ভাল মনের , আর্দশ ব্যক্তিত্ব বলা যায় ------ পরিবারটি পিতা-মাতার আর্দশে খুব ভাল শৃঙ্খলভাবে চলত। সন্তানেরা মা-বাবার বাধ্য হয়ে চলত। সন্ধাবেলা রোজারী প্রার্থনা হতো, সন্তানেরা কিন্তু মা-বাবার কাছ থেকেই গান-প্রার্থনা শিখত। সত্যি পারিবারিক ভালবাসার কমতি ছিল না। এভাবেই দিন, মাস, বছর যেতে থাকল, সন্তানেরা বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ এই পরিবারে নেমে এলো এক দমকা হাওয়ার ন্যায় কঠিন মুর্হুত যা ছোট ছোট স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে ফেলে আবার স্বপ্নের মতোই জীবন নামক রেলগাড়ীটা সব কেড়ে নিয়েও ফিরিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও পরিবারটি খুব জাগতিক ভোগ-বিলাসিতার উর্ধ্বে না গিয়ে সহজ-সরল সাদা-মাটা স্বচ্ছলতা নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। হ্যাঁ, বলতেই হবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন পরিবারটি ঘিরে রেখেছিল। তাই তো কঠিণ সময়গুলো পিতা-মাতার খুব যত্ন নিয়ে ধরে রাখতে সক্ষম হোন।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। বাবা যিনি মাথার উপর ছাদ, বটবৃক্ষ তিনি চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যে সন্তানদের তিনি মানুষ করেন তারাই সংসারে হাল ধরে। এভাবেই শুরু হয় আরো একটি নতুন অধ্যায়। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, ঝড়-চড়াই-উৎরাই পার হয়ে একটা সময় পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। আর এভাবে চলতে থাকে একটি বৃহৎ যৌথ পরিবার। বর্তমানে যেখানে যৌথ পরিবারই দেখা যায় না। সেখানে পিতা-মাতার আদর্শ অনুসরণ করে সন্তানেরাও বাবার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে একসাথে মিলে-মিশে থাকতে শুরু করে। সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ সব যেন এক ফ্রেমে বাঁধা কিছু স্মৃতি, মুর্হুত এবং যেখানে ছিল ভালবাসা তো বটে। কিন্তু এতকিছুর পরও একটা সময় এলো ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের। তাই তো পরিবারটি হয়ে পড়ে আবারো অসহায়। পরিবার যাকে ছাড়া কিছু ভাবত না, গ্রামবাসী সমস্যায় পড়লে যার কাছে ছুটে আসতেন সেই তিনি ভবের নীলা সাঙ্গ করে পিতার রাজ্যে অনন্ত সুখের আশায় চলে যান।

এদিকে ধীরে ধীরে বড়দিনও ঘনিয়ে এলো। পরিবারের সবাই কিভাবে এই আনন্দ উপভোগ করবে তাই তো জানেন না। এক অপূর্ণ, অতৃপ্ত আনন্দ পুরো পরিবারকে আস্টে পৃষ্টে আছে। জীবনের যেমন শুরু আছে ঠিক তেমনি শেষও আছে। তবুও কিছু স্মৃতি, বা মুহূর্ত ভোলার নয়। 'অপূর্ণ আনন্দ' যেভাবে পরিবারটিকে ঘিরে রয়েছে তেমনি অতৃপ্ত খেকে যাবে মনের চাওয়া-পাওয়া যদি আমরা মনের কালিমা দূর করি। হিংসা-বিদ্বেষ, মনোমালিন্য, রেষারেষি ভুলে ভালোবাসার মিলন সাজে সাজতে হবে যেন এই পুণ্য তিথি' বড়দিন' হয় সকল আশা-ভরসার স্থান। আমরা যেন প্রত্যেকে পরিবার -পরিজন কাছের মানুষগুলোকে পর না ভেবে দূরে সরিয়ে দেই। পরিবারের মানুষগুলোকে বোঝা মনে না করি। অতিথি সেবায় আনন্দিত হই। কাছের মানুষ এলে মুখ কালো না করে ভালবাসায় কাছে টেনে নেই। তাহলেই পূর্ণ হবে প্রকৃত 'বড়দিন'। পূর্ণতা পাবে শিশু যিশুর জন্মগ্রহণ। সত্যি বলতে বর্তমান সময়ে ভালবাসা একটু কেমন যেন মরিচা পড়ে গেছে। ভালোবাসার সুন্দর মুহূর্তগুলো পরিণত হয়েছে ক্ষোভে, কখনো চরম অরাজকতায় আবার কখনো অবহেলা আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এইসবের মধ্যে। কিন্তু যিনি পৃথিবীর আলো আলোকিত করে এই ধরণীতে এলেন তিনি চান শান্তি, একতা, ভালোবাসা এবং শুধুই ভালোবাসা। ভালোবাসার উর্ধ্বে আর কিছুই থাকতে পারে না। তাই আসুন গড়ে তুলি তেমনই এক সমাজ, পরিবার যেখানে থেকে শিশু বিকশিত, প্রস্ফূটিত হতে সক্ষম হবে এবং সর্বোপরি নৈতিক আর্দশের মধ্যে থেকে নিজেকে তৈরি করতে আগ্রহী হবে।

পলু শিকারী ও আঙ্গুরফল

সাগর কোড়াইয়া

পলু শিকারী শয্যাশায়ী। এই যাত্রায় যে বেঁচে ফিরতে পারবে না তা নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়। আত্মীয়-স্বজনরা এসে দেখে যাচ্ছে। সবার একই কথা, পলু বেশ ভালো লোক ছিলো। ভাওয়ালে খবর দেবার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সন্দেহ, আত্মীয়রা এসে জীবিত দেখতে পাবে কিনা!

পলু শিকারীর জীবনটা বিভিন্ন রঙের ভরপুর। জন্ম ভাওয়ালে। এরপর শিকারের নেশায় উত্তরে চলে আসা। বাবা-মায়ের বারণ অমান্য করে এই অচেনা এলাকায় সংসার বেঁধেছিলো। সবেমাত্র তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। অভাব-অনটন চারিদিকে। একদিন সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন লোক এসে হাজির। সবাই পলু শিকারীর সাথে দেখা করবে।

পলু শিকারীর উড়নচণ্ডী মন। সারাদিন কাঁধে দু'নলা বন্দুক নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরে বাড়িতে আসে। বাড়ির কাছে এসে মনটা ছলাৎ করে উঠে। উঠানে এতো মানুষের সমাগম কেন! কার আবার কি হলো। আলগোছে বাড়িতে প্রবেশ করে দেখে সবাই অচেনা। সবার মাঝখানে বৃদ্ধ বাবা বসে আছে।

এমনিতেই পলু শিকারীর বাবার মুখভরা গল্প জমে থাকে। অন্য এলাকার লোক পেয়ে তার গল্পের ঝুঁলি যেন ফুরাতেই চায় না। পলুকে দেখে বলে উঠে, ঐ যে সারাদিন পর জমিদার ফিরে এলো। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে তা ওকেই বলুন।

পলু ভাবতে থাকে, কি আর বলবে? হয়তো শিকার করে দেবার কোন আবদার নিয়ে এসেছে। আর ঠিক হলোও তাই। লোকগুলো যমুনাপাড়ের ওপার থেকে এসেছে। এলাকার নাম চাটমোহর। নামটি শুনে পলু শিকারীর কেন যেন হাসতে ইচ্ছা হলো। তবে হাসতে পারলো না। লোকগুলোর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। প্রটেস্টান্ট পালক বন্য শুকরের ভয়ে এলাকায় আসা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্য শুকর নিধন করতে না পারলে এলাকায় আর আসবেন না বলে দিয়েছেন।

যাই হোক, পলু শিকারীর ভালোই লাগলো ওদের কথা শুনে। ভবঘুরে হয়ে ঘুরতে ভালোই হবে। সাতপাঁচ না ভেবে রাজি হয়ে গেলো। তবে পলুর শর্ত একটাই, এলাকা ভালো লেগে গেলে বসতিও গড়ে তুলতে পারে।

এরপর সময় সুযোগ দেখে পলু একদিন ট্রেনে চড়ে বসে। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা এলাকা। লোকগুলো ফিরে যাবার সময় শুধু ঠিকানা বলে গিয়েছিলো। উত্তাল যমুনা লঞ্চে পাড়ি দিয়ে এপারে এসে আবারো ট্রেন। মধ্যরাতে চাটমোহর স্টেশনে এসে নামে পলু। অন্ধকার স্টেশন। লোকজন নাই। সারারাত স্টেশনে নির্ঘুম কাটিয়ে দেয়। সকালে টমটমে চড়ে উত্থলীতে এসে উপস্থিত হয় পলু শিকারী।

সময়টা ছিলো জমিদারের আমল। এলাকার চারিদিক বনজঙ্গলে ভরা। মানুষের অভাব লেগেই থাকে। এর মধ্যে বন্যশুকর এসে ফসলি মাঠ নষ্ট করে ফেলে। জমিদার ঘোষণা দিলেন শুকর মেরে যে লেজ জমা দিতে পারবে তার জন্য বিঘা বিঘা জমি বরাদ্দ।

পলু শিকারী কি এই ঘোষণা অমান্য করতে পারে। জমির লোভ নয় বরং শিকারের লোভেই কার্যোদ্ধারে লেগে পড়ে। অল্প কয়েকদিনেই বহু জমির মালিক বনে যায় পলু শিকারী। বসত করার মতো ঘরও তুলে ফেলে। ভাওয়াল থেকে স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। বাবা ও অন্য আত্মীয়দের আসতে বলেছিলো কিন্তু তাদের একই কথা, যেখানে জন্মেছি সেখানেই মরবো।

পলুর কি আর করা। নিজের ভাগ্যগড়ার জন্য নিজেকেই পথ বেছে নিতে হয়েছে। ঐ যে ভবঘুরে মন; ঘরে টিকে থাকা দুঃসহ হয়ে পড়ে। এখানেও বেশিদিন টিকতে পারেনি। স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও অনত্র বসতি গড়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। স্ত্রীর এক কথা, ছেলেগুলোকে ঠিকমতো পড়াশুনা করতে দিলে না।

আসলে পলুর মন পড়ে থাকে শিকারের নেশায়। কতবার যে বাঘের থাবা থেকে বেঁচে ফিরেছে। একবার তো বাঘ গাছ থেকে হামলে পড়ে পলুর ওপর। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে পলু সরে যায় বলে সে যাত্রায় বিপদ ঘটেনি। পলুর আফসোস, বাঘটিকে মারতে পারেনি। আরেকবার জানতে পারে, বাঘগুলো খেয়ে বিলের জঙ্গলে গিয়ে পালিয়েছে। গুলি খাওয়া বাঘ বরাবরই ভয়ংকর। বাঘটিকে মারার জন্য পলুর মন উদগ্রীব। তবে সমস্যা, শিকারীদের একটা ধর্ম আছে। যার বন্দুকের গুলি প্রথম লাগে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন শিকারী গুলি ছুঁড়তে পারে না।

দুইদিন পর পলু শিকারীর ডাক আসে। মহোল্লাসে দু'নলা বন্দুক নিয়ে পলু হাজির। বাঘটিকে খুঁজে বের করে। কাঁটাঝোঁপের ভেতরে ঘুমাচ্ছে। কেউ সাহস করে পলুর সাথে আসে না। পলুর প্রচণ্ড সাহস। বন্দুক হাতে বাঘের কাছাকাছি চলে যায়। এ যেন মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে চলা।

গুলি খাওয়া বাঘ শেষ মূহূর্তে কিভাবে যেন পলুর উপস্থিতি টের পায়। বাঘটি যেই না লাফ দিয়েছে অমনি দুড়ুম করে একটা শব্দ হলো। গ্রামের সবাই বুঝলো কাজ হয়েছে। বাঘটি একটু সামনে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। লোকজন এসে দেখে পলু বাঘের শরীরের ওপর উঠে বসে আছে। সবাই অবাক! এ আবার কেমন ধারার শিকারী।

আরেকবার হয়েছে আরেক কাণ্ড। পলু শিকারী তখন পরিবারসহ মানগাছাতে বসতি গড়েছে। বয়সও বাড়ছে পলুর। আগের মতো শরীরে শক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু মনের জোর প্রচণ্ড। গ্রামের মুসলিমরা এসে পলুকে এক প্রকার জোরজবরদস্তিই করতে লাগলো। জঙ্গলী শুকর জমির ধান খেয়ে ফেলছে। যে করেই হোক পলু শিকারীকে মারতে হবে। মারতে পারলে উপঢৌকন অবধারিত।

পলু শিকারীর উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই। মনে জেগেছে শিকারের নেশা। ঠিকই একদিন বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মুসলমানপাড়ায় গিয়ে হাজির। ঠিক সন্ধ্যার আগ মূহূর্তে মাঝারি আকারের কয়েকটি শুকরের বাচ্চা ধানের জমিতে এসে নামে। আঁধশোয়া অবস্থায় পলুর বন্দুকও তাক করা। যেই না গুলি ছুঁড়তে যাবে অমনি বিরাটাকারের একটি শুকর গোঁতগোঁত শব্দে এসে পলুর হাত কামড়ে ধরে।

পলু ব্যাথায় কুকড়ে উঠে। হাত থেকে বন্দুক ছিটকে যায়। পলুর ছেলে প্রথমদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তবে নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগে না। বাবার বন্দুকটা কুঁড়িয়ে নেয়। ইতিমধ্যে শিকারী হিসাবে পলুর ছেলেরও এলাকায় বেশ নামডাক। শুকরটির বুক বরাবর গুলি করে। মূহূর্তে শুকরটি মারা যায়। সে যাত্রায় পলুর হাত বেশ

বাকি অংশ ১২০ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

সাতাশের রাতে

সুনীল পেরেরা

তখন দিন ফুরিয়ে যায় নি। সবে মাত্র রক্তলাল আস্তগামী সূর্যটা সারা আকাশে বিধুর আভা ছড়িয়ে একটু একটু করে ডুবি যাচ্ছে। এরই মধ্যে মরা বিকেলের হলুদাভ অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে গাছের পাতায় পাতায়। নিস্তরঙ্গ গোধূলি সন্ধ্যায় আকাশের গায়ে রেখা টেনে একদল ভয়ার্ত বলাকা উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের পথে।

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। আকাশের চাঁদেরয়ায় সন্ধ্যা তারাটি দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে রাতের সাক্ষী হয়ে হয়তো বিকেলে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি হয়েছে। বাতাসে তারই ভিজে গন্ধ ছড়াচ্ছে। পথের ধারে কোন বাড়িতে আনন্দোৎসবে তারাবাজির ফুলকি ছড়াচ্ছে। আকাশে ম্রিয়মান ক্ষীণ চাঁদ উঠেছে। কিন্তু গাছের আড়ালে থাকায় তেমন জ্যোৎস্না ফোঁটেনি। একটু পরেই একটা ট্রেন মাটি কাঁপিয়ে কানফাঁটা আওয়াজ তুলে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে চলে গেল। দু'পাশের জঙ্গলের রূপ দেখতে দেখতে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। নীরার পছন্দের 'স্বর্গপূরী'।

সারাদিনের অবিরাম জার্নিতে সবাই ক্লান্ত। এখন হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় পড়তে পারলেই এক ঘুমে রাত কাবার। নীরবতা সেন্ডেল না খুলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। সারা যাত্রাপথে তিনবার বমি করেছে। শেষবার বমি করেছে রেল স্টেশনের মোড়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সামনে বাটিতে ডাল রুটির উচ্ছিষ্ট অংশ মাছি ভনভন করছে। লোকটা খ্যান খ্যানে গলায় খুক্কুর খুক্কুর করে কাশছে আর দলাদলা কফ ফেলাছে পথের উপর। কিছুটা পড়ছে তার পায়ের কাছে আর বাটিতে। দেখে মনে হলো মৃতপ্রায় মানুষেরও কত আশা বেঁচে থাকার।

শীতের মাঝে গরম জলে সবাই স্নান করে খাবার জন্য বসেছি। এ সময় চিঁড়ে চ্যাপ্টা গোছের একটা লোক মুখে সহৃদয় হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, এক্ষুনি রাতের খানা দেই স্যার?

আমি ধমক দিয়ে বললাম, রাত কোথায়, সবে তো সন্ধ্যা পেরোল। আমার কথায় সে আর কোন কিছু না বলে মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়।

নীরা হাই তুলতে তুলতে বলল, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, এক্ষুণি ভাত খাবে। তখন সবাই সমস্বরে ভাত খাবে বলে চেঁচিয়ে উঠল।

এ আদেশ পেয়েই লোকটার রেখা বহুল সারা মুখে ঝলমলে হাসি ফুটে উঠল। সে বিনয়ের সঙ্গে কিঞ্চিত ঘাড় কাৎ করে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। আমরা বলতে আমি, নীরা আর বন্ধু নিলয়।

ত্রিভঙ্গ এই লোকটাই এ বাংলোর ম্যানেজার, পাহাড়াদার, বাবুর্চি। ওর নাম গেছা। নাম যাই হোক, রাতে খাবার খেয়ে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল, নাম গেছা হলে কি হবে, রান্নায় পাক্কা শেয়ানা, নীরা তো হতে চেটে খেয়েছে।

পরদিন প্রভাতী পাখীর কলকাকলীতে শিশির ভেজা নরম সকালে ঘুম ভাঙ্গলে। তখন সোনা-গলানো পূর্বাকাশে সবে মাত্র ভোরের লাল সূর্য উঁকি দিয়েছে। শিশির ভেজা পাতায় রঙ্গিন রোদ গড়িয়ে পড়েছে। শীতের হালকা বাতাসে বুনো ফুলের গন্ধ। বাড়ির লনে জোড়া শালিকের পায়ে একটুকরো শান্তে রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছিল সকালের আশাবাদী রোদ দেখে আল্লাদে আটখানা। একেবারে গ্লোরিয়াস সান সাইন।

এ সময় সবাইকে চমকে দিয়ে একটা ছিপছিপে তন্বী মেয়ে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলো। আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। গতরাতে কেউ এই মেয়েকে দেখেনি। নাম জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটা এক গালে হাসল। ওর নাম রূপা। রূপা রূপসী নয় তবে ওর রূপ আছে। মেঘকালো গায়ের রং। সবে মাত্র যৌবনের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। কথা বলার সময় ওর পায়রা চোখের মনিতে চঞ্চলতায় ঝিলিক ওঠে। পায়ে ছন্দ তুলে হাঁটে। পাতলা ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ঝুলিয়ে রাখে সব সময়।

দুই দিনের মধ্যেই রূপা আমাদের সবার আপনজন হয়ে গেল। আমরা রূপাকে আপন করে নেবার আগে রূপা নিজেই আমাদের আপন করে নিয়েছে ওর কাজ আর ব্যবহার দিয়ে। ওর জন্যই আমাদের বন ভ্রমণ স্বার্থক।

তৃতীয় দিনে, আমরা বেশ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত দুপুরে কারও কান্নায় আমায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে কান্না এমন ভৌতিক যে, আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম। জানি না মানুষের অন্তরে কত কষ্ট থাকলে এমন করে, কাঁদে। নীরার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম সে গভীর ঘুমে অচেতন। দরজা খুলে বাইরে এসে লক্ষ্য করলাম কান্নার শব্দ আসছে, রান্না ঘরের ওপাশে থেকে। তবে কি রূপা অমন করে কাঁদছে? এমন মন জোগানী হাসি খুশি মেয়েটা এমন করল স্বরে কাঁদতে পারে তা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

রান্নাঘর পেরিয়ে যেতেই দেখি গেদা তার বারান্দায় স্থবির হয়ে বসে রয়েছে। গেদা নিজেও চাপা কণ্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভিতরে রূপা আর বাইরে গেদা। আমি কি বলে সান্ত্বনা দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। হয়তো আমার আগমনে ঘরের কান্না থেকে গেল। গেদাকে জিজ্ঞেস করলাম, রূপা এভাবে কাঁদছে কেন, কোন দুর্ঘটনা?

গেদা অনেক কষ্টে হাতের তালুতে চোখ মুছে যা বলল, তা এক করুন হৃদয় বিদারক কাহিনী। রূপা ছোটবেলা থেকেই দূরন্ত ছিল। ক্ষেতে খামারে কাজ করা, খালে বিলে মাছ ধরা কোনটাই বাদ যেতো না। হঠাৎ করেই ওর বাবা-মা মারা যাবার পর ওর আপনজন বলতে শুধু আমরাই। রূপা আমার আপন ভাগ্নি। ওর পড়াশুনার সব খরচ আমিই দেই।

আমি অধৈর্য্য হয়ে প্রশ্ন করি, তো রূপা এখন কাঁদছে কেন?

গেদা ওর ভেজা চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। একটু ক্ষণ পর জোরে একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাশে শুয়ে থাকা কুকুরটা কুইকুই করে কাঁদতে শুরু করল টানা সুরে। কুকুরটাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে গেদা আবার বলতে শুরু করে।

সেদিন আমি শহরে গেলাম বাংলোর কিছু জিনিস কিনতে। কয়দিন পরেই রূপার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। রূপাকে বলে গেলাম সন্ধ্যার পরেই ফিরে আসব। রাস্তার যানজটের কারণে সন্ধ্যার ট্রেনটা ধরতে পারিনি। পরের ট্রেন ভোর পাঁচটায়। গ্রাম এলাকা তাই রাতের বেলা অন্য কোন যানবাহন ও আসতে চায় না। অগতা সারা রাত স্টেশনে বসে রইলাম।

সকালেই ফিরে এলাম। দেখি বাড়ির প্রধান ফটক সামান্য ভেজানো। বাইরে সব বাতি জ্বলছে। অথচ অন্যদিন রূপা নিজে আমার আগেই ওঠে বাতিগুলো নিভিয়ে রাখে।

রূপাকে ডাকলাম একবার, দুইবার। কোন সারা নেই। ভাবলাম সারারাত পড়া-লেখা করে ভোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। রূপার ঘরের দিকে গেলাম। ওর ঘর খেলো। উঁকি দিয়ে দেখি রূপা বিছানায় অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ। শীতের মাঝে ও রূপার মাথায় পানি দিলাম। অনেকক্ষণ পর সে চোখ মেলে তাকায়। সেই চাহনিতে আনন্দের ঝলক নেই, নেই কোন

খুশির ঝিলিক দু'চোখে বিষাদের জমাট বাঁধা কালো মেঘের বর্ষণ। কুকুরটা আবারও সুর করে কেঁদে উঠল। প্রথম ভেবেছিলাম হয়তো স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে।

এ সময় হঠাৎ করে 'মামাগো' বলে গগণ বিদারী আর্তনাদ। তারপর আমার দুইহাত জড়িয়ে ধরে বারবার প্রশ্ন করতে লাগল, 'আমার কি হবে মামা, আমার যে আর কিছুই রইল না।'

কিছুক্ষণ কান্নার পর রূপা একেবারে নির্বাক হয়ে যায়। সেই থেকে প্রতিমাসের ২৭ তারিখ রাতে এমনি করে কাঁদে। পরে রূপাই একদিন বলল, আমি শহর থেকে রাতে ফিরব বলে সে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। প্রায় একটার দিকে বড় গেট খোলার শব্দ হলো। রূপা ভাবল আমি ফিরে এসেছি। ছেলেটা ঠিক আমার কণ্ঠ নকল করে রূপাকে ডাকল। রূপা দ্রুত দরজা খুলতেই ছেলেটা তার মুখ চেপে ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যায়। পরেমুখে চেপে ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যায়। পরে মুখে বেঁধে বিছানায় ফেলে দেয়া। রূপা প্রাণপন চেষ্টা করে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শুধু বলেছে ছেলেটার কপালে একটা কাটা দাগ আছে।

ছেলেটাকে আমি চিনি। কয়েকদিন এদিকে ঘুরাঘুরিও করতে দেখেছি। ওর নাম বুলা। মুচিপাড়ার যদুর ছেলে। ওদের একটা জুতার দোকান আছে বাজারে। বাপ জুতা সেলাই করে আর ছেলে বেচাকেনা করে।

ইদানিং হাতে কিছু টাকা জমেছে তাই বিভিন্ন নামীদামী ব্র্যান্ডের জুতা নকল করে। পাংকোমার্কা চেহারা নিয়ে মেয়েদের পেছনে টাস্কি মেরে বেড়ায়। ওর কপালে একটা কাটা দাগ আছে। বুঝতে বাকি রইল না, ঐ ছেলেই সেই নরপিশাচ।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। ঘরে চলে এলাম গেদাকে সান্ত্বনা দিয়ে। সে রাত আর এক সেকেন্ডের জন্যও ঘুম হলো না। পরদিন সকালে গেদা এসে নাস্তা দিল। নীরা প্রায় ক্ষেপে গিয়ে বলল, রূপা রূপা কোথায়? ও না এলে নাস্তাই খাবো না। নিলয় ও নীরার দলে।

গেদা আমার দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে গেল। নাস্তা সেরে নীরা আর নিলয়কে বললাম, আমরা আজই, অর্থাৎ লাঞ্চ সেরেই ঢাকা ফিরে যাবো আমরা একটা জরুরী প্রয়োজনে। আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে গেদা এবং তার ভাগ্নি রূপা। রূপার কথা শুনে নিলয় বেশ খুশি হলেও নীরা ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলো। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি।

রূপা আর গেদা আমার বাসায়ই থাকল। রূপাকে মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি এক সপ্তাহ রূপাকে অবজারভেশনে রাখলেন তার ক্লিনিকে। এই মুহূর্তে রূপার মানসিক চিকিৎসা জরুরী। দুঃশ্চিন্তায় যে কোন সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সুইসাইড করার প্রবনতাও বৃদ্ধি পায়।

রূপাকে নিয়ে ব্যস্ততার কারণে নীরার সাথে তেমন যোগাযোগ হয়নি ফোনে দুইবার কথা বলা ছাড়া। নীরা কিন্তু গোপনে আমার সব খবরই রেখেছে। বিশেষ করে রূপাকে নিয়ে কখন কোথায় যাচ্ছি, রূপার চালচলন কেমন এসব।

চিকিৎসার পর রূপা বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছে।

আর দুইদিন পরেই ডাক্তার ফাইনাল রিপোর্ট দেবে। দুইদিন পরেই সেই সাতাশ তারিখে, সেই বিভীষিকাময় কালোরাত। রূপাকে এই দিনটি ডাক্তার তার ক্লিনিকেই রাখবেন বলে জানিয়েছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি ব্যাগ হাতে রূপা দাঁড়িয়ে আছে। বলল, আমি এখনই এই সকালের ট্রেনে চলে যাবে। আমি প্রায় উত্তেজিত স্বরে বললাম, চলে যাবে। চলে যাবে মানে? এখানো তোমার চিকিৎসা শেষ হয়নি। আর দুইটা দিন মাত্র।

গেদা আমাকে পাশে ডেকে নিয়ে বলল, গতকাল আপনার বান্ধবী নীরা এসেছিল। রূপাকে যাচ্ছে তাই বলে গালাগাল করেছে। বলেছে, তোমার সাথে তার এত দিনের প্রেম ভাঙ্গতেই নাকি রূপা এখানে দিনের পর দিন থাকছে। আরও যা বলেছে তা ভাষায় বলা যাবে না। আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। রূপা আপনাকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওকে বাঁধা দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অগত্যা রূপাকে ট্রেনে তুলে দিলাম। যাবার আগে আমরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ওর শীতল স্পর্শে আমার গা শিহরিত হলো। এ সময় হুঁইসেল দিয়ে হুশ হুশ করে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলাম বিমূরের মত।

এরপর অনেক দিন রূপার সাথে কোন যোগাযোগ হয়নি। সাতাশ তারিখে আবারও কি সে আগের মতই কাঁদে কিনা তাও জানি না। তবু ওর জন্য, ওর এই চরম অসহায়ত্তের জন্য নীরব সমবেদনায় বারবার মন হু হু করে কেঁদে ওঠে। শুনেছি নীরা এবার নিলয়কে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। সত্যিই মানুষের মন এক দুর্জ্ঞেয় নিনিষ। তাই ভাবি, জীবনের ছায়াময় রুক্ষ পথে চলতে গিয়ে অনেকেই আমার মতো হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।

১১৮ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

জখম হয়েছিলো। সেরে উঠতে সময় লেগেছে বেশ। এরপর আর কখনো বন্দুক ধরেনি পলু শিকারী। মনে ইচ্ছা জেগেছে বহুবার কিন্তু ইচ্ছা সম্বরণ করতে সময় লেগেছে।

এ রকম আরো বহু ঘটনা ঘটেছে পলুর জীবনে। সেই তেজময় পলু শিকারী আজ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। শরীরটা বিছানার সাথে লেপ্টে আছে। দেখে কে বলবে, এ পলু শিকারী। গলার কণ্ঠ ক্ষীণপ্রায়। গতকাল সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে বড় ছেলেকে কাছে ডাকে পলু শিকারী।

ফিস ফিস করে কি যেন বলতে চায়। বড় ছেলে মুখের কাছে কান নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। বহু কষ্টে বুঝতে পারে, পলু শিকারী আঙ্গুর খেতে চান। এই সময় কোথায় আঙ্গুর পাওয়া যায়। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। বড় ছেলে পলুকে বুঝাতে চেষ্টা করে, আগামীকাল আঙ্গুর কিনে আনবে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আঙ্গুর আনার জন্য ঈশ্বরদী অথবা পাবনা শহরে যেতে হবে। পরদিন ভোরবেলা সূর্য উঠার আগে পলুর বড় ছেলে ঈশ্বরদীর উদ্দেশে রওনা দেয়। সম্পূর্ণ রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হবে। ট্রেনে যাওয়া যেতো তবে দুপুরের আগে কোন ট্রেন নেই।

দিন গড়িয়ে রাত। তবু পলুর বড় ছেলে ফিরে আসে না। এদিকে পলু শিকারীর দেহটা নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। যে কোন সময় দেহত্যাগ করতে পারেন। রাত তখন প্রায় বারোটা। বাহিরে প্রচণ্ড শীত। কাঁপতে কাঁপতে পলুর বড় ছেলে ফিরে আসে। কাঁধের গামছাতে পাঁচটি কমলা বাঁধা। ঈশ্বরদীতে আঙ্গুর না পেয়ে পাবনা শহরে যেতে হয়েছে। সেখানেও আঙ্গুর নেই। অবশেষে কমলা নিয়েই ফিরতে হলো।

বাবা, বাবা বলে ডাকতেই পলু শিকারী বহু কষ্টে চোখ খুলে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। এরপর আর চোখ খুলেনি। ঘুমিয়ে পড়ে। তখন প্রায় ভোর রাত। সবাই ঘুমে অচেতন। পলু শিকারী মারা যায়।

বড় ছেলে তখন পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছিলো। সারাদিন কম ধকল যায়নি। সবার ডাকাডাকিতে বিছানা থেকে উঠে আসে। দেখে, বাবার দেহটা বিছানায় শোয়ানো। ঘুমন্ত চোখেমুখে যেন তৃপ্তি আর জয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। কিন্তু বড় ছেলের দুঃখ, বাবার শেষ আবদার অপূর্ণই রয়ে গেল।

এরপর থেকে পলু শিকারীর বড় ছেলে আর কখনো আঙ্গুরফল খায়নি।

আসন্ন বড়দিন
ও ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
পাঠক-পাঠিকাসহ
সকলকে
জানাই আন্তরিক প্রীতি
ও শুভেচ্ছা।

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সর্বজনীন ভালোবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের-যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

প্রয়াত ডানিয়েল রোজারিও
জন্ম: ১৭ নভেম্বর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১ জানুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"তুমি ছিলে, তুমি থাকবে
মোদের মনে চিরদিন।
তুমি আমাদের আদর্শ বাবা
তুমি ছিলে মোদের সব।"

বাবা,
দেখতে দেখতে কখন যে একটি বছর চলে গেছে বুঝতেই পারিনি তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো। তোমার এই হঠাৎ চলে যাওয়া আজও স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমরা তোমার এই চলে যাওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না । জানো তো, বাবা, তোমাকে ছাড়া বাড়িটা শূণ্য লাগে। তোমার উপস্থিতি, সান্নিধ্য, প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে। তুমি তো ছিলে আমাদের আর্দশ। তোমার বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, ন্যায়বোধ এবং সর্বদা অন্যের প্রতি সহৃদয়তা , সহমর্মিতা সত্যি অবর্ননীয়। তোমাকে ছাড়া আমরা খুব অসহায় গো বাবা। বড় একা লাগে তোমাকে ছাড়া । তোমার শূণ্যতা আজও কাঁদায় বাবা। তোমাকে ছাড়া আমরা ভালো নেই বাবা।
বাবা , তুমি আমাদের ভালোবাসায় চিরম্লান হয়ে থাকবে। আমরা জানি, তুমি প্রভুর সান্নিধ্যে পরম সুখে আছো। বাবা , তুমি আমাদের স্বর্গ থেকে আর্শীবাদ করো যেন আমরা আমাদের প্রিয় মাকে নিয়ে তোমার শিখানো পথে, খ্রিস্টীয় আদর্শে সর্বদা সৎ পথে চলতে পারি। তুমি ওপাড়ে খুব ভালো থেকো বাবা।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
আমাদের প্রিয় মা পারুল রোজারিও
ছেলে ও ছেলে বউ: শিশির-লিদিয়া , লিনুস-এ্যানি, বিপুল-শিল্পী, স্বপন-মারলিন, ব্রাদার সঞ্চয় মাথিয়াস রোজারিও সি.এস.সি.
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: রীটা-বিপিন, জেছিকা-হিমন গমেজ, সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এস.এস.এম.আই. আদরের নাতী-নাতনী ও আত্মীয়-স্বজন।
গ্রাম: পিপ্রাশৈর (মেতু করিগ বাড়ী) পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

"মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক তবে তাই হোক"

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ
জন্ম: ৯ মার্চ, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সিস্টার মেরীয়ান তেরেজা গমেজ সিএসসি
জন্ম: ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

শ্রদ্ধেয়া মা ও দিদি,

এ মরজগতে আমরা ক্ষণিকের অতিথি। তাইতো মনে হয় খুব অল্প সময়ের জন্য আমরা ছিলাম একসাথে। সহসা এক অদৃশ্য শক্তি তোমাদের ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে। ভাবতেই মনটা কেমন বিষন্ন হয়ে ওঠে। মনে হয় বড় অসময়ে তোমরা চলে গেলে। আর তো কত কি দেখার, উপভোগ করার কথা ছিল। এই তো সেদিন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিবসে সবাই একত্রিত হয়েছি। আমাদের সে মিলন মেলায় তোমরাই শুধু ছিলে অনুপস্থিত। আমি জানি আপাত দৃষ্টিতে তোমাদের না দেখলেও স্বর্গধাম থেকে তোমরা আমাদের ঠিকই দেখছ, আশীর্বাদ করছ, মিলে মিশে একাকার হয়ে আছ আমাদের সাথে। পরমপিতা যে অমৃতময় লোকে তোমাদের তুলে নিয়েছেন, সেখান থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো নিয়ত। থেকো পরম শান্তিতে। তোমাদের সাথে নিয়ে সকল আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে জানাই বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

তোমাদেরই স্নেহধন্য
ড. লরেন্স গমেজ, সুজান গমেজ
ও
পরিবার বর্গ
প্রামানিক বাড়ি, পাদ্রিকান্দা।

মার্কাস রোজারিও
জন্ম : ৩ জুলাই, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
বাবা: স্বর্গীয় পল রোজারিও
মা: স্বর্গীয় মারীয়া রোজারিও

পংকজ ফ্রান্সিস রোজারিও
জন্ম: ১১ জুন, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৮ অক্টোবর, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
বাবা: স্বর্গীয় মার্কাস রোজারিও
মা: ফ্লোরেন্স রোজারিও

আমাদের বাবা **মার্কাস রোজারিও** এবং **ভাই পংকজ ফ্রান্সিস রোজারিও**-এর আত্মার চির শান্তির জন্য পরমকরুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাদের স্বর্গীয় সুখ প্রদান করেন। শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের প্রতি চির মঙ্গলময় প্রার্থনা কামনা করি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
ফ্লোরেন্স রোজারিও
মনোজ পল ও সোনিয়া রোজারিও
শিউলী ও জেভিয়ার ডি:ক্রুজ
মিতালী রোজারিও
রিয়া ও রাহুল রোজারিও

সবাইকে শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

গ্রাম: রাহুত হাটি
গায়ান বাড়ি
হাসনাবাদ ধর্মপল্লী

GLOBAL HORIZONS

START YOUR STUDY ABROAD JOURNEY

Speak With
PETER GOMES

- Free Counseling
- IELTS
- Top Ranked University Options
- Maximum Scholarships
- Learn About Internships
- Expert Visa Officer

এরই পাশাপাশি আপনারা উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন মালেশিয়া, নিউজিল্যান্ড, দুবাই এবং শেনজেন দেশগুলোতে।
সুবিধা রয়েছে **Spouse** ভিসা এবং **Visit** ভিসারও।

Suite 322, Lvl 4,
RH Home Center
74/B/1 Green Rd, Dhaka 1215

HOTLINES: 01857 866 409, 01612 1919 82

www.globalhorizons.com.bd

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত স্বপ্না ম্যাগডেলিন পেরেরা
জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
যাকোব মাষ্টারবাড়ী, পুরান তুইতাল
তাসুল্লা, বাংলাবাজার
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

তোমার চিরবিদায়ের পঞ্চম বার্ষিকী পেরিয়ে গেলেও আমাদের হৃদয়ে আজও তুমি রয়েছ অম্লান। আমরা তোমাকে আগলিয়ে রেখেছি চিরঞ্জীব করে। তোমার বিয়োগ ব্যথায় প্রতিনিয়ত কাতর চিত্তে অশ্রু সজলে ভাসিয়ে দিই আমাদের দু'নয়ন। ঈশ্বরের পরম ইচ্ছেই তোমাকে কতটা ভালোবেসে তিনি তাঁর রাজ্যে তোমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। আমরা বিশ্বাস করি তুমি আজ স্বর্গের অনন্ত রাজ্যে চিরসুখে রয়েছ। তোমার গড়া সংসারে তোমার স্মৃতিগুলো এখনও দীপ্তমান। তুমি আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করো যেন আমরা তোমার আদর্শগুলো আকড়ে ধরে এগিয়ে চলতে পারি। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা তুমি রয়েছ, থাকবে অনন্তকাল। আজ তোমার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে লহো আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শোকার্ত চিত্তে তোমারই প্রিয়জন

স্বামী: জর্জ রঞ্জিত পেরেরা
মেয়ে: প্রথমা পেরেরা
ছোট ছেলে: প্রতাপ পেরেরা

ভাই: ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ
ও শোকাহত স্বজনবৃন্দ।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগীতা করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যাঁরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই ।

সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

ফাদার কমল কোড়াইয়া — মালবিন ক্লারা বাড়ৈ — থিওফিল নিশারন নকরেক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিদেশ প্রতিনিধিগণ

জেমস্‌ গমেজ (আদি), আমেরিকা — ডেভিড স্বপন রোজারিও, আমেরিকা — বিপুল এলিট গনছালভেস, আমেরিকা — হিউবার্ট ডি'ক্রুজ, আমেরিকা

সুবীর কাশ্মির পেরেরা, আমেরিকা — মিন্টু রোজারিও, অস্ট্রেলিয়া — শংকর ভাস্কর পালমা, ইতালি, ইউরোপ — সুমন জন গমেজ, কানাডা

বাংলাদেশে সকল ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ, ধর্মব্রতী/ব্রতীনিগণ, বিভিন্ন ধর্মপল্লীর স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র উন্নয়নে সহায়তা করে চলেছেন। তাদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা।

Bangladesg Christian Association Europe

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন ইউরোপ

BCAE

Executive Committee for 2024-2025

মিস সুচিত্রা তেরেজা রোজারিও — সভাপতি
মি: ভিক্টর শেখর রোজারিও — সিনিয়র সহ-সভাপতি
মি: মিল্টন কস্তা — সহ-সভাপতি
মি. রোনাল্ড রিবেরু — সহ-সভাপতি
মি.রঞ্জন কোড়াইয়া — সহ-সভাপতি
মি.ববি যোসেফ পেরেরা — সাধারণ সম্পাদক

মিসেস জ্যাকলিন কস্তা — সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক
মিসেস নিপুন মনিকা বটলেরু — সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক
মি.কল্যান কোড়াইয়া — সাংগঠনিক সম্পাদক
মিসেস ম্যাগদালিনা গনসালভেস — সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
মি.জুড মার্ক রোজারিও — কোষাধ্যক্ষ
মিসেস সম্পা এমিলিয়া হাওয়াদার — মহ-কোষাধ্যক্ষ

মি: সবিতা গ্রেগরী — সহ-কোষাধ্যক্ষ
মি: রিকি স্ট্যানলি ডি ক্রুজ — শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক
মি: এলভিস কস্তা — সহ-শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
মিসেস রিমা রোজারিও — সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মিসেস জ্যাকলিন পান্ডে — সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মি: লিপন রোজারিও — আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

মি: উজ্জ্বল রোজারিও — ধর্মীয় সম্পাদক
মি: সামুয়েল এল. ডায়েস — সহ-ধর্মীয় সম্পাদক
মি: কিশোর সরেন — সাহিত্য ও প্রকাশনা
মি: জন সংগ্রাম গমেজ — সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
মি: লর্ড গোমেজ — দপ্তর সম্পাদক
মি: অপূর্ব গোমেজ — সহ-দপ্তর সম্পাদক

মি: রিংকু বিশ্বাস — ক্রীড়া সম্পাদক
মি: স্ট্যানলি পালমা — সহ-ক্রীড়া সম্পাদক
মি: নিক্কন কস্তা — প্রচার সম্পাদক
মি: শশী গোমেজ — সহ-প্রচার সম্পাদক
মি: অ্যান্ডি লেনার্ড ডায়েস — নির্বাচিত সদস্য
মি: নোয়েল দ্বীপ সরকার — নির্বাচিত সদস্য

মি: লিটন গাইন — নির্বাচিত সদস্য
মিসেস হেনরী ডি'কস্তা — উপদেষ্টা
মি: অজিত রোজারিও — উপদেষ্টা
মি: এডওয়ার্ড গমেজ — উপদেষ্টা
মি: ব্রাইন ডিয়াম — উপদেষ্টা
মি: শ্যামল প্রধান — উপদেষ্টা

মি. শংকর ভাস্কর পালমা — নির্বাচিত সদস্য
আলেক্স রোজারিও — উপদেষ্টা
মি.জীবন পিরিচ — উপদেষ্টা
মি.লরেন্স পিউরিফিকেশন — উপদেষ্টা
মি.মিকি ডায়েস — উপদেষ্টা
মি' লিটু বৈরাগী — উপদেষ্টা
মি. লিও এস.গমেজ — উপদেষ্টা

www.bcae.eu

স্বরূপকাঠির কান্না

ষ্টিফেন কোড়াইয়া

ঢং্ ঢং্ ঢং্। মফস্বল শহরের নিস্তব্দতা ভেঙ্গে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গির্জার পিতলের ঘন্টাটা সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় ঘোষণা করে। গোধূলি লগ্নের সেই পাতলা ফিঁকে অন্ধকারটা ক্রমেই ঘন থেকে ঘনতর হয়। সারাদিন গ্রামের অদূরে পুরাতন বটগাছটির আগডালে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকা ক্ষুধার্ত বাদুরগুলো খাবার সন্ধানে রাতের আকাশে ঘোরাফেরা শুরু করে। মেঘহীন আকাশে ফুঁটে উঠে অগণিত তারা। একফালী চাঁদ উঠেছে আকাশের কোনে। সরূপকাঠি গ্রামের মধ্য সীমানা ঘেঁসে চলে যাওয়া মেঠো পথটির দু'পাশের সারিবদ্ধ গাছগুলোর শিশির সিক্ত পাতার উপর স্নিগ্ধ চাঁদের আলো পড়ে যেন কোন অশরীরি আত্মার জলন্ত চক্ষু বলে ভুল হয়।

দ্রুত পা চালায় এন্টনী। হাতে পলিথিনের ব্যাগে এক কেজি চাল। এতক্ষণে অনাহারে হয়তো মূর্ছা গেছে অনন্যা, তার মেয়ে। বাপ হয়ে কিভাবে এমন কাজ করতে পারলো সে? নিজের ভুলের জন্য অনুতাপের দাবানলে পুড়তে পুড়তে কখন যে নিজ বাড়ি এসে পৌঁছে, তা যেন নিজেও বুঝতে পারেনা এন্টনী। স্বরূপকাঠি এলাকার মোটামুটি অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারের সন্তান এন্টনী। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, ধনী লোকের এই সব ক'টি বিশেষণই যেন সৃষ্টিকর্তা তাকে দিয়েছেন। স্ত্রী লাবনী, ছেলে অর্ণব ও মেয়ে অনন্যাকে নিয়ে তার সুখের সংসার। বাড়ী থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্ব স্বরূপকাঠি গির্জা। পুরুষানুক্রমে গির্জার যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে তাদের পরিবারের সুন্দর সম্পর্ক।

গির্জার পাশেই স্বরূপকাঠি খ্রিস্টান কবরস্থান। নতুন পুরাতন মিলে কয়েকশ ক্রুশ ও সমাধি প্রস্তর কবরস্থানটির প্রাচীনত্বের স্বাক্ষ্য বহন করছে। কবরস্থানের প্রবেশ পথের দু'পাশে হাত জোড় করা হাঁটু দেওয়া অবস্থায় দু'টো দেবদূতের মূর্তি। মনে হয় এই মূর্তি দু'টো যেন এ পৃথিবীর মায়ামোহ ছেড়ে পরকালের মহাযাত্রায় শরীক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে বিশ্ববাসীকে। একটু এগোলেই চোখে পড়ে পাশাপাশি টাইলস বাধান দু'টো সমাধি প্রস্তর। উপরে পিতলের প্লেটে সোনালী অক্ষরে লেখা ফ্রান্সিস মেলেছিয়াছ ও জোয়ান্না মেলেছিয়াছ, লিসবন, পর্তুগাল। প্রায় প্রতিদিনই মানুষ আসে এখানে। ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না মেলেছিয়াছের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে। কেউ কেউ নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানত করে, আবার কেউ কেউ তাদের মানত পূরণ হওয়ায় ফ্রান্সিস ও জোয়ান্নার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানায়। সরূপকাঠি মিশন বাড়ির এ সমাধিতে শায়িত। কে এই ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না মেলেছিয়াছ, যাদের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রতিদিন এত মানুষ আসে? মিশন বাড়ীর আশেপাশের যে কোন মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তরটা রূপকথার গল্পের মত একটানা বলে যায়। দিনের পর দিন একই গল্প বলতে বলতে যেন তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

স্বরূপকাঠি গ্রাম। নামের সাথে মিল রেখেই যেন গড়ে উঠেছে এ গ্রামের সমাজ, সংস্কৃতি, প্রকৃতি ও পরিবেশ। ধর্ম বা বর্ণে ভিন্ন হলেও এ গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে রয়েছে অবাক করা সম্মান, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক অভূতপূর্ব সমারোহ। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই যেন এক আশ্চর্য মেল-বন্ধনে আবদ্ধ। স্বরূপকাঠি গ্রামে সম্পর্কের এই বন্ধনের সূত্রপাত যাঁরা করে ছিলেন, তাঁদের নামই ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না। এই গ্রামের বিদেশী আদি বাসিন্দা।

শোনা যায়, পাক ভারতে মোগল শাসনের মাঝামাঝি সময়ে সুদূর পর্তুগাল থেকে ফ্রান্সিস নামে এক পর্যটক ভারতবর্ষ ভ্রমণে এসে ঘুরতে ঘুরতে একদিন স্বরূপকাঠি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। দিন কয়েক এখানে অবস্থানের পর এখানকার অসহায়, দরিদ্র পীরিত মানুষগুলোর অমায়িক ব্যবহার, আতিথেয়তা, সরলতা তাঁকে মুগ্ধ করলেও যে বিষয়টি তাঁর মনে পীড়া দেয়, তা হলো এ এলাকার মানুষের রন্দ্রে রন্দ্রে অশিক্ষা, অসচেতনতা, কুসংস্কার, ফলে সামান্য কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, মনোমালিন্য এমনকি মারামারি পর্যন্ত। এ অবস্থা থেকে কিভাবে তাদের মুক্ত করা যায়, সে উপায় খোঁজে ফ্রান্সিস। এখানে আর দেরী না করে নিজ দেশ পর্তুগাল ফিরে গিয়ে সবকিছু জানায় স্ত্রী জোয়ান্নাকে। স্বামীর কথায় জোয়ান্নাও ভারতবর্ষে এসে এ দেশের মানুষগুলোর কল্যাণে কিছু করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেন। তাই আর দেরী নয়। তাদের ইচ্ছার কথা জানিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্থায়ীভাবে ভারতে এসে বসবাসের অনুমতি প্রদানের আবেদন জানান। আবেদন মঞ্জুর হলে পর আর দেরী নয়, এখানে এসেই কাজ শুরু করেন এ দম্পতি।

গ্রামের মাঝ বরাবর এক টুকরো জমি ক্রয় করে নিজেদের থাকার জন্য তৈরী করে ফেলেন একটি কাঁচাপাকা ঘর। ঘরের একপাশে একটি বারান্দার মতো বানিয়ে শুরু করেন সকালে বাচ্চাদের ও বিকেলে বয়স্কদের স্কুল শিক্ষা কার্যক্রম। একজন স্থানীয় বাঙালি শিক্ষককে পাওয়া গেল তাদের কার্যক্রমে সাহায্য করার জন্য। লেখাপড়ার পাশাপাশি "সবাই একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট জীব। তাই মানুষে মানুষে আর কোন বিভেদ, রেষারেষি, ঝগড়া বিবাদ নয়, ররং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, আর এ লক্ষ্য অর্জনের ফল হলো মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করা।" এ কথা কয়টি মূল মন্ত্র করে শুরু করেন তাঁদের সমাজ সংস্কার কার্যক্রম। প্রতিদিন সকাল হলেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ফ্রান্সিসের স্কুলে এসে উপস্থিত হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষাদানের মাধ্যমে শুরু হয় তাদের স্কুল কার্যক্রম। বাংলাভাষা শিক্ষায় প্রচণ্ড আগ্রহী ফ্রান্সিস ও তার স্ত্রী জোয়ান্না সময় পেলেই বসে পড়েন ছাত্র ছাত্রীদের সাথে বাংলা ভাষা শেখার জন্য।

কয়েকদিনেই বাংলা ভাষাটি মোটামোটি রপ্ত করে ফেলেন তাঁরা। দু একটি কথা শুনে বা বলে মনের ভাব আদানপ্রদান করতেও পারেন এখন। মানুষের প্রতি তাদের অমায়িক ব্যবহার, কথাবার্তা সর্বোপরি অসুখে বিসুখে তাদের পরামর্শ এবং সামান্য ঔষধে কিভাবে রোগ ব্যাধি নিরাময় হচ্ছে, এ খবর স্বরূপকাঠি ও আশেপাশের গ্রাম গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী হয় না। বিভিন্ন সমস্যায় যেমন ফ্রান্সিস দম্পত্তি গ্রামের মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান, তেমনি তাদের সৎপথে চলার উপদেশ দেন। মাঝে মাঝে ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ভক্তির কথাও শোনান তাদের। গ্রামের মানুষ ঈশ্বরের প্রতি এ অসীম বিশ্বাস ও ভক্তি তারা কোথায় এবং কিভাবে পেলেন জানতে চাইলে তাদের হাতে একটি করে বাংলায় অনুদিত পবিত্র বাইবেল তুলে দেন তাঁরা। কেউ ইচ্ছে করলে বাংলা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে বাইবেল গ্রন্থটি তাদের পড়ে শোনান ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না।

পিতা ঈশ্বর, স্বর্গ-মর্ত ও নরক, আদি পিতা মাতা- আদম ও হবা, তাঁদের ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া এবং আদি পাপে নিজেদের কলুষিত করা, পৃথিবী, দিন-রাত্রি, সূর্য, চন্দ্র, প্রকৃতি, সাগর মহাসাগর সৃষ্টি, আদি পাপ মোচনের জন্য মানুষ রূপে স্বয়ং ঈশ্বরের মানুষ হয়ে যিশুখ্রিস্ট রূপে পৃথিবীতে আগমন, তাঁর ক্রুশীয়

মৃত্যু ও তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান ইত্যাদি ঘটনা শুনতে শুনতে একদিন সে মানুষগুলো ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তাদের এ বিশ্বাসকে স্থায়ী রূপ দিতে ফ্রান্সিস দম্পত্তিকে অনুরোধ জানান তারা।

তাদের কথায় ফ্রান্সিস ও তার স্ত্রী জোয়ান্না এই ভেবে খুশী হন যে, ঈশ্বর অবশেষে তাদের প্রার্থনা শুনেছেন। পৌত্তলিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী অত্র এলাকার মানুষ তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে সত্য ঈশ্বর তথা খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন খ্রিস্টে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা পরিপূর্ণভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করে। সে তো জানে একজন সাধারণ খ্রিস্টভক্ত হিসাবে তাদের এ বিশ্বাসকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্সিসের তো কিছুই করার ক্ষমতা নেই। একমাত্র একজন ধর্ম যাজকই পারেন এ কাজে তাদের সাহায্য করতে। খ্রিস্টকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণের পূর্বশর্ত হচ্ছে 'দীক্ষাস্নান' সংস্কার গ্রহণ করা, তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সংস্কারগুলো গ্রহণের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাই স্ত্রী জোয়ান্নার সাথে পরামর্শ করে জানাশুনা একজন কাথলিক পুরোহিতের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে পড়েন ফ্রান্সিস।

স্বরূপকাঠি গ্রাম থেকে কোন কাথলিক পুরোহিত থাকেন, এমন একটি কাথলিক গির্জার দূরত্ব নেহাতই কম নয়। হাঁটা পথে প্রায় দু'দিনের পথ পেরিয়ে নৌকায় আরো কয়েক ঘন্টা। তারপর উঁচুনীচু জঙ্গলাকীর্ণ হাঁটা পথে আরোও কয়েক মাইল গেলে লোকালয় শুরু। বেশ কয়েকটি ইউরোপিয়ান পরিবারের বাস এখানে। আশে পাশের কিছু কৃষক পরিবার বহু পূর্ব থেকেই খ্রিস্টধর্ম পালন করছে বলে এই এলাকাটি একটি খ্রিস্টান এলাকা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সেসাথে সুদূর পর্তুগাল থেকে খ্রিস্টান পুরোহিতগণ এসে নিজেদের স্থাপত্য শৈলীতে গির্জাঘর নির্মাণ করে খ্রিস্টের বাণী ও আদর্শ প্রচার করছেন। "কোন ধর্মই কোন মানুষকে ছোট করে দেখেনা, সকল ধর্মের মূল মন্ত্রই হচ্ছে মানুষের সেবার মাধ্যমে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে সেবা করা।" কিন্তু কে সেই সৃষ্টিকর্তা? সেই সৃষ্টিকর্তা হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, আল্লাহ্ বা ভগবান, যে নামে যে ডাকে তাঁকে। এভাবেই পর্তুগীজ মিশনারীগণের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ এলাকায় খ্রিস্ট বিশ্বাসীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে।

ফ্রান্সিস যখন সেই কাথলিক গির্জায় এসে পৌঁছেন, তখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। দীর্ঘ উঁচুনীচু জঙ্গলাকীর্ণ হাঁটা পথে চলতে চলতে ক্লান্ত ফ্রান্সিস সে গির্জার পুরোহিতের সাথে দেখা করার জন্য ছোট্ট কলিং বেলটা টিপে অপেক্ষা করতে থাকেন। একটু পরেই গির্জার পাল পুরোহিত ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা এলেন। ফ্রান্সিসের সাথে পরিচিত হয়ে সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে। এত দূর থেকে এসেছেন শুনে ধর্মপল্লীতেই তাঁর খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার পর গত তিন দিন হাঁটাপথ ও নৌকা ভ্রমণে ক্লান্ত শরীরটা একটু উজ্জীবিত হতেই ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা'র সাথে আলাপে বসেন ফ্রান্সিস। কথা প্রসঙ্গে প্রথমবার দেশ ভ্রমণে এসে স্বরূপকাঠি নামক এই গন্ডগ্রামে কিভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন সে বর্ণনা দেন। তারপর এ গ্রামের মানুষের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেখে তাদের উন্নয়নের সদিচ্ছা এবং চিরতরে এদেশে চলে আসা থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুই বলে গেলেন। ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা এই নিভৃত্যচারী স্বদেশী মানুষটির কথা শুনে শুধু অবাকই হলেন না, তাঁকে সর্বাত্তক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। ঠিক হয় কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে একটি ব্যবস্থা করে ফ্রান্সিস ও জোয়ান্নার গ্রাম স্বরূপকাঠিতে যাবেন।

প্রায় সপ্তাহখানেক পর ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা ফ্রান্সিসের গ্রাম স্বরূপকাঠির উদ্দেশে রওনা হন। নৌকা থেকে নেমে উচুনীচু জঙ্গলাকীর্ণ মেঠো পথে চলতে চলতে ক্লান্তি ও অবসাদে যখন পা দু'টো জড়িয়ে আসে, তখন রাস্তার পাশের কোন একটি বড় গাছের নীচে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করেন। হাঁটতে হাঁটতেই কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে পানির বোতলটা বের করে শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নেন।

এভাবে চলতে চলতে ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা যখন সরূপকাঠিতে এসে পৌঁছেন, তখন দিনের আলো নিবে গেছে। মেঘহীন আকাশে এক একে ফুঁটে উঠছে ছোট বড় উজ্জ্বল নক্ষত্র। "উট্টা হোওয়া, উট্টা হোওয়া" শব্দ করে সারাদিনের অভুক্ত শেয়ালের দল খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে। অচেনা রাস্তায় অসীম সাহসী বলে পরিচিত ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভার শরীরটাও যেন কেমন ছম্ ছম্ করে উঠে। জমাট বাঁধা অন্ধকারে ফাদারের হাতে ধরা ছোট টর্চের আলোটা মনে হয় যেন একটি জোনাকী পোকা। ক্ষণে ক্ষণে জ্বলছে আর নিবছে। হঠাৎ সামনে একটি আলো দেখে ফাদারের মনে মৃদু আশার সঞ্চার হয়েও যেন দপ্ করে নিবে যায়। ডাকাত নয়তো? শুনেছেন এ এলাকার অভাবী মানুষ রাতের বেলা কাউকে একা পেলে তার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। যদি তাই হয়, তবে তিনি কি করবেন? ঠিক করে ফেলেন ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা, তাঁর সাথে যা আছে, সবকিছুই দিয়ে দেবেন তাদের। নিশ্চয় খুব অভাবে আছে তারা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্বলন্ত মশাল হাতে লোকটি তার কাছে চলে আসে। মশালের আলোতে লোকটিকে দেখে সাহস ফিরে পায় ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা। সাদা শশ্রুমণ্ডিত ফ্রান্সিসকে চিনতে অসুবিধা হয়না ফাদার ডি' সিলভা'র। আন্তরিক সম্ভাষণ জানিয়ে ফাদারকে জড়িয়ে ধরে এ অজ পাড়াগায়ে তাঁর শুভাগমনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ফ্রান্সিস, তারপর তাকে অনুসরণ করতে বলে মশাল হাতে অন্ধ্যকার পথে এগিয়ে চলেন। কিছুক্ষণ চলার পর তারা একটি আধ পাকা ছিম্ ছাম্ বাড়ীতে এসে উঠেন। ঘরের এক কোনে একটি হ্যারিকেনের আলোয় একজন সাদা মহিলা মনযোগ দিয়ে কি যেন একটি বই পড়ছেন। দেখেই বুঝা যায় বাইবেল। ফ্রান্সিসের ডাকে বই থেকে মুখ তুলে ফ্রান্সিসের পেছনে ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভাকে দেখে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানান জোয়ান্না, ফ্রান্সিসের স্ত্রী।

পরদিন থেকেই শুরু হয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণেচ্ছু মানুষের আগমন। এতদিনে তারা খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। অন্তত: ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভার তাই মনে হয়েছে। যখনই যাকে যিশু খ্রিস্ট, তাঁর শিক্ষা ও সেবা কাজ, মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা ও যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, তখনই তাঁরা সঠিক জবাব দিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই তাদের বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ট প্রদান শুরু করেন তিনি। দেখতে দেখতে গ্রামের কয়েকশত মানুষ খ্রিস্টান হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করে। ফ্রান্সিসের টিনসেড ঘরের পাশে আর একটি লম্বা হল ঘরের মত আর একটি ঘর উঠে। এই ঘরটিই গির্জাঘর হিসাবে ব্যবহার শুরু করে মানুষ। ফাদার জেভিয়ার ডি' সিলভা এ ঘরটির নাম রাখেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গির্জা।

এরপর পেরিয়ে গেছে অনেক বছর। মোগল শাসন শেষ হয়ে দু'শত বছরের ব্রিটিশ শাসনেরও অবসান হয়। দিনে দিনে খ্রিস্ট বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গির্জার পরিধি বেড়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গির্জায় রূপান্তরের বয়সও প্রায় চারশত বছর পেরিয়ে গেছে। গির্জার পাশের সমাধি ক্ষেত্রে শায়িত ফ্রান্সিস ও জোয়ান্নার সমাধি প্রস্তরে লেখা তাদের মৃত্যুর তারিখ সেটা প্রমাণ করে। শত বছরের পরিক্রমায় পর্তুগীজ বংশদ্ভুত ফ্রান্সিসের নির্মিত সেই টিনসেড গির্জা ঘরটি সময় ও স্থাপত্যের উৎকর্ষে নির্মিত হয়েছে কয়েকবার। গির্জার পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে পুরোহিতদের আবাসিক গৃহ। সেন্ট ফ্রান্সিস জেবিয়ার স্কুল, কলেজ, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আরোও কত কি। পরিবর্তন এসেছে স্বরূপকাঠি গ্রামেরও। স্বরূপকাঠি এখন আর সেই গন্ডগ্রাম নেই। রীতিমত শহরতলী। এত বছরে এখানকার সবকিছু পরিবর্তন হলেও কিন্তু এখানে বসবাসরত মানুষগুলোর পরিবর্তন হয়নি। শত শত বছর

আগে সুদূর লিসবন থেকে এসে ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না দম্পতি যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, এত বছর পরও বংশ পরম্পরায় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এখানকার মানুষগুলো তা মনে রেখেছে। "কোন ধর্মই কোন মানুষকে ছোট করে দেখেনা, সকল ধর্মের মূল মন্ত্রই হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা ও সেবা। তাই মানুষকে সেবা করার মাধ্যমে সয়ং সৃষ্টিকর্তাকেই সেবা করা।"

স্বরূপকাঠির মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক সৌহার্দে ভাটা পড়ে তখন, যখন স্বরূপকাঠি মিশন হাউজ থেকে কয়েক মিনিট দূরত্বে বসবাসরত একটি খ্রিস্টান পরিবারের দুর্নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এত বছর পর ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না দম্পতির যুগ যুগ ধরে চলমান শিক্ষা যেন হোঁচট খায়। যে ধর্ম বিশ্বাস মানুষকে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের শিক্ষা দেয়, সে ধর্মে বিশ্বাসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যেখানে স্বরূপকাঠির ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীগণও হয়ে উঠেছে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পূজারী, তাদের এ অধঃপতনে স্বরূপকাঠিতে প্রথম খ্রিস্টবানী প্রচারক ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না'র অদৃশ্য আত্মা যেন কেঁদে ফেরে।

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গির্জার আশেপাশে হিন্দু মুসলিম ও খ্রিস্টান মিলে কয়েক হাজার পরিবারের বসবাস। ধর্ম বিশ্বাসে ভিন্নতা থাকলেও ফ্রান্সিস ও যোয়ান্না দম্পতির শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষগুলোর মধ্যে আজও সামাজিক মিল বন্ধনের কোন অভাব নেই। যে কারো ধর্মীয় উৎসবে অন্য ধর্মের প্রতিবেশীরা যোগ না দিলে সে উৎসব পালনে যেন পূর্ণতা আসেনা। তাই গির্জার ঘন্টার শব্দটা যেন এলাকার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কাছেই সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করার এক অমোঘ আহব্বান বলে মনে করে তারা। তাই তো গ্রামের মানুষগুলো স্বরূপকাঠি গির্জায় সন্ধ্যার ঘন্টাধ্বনির সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তাদের দিনের কাজকর্ম সেরে যার যার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে মন দেয়। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা যেমন সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীর থেকে ঘর্মাক্ত পরিধেয় বস্ত্রটি খোলে ফেলে সাদা পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে সন্তপর্ণে নামাজের টুপিটা মাথায় দিয়ে পাড়ার মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি মাটির প্রদ্বীপ ও ধোপদানী হাতে হিন্দু নারীরা ব্যস্ত হয় সান্ধ্য পূজার আয়োজনে। ধূপের গন্ধে মাতোয়ারা হয় চারদিক। খ্রিস্টান পরিবারগুলো ছোট বড় সবাই মিলে সান্ধ্য রোজারী মালা প্রার্থনার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোন কোন বাড়ি থেকে সমবেত রোজারীমালা জপের সমবেত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

গির্জার ঘন্টাধ্বনীর শব্দে বিরক্ত হয় সে গ্রামের মধ্যবিত্ত খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান এন্টনী। ধর্ম কর্ম বিষয়টি একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এজন্য অহেতুক বিকট শব্দ করে ঘন্টা বাঁজাবার কোন মানেই হয়না এন্টনীর কাছে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালোবাসা-বিশ্বাস, প্রার্থনা সবকিছুই তার কাছে মনে হয় অবান্তর, নিরর্থক, গির্জার পুরোহিতদের ধোঁকাবাজি। তাই সন্ধ্যার ঘন্টার পর পরিবারের ছোট বড় সবাই যখন মালার প্রার্থনা করতে বসে, তখন সে পাড়ার বন্ধু বান্ধব নিয়ে নেশার আড্ডায় বসে। এ সাথে যোগ হয় মদ্যপান আর জুয়া খেলা। বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই স্ত্রী লাবনী তাকে তিরস্কার করে। কথা কাটাকাটি হয় দু'জনের মাঝে, এ সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখায় স্বামীকে, কিন্তু যে কদু সে লাউ, কিছুতেই এন্টনীর অভ্যাসের পরিবর্তন হয়না, বরং নেশা ও জুয়া খেলা করার বদঅভ্যাসটি দিনে দিনে আরো বেড়ে যায়। তার সাথে যোগ দেয় বাড়ির আশেপাশের আরো কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব। সন্ধ্যা হলেই বাড়ির পাশের খালি জায়গাটিতে নেশার আসর বসে। মদ, গাঁজা সেবন থেকে শুরু করে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন মাদকের ব্যবহারও বাদ যায়না তাদের। এতকিছু করেও ক্ষ্যান্ত হয়না এন্টনী ও তার বন্ধুরা। কোথায় কিভাবে এ নেশার টাকা যোগার হবে, সে পরিকল্পনাও করে। ছেঁচকা চুরি থেকে ছিনতাই, সামান্য কারণে ঝগড়াঝাটি, মারামারি কিছুই বাদ যায়না তাদের পরিকল্পনা থেকে। এতসব করেও টাকা যোগার না হলে নিজের ঘর থেকে বিভিন্ন সামগ্রী এমনকি স্ত্রীর পরিদেয় শাড়ী, অলঙ্কার ইত্যাদি বিক্রি করে নেশার টাকা যোগার করা নিত্য নৈমেত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নেশার আড্ডায় কাউকে সঙ্গী হিসাবে না পেলে বাড়ির এককোনে বসে একাই শুরু করে মদ্য পান। চলে যতক্ষণ না স্ত্রী লাবনী এসে বাঁধা দেয়। কিছু দিনের মধ্যেই গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ নিয়ে গর্বিত সেই ধনী লোকটি হয়ে পড়ে কপর্দকশূন্য, নিঃস্ব।

সেদিন একটি লম্বা সময় ধরে গ্লাসের পর গ্লাস তরল পানীয় গলাদকরণ করে সবে মাত্র নেশাটা জমে উঠেছিল এন্টনীর। ডিসেম্বর মাস। তাই একটু আগেই সূর্যটা পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। বিষয়টি খেয়াল হয় তখন, যখন স্ত্রী লাবনীর খিট্‌খিটে কণ্ঠস্বরটা তপ্ত বারুদের মত এন্টনীর কানে এসে বাঁজে, "বলি মিনসের কি সংসারের প্রতি কোন খেয়াল আছে? এদিকে যে একমুঠো চালও নেই ঘরে। একটু পরেই যে দোকানপাট সবই বন্ধ হয়ে যাবে। সারাদিনের অভুক্ত ছেলেমেয়েগুলোকে তো একমুঠো খেতে দিতে হবে।"

লাবনীর কথায় এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারে এন্টনী, লাবনী অকারণে তাকে শাসাচ্ছেনা, কখন দিনের আলো নিবে পাতলা অন্ধ্যকার ভর করেছে সারা প্রকৃতি জুড়ে। কিঁচির মিঁচির শব্দ করে কয়েকটি পাখি রাতের আশ্রয়ের সন্ধানে খোলা আকাশের এদিক থেকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে। ক্ষীণ অন্ধকারের সাথে মিতালী পাকিয়ে উত্তরের কনকনে ঠান্ডা হাওয়াটা গায়ে এসে বিঁধছে। নেশার প্রভাবে টলতে টলতে কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়ায় এন্টনী। নিজের অজান্তেই স্ত্রী লাবনীর উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে করতে বাড়ির পাশ ঘেঁসে চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটা ধরে সামনের দিকে এগোয়। স্বরূপকাঠিতে বিদ্যুৎ এসেছে অনেক দিন হয়। তাই রাস্তার আশেপাশের বাড়ীগুলোতে বৈদ্যুতিক বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠছে। এতক্ষণে আকাশে একটি দুটো করে তাঁরাও ফুঁটতে শুরু করেছে।

শীতের রাত্রি বলে রমেন দোকানদার একটু আগেই দোকান বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দূর থেকে টলতে টলতে এন্টনীকে তার দোকানের দিকে আসতে দেখে একটু থামে রমেন, কিন্তু কি মনে হতেই ঝুঁপ ঝাঁপ করে দোকানের কপাট বন্ধ করে রাস্তায় নেমে পড়ে। নেশাগ্রস্ত হলেও এন্টনী বুঝতে পারে, তাকে দেখেই রমেন এমনটা করেছে। গত কয়েকদিনে বেশ বড় অংকের টাকা তার দোকানে বাকী পড়েছে এন্টনীর। আজও আবার বাকী চাবে ভেবে সে তার দোকানে পৌঁছার আগেই দোকান বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে।

"রমেন দা, আরে ও রমেন দা, দোকান বন্ধ করে দিয়েছ নাকি? আমি যে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম গো দাদা। ঘরে নাকি একটাও চাউল নেই। ছেলে মেয়েগুলো না খেয়ে আছে।" চিৎকার করে রমেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এন্টনী। "না, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, আর খোল্া যাবে না। বোতলের পর বোতল মদ খাওয়ার পয়সা হয় তোমার, কিন্তু চাউল কেনার পয়সা থাকে না।" রমেনের কথায় ক্ষেপে যায় এন্টনী। দৌঁড়ে গিয়ে রমেনের সার্টের কলার চেপে ধরে হেঁছকা টান দেয়। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাচ শুরু করে রমেন দোকানদার। এতে আরোও রেগে গিয়ে টেনে হিঁচড়ে মাটি থেকে উঠিয়ে তাকে দোকান খোলতে বাধ্য করে এন্টনী। নেশা গ্রস্তের সাথে কোন কথা বলে লাভ হবেনা ভেবে আর কোন কথা না বাড়িয়ে এক কেজি চাল মেপে এন্টনীর হাতে দিয়ে পুনরায় দোকানের দরজা বন্ধ করে দেয় রমেন।

চাউল ভরা পলিথিনের ব্যাগটি হাতে নিয়ে এন্টন যখন বাড়ি ফেরে, তখন রাত আরো বেড়ে গেছে। স্বরূপকাঠি মিশন বাড়ির আশেপাশের গ্রামগুলোতে ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোর সন্ধ্যা প্রার্থনা ও পূজা আরতীর শব্দ থেমে গিয়ে সাড়া প্রকৃতি জুড়ে শুরু হয়েছে একটানা ঝিল্লিরব। সারাদিনের

অনাহারক্লীষ্ট এন্টনীর ছেলে-মেয়ে দু'টো বাবার খাবার নিয়ে ফিরে আসার অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। "লাব...নী! লাবনী কোথায় গেলে, এই দেখ চাউল নিয়ে এসেছি। ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?" বাড়ি পৌঁছেই স্ত্রীর নাম ধরে ডাক দেয় এন্টনী। স্ত্রীর কোন সাড়া না পেয়ে এতক্ষণের মদের নেশাটা যেন হঠাৎ উবে যায় এন্টনীর। দৌড়ে শুবার ঘরে এসে দেখে লাবনী শুয়ে আছে। ছেলে মেয়ে দুটো মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "তোমাদের এতক্ষণ ধরে ডাকছি, শুনতে পাওনা নাকি?" রাগান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে এন্টনী। লাবনীর কোন সাড়া না পেয়ে কাছে গিয়ে মৃদু ধাক্কা দেয় এন্টনী। অনেক কষ্টে পাশ ফিরে লাবনী। অনাহারে শরীরের সমস্ত শক্তি যেন শেষ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেট জ্বলছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। তাই চেষ্টা করেও স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে পারছিল না এতক্ষণ লাবনী। ঘরে কম পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে। পাশ ফিরতেই লাবনীর মুখমণ্ডলটা চোখে পড়ে এন্টনীর। অনাহার ক্লীষ্ট সাদা পাণ্ডুর মুখ মণ্ডল। চোখ দুটো কুটরাগত। কি যেন বলতে চেয়েও বলতে পারছেনা সে। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি এনে লাবনীর মুখের কাছে ধরে এন্টনী। এক চুমুকে গ্লাসের সবটুকু পানি পান করলে পর গলায় স্বর ফুটে লাবনীর। "কখন এসেছ? কিছু কি আনতে পেরেছ?" স্বামীর দিকে ফিরে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে লাবনী। "হ্যা, এনেছি, কিন্তু রাঁধবে কে? তুমি তো উঠতেই পারছনা।" ব্যাকুল কণ্ঠে উত্তর দেয় এন্টনী। "আমাদের জন্য না হোক, অর্ণব আর অনন্যার জন্য হলেও যে আমাকে উঠতে হবে।" বলে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে বিছানায় উঠে বসে লাবনী। এন্টনী তাকে সাহায্য করে। এক গ্লাস পানিতে যেন জীবন ফিরে পায় লাবনী। ধীরে ধীরে শরীরে স্বভাবিক শক্তি ফিরে আসে।

স্বামীর হাত থেকে চাউল ভরা পলিথিনের ব্যাগটি নিয়ে রান্নাঘরে এসে তা চুলায় বসিয়ে দেয়। এতক্ষণে অর্ণব আর অনন্যার কান্না থেমেছে। অবুঝ শিশু হলেও মা বাবার কথায় তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে বাবা তাদের জন্য খাবার এনেছে। এখনই তারা খাবার পাবে। ভাত রান্না হলে লাবনী ও এন্টনী ছেলে মেয়েকে খাবার জন্য ডাকে। মা বাবার ডাকে বিছানায় উঠে বসে অর্ণব আর অনন্যা। বাবা মায়ের হাতে খাবারের থালা দেখে পেটের ক্ষুধাটা যেন আরো বেড়ে যায় ওদের। ছোঁ মেরে মায়ের হাত থেকে খাবারের থালাটি কেড়ে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে অর্ণব, এন্টন আর লাবনীর ছেলে। ক্ষুধায় কাতর হলেও মেয়ে অনন্যা বসে থাকে মূর্তির মত। "বসে রয়েছিস কেন মা, খা, তোর বাবা আমাদের জন্য খাবার এনেছে যে।" মেয়ের ভাবলেসহীন অবস্থা দেখে লাবনী মেয়েকে নিজ হাতে খাইয়ে দিতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। তার চোয়াল দুটো একটির সাথে আর একটি শক্তভাবে লেগে গেছে। মেয়ের কোন সাড়া না পেয়ে কেঁদে উঠে লাবনী। "

"এন্ট...নী দা, আরে ও এন্টনী দা, সাড়া শব্দ নেই যে হে। বলি বউ এর আঁচলে জড়িয়ে গেছ নাকি হে? খুব ভালো জিনিস পাওয়া গেছে আজ। আজ ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ। আর একদিন পরতো বড়দিন। তাই খুব ভালো মাল বানিয়েছে ওরা। এক গ্লাস খেলেই কুপোকাত।" এন্টনীর বন্ধুরা ডাক দেয় তাকে।

লাবনীর চিৎকার, নিজেদের এবং ছেলে মেয়ের খাবার যোগারের জন্য রমেনের দোকানে যাওয়া-আসা, তার সাথে রাগারাগি, মারামারি ইত্যাদিতে এতক্ষণের নেশাটা ছেড়ে গেলেও এখন ভাল মালের কথা শুনে আবার যেন একটু তরল পানীয়র জন্য এন্টনীর গলাটা উসখুস করে উঠে।

"এই দেখেছ অনন্যা যে কথা বলছেনা, শরীরটা কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে।" বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে লাবনী। "কিছু হয়নি, ভালো হয়ে যাবে, খাবার এনেছিনা, খাইয়ে দাও। আমি আসছি, শুনছ না বন্ধুরা আমাকে ডাকছে, ওরা যে সবাই আমার জন্য বসে আছে।" বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এন্টন। অনন্যাকে জড়িয়ে ধরে আরো জোড়ে কেঁদে উঠে লাবনী। মায়ের কান্নায় খাওয়া ছেড়ে অর্ণবও ছোট বোনকে জড়িয়ে ধরে। ধীরে ধীরে অনন্যার শরীরটা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে আসে। দীর্ঘক্ষণ খেতে না পেয়ে অনন্যার ছোট দেহটি আর সহ্য করতে না পেরে অনাহার আর পানি শূন্যতা জনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে তার।

লাবনীর হৃদয় বিদারক কান্নার শব্দ রাতের নিস্তব্দতা ভেঙ্গে সরূপকাঠির আকাশ বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠে। বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী প্রতিবেশীরা এন্টনের বাড়ি এসে সব ঘটনা শুনে এন্টনকে ধিক্কার দেয়। কয়েকটি জোনাকী পোকা জমাটবাধাঁ অন্ধকারের বুক চিড়ে এন্টনের বাড়ির উঠোন জুড়ে স্বর্গীয় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না দম্পত্তির শিক্ষাকে পরিহাস করে।

লাবনীর কান্নার শব্দে নেশা ছুটে যায় এন্টনীর। কান্নার কারণটা বুঝতে দেরী হয় না তার। একটি অপরাধবোধ যেন তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। যে বন্ধুদের নিয়ে এতক্ষণ নেশা করছিল, চারপাশে তাকিয়ে দেখে তারা কেউ কোথাও নেই। এক অজানা আশংকায় শরীরে কাঁপন শুরু হয় এন্টনীর । লাবনীর এতক্ষণের বুকফাঁটা চাঁপা কান্নাটা এবার সজোড়ে বেরিয়ে আসে। লাবনীর কান্নার শব্দে বাড়ির উঠোনে জড়ো হওয়া মানুষের ভীড় ঠেলে দৌড়ে নিজের ঘরে এসে ঢোকে এন্টনী। পুরাতন ও মলিন বিছানাটায় শায়িতা মেয়ে অনন্যা। কে যেন দয়া করে তার মাথার কাছে একটি মোম বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মেয়ের শিয়রে রাখা একটি মাটির ধোপদানী থেকে ধোঁপের গন্ধ বেরুচ্ছে। মোম বাতির আলোয় মেয়ের মুখমন্ডলে চোখে পড়ে এন্টনীর। অনাহার ক্লীষ্ট শুকনো মলিন মুখমণ্ডল। চোখ দু'টো কোটরাগত। মুখে লেগে থাকা একটি ক্রোড় হাসি। এন্টনের মনে হয় যেন সে বিদ্রুপ করে বলছে, "তুমি ব্যর্থ বাবা, যে বাবা নিজের আনন্দের জন্য সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, সে মানুষ হলেও বাবা হওয়ার যোগ্য নয়।" মৃত দেহের পাশে বসা স্ত্রী লাবনী ও পাড়া- প্রতিবেশীদের সরিয়ে দিয়ে এক অব্যক্ত কান্না উচ্ছাসে মেয়ের মৃত দেহটি বুকে জড়িয়ে ধরে এন্টনী।

২৪ ডিসেম্বর। বড়দিনের আগের দিন। একদিন আগে মেয়ে অনন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়েছে। স্বরূপকাঠি ধর্মপল্লীর খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা শুধু নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজনও যার যার ধর্মমতে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেছে তার আত্মার শান্তির জন্য। সব কথা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে তার বাবা এন্টনীর উপর। মদ্যপান তথা যে কোন নেশা কিভাবে একটি মানুষ তথা একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে পারে, এন্টনীকে দিয়ে সে দৃষ্টান্ত দেখাতে চেয়েছে। চারশত বছর পূর্বে স্বরূপকাঠিতে খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও বিশ্বাসের যে বীজ একদিন ফ্রান্সিস ও জোয়ান্না দম্পত্তি বপন করেছিলেন, সে বীজ থেকে উৎপাদিত চারা গাছের এ অধঃপতন প্রত্যক্ষ করে সুখী সমৃদ্ধ স্বরূপকাঠি যেন আত্মগ্লানী আর অপমানে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বড়দিনের খ্রিস্টযাগের ঘন্টা বাজার সাথে সাথেই স্ত্রী লাবনী ও ছেলে অর্ণবকে নিয়ে স্বরূপকাঠি গির্জায় এসে উপস্থিত হয় এন্টনী। খ্রিস্টযাগের উপদেশে পুরোহিত বড়দিনের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে নেশা তথা মদ আর মাদক কিভাবে একটি সাজান সংসারকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়, সে কথা বলতে গিয়ে এন্টনীর অভিশপ্ত জীবনাতিহাস তুলে ধরেন। পরিবার ও পরিজনের প্রতি ভালবাসা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং নিজেকে রক্ষা করার তাগিদেই নেশার জগৎ পরিহার করে একজন মানুষর সৃষ্টিকর্তার উপর অকালে কোন মানুষকে তুলে নেওয়ার জন্য দোষারূপ করা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

মেয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক যন্ত্রণা ছাপিয়ে, নিজের প্রতি অসম্ভব ঘৃণা, লজ্জা আর অনুতাপের দহন জ্বালা যেন এন্টনীকে তিলে তিলে দগ্ধ করে। শত শতবার স্বরূপকাঠির কবরস্থান পরিদর্শনার্থীদের কাছে বলা এ সমাধিতে শায়িত ফ্রান্সিস আর জোয়ান্না'র নীরব কান্না যেন আজ এই স্বরূপকাঠির কান্না হয়ে তার কানে এসে বাঁজে। নেশার গ্লানীময় জীবন ছেড়ে সত্য ও সুন্দর জীবনের আকঙ্খায় স্ত্রী লাবনী ও ছেলে অর্ণবকে নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায় এন্টনী।

লোকটি

খোকন কোড়ায়া

অস্টিন ডি'কস্তার বাড়িতে আজ বিশাল খানাপিনার ব্যবস্থা। বড়দিন বলে কথা। আধুনিক সাজে সাজানো হয়েছে তার বিশাল বাড়িটি। বাবুর্চিরা বড় বড় হাড়ি ডেকচিতে রান্না বসিয়েছে। ডেকোরেটরের লোকেরা সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে চেয়ার টেবিল সেট করছে। সাউন্ড সিস্টেমে বাজছে বড়দিনের গান। অস্টিন ডি'কস্তা তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে সবকিছু দেখাশুনা করছেন। অন্তত দুইশ' অতিথি খাবে আজ এ বাড়িতে। নিজ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেক মানুষ আসবে, যাদের অনেকেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। ভিআইপিদের মধ্যে আসবেন ইউএনও, তিন ইউনিয়নের তিনজন চেয়ারম্যান, তিনটি সমবায় সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দু'টি স্কুলের দুজন হেডমাস্টার।

অস্টিন ডি'কস্তার একটু পরিচয় এখানে দেয়া প্রয়োজন। অস্টিন ডি'কস্তার জন্ম এই গ্রামেই। গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি এবং সিটি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করে। এরপর মার্সেন্ডাইজিং এর ট্রেনিং নিয়ে একটি বায়িং হাউজে চাকরিতে ঢুকে যায়। কয়েক বছরের মধ্যেই তার আর্থিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ঢাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনে, বাড়িতেও বিল্ডিং করে। এরপর বিয়ে করে তার প্রেমিকা নিজ গ্রামেরই মেয়ে চন্দ্রাকে। আস্তে আস্তে ধর্মপল্লীর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, গ্রামের সমাজ, যুব সংগঠন এসবের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এক সময় যুব সংগঠনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। তারপর ক্রেডিট ইউনিয়নের ছোট পদ থেকে আজ আট বছর ধরে চেয়ারম্যান। গ্রামের বাজারে বেশ কয়েকটি দোকান আছে তার, রয়েছে কয়েক একর ফসলী জমি। বায়িং হাউজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে কয়েক বছর আগেই। স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে ঢাকায় থাকলেও অস্টিন বেশিরভাগ সময় গ্রামেই থাকে। আগামীতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার পরিকল্পনা রয়েছে তার এবং সে নিমিত্তে কাজও করে যাচ্ছে। এলাকায় একজন দক্ষ সমবায়ী নেতা, সমাজসেবক এবং দয়ালু ব্যক্তি হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। আবার নিন্দুকেরা তার কিছু বদনামও করে থাকে। যেমন, তার বিশাল ধন সম্পত্তির সম্পূর্ণটা সৎভাবে উপার্জিত নয়। ক্রেডিট ইউনিয়নে সে অনেক অনিয়ম করছে এবং ক্রেডিট ইউনিয়নের নামে যে একটি জমি ক্রয় করা হয়েছে, সেখানে টাকা পয়সার বেশ নয় ছয় করেছে সে।

হঠাৎ অস্টিন ডি'কস্তার একজন চামচা বিন্দু এসে বললো, বড়দা খবর আছে একটা?

- কি খবররে বিন্দু?

ঐ যে বাজারে ব্যান্ড পার্টির ঘর আছে না, যেখানে তোমার পরম শত্রু আন্তনদা আড্ডা দেয় সেখানে অপরিচিত একজন লোক এসেছে।

- তাতে কি হয়েছে বাজারে তো কতো রকম লোকই আসে।

- কিন্তু এই লোকটা একদম অন্যরকম। ফকির দরবেশের মতো দেখতে, লম্বা চুল দাঁড়ি, সাদা রঙ্গের আলখাল্লা জাতীয় কাপড় পরা। লাল লাল দু'টো চোখ, তাকালে ভয় করে।

- এতো ভয় পেলে আমরা সঙ্গে চলবি কি করে বিন্দু!

- আরে দাদা আপনি বুঝতেছেন না, এই লোকটি কিন্তু অতীত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। আমাদের গ্রামের অতীতের অনেক খবরই সে জানে। বিশ বছর আগে আমাদের গ্রামে একটি খুনের ঘটনা ঘটেছিলো, কে কাকে খুন করেছিলো সেটাও সে বলে দিলো যা আমরাও জানি না।

- বলিস কি? আর কি কি বললো লোকটা?

- অনেক কিছুই বললো লোকটা, তোমার কথাও বললো।

- আমার কথা কি বললো?

- বললো তোমাকে সাবধান হতে, সামনে নাকি তোমার অনেক বড় বিপদ আছে।

- বলিস কি?

- তুমি যাবে নাকি দাদা একবার?

- ওখানে কি আন্তন আছে?

- আছে।

- নিশ্চয়ই মদ খেয়ে টাল?

- টাল ছিলো, তবে লোকটার কথাবার্তা শুনে মনে হলো তার নেশা কেটে গেছে।

- যেখানে আন্তন আছে সেখানে আমি যাবো না। তুই গিয়ে বরং লোকটাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আয়।

বিন্দু যা আগন্তুককে আনতে ততক্ষণে আমরা আন্তনের সঙ্গে একটু পরিচিত হই।

আন্তন ওরফে আন্তুনী কোড়ায়া, এ গ্রামেরই সন্তান। বাল্যকাল থেকেই অস্টিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুব ভালো ছাত্র ছিলো। স্কুল জীবনেই দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছিলো তারা লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে ফিরে আসবে, গ্রামের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে তারা কাজ করবে। আন্তন অনার্স পাশ করে ঠিকই গ্রামে ফিরে এসেছিলো, শিক্ষকতা শুরু করেছিলো গ্রামের স্কুলে। অস্টিন ফিরে এলো অনেক বছর পর গ্রামের ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তা হয়ে। আন্তন স্বাগত জানালো বন্ধুকে, বন্ধু তুই ফিরে এসেছিস ভালো হয়েছে, দুই বন্ধু মিলে কাজ করবো এবার। আমি শিক্ষার দিকটা দেখবো আর তুই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকটি দেখবি। দুই বন্ধুর পরিকল্পনায় গ্রাম উন্নয়নের কাজ বেশ ভালোই এগিয়ে চললো কিছুদিন। তারপর দুই বন্ধুর মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতোপার্থক্য দেখা দিতে লাগলো। এর মধ্যে অস্টিনের কিছু তাঁবেদার জুটে গিয়েছে। তারাই ওর চারপাশে ঘুর ঘুর করে সারাদিন। কারণে অকারণে ওর প্রশংসা করে, বিনিময়ে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়ার সুযোগ পায়। এই চাটুকারদের সঙ্গে অস্টিনের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে, অপরদিকে বাড়তে থাকে আন্তনের সঙ্গে দূরত্ব। আন্তন মাঝে মাঝে অস্টিনকে বোঝায়, দেখ বন্ধু আমি ছোটবেলা থেকে তোকে চিনি। তুই খুব ভালো মনের মানুষ, তোর হৃদয় বিশাল। নিজের ভালোর কথা না ভেবে মানুষের জন্য কিছু করতে পারলেই তুই নিজেকে ধন্য মনে করিস। তুই একজন খাঁটি সৎ মানুষ। কিন্তু তোর চারপাশে যারা রয়েছে, যাদের সঙ্গে তুই চলাফেরা করিস তারা সবাই কিন্তু ধান্দাবাজ। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা তোকে ব্যবহার করছে। ধীরে ধীরে তোর ইমেজ নষ্ট হচ্ছে, তুই টের পাচ্ছিস না। ওদের সঙ্গ ত্যাগ করতে না পারলে দেখবি ওরাই একদিন তোকে ডোবাবে। বন্ধুর কথায় খুব একটা পাত্তা দেয় না অস্টিন কারণ চাটুকারের দল আন্তনের নামে অনেক কিছু বলে, ততদিনে অস্টিনের কান ভারি করে ফেলেছে। উল্টো বলে বসে, তুই যে আমার কতোটা ভালো চাস সেটাও আমি জানি। বন্ধুর কথায় ভীষণ মর্মাহত হয়ে আন্তন আর কোন সম্পর্ক রাখে না অস্টিনের সঙ্গে। এরপর আন্তনও বদলে যেতে থাকে। মদ খেতে শুরু করে এবং মদে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে যে, এ কারণে স্কুলের চাকরিটাও চলে যায়। এখন কয়েকটি টিউশনি করে ও সংসার চালায়। মাতাল

জেনেও অভিভাবকরা ওকে টিউশনি দেয় কারণ আন্তনের মতো অংক আর ইংরেজিতে পারদর্শী শিক্ষক এ তল্লাটে আর নেই।

বিন্দু এসে বেজার মুখে বলে, বড়দা উনি আসলেন না, আপনাকে বললেন যেতে।

অস্টিন রেগে যায়, কি! আমার দাওয়াত গ্রহণ করলো না, চলতো দেখি কেমন দরবেশ সে, হয় আমার বাড়িতে আসবে নয় তাকে আমি এখনই এ এলাকা ছাড়া করবো।

ব্যান্ডপার্টির দোকানে চাটাইয়ের উপর বসে কথা বলছেন লোকটা। তার সামনে-পাশে, বসে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ তার কথা শুনছে। বয়স অস্টিনদের মতোই হবে। বসে থাকলেও বোঝা যায় লম্বায় ছ'ফুটের কম হবে না। গায়ের রং তামাটে, মেদবিহীন বলিষ্ঠ শরীর। লম্বা চুল দাঁড়ি। গায়ে সাদা রংয়ের আলখাল্লা ধরনের পোশাক। লোকটার কণ্ঠে এক ধরনের মাদকতা আছে যা সবাইকে আকর্ষণ করে। সবচেয়ে বড় বিস্ময় হল লোকটার চোখ। চোখ দু'টি, এতো জীবন্ত যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। অস্টিন কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু লোকটি তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দেন। তারপর সবার উদ্দেশে বলেন, এবার তোমাদের শেষ কথা বলবো, সব শেষ কথা হলো ভালোবাসা। মানুষকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসতে হবে প্রতিবেশীকে। শুধু যে তোমাকে পছন্দ করে তাকে নয়, যে তোমাকে ভালোবাসে না, যে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে, তাকেও ভালোবাসতে হবে। শুধু ভালোবাসাই পারে মানুষের মনে সুখ আনতে, আনন্দ আনতে। ভালোবাসাই পারে পৃথিবীতে শান্তি আনতে। আর একটি কথা, প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা করতে হবে। প্রতিশোধ কখনো মঙ্গল বয়ে আনে না। এবার তোমরা যাও, আমি আন্তন আর অস্টিনের সঙ্গে একটু কথা বলবো।

সবাই চলে গেলে, লোকটি আন্তন আর অস্টিনকে তার দু'পাশে বসালেন। তারপর দু'জনের কাঁধে দু'হাত রেখে বললেন, আমি জানি তোমরা দুজন খুব ভালো বন্ধু ছিলে। দু'জন দু'জনকে অনেক ভালোবাসতে। দু'জনের উদ্দেশ্যই মহৎ ছিলো, দুজনই চেয়েছিলে মানুষের সেবা করতে, মঙ্গল করতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে অস্টিন মানুষের সেবা করছে কিন্তু না, সে সব মানুষের সেবা করছে না, সে উপকার করছে হাতে গোনা কিছু মানুষের। আমি তোমাদের সব কিছুই জানি কিন্তু কিছুই বলবো না। তোমারও দোষ আছে আন্তন, তোমার উচিত হয়নি কোন অবস্থাতেই তোমার বন্ধুকে ত্যাগ করা। যাহোক, তোমরা তোমাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গেছো এতে তোমাদেরও ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে সমাজের, এ গ্রামের। আমি চাই তোমরা আবার এক হও। এক হয়ে মানুষের জন্য কাজ করো। লোকটার আর কিছু বলতে হলো না, দু'বন্ধু দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আন্তন বললো বন্ধু, অভিমান করে তোর কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি, এটা আমার ঠিক হয়নি। অস্টিন বললো, তোকে আমি ভুল বুঝেছি, কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করে দিস বন্ধু। এখন তোর বাড়ির সবাইকে নিয়ে আমার বাড়ি আয়, আজ আমরা দুই বন্ধু একসঙ্গে বড়দিনের উৎসব পালন করবো।

লোকটি এবার দাঁড়িয়ে বললেন, অস্টিন বন্ধুকে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাও, তোমার জন্য অনেক মানুষ অপেক্ষা করছে। সবাইকে নিয়ে আনন্দ কর, ঈশ্বরের প্রশংসা কর।

অস্টিন বললো, গুরু আপনাকেও যে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

লোকটি এবার একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমরা যাও, আমি পরে আসছি, আমাকে একটু গির্জায় যেতে হবে।

না, লোকটি আর যাননি অস্টিনের বাড়িতে। খবর নিয়ে জানা গেলো গির্জায়ও যাননি। সারা গ্রাম, রিক্সা স্ট্যান্ড, নৌকার ঘাট তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও পাওয়া গেলো না লোকটিকে। বাজার থেকে বের হওয়ার পর লোকটিকে কেউ নাকি আর দেখেইনি। তাহলে কি লোকটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন!

মন পরিবর্তন

মিল্টন রোজারিও

সম্রাট আর রাজা দুই বন্ধু। ছোট বেলা থেকে ওরা একই সাথে গ্রামের মাটিতে খেলাধূলা করে বড় হয়েছে। একই সাথে স্কুলে লেখাপড়া করেছে। বাড়ীর সামনে ইছামতি নদীতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে স্নান করেছে। হাত দিয়ে, বড়শি দিয়ে ছোট বড় অনেক মাছ ধরেছে। এরওর বাড়ীর আম, জাম, পেয়ারা, গাব, কাঁঠাল খেয়েছে। সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত হাডুডু দাড়িয়াবান্দা খেলেছে। গ্রামের সবাই ওদের মানিক জোড়া বলে চেনে। ডানপিটে ছেলে বলেই গ্রামে সবার কাছে পরিচিত ওরা।

নরেন আর সন্তোষ তারাও দুই বন্ধু। তাদের সখ ছেলেদের নাম রাখবে সম্রাট আর রাজা। গরিব হলেও ছেলেদের এই নামে তারা কেউ সম্রাট, কেউ রাজার বাবা বলে গর্ব করবে।

মাসখানেক আগে দুই বন্ধু বিয়ে করেছে। হেমন্তের এক বিকেলে দুই বন্ধু মাঠের পাশে তোতামিয়ার চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিল আর চা পান করেছিল। নতুন বিবাহিত সংসারের খুব মজার মজার গল্পে তারা সব সময় মশগুল থাকে। নরেন তার বন্ধুকে বলে, দোস্ত একটা কথা বলি। সন্তোষ বলে, বল দোস্ত কি বলতে চাও। নরেন বলে, তোর যদি ছেলে হয়, আর আমার যদি মেয়ে হয় তা'হলে আমরা দুইজনে বিয়াই হবো। আর দুইজনেরই যদি ছেলে হয় তবে তারাও হবে আমাদের দুই দোস্তের মত দোস্ত। সন্তোষ বলে, বাহ্ দোস্ত, তুমি তো আমার মনের কথাটা বলে দিয়েছ। এবার আমার কথা শোন। নরেন বলে, বলো দোস্ত। সন্তোষ বলে, দোস্ত আমরা তো আর কোন দিন বড়লোক হইতে পারবো না, তাই আমি ঠিক করেছি আমাদের দুইজনেরই যদি ছেলে হয় তবে তাদের নাম রাখবো, সম্রাট আর রাজা। নরেন লাফিয়ে ওঠে বলে, আরে শালা, তুমি আমার মনের কথা জানলি কি করে? দেখ, তোর মনের সাথে আমার মনের ভাবনা একদম মিলে গেছে। আমিও মনে মনে ভাবছিলাম দুই দোস্তের যদি ছেলে হয়, তা'হলে মিলেমিশে দুইটা সুন্দর নাম রাখবো। কিন্তু দোস্ত তুমি জব্বর দুইটা নাম পছন্দ করছো। আমারও পছন্দ হয়েছে। আমি এখনই গিয়ে আমার বৌকে বলবো। আমি সম্রাটের বাবা আর আমার দোস্ত রাজার বাবা। এই কথা বলে, নরেন সন্তোষকে জড়িয়ে ধরে।

একদিন রাত্রের খাবার খেয়ে একটা পান মুখে দিয়ে বিছানায় গা-টা এলিয়ে দিয়েছে সন্তোষ। কিছুক্ষণ পর তার স্ত্রী কাজলী খাবার ঘরের সব কাজ গুছিয়ে গাছিয়ে শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সন্তোষের পাশে এসে বসে। বলে, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। সন্তোষ চোখ বুঁজে পান চিবাতে চিবাতে বলে, বল কি জানতে চাও? কাজলী বলে, আচ্ছা তুমি ছেলের নাম সম্রাট রাখতে চাও কেন? আরো তো কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে। সন্তোষ তখন বুক ফুলিয়ে বলে ওঠে, আরে সম্রাটের মা, তুমি কি বলছো বুঝতে পারছো? সম্রাট নামটা শুনে তোমার বুকটা কি ফুলে ওঠে না? ও থুক্কু। তোমারও কি মনটা ভরে ওঠে না? শোন, আমরা সম্রাটের বাবা-মা। আমরা আমাদের ছেলেকে লেখাপড়া শিখাবো। সে অনেক বড় হবে। মানুষের মত মানুষ হবে। অনেক বড় চাকুরী করবে। বাড়ী হবে. গাড়ী হবে। অনেক ধনদৌলত হবে। সম্রাটের মত হবে। কাজলী বলে, আমরা গরিব মানুষ।

আমাদের অত ধনদৌলতের দরকার নাই। আমদের সন্তান যেন মানুষের মত মানুষ হতে পারে এই আশীর্বাদ কর। সন্তোষ বলে, জানো সম্রাটের মা, আমার আরো একটা স্বপ্ন আছে। কি স্বপ্ন? আমি চাই আমার সম্রাট অনেক বড় হবে। এলাকায় যারা গরিব আছে, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে। বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করবে। কেউ তখন আর গরিব থাকবো না। সন্তোষের বৌ কাজলী তখন ভাবতে থাকে, হ্যাঁ। কথাটি ঠিকই বলেছে। আমরা কত কষ্ট করছি। আমাদের এলাকার প্রায় সবাই গরিব। গরিব হলে সংসারে অশান্তি লেগে থাকে। প্রতিবেশীদের বাড়ীতে সব সময় ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। এত অশান্তি কার ভালো লাগে? মনে মনে ভাবে ঈশ্বর যেন সম্রাটের বাবার স্বপ্ন পূর্ণ করে।

সম্রাটের বয়স যখন বারো বছর, তখন ওর বাবা সন্তোষ স্বর্গবাসী হয়। বাবার মৃত্যুর পর সম্রাটের আর স্কুলে যাওয়া হয় না। সন্তোষের বন্ধু নরেন কাজলীকে বলেছিল, দেখো বৌদি, সম্রাট আমার ছেলের মত। ওকে স্কুলে পাঠিও। ওর লেখাপড়াটা বন্ধ করো না। আমার দোস্তের কত স্বপ্ন ছিল ছেলেকে নিয়ে। কাজলী বলে, আপনি আর কত করবেন! আমার কোন আয় রোজগার নাই। সম্রাটের বাবাও কোন টাকাপয়সা রেখে যায় নাই। আপনি আমাদের অবস্থা ভালোই জানেন। তার চেয়ে ভালো আপনি সম্রাটকে একটা কাজে লাগিয়ে দেন। নরেন বলে, ঐ টুকুন ছেলেকে কোথায় কি কাজে দেব বৌদি! আমার রাজার বয়সের ছেলে। তবুও তো সম্রাটের মাথাটা ভালো। ক্লাস ফোরে পড়ে। আমার রাজাটার মাথায় গোবর ভরা। একই সাথে স্কুলে ভর্তি হয়ে ফেল করতে করতে এখনো পর্যন্ত ক্লাস টু পাশ করতে পারলো না।

সম্রাটের মা কোন উপায়ান্ত না দেখে ছেলেকে নিয়ে তার বাবার বাড়ীতে ভাই বিশ্বম্বরের কাছে নবগ্রামে চলে আসে। নবগ্রাম এলাকাটি তাঁতের কাপরের জন্য বিখ্যাত। বিশ্বম্বর তাঁতের কাপরের ব্যবসা করে। এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন। এখানের শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা বেশ বিখ্যাত। প্রতি শুক্রবার এখানে পাইকারদের হাট বসে। একদিন রাত্রে খাবারদাবার সেরে বিশ্বম্বর নিজের বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে পান চিবাচ্ছিল আর ডান হাতে গড়গড়ি হুক্কাটা টানছিল। এমন সময় কাজলী তার ভাই বিশ্বম্বরের কাছে যায়। বলে, দাদা কি শুয়ে পড়েছো? বিশ্বম্বর তখন উঠে বসে বাম হাত দিয়ে চিলুনচিটা মুখের কাছে এনে পিচ্ করে একটু পিক ফেলে বলে, না রে। এমনি একটু শুয়ে ছিলাম। আজ অনেক খাটাখাটনি করেছি তো। কালকে আবার হাটবার বুঝিসই তো। কাজলী বলে, না থাক তাহ'লে, আমি এখন যাই। তুমি একটু বিশ্রাম নাও। বিশ্বম্বর বলে, না না কিছু হবে না। তুই কি বলতে এসেছিস বল। কাজলী কাঁচুমাঁচু করে বলে, দাদা ছেলেটাকে একটা কাজে লাগিয়ে দাও না। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, কি করে। দিনকাল ভালো না, আমার বড় চিন্তা হয় দাদা। বিশ্বম্বর বলে, ঐ টুকুন ছেলে, ওকে কি কাজ দেব বল? তার চেয়ে ভাল ওকে আমি এখানে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেই লেখাপড়া করুক। সম্রাট তো আমার দেবের চার বছরের ছোট হবে, তাই না। দেব এবার ক্লাস টেন এ পড়ছে। সামনের বার মেট্রিক দেবে। তোর ছেলে কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে? কাজলী বলে, দুইবার ফেল করে এবার ক্লাস ফোরে উঠেছিল। ঠিক আছে। কালকেই আমি বিকাশ স্যারকে বলে দেব। তুই আর চিন্তা করিস না। কাজলী তবুও দাদাকে বলে, দাদা তুমি ওকে চেন না। ওর আর লেখাপড়া হবে না। ঐখানেও ও ঠিকমত স্কুলে যেতো না। এরজন্য ওর বাবা ওকে সব সময় বকাবকি করতো। আর লজ্জার কথা কি বলবো দাদা, ঐ টুকুন ছেলে এখনই বিড়ি-সিগারেট খাওয়া শিখে গেছে। এই কথা বলে কাজলী কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, এই বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার জন্য সম্রাট ওর বাবার হাতে কত মারও খেয়েছে। তবুও ছেলেটাকে ঠিক করতে পারে নাই। বিশ্বম্বর বোনের কথাটি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ঠিক আছে আমি দেখছি। রাত অনেক হয়েছে, যা, গিয়ে শুয়ে পড়। আমার আবার কালকে খুব ভোরে উঠতে হবে। নগরে যাবো। কাজলী চোখ মুছতে মুছতে নিজের ঘরে চলে যায়।

মামা বাড়ীতে এসে সম্রাট বেশ জমিয়ে উঠেছে। নতুন নতুন বন্ধু পেয়ে সে এখন তাদের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্রাটকে এখন নবগ্রামের সবাই এক নামে চেনে। রাজনৈতিক নেতাদের মাস্তানগ্রুপ পরিচালনা করে সম্রাট। নেশার জগতটা এখন তার কব্জায়। সম্রাটের মা ছেলের এই সব কার্যকলাপের কথা কিছুই জানে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, আমি ভালো একটা কাজ করছি মা। এখন থেকে আমাদের আর কোন কষ্ট থাকবে না।

একদিন খুব ভোরে হঠাৎ সম্রাটদের দরজায় কে যেন বেশ জোড়ে জোড়ে কড়া নাড়ে। সম্রাটের মা চমকে ধরমরিয়ে ঘুম থেকে ওঠে। ভাবে ছেলে বুঝি এসেছে। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে, দাঁড়া বাবা দরজাটা খুলছি। দরজা খুলেই দেখে পুলিশ দাঁড়িয়ে। সম্রাটের মা চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করে, আপনারা? এক এস.আই বলে, আমরা থানা থেকে এসেছি। সম্রাট কোথায়? সম্রাটের মা বলে, আমার সম্রাট কি করেছে? ও তো ঘরে নাই। কালকে রাত্রে ঘরে আসে নাই। দুইজন পুলিশ সম্রাটের মাকে সরে দাঁড়াতে বলে ঘরে ঢোকে। সম্রাট কোথাও খুঁজে না পেয়ে পুলিশ চলে যায়। সম্রাটের মা দিশেহারা হয়ে খুব ভোরে ভাই বিশ্বম্বরের কাছে ছুটে যায়। ভাইকে সব খুলে বলে। বিশ্বম্বর বোনের কথা শুনে রাগে গজ্‌গজ্ করতে থাকে।

পুলিশ সম্রাটকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করা এবং মাদক ব্যবসা করার জন্য গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্ধী করে। জেলখানায় গিয়ে সম্রাট তার সেই বাল্যবন্ধু রাজাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। বুকে জড়িয়ে ধরে। বলে, দোস্ত তুই এখানে? তখন দুই বন্ধু নিজেদের সব অপরাধ জগতের কথা বলতে থাকে। রাজা বলে, জানিস আমি আমার এলাকায় রাজার মত ছিলাম। বড় বড় সব নেতাদের এবং পুলিশকে মানিয়ে চলতাম। এক ছটকু মাস্তান এসে আমার সাথে বেইমানী করে ধরিয়ে দিয়েছে। যাক, ভালোই হয়েছে, পুলিশ আমাকে ধরে না নিয়ে আসলে তোর সাথে আমার আর দেখাই হতো না দোস্ত। তা'তুই এখানে আসলি কিভাবে? সম্রাট বলে, আমিও আমার এলাকার সম্রাট মত ছিলাম। ঠিক তোর চেয়ে এক ডিগ্রী উপরে। দুই বন্ধু আবারও একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। সম্রাট বলে, মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। এই কথা বলে সে কাঁদতে থাকে। বলে, অনেক বড় পাপ করে ফেলেছি দোস্ত। জেল থেকে বের হয়ে মায়ের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে ভালো হয়ে যাবো। আর কখনও এই সন্ত্রাসী কাজ মাদকের কারবার করবো না। মামার কাছেও মাফ চেয়ে তার কাছে ব্যবসা শিখবো। রাজা বলে, তোর তো মা আছে। আমার যে এই সংসারে কেউ নাই রে। সম্রাট বলে, কে বলেছে তোর কেউ নাই আমরা দুই বন্ধু ভাইয়ের মত মায়ের কাছে ফিরে যাবো। আমার মা তোরও মা। দেখবি তোকে পেয়ে মা কত খুশী হয়।

জানালার মোমবাতি

জেরী জুলিয়াস রোজারিও

একলা কুঁড়েঘর

উঁচু শুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পাহাড়ের দাঁড়িয়ে ছিল কাঠের একটা কুঁড়েঘর। আশেপাশে আঁকাবাকা পাহাড়ি পথ, আর সেই পথের একপ্রান্তে ছিল কুঁড়েঘরটি। মনে হতো যেন সময় তাকে ভুলে গেছে। এতটাই জীর্ণদশা ছিল ঘরটার যে ছাদের কাঠগুলো বেঁকে গিয়েছে আর দেয়ালে দেখা যায় অনেক বছরের দাগ; অথচ কে বলবে একসময় পাহাড়চূড়ার সবচেয়ে জৌলুশসম্পন্ন ঘর ছিল ওটা। এই কুঁড়েঘরেই থাকতেন মিসেস ফ্লোরেন্স, সত্তরোর্ধ্ব একজন ধার্মিক মহিলা। তিনি তার স্বামী হেনরীর সাথেই এখানে কাটিয়েছেন জীবনের দীর্ঘ একটা সময়। স্বপ্নময় সেই দিনগুলোর সময়ের নিয়মে হারিয়ে গেছে। অনেক ত্যাগস্বীকারের ফলে গড়ে উঠেছিল নিঃসন্তান এই দম্পত্তির একমাত্র স্বপ্ন, তাদের এই কুঁড়েঘর।

দশবছর আগে হেনরী মারা গিয়েছে, তারপর থেকে ফ্লোরেন্সের একমাত্র সঙ্গী ছিল শুধু তার আদরের কমলা রঙের বিড়াল, প্যাচেস্। পাহাড়ের তুলনায় নিচের গ্রাম ছিল জীবন আর আনন্দে ভরপুর। কিন্তু ফ্লোরেন্স তার স্বামীর ঘর ছেড়ে দূরে থাকতে চাইতেন না। পাহাড়ি রাস্তা তার বয়সের জন্য কষ্টকর ছিল আর সত্যি বলতে তিনি গ্রামের সাথে মানিয়ে নিতে পারতেন না। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে শহরে যাওয়ার রাস্তা ছিল। আর সেই রাস্তার পাশেই তিনি রুটি তৈরি করে বিক্রি করতো। সেখান থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তার একার জন্য দিব্যি চলে যেত।

বড়দিন চলে আসছে। ডিসেম্বর শুরু হয়ে গেছে। গ্রামে উৎসবের আয়োজন চলছে। সবাই বাড়িঘর সাজাচ্ছে, দরজায় টাঙানো হচ্ছে মালা, গির্জায় গান গাওয়া হচ্ছে, শিশুরা বরফ দিয়ে তুষারমানব আর বরফের ঘর বানাচ্ছে। কিন্তু ফ্লোরেন্স এর ঘরে এই সাজ-সাজ রব নেই, কোন কোলাহল নেই, কোন উৎসাহ নেই শুধু অন্তরে যিশুকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি হচ্ছে। ফ্লোরেন্সের কুঁড়েঘরে বড়দিন মানে ছিল নির্জনতা। তার একমাত্র বড়দিনের রীতি ছিল প্রতিবার বড়দিনের আগে প্রতিরাতে জানালায় একটা করে মোমবাতি জ্বালানো।

"হেনরী সবসময় বলতো, এই মোমবাতির আলো ক্লান্ত পথিকদের পথ দেখিয়ে সত্যকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য।" ফ্লোরেন্স ফিসফিস করে বলতো। মোমবাতির নরম আলো বরফ ঢাকা কাঁচের জানলায় প্রতিফলিত হতে লাগলো।

ভয়াবহ ঝড়

সেদিন ছিল ২৪ ডিসেম্বরের রাত। প্যাচেস্ তার বিছানায় গোল হয়ে শুয়ে পড়ল আর বাইরে তুষারঝড় শুরু হলো। রাত যত বাড়ছিল ঝড় তত ভয়ংকর হচ্ছিল। বাতাস কুঁড়ে ঘরকে ধাক্কা দিচ্ছিল, জানালাগুলো কাঁপছিল আর ঠান্ডা ঘরের কাঠের দেয়াল পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছিল। ফ্লোরেন্স আগুনের পাশে বসে উলের একটা স্কার্ফ বুনছিলেন, যেটা হয়তো তিনি কোনদিন ব্যবহার করবেন না। ঝড়ের শব্দ তাকে তার পুরোনো হারানো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। যে বছর হেনরী ফায়ারপ্লেসটা তৈরি করেছিল সে বছরও এমন ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যে আগুনের পাশে বসে তারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলেন।

হঠাৎ করে ফ্লোরেন্স একটা শব্দ শুনতে পেল, সেটা কি বাতাসের শব্দ? না, এটা ভিন্ন! দড়জায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ। ফ্লোরেন্স চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এতরাতে আর এমন ঝড়ের মধ্যে কে আসতে পারে? লণ্ঠন হাতে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলতেই ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে গেল ঘরে। কিন্তু সেটার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় ছিল একটা ছোট মেয়ের উপস্থিতি। হয়তো বারো কিংবা পনের বছরের হবে, ঠান্ডায় তার গাল লাল হয়ে আছে আর পাতলা জ্যাকেট তার তুষারে ভেজা।

অপ্রত্যাশিত অতিথি

ফ্লোরেন্স মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে এলেন আর তাকে কম্বলে জড়িয়ে আগুনের পাশে বসালেন। "তোমার নাম কী, বাছা?" তিনি মায়াবী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

"মারিয়া" মেয়েটি বলল, কম্বলটা শক্ত করে ধরে। "আমি বাবার সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু আমাদের গাড়ি পাহাড়ি রাস্তায় নষ্ট হয়ে গেছে। বাবা আমাকে গাড়ির ভেতরে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আর চলে আসি। আমি জানতাম না কোথায় যাব।" ফ্লোরেন্স এর বুক ব্যথায় ভরে উঠল। তিনি তার জন্য গরম স্যুপের বাটি নিয়ে এলেন। "তুমি এখন নিরাপদে আছো," তিনি তাকে আশ্বস্ত করলেন। "সকাল হলেই আমরা সব কিছু সমাধান করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বাছা।"

মারিয়া ধীরে ধীরে গরম হয়ে এলো, আর স্যুপ খেতে খেতে তার কথা বলছিল। ফ্লোরেন্স জানলেন, তার বাবা একজন ট্রাক ড্রাইভার, যিনি ক্রিসমাসে তার দাদুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন শহরের রাস্তায়। তার মা কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন, আর মারিয়ার চোখে সেই স্মৃতির গভীর শোক ফুটে উঠছিল।

সেই রাতে ফ্লোরেন্স মারিয়াকে তার স্বামীর পুরোনো বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তিনি আগুনের পাশে বসে রইলেন, ঝড়ের দিকে চোখ রেখে তার বাবার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

মোমবাতির আলো

সকাল হতেই ঝড় থেমে গেল। সূর্যের আলো বরফের চাদরে পড়ে চারপাশকে স্বর্গীয় করে তুলেছিল। ফ্লোরেন্স মারিয়াকে নিয়ে বের হলেন তার বাবাকে খুঁজতে। তারা কিছুদূর যেতেই ফ্লোরেন্স খেয়াল করলেন, বরফের মধ্যে পায়ের চিহ্ন আছে, যা তাদের কুঁড়ে ঘরের দিকে এসেছে। তার বুকের ভেতর আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। অল্পক্ষণ পরেই একজন মানুষ বরফ কেটে তাদের দিকে আসতে লাগল। "মারিয়া!" তিনি চিৎকার করলেন, তার কণ্ঠস্বর আবেগে ভরা।

"বাবা!" মারিয়া দৌঁড়ে তার বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্লোরেন্স দেখলেন, মানুষটির মুখে ক্লান্তি আর চিন্তার রেখা। তিনি ফ্লোরেন্স এর দিকে ফিরে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, "আপনাকে ধন্যবাদ। আমি জানি না কী হত, যদি না...।" তিনি থেমে গেলেন, তার গলা বুজে এল। "ঝড়ের মধ্যে আপনার জানালার মোমবাতির আলো দেখেই আমি দিক ঠিক করতে পেরেছি। সেটাই আমার একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল।"

একান্ত উপহার

মারিয়ার বাবা ফ্লোরেন্সকে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। ফ্লোরেন্স দ্বিধায় পড়লেন। এই কুঁড়ে ঘর তার একমাত্র আশ্রয়, হেনরীর স্মৃতি। কিন্তু সেই বাবা-মেয়ের ভালোবাসা দেখে তার মন বদলে গেল। গ্রামে গিয়ে ফ্লোরেন্স দেখলেন এক নতুন জীবন। তিনি মারিয়া আর তার বাবার সঙ্গে ক্রিসমাস ডিনারে যোগ দিলেন। অনেক দিন পর ফ্লোরেন্স এমন আনন্দ পেলেন, যা তার জীবনে ছিল একেবারেই অনুপস্থিত।

বছর ঘুরে গেল। ফ্লোরেন্স গ্রামের ভালোবাসায় আবদ্ধ হলেন। সবাই জানলো তার কুঁড়েঘর আর মোমবাতির গল্প। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো তার গুণকীর্তন। তার কুঁড়ে ঘর, এখন গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় সুন্দরভাবে মেরামত করা হয়েছে, আর তা পথিকদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। প্রতি বড়দিনের আগে প্রতি রাতে, ফ্লোরেন্স জানালায় একটি মোমবাতি রাখেন, যেমন তিনি সবসময় করতেন।

একদিন মারিয়া তার পাশে বসে বলল, "আপনি কেন মোমবাতি জ্বালান জানেন?"

ফ্লোরেন্স হাসলেন। "কারণ সেই মোমবাতি আমাকে তোমার কাছে এনেছে।"

মারিয়া হাসল। "এবং কারণ এটা আমাদের শেখায়, অন্ধকারের মধ্যেও সামান্য আলো আমাদের ঘরে ফিরতে সাহায্য করে।"

বার্তা

ফ্লোরেন্স আর তার মোমবাতির গল্প আমাদের শেখায়, বড়দিন শুধু উৎসব নয়; এটি মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর সহযোগিতার প্রতীক। অন্যদের জীবনে আলোর উৎস হতে যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকি আমরা।

আমার একলা আকাশ

রাখী রীটা রোজারিও

আমি জীবনযুদ্ধে বেশ ক'বার হেরে যাওয়ায় আমার একটা ছবি একটা শক্ত পোক্ত পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে লাগানো হল। ছবির নিচে লেখা হল "ইনি হেরে যাওয়া দলের লোক।" আশেপাশে লোকজন কেউ কেউ দেখতে এল। কেউ আবার বলে উঠল, হারবে না জীবনে, কোন দিন দেখিনি একটু ভালো ব্যবহার করতে। সারাক্ষণ হিটমিট ঝগড়া, অমুকের ভুল ধরা, কান ভাঙ্গানো এ হেন কাজ নেই যে 'ও' করেনি। ওই তো হারবে। বেশ হয়েছে।

রাস্তায় নেড়ে কুকুরেরা একটানে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বোধ করি চোর-ডাকাতের শব্দ পেয়েছে। ওদের ওই ডাকে আমার দুঃস্বপ্নের ঘুমটা চটজলদি ভেঙ্গে গেল। একেবারে ঘেমে নিয়ে একসা হয়ে উঠলাম আমি। এ কীরকম স্বপ্ন দেখলাম আমি। আসলে বেশ ক'দিন যাবৎ আমার সাথে যা যা ঘটনা ঘটেছে তারই দুশ্চিন্তার রেশ হতে পারে এই দুঃস্বপ্নটা। বেসিনের ট্যাপ খুলে চোখে মুখে পানির ছিটা দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

আসলে এই স্বপ্নটা দেখার পর থেকে আর ঘুম-টুম সহজে আসবে না। তাই বারান্দায় বসে থাকা। আজকাল রাত-বিরাতে চুরি, ডাকাতি বেড়ে যাওয়ায় এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে। ঐ রকম ব্যাপারের জন্য নাইট গার্ড অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহাড়া দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বাঁশি ফুঁ দিচ্ছে। বাচ্চাদের ঘরে গিয়ে দেখলাম ওরা বেঘোরো ঘুমাচ্ছে। খুব মায়াবী চাঁদের মতন মুখগুলো ওদের। সারাদিনের হাজার হাজার কাজের চাপে সৃষ্ট ক্লান্ত শরীর, ওদের দেখলেই কেমন করে যেন হাওয়া মিলিয়ে যেত সারাদিনের ক্লান্তি ভাব। ঠিক যেন ম্যাজিকের মতো।

দু'কামরার ভাড়া বাসা আমার। মধ্যবিত্তের স্বচ্ছলতা আছে বৈকি। দু'জনের চাকরি। ঘরে বাইরের কাজ সামলানোর জন্য একজন ছুটা বুয়া রাখা হয়েছে। ঘরঝাড়ু দেয়া আর কাপড় ধোয়া মূলত এই দু'টো কাজই করে দেয়। তবে মাঝে মধ্যে রান্না-বান্না সাহায্য করে। যদিও কাপড় ধোয়া মূলত এই দু'টো কাজই করে দেয়। তবে মাঝে মধ্যে রান্নাবান্না সাহায্য করে, যদি কাপড় ধোয়া তেমন না করে থাকে। বাচ্চা দু'টি স্কুলে যায়, টিউশন করে একেবারে বাসায় ফিরে নিজেরাই ঘরের দরজার তালা খুলে প্রবেশ করে। তারপর স্নান সেরে, দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ততক্ষণে আমি অফিস থেকে ঘরে চলো আসি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার কাটা ছুঁই ছুঁই করলে ওদের বাবাও ঘরে ফেরে।

অফিসের কথা বলতেই মনে পড়ল- 'বর্ষার কথা'। বর্ষার আমার কলিগ। বেশ ভাব ওর সাথে। কিন্তু ওর স্বামী বেশ কিছুদিন ধরে ওকে সন্দেহ করছে। ভাবছে ওর অন্য কারো সাথে চক্কর চলছে। তাই চাকরি করতে বারণ করছে। এদিকে একজনের উপার্জনে সংসার তো চলে না। মাথায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা ভর করছে। কী করবে 'ও'?

ওর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে দু'টো কথা ওর স্বামীর সাথে বলতে গেলে বাঁধল আরো বিপত্তি। বেচারার ডিভোর্স হয় হয় উপক্রম। নিজেকে এতো ছোট মনে হল আমাকে। কী দরকার ছিল ওদের মধ্যে যাবার? ইচ্ছে করছে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়ে ফেলি। এক্ষেত্রে আমি যেন যাওয়ার দলে নাম লিখালাম। বেশ ক'দিন পর জানলাম বর্ষা চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন। মনে হয় সংসারের শান্তির জন্যই।

অফিসে দুপুরে লাঞ্চের টেবিলে বসে দেখলাম দীপ্তির মনটা খারাপ। দীপ্তি আমার আরো একজন অফিস কলিগ। ও সবে মাত্র জয়েন করেছে। আনম্যারিড, দেখতে সুন্দর সর্বোপরি স্মার্ট।

- কী ব্যাপার দীপ্তি? কেমন আছ?

হ্যাঁ, দিদি ভালই।

- কেমন যেন মনমরা, বিষণ্ন। কিছু হয়েছে কী? কোন আপত্তি না থাকলে আমাকে বলতে পারো।

- না, তেমন কিছু না। আসলে বাসা থেকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে কিন্তু আমি পরেশকে পছন্দ করি। একথা বাসায় বলতেও পারছি না।

ও এই কথা। তা পরেশ কী করে?

- সমস্যা তো ওখানেই। ও বেকার।

আমার যতটা উৎসাহ ছিল সমস্যার সমাধানের, ততটাই নিরুৎসাহিত হয়ে গেলাম দীপ্তির ওই কথায়। দুর্মূল্যের বাজার, দু'জনের চাকরির টাকায় যেখানে সংসারের চাকা ঘুরানো যায় না। সেখানে পাত্র বেকার। জিজ্ঞেস করাতে জানতে পারলাম বাবা মায়ের পছন্দের পাত্র বিদেশে থাকে। বিয়ের পর ওকে নিয়ে যাব। বেটার অপশনটা ওকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিলাম।

দিন কয়েকপর শুনলাম দীপ্তি সুইসাইড করেছে। আসলে, পরেশকে ও প্রচণ্ড ভালোবাসত। ওদের ১২ বছরের প্রেম। পরেশের ভূত ছাড়ানোর জন্যই ওকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। অগত্যা নিজের জীবনটাই .....

আমি বোধ করি আবারো হেরে বসলাম। ঠিক কী বললে ওকে বাঁচানো যেত ওই মুহূর্তে আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। নিজের জন্য আরো একটি হেরে যাওয়ার ঘটনায় যুক্ত করলাম। কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না।

'প্রজ্ঞা' আমার পাশের টেবিলে বসে। আমার পরিবারের হাজারো সুখ-দুঃখের কথা ওর জানা। 'প্রজ্ঞা'ও বেশ ক'বার আমার দু'কামরার ভাড়া বাসায় এসেছে। ওর দু'মেয়ে আমার দু'মেয়ের সাথে বেশ সখ্যতা রয়েছে। বলতে গেলে, প্রজ্ঞাকে আমি খুব কাছ থেকে চিনি। দু'টো মেয়ে বলে ১টা ছেলের জন্য প্রজ্ঞার হা-হুতাশ লেগেই থাকত। এই নিয়ে ওদের সংসারে বার কয়েক অশান্তির বালির ঝড় উঠেছিল। আমি বলতাম, থাক না। কী দরকার? কিন্তু প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে এই 'না' টা ওর স্বামী মেনে নিতে চাইল না।

অগত্যা তৃতীয়বারের মত 'প্রজ্ঞা' প্রেগনেন্ট হলো। মাস চারেক যাওয়ার পর ওরা জানতে পারল গর্ভস্থ সন্তান এবারো মেয়ে। সুতরাং শুরু হল আরেক ধরনের নিপীড়ন। 'উত্তরাধিকার নাই' এই দুশ্চিন্তায় প্রজ্ঞার স্বামী উদ্যত হল ওর উপর। যেমন শারীরিক কষ্ট তেমন মানসিক নিপীড়ন। শ্বশুড়বাড়ীতে কানাঘুষা চলল ছেলে মা থাকায় সম্পত্তির ভাগের কী হবে? অথচ এই ব্যাপারটার সাথে গোঁড়া থেকে প্রজ্ঞার কোন দোষ নেই। কিন্তু এই নির্মম সত্যটাকে শাক দিয়ে ঢেকে ওর দিকেই আঙ্গুল তোলা হলো।

এবার ওকে বলা হয় মিস্‌ক্যারেজ করতে কিন্তু ও করতে চাইল মা। আমিও ওকে সাহস দিতাম। নাহ 'ওটা করলে তোমার লাইফও বারোটা বাজবে। ধৈর্য্য ধর। কোন একদিন জানলাম অত্যন্ত রক্তক্ষরণে প্রজ্ঞা ও তার বাচ্চাটা দু'জনই মারা গেছে। আমার বাচ্ছা দু'টো প্রজ্ঞার এই পরিণতি দেখে ভীষণ কাঁদল। প্রজ্ঞার বাচ্চা দু'টো আমাকে জাপটে ধরে রাখল। কিছুতেই ছাড়তে চাইল না।

নিজেও বুঝতে পারলাম আমিই বোধ হয় 'অপয়া'। নইলে আমার চারিদিকে প্রিয় মানুষগুলো এভাবে হারিয়ে যায়? আমার হারানোর পাল্লা বোধ হয় এখনো ভারী হয়নি। ভগবানের মাইরের শব্দ হয় না। এই বোধটুকু শুধুই আমার কানে বাজছিল। এই বাক্যটাকে

নিয়ে বেশ ক'দিন এলোমেলোভাবে ভাবছিলাম অথবা আমার ভাগ্যটা 'ঘোলা জলের ডোবা' বলে পরিণত হচ্ছে।

আরো একদিন ঘটল, বড় একটা দুর্ঘটনা আমার জীবনে। আমার স্বামীর রোড এক্সিডেন্ট হল। তিনি পা দু'টো হারিয়ে আজ উইল চেয়ারের বাসিন্দা। যুক্ত হল আরো ১টি বিপদের বেড়াজাল। তিনি পা আর চাকরি দু'টোই একসাথে হারালেন। বাচ্চা দু'টো ছোট। এখনো অনেক যেতে হবে আমাকে।

আমার আকাশে অনেক অনেক বিপদ। এগুলো সব আমাকে একা হাতে একটা একটা করে সমাধান করতে হবে। সংসারের চারচাকা, অবুঝ সন্তানদের ভবিষ্যৎ, অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা আর চাকরির নানা পদ। চারপাশে চেয়ে দেখলাম, এতো বড় আকাশে আমি একা হাতে অসংখ্য বিপদের তোড়া। প্রস্তুত হতে হবে আমার আগামী ভবিষ্যতের জন্য।

বড্ড চমৎকার আর অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটল আমার সাথে। নিজেকে বুঝাতে চাইলাম ভগবানের মাইরের যেমন শব্দ হয় না তেমনি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকেও ভগবান ফিরিয়ে দেয় না। দুঃস্বপ্নের রাত পার হয়ে সোনালী ভোর দেখলাম বারান্দায় বসেই। দেখলাম পাখ-পাখালি কিচিরমিচির, অনুভব করলাম স্নিগ্ধ সমীরণের আভাস। নিজেকে শান্ত করে হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হলাম অফিসে যাবার জন্য এর মধ্যে বাচ্চা দু'টো রেডি হয়ে গেল স্কুলে যাবার জন্য।

সারা রাতের দুশ্চিন্তাগুলো বস্তায় ভরে রাখলাম। জীবনযুদ্ধের জন্য আমি প্রস্তুত। এটা আমার একলা আকাশ। জীবন পরের দরজার ওয়ান্ডারফুল কিছু ঘটতে পারে আবার নাও ঘটতে পারে। তাতে কী?

তিন বৃক্ষের গল্প

এলয়সিয়াস মিলন খান

একদা এক গহীন বনে তিনটি বৃক্ষ পাশাপাশি বেড়ে উঠছিল। একদিন তাদের মধ্যে কথা হয়। আলাপচারিতায় তারা পরস্পর তাদের ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিয়ে কথা বলতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলে, যখন আমাকে কাঁটা হবে আমি চাই আমাকে দিয়ে যেন শিশুদের খাট বানানো হয় । যেখানে শিশুরা আনন্দে ঘুমাবে, পিতামাতার আদর-যত্নে। এই বিছানাটি হয়ে উঠবে পরিবারের সবারই প্রিয় স্থান। তাদের আদরের কেন্দ্রস্থল। ২য় গাছটি তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রত্যাশা জানাতে গিয়ে বলে, আমাকে যখন কাঁটা হবে তখন আমাকে দিয়ে যাতে সৌখিন মানুষের ভ্রমণের জন্য প্রমোদ তরী বানানো হয়। যার মাধ্যমে ধনী ও বিখ্যাত মানুষেরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আনন্দ ভ্রমণ করবে। কিছুক্ষণ পর, ৩য় গাছটি আস্তে আস্তে তার আগাম প্রত্যাশা জানিয়ে বলে, আমাকে যখন কাঁটা হবে আমি রাস্তায় সাইন পোস্টের কাজে ব্যবহৃত হতে চাই। যাতে পথহারা মানুষকে সঠিক নিদেশনায় পথ চলতে সহায়তা করতে পারি।

সময়ের আবর্তে তিনটি বৃক্ষই কাঁটা হলো, আনা গুলো করাতকলে আসবাবপত্র তৈরীর জন্য। ইতোমধ্যে একজন ক্রেতা কাঠের মিলে কাঠ ক্রয় করতে এসে ১ম গাছটি কিনে নিয়ে গেল। গাছটির প্রত্যাশা ছিল যেন শিশুদের ঘাট বানানোর কাজে ব্যবহৃত করা হয়। এতে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু পরিকল্পনা হলো ভিন্ন। লোকটি গাছটি কিনে নিয়ে বানালো গরু-ছাগলের থাকার জন্য একটি নোংরা গোয়ালঘর।

এদিকে, অন্য একজন ক্রেতা মিলে এসে ২য় গাছটি কিনে নিয়ে গেল। এই গাছটির প্রত্যাশা ছিল প্রমোদ তরী বানানোর কাজে ব্যবহৃত হওয়ার। কিন্তু পরিকল্পনা করা হলো ভিন্ন কাজের। তাকে দিয়ে বানানো হলো মাছ ধরার নৌকা। যেখানে থাকে গন্ধযুক্ত মরা মাছ।

এর কিছুদিন পর ৩য় গাছটিও মিল থেকে বিক্রি হয়ে গেল। গাছটি প্রত্যাশা ছিল মানুষের উপকারের জন্য সাইনপোষ্ট হওয়ার কিন্তু হলো অন্যটি। গাছটি ব্যবহার করা হলো দস্যুদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য ক্রুশকাষ্ঠ তৈরীতে।

তিনটি গাছেরই পরিকল্পনা ও প্রত্যাশা ছিল এক আর বাস্তবে হলো আরেক। তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ধূলোয় মিলিয়ে গেল। ভাবা হয় এক আর বাস্তবে হয় আরেক।

পরবর্তীতে হলো কি- একজন যুবক তার গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে এক শীতের রাতে এক ভিনদেশে এসে রাতে কোন পান্থশালায় স্থান না পেয়ে শেষঅবধি একটি গোয়াল ঘরে রাত্রি যাপনের জন্য স্থান করে নেয়। সে সময় তার স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হলে সেখানেই তার স্ত্রী এক পুত্র সন্তান প্রসব করে এবং পিতামাতা শিশুটিকে কাপড়ে জড়িয়ে একটি যাবপাত্রে শুয়িয়ে রাখে। সেই দুর্ভাগা মা ছিলেন স্বয়ং মারীয়া তার শিশুটি আমাদের ত্রানকর্তা স্বয়ং যিশু। মারীয়া এই গোয়ালঘরেই আমাদের ত্রানকর্তার শিশু-যিশুকে জন্ম দেন।

১ম গাছটির প্রত্যাশা ছিল সকল মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার, আদর ভালবাসায় ভরে তোলা। হলোও তাই। নাসারেতের বেথলেহেম নগরে শিশু যিশুর জন্ম স্থানটি কেবল ঐ সময়ের মানুষের জন্যই কেন্দ্রবিন্দু ছিল না, সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আজও তা ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে বিরাজ করছে। শিশুটি জ্ঞান-বুদ্ধিতে বেড়ে উঠে। তিনি ছিলেন স্বয়ং খ্রিস্ট। তিনি আমাদের পরিত্রান ও মুক্তির পথ উম্মোচন করেছেন। যুগ যুগান্তরে।

২য় গাছটির প্রত্যাশা ভুল থাকায় পূরন হয়নি। তাকে দিয়ে মাছ ধরার নৌকা বানানো হয়েছে। কিন্তু মাছ ধরার নৌকায় চড়ে আমাদের ত্রানকর্তা স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট মানুষের পরিত্রান ও মুক্তির বানী প্রচার করেছেন। শুধুমাত্র ঐ সময়ের মানুষের কাছেই নয় বরং সর্বকালে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে।

৩য় গাছটি সাইন পোষ্ট হতে চেয়েছিল এবং তার প্রত্যাশা স্বার্থক হয়েছে। সে হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাইন পোষ্ট সর্বযুগের মানুষের জন্য। ক্রুশ আমাদের মুক্তির প্রতীক, ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসার প্রতীক আমাদের আদর্শ যা আমরা সর্বদা অন্তরে ধারণ করি। আমাদের প্রতিদিনের চলার পথে সঠিক নির্দেশনা দান করে।

আমাদের প্রত্যেকের মতো তিনটি গাছেরই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রত্যাশা ছিল। গাছগুলো আসলে বুঝতে পারে নি তাদের ভবিষ্যৎ বাস্তবতা। তেমনি আমরাও অনেক সময় আমাদের সঠিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বুঝতে পারি না। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পুরোটাই নির্ভর করে ঈশ্বরের পরিকল্পনার ওপর। ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে পথ চলায়। তিনিই আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিবেন, সঠিক পথে চলতে সহায়তা করবেন। কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন, আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। জীবনে আমাদের সুখি হতে আশীবাদ করেন এবং পরকালে তাঁর সান্নিধ্যে স্বর্গসুখ লাভ করতে আহ্বান করেন।

সংগ্রহ,অনুদিতঃ A CALL TO JOY by Matthew Kelly, Published in Australia and New Zealand

ছুটু বড্ড একা

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

পৃথিবীতে আমরা সবাই ভালোবাসার কাঙ্গাল, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আবেগ ও ভালোবাসা আছে। ভালোবাসার কারণেই একজন যুবক-যুবতী বিবাহের মধ্যদিয়ে পরিবার গড়ে তোলে। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকে বিশ্বাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ধর্মবিশ্বাস। যদি আমাদের পরিবারে এগুলো না থাকে তাহলে আমাদের পরিবার কোন দিন সুখের হতে পারে না।

ছোট্ট একটি সুখের সংসার। বাবা-মা ও সুন্দর ফুটফুটে ছেলে ছটু। বাবা মার কাছে কতই না আদরের সন্তান ছিল ছটু। মা তাকে রোজ ভাত মাখিয়ে খাওয়াতো। বাবা রাতে ছেলে ও স্ত্রীর জন্য কতই না মজার খাবার আনতো। স্ত্রীও স্বামীর অপেক্ষায় রাত জেগে থাকতো। স্বামী কঠোর পরিশ্রম করতো যেন তার সন্তান ও স্ত্রী সুখে থাকে, ভালো থাকে। হঠাৎ কোথা থেকে এক কালবৈশাখী ঝড় এসে তাদের পরিবারের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেল।

স্ত্রী এখন অমনোযোগী থাকে, এখন অন্য একজনের ফোনের অপেক্ষায় থাকে। এখন আর ছেলে ও স্বামী ভাল লাগে না, স্বামীকে সময় দিতে চায় না, কথা-বার্তার ধরণ পরিবর্তন হতে লাগল। স্বামী যখন কাজের জন্য বাইরে যেতো তখন তার কাছে একটি যুবক আসতো, কথা হতো অনেক নতুন স্বপ্ন দেখাতো। এমনিভাবে প্রেম সৃষ্টি হল, তার মানে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ল। এই কঠিন রোগ তাকে অবিরাম তাড়া দিতে শুরু করলো। এখন আর তার সংসারে মন বসেনা। ছটুর মা সিদ্ধান্ত নিলো তার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সে ঘর করবে, পালিয়ে যাবে। যেই কথা সেই কাজ। সোনাদানা, অর্থ আর আদরের বুকের মানিক ও স্বামীকে রেখে পালিয়ে গেল নতুন সংসারের আশায়। ছোট্ট ছটু মাকে খোঁজে, বাবাকে খোঁজে কেউ নেই। ক্ষুধায় জোরে জোরে কান্না করে। মা মা বলে চিৎকার করতে থাকে, তাকে থামানোর কেউ নেই। যাবার সময় চিঠি লিখে গেছে। বাবা এসে টেবিলে একটি চিঠি দেখে এবং দেখে তার ছেলে কান্না করেই যাচ্ছে। চিঠিতে লেখা ছিল, "আমি আমার ভালোবাসার মানুষের সাথে তোমার সন্তান ও তোমাকে ছেড়ে চলে গেলাম, আমাকে আর খুঁজো না, ভালো থেকো, সময় মত ডিভোর্স লেটার পেয়ে যাবে।" স্ত্রীর চিঠি পড়ে স্বামীর মাথায় বাজ পড়ল, দুঃখে কষ্টে রাগে অভিমানে জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল। কাদের জন্য কি করলাম, আমি তোমাকে কিসে কম রেখেছি, আমায় ছেড়ে কেন চলে গেলে? এতো ভালোবাসার পরেও তার স্ত্রী কেন তাদেরকে ছেড়ে যাবে, তা সে কোনভাবেই মানতে পারছে না। যার জন্য সব কিছু ছেড়েছে সে-ই এখন তাকে ছেড়ে গেছে।

বাবা মাকে স্ত্রীর কথায় ছেড়ে আসার অপরাধবোধ কাছ করছিল তার মনে। তবু উপায়ান্ত না দেখে ছটুর বাবা আবার ফিরে গেল মা ও বাবার কাছে। মাকে বলল, আমাকে ক্ষমা করো মা, আমি ভুল করেছি। আমার ছেলে এখন মা-হারা, তোমরা ছাড়া ওর এখন আর কেউ নেই। বৃদ্ধা মা ও বাবা ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে দিলো। কেন এমন হল বাবা, আমরা তো তোদের সুখের জন্যে তোর সংসার থেকে চলে এসেছি। যাহোক বৌমা বড় ভুল ও অন্যায় করেছে ঠিকই তবুও ও আসতে চাইলে তুই না করিস না বাবা। মায়ের এমন কথায় ছটুর বাবা আরো বেশি কাঁদতে থাকে।

ছটুর বাবা তার স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসতো। স্ত্রীর কথা প্রায়ই মনে করতো এবং দেখা করতে চাইতো। সে মনে মনে বলে, আমি ছটুর মাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমার কি অপরাধ ছিলো। কেন আমার জীবনকে এভাবে নষ্ট করলে? অনেক কষ্টে জানতে পারলো তার স্ত্রী তার বন্ধুর সঙ্গে পালিয়েছে। স্ত্রীর ফোন নাম্বার নিয়ে স্ত্রীকে ফোন করলো এবং বললো তোমার ছেলে ছটু তোমার জন্য খুব কান্নাকাটি করছে, তুমি একদিন ওর সঙ্গে দেখা কর এবং ওকে বুঝিয়ে যাও। একদিন তারিখ অনুযায়ী একটি হোটেলে দেখা করতে আসলো। ছটু মাকে পেয়ে সেকি আনন্দ, খাওয়া-দাওয়া সবাই একসঙ্গে করলো। এক কথা দুই কথায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। বাবা মায়ের ঝগড়া দেখে ছটুর মুখ মলিন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ঝগড়া-ঝাটি ও চেঁচামেচি করার পর উভয়েই একটু শান্ত হয়। ছটুর মার মনে একটু অপরাধবোধ আসলেও সে বলতে পারেনা। স্বামীর রাগান্বিত চেহারা দেখে সে ঘাবড়ে যায়। বিবাহিত জীবনে সে তার স্বামীকে এত উগ্রভাবে রাগতে দেখেনি। তাহলে কী ছটুর বাবা তাকে বর্তমান স্বামী থেকেও বেশি ভালোবাসে। এসব চিন্তা করতে করতে ছটুর মা ছটুকে নিয়ে বেলকনিতে এসে দাঁড়ায়। হোটেলের এইদিকের বেলকনিটা খুব একটা মজবুত নয় বলে ছটুকে সেদিকে যেতে বারণ করে তার মা। এদিকে ছটুর বাবা রাগান্বিত হয়ে ছটুকে আনতে গেলে ছটুর মা ভয় পেয়ে পিছনের দিকে যেতে গিয়ে তিনতলার বেলকনি ভেঙ্গে নিচে পড়ে যায়। ছটু ভয় পেয়ে জোরে চিৎকার করে উঠে। ছটুর বাবা কিছু বুঝে উঠবার আগেই হোটেলের কর্মচারীরা তাকে আটকে ফেলে। হোটেলের মালিক এসে দেখে লাশ পড়ে আছে, অতপর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা লাশ মেডিকেলে পাঠায় আর ছটুর বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। আর ঐদিকে অসহায় ছোট ছটুর কথা কেউ শুনতে চাইলো না। ছটু জানে, বাবা মাকে ফেলে দেয়নি। ভয় পেয়ে মা-ই পরে গেছে। ছটু গ্রামে তার দাদা-দাদীর কাছেই থাকতে থাকে।

অবশেষে ছটুর বাবার আইনগত সাজা হয়। ছটুর বাবা দাদীর কাছে অনুরোধ রেখেছে আমার ছেলেকে তোমরা দেখো। ছটুর দাদা-দাদী ছিল বৃদ্ধ গরীব। তাই ছটু কারখানায় কাজে ঢুকে পড়লো। অবুঝ ছোট ছেলেটি সারাদিন কাজ করে যা পায় তা দিয়ে দাদা-দাদীর সঙ্গে খায়। ও এখন একা একা রাস্তায় চলাচল করে তখন কাউকে কাউকে বলতে শুনে, পাপ ছাড়ে না বাপকে। ছটুর ছোট মনে প্রশ্ন জাগে, মা তাদেরকে ছেড়ে গিয়ে হয়তো পাপ করেছে কিন্তু বাবাতো কিছু

করেনি। তবে বাবা সাজা পাচ্ছে কেনো? আগে এসব কথা ভেবে ভয় পেলেও এখন আর ভয় পায় না। এখন একা একা ঘুমায়, তবে মাঝে মাঝে দাদীর কাছে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করে। এখন দাদী তাকে মায়ের মত আদর করে, ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে দেয়। আত্মীয়-স্বজন যখন ছটুর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন ছটুর বাবা হাত জোর করে বোনের কাছে অনুরোধ করে- ছটুকে তোরা দেখিস, একবেলা হলেও ওরে কিছু খেতে দিস। বোনটি গরীব ঘরে বিয়ে হওয়ায় এবং তার সংসারে টানাপোড়ন থাকায় ছটুকে নিজের কাছে রাখার সাহস করেনি। এদিকে ছটুও দাদীকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না।

বৃদ্ধ দাদীকে ছটু যেমনি ছাড়তে চায় না তেমনি অসুখ ছাড়তে চায় না। দারিদ্রের কারণে ঔষধও ঠিক মতে খেতে পারে না। কিছুদিন আগে হঠাৎ ভীষণ জ্বরে ও পেটব্যথায় দাদীও ছটুকে ছেড়ে পরপারে চলে গেল। একমাত্র অবলম্বন দাদীর মৃত্যুতে ছটু পাগলের মত কান্না করতে করতে বলে, দাদী আর যে কেউ রইলো না আমার। আমি যে এবার সত্যিই বড্ড একা হয়ে গেলাম!

বাবা-মায়ের ভুলে কত ছটুরা একাকী হয়ে যায়, হারিয়ে যায়, মরে যায়। তার হিসাব কি আমরা রাখি! আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। একজন আরেকজনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। পরবর্তীতে সন্তান-সন্ততি হলে তাদের লালন-পালন এবং ভালো মানুষ করে গড়ে তুলবো। ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তাই নিয়ে আমরা সুখী থাকার চেষ্টা করবো। আমাদের পরিবার হল প্রথম শিক্ষালয়। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পরস্পরের মধ্যেই থাকতে হবে। তাহলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর একটি পরিবার ও সুন্দর একটি জাতি উপহার দিতে পারবো॥

সময়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে

ব্রাদার জয় আন্তনী রোজারিও সিএসসি

নদীর ঢেউ লঞ্চের গায়ে আস্তে আস্তে আঘাত হানছে, যেন কোনো অদৃশ্য ছন্দে গাঁথা শব্দের প্রতিধ্বনি। নির্বাক হয়ে দোলা বসে আছে দুলালের পাশে। বিয়ের পর এটাই তাদের একত্রে প্রথম যাত্রা; গন্তব্য সুন্দরবন। বলতে গেলে, এটা তাদের হানিমুন কিন্তু হানিমুন শব্দটা যেন দোলার কাছে জলবিহীন সমুদ্র, লবণবিহীন কারির মতোই অর্থহীন ও পানশে মনে হতে লাগলো। দুলাল ও দোলার পারিবারিক সম্মতিতেই বিয়ে হয়েছে। এরেঞ্জ মেরেজ। তাদের বিয়ের দু'মাস হতে চলেছে অথচ সান্নিধ্যের যে অনুভূতি, রোমাঞ্চ, সেইসব যেন কোনো গল্পের পাতায়ই আটকে রয়ে গেছে।

দুলাল দোলার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে "শ্রীকান্ত" নিয়ে ডুবে আছে। তার চোখে সেই পরিচিত নিবিষ্টতার ছাপ, যেন দোলার উপস্থিতি তার কাছে তেমন বিশেষ কিছুই নয়। দোলা খুবই বিরক্তি ও ক্ষোভ নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখ পড়লো একজোড়া দম্পতির উপর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাদের উভয় দম্পতি যুগলের লক্ষ্য এক। তবে তাদের মধ্যেকার বর্তমান অবস্থা খুবই ঈর্শনীয়। মনে হচ্ছে দু'জনেই খুব রোমান্টিক। এমন রোমান্টিকতা দোলা নিজেও চেয়েছিল-একজন জীবনসঙ্গী, যে তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসবে। দোলারও স্বপ্ন ছিল তার স্বপ্নের পুরুষটি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে রোমান্টিক একজন যা রোমিও-জুলিয়েটকেও হার মানাবে। কিন্তু ভাগ্যে জুটল এক গর্দভ, আন-রোমান্টিক ছেলে। কি আর করার? কিছুটা জোড় করেই তার মা বিয়ে দিয়েছেন। ছেলের মা নাকি তার বাবার ছোট্টবেলার বন্ধু ছিলেন। বাবা কিনা মৃত্যুর পূর্বে মাকে বলে গেছেন যেন তার বিয়ে ঐ ছেলের সাথেই হয়। মা তাকে বললো, এ স্বপ্ন পূরণ না হলে বাবার আত্মা শান্তি পাবে না। আর সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী ব্যাপার হলো ছেলে বড় হয়েছে একটি এতিমখানায়। যা তার বিবেককে নাড়া দিয়েছে ভালোলাগার বন্ধনে আবদ্ধ হতে। অগত্যা বাধ্য হয়েই তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলো। যদিও মৃত মানুষকে বকতে নেই তারপরও তার খুব ইচ্ছে করছে বাবাকে ইচ্ছে মতো বকতে। কিসের অভাব ছিলো তার? রূপ, গুণ, বংশমর্যাদা? না, কোনটিরই নয়। তার এ মুহূর্তে খুবই হিংসা হচ্ছে ঐ দম্পতিদের দেখে। তারা একে অপরকে চিপস্ খাইয়ে দিচ্ছে, জুস্ খাইয়ে দিচ্ছে। একে অপরের চিবুক টানছে, চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আ! কী মনোরম দৃশ্য। একেই বলে রোমান্টিকতা। এমনটিই চেয়েছিল সে। আর তার গর্দভটা কিনা বসে বসে গল্পের বই পড়ছে। দোলার মনে এমন ক্ষোভ জন্ম নিল যে একটানে দুলালের চোখের চশমাটা খুলে নিয়ে জলে ফেলে দিল। কেননা দুলাল চশমা ছাড়া চোখে কিছুই দেখে না। অন্তত এটুকু প্রশান্তি তার স্বামী আর বই নিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকবে না। সে পুরো যাত্রা জুড়ে শুধু দুলালকেই নয়ন ভরে দেখবে। দুলাল চমকে উঠে তাকায়, কিছুটা হতভম্ব। দোলা চুপচাপ নদীর বুকে কপালের ঘাম মুছে ফেলে। সে ভাবে, এইভাবেই কি তার জীবন কাটবে-অবহেলায়, নীরবতায়?

উত্তর-পূর্ব কোণে তাকাতেই দোলা দেখতে পেল লঞ্চের কোণায় বসে থাকা এক বৃদ্ধকে। সে নীরবে একটা পুরনো ছবি হাতে নিয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে ফিসফিস করে কিছু বলছে আবার কখনো উদাস দৃষ্টিতে চারপাশ দেখছে। তার চোখে এমন এক শূন্যতা যা দোলার মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করল। যেন এই বৃদ্ধ এক প্রতিচ্ছবি, ভবিষ্যতে দোলা নিজেও এই ধরনের একাকিত্বে বন্দী হয়ে পড়বে।

দোলা নিজেকে দমাতে না পেরে ধীরপায়ে বৃদ্ধের কাছে গেল। বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে হালকা মৃদু হাসল, যেন তার মনের গভীর ক্ষতকে বুঝতে পেরেছে।

দালা সম্মতিক্রমে পাশে বসলো এবং জিজ্ঞাসা করল "কেমন আছেন?"

বৃদ্ধ তার হাতে থাকা ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক যেমন একজন মানুষ একা থাকলে থাকে। এই নদী, এই আকাশের মাঝেই আমার সঙ্গী।"

দোলার মনের গভীরে এই কথাগুলো অনুরণিত হয়, কিছুটা ক্ষোভ জন্মায়। সে কি এভাবেই একাকিত্বে দিন কাটাবে? সঙ্গী থাকতেও কি সে একা থাকবে? কথাগুলো ভাবতেই দোলার শরীর শিউরে উঠে। সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। হাজারো চিন্তা-দুশ্চিন্তা বাসা বাধে তার মনের মাঝে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে যায় নিজের জায়গায়।

নদীর বুকে এক নির্জন সন্ধ্যা। লঞ্চ থেমে গেছে একটি অজানা পাহাড়ের গায়ে। চারপাশে পর্যটকদের ভিড়। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেড়াচ্ছে ;কেউ খাবারের দোকানে, কেউবা প্রকৃতি দেখতে ব্যস্ত আবার কেউ স্মৃতি বেধে রাখতে ব্যস্ত। কারো মধ্যে ক্লান্তির বিন্দুমাত্র ছাপটুকু নেই আর অন্যদিকে তার গর্দভটা গভীর ঘুমে মগ্ন।

দোলা লঞ্চ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল, সেই রহস্যময় বৃদ্ধের খোঁজে, যার সাথে দুপুরে কথা বলার পর থেকে তার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বাসা বেঁধেছে। বৃদ্ধটি যেন তার মনের কথা জানে, বোঝে এমন এক উদ্ভুত উপলব্ধি হচ্ছিল তার।

কিছুদূর যেতেই সে লক্ষ্য করল বৃদ্ধটি একটু দূরে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট প্রদীপ জ্বালিয়ে তা পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দোলার মনে হলো যেন তিনি তার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি বা কোন পুরনো যন্ত্রণা ছেড়ে দিচ্ছেন। দোলা ধীরগতিতে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাছের পাথরটিতে বসল, পা দু'টি ভাসিয়ে দিল স্বচ্ছ, শীতল নদীর পানিতে। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল, যেন দোলার আসার অপেক্ষায়ই ছিলেন তিনি। দোলার মুখে এক দ্বিধা, কৌতূহল আর অবচেতন এক আকর্ষণ।

"কী ভাবছো?" বৃদ্ধ ফিসফিস করে বললেন।

দোলা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "জীবনের অর্থ কী? সবকিছু এত নীরব কেন? সম্পর্কগুলো যেন নিস্তরঙ্গ।" কোন প্রকার সংকোচ না করেই বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, "আপনার কি মনে পড়ে, বিয়ের পর আপনার হানিমুনের কথা?"

বৃদ্ধ একটু চুপ থেকে হালকা হাসলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ মনে পড়ে। সেই স্মৃতি এখনও আমার জীবনের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি। আমাদের বিয়ের কিছুদিন পর আমি আর আমার স্ত্রী শ্রীমঙ্গলে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের কোলে ঘেরা এক ছোট্ট গ্রাম, চারপাশে চা-বাগান আর নীল আকাশ। আমরা দু'জনেই শহরের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলাম।

দোলার কৌতূহল যেন আরও বেড়ে গেল, "তারপর?"

বৃদ্ধের চোখে স্মৃতির আলো জ্বলে উঠল। "আমরা তখন নতুন বিয়ে করেছি, প্রথমে ওর সাথে কথা বলতে আমার খুব সংকোচ হতো। কিন্তু যখন পাহাড়ের পাড়ে বসে ওর সঙ্গে চা খেতাম, আমাদের মধ্যে এমন বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।"

দোলা একটু বিস্মিত হয়ে বলল "কীভাবে বুঝলেন, যে উনিই আপনার জন্য ছিলেন?"

বৃদ্ধ এক মুহূর্তের জন্য চুপ থাকলেন। তারপর তিনি বললেন, "সেদিন সন্ধ্যায় পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ও আমাকে বলেছিল, 'আমাদের এই সম্পর্কটা যেন এই পাহাড়ের মতোই মজবুত হয়। প্রতিটা বিপদে, প্রতিটা ঝড়ে আমরা যেন একে অপরের পাশে থাকি।' তখন আমি মনে মনে বুঝেছিলাম, এই নারীই আমার জীবনসঙ্গী।"

দোলা নির্বাক হয়ে শুনছিল। বৃদ্ধ যেন এক অদৃশ্য শিক্ষকের মতো।

আমি হেসে বলেছিলাম, 'এই আকাশের মতো বিশালতায় তুমি আমার কাছে থাকবে।' সেই মুহূর্তে আমরা দু'জনেই এমন এক প্রতিশ্রুতি করেছিলাম যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মেনে চলার ইচ্ছে করেছিলাম।"

দোলার চোখে এক অদ্ভুত আলো ঝলমল করে উঠল। সে যেন একদম নিজের জীবনের কথা ভাবতে লাগল।

বৃদ্ধ আবার বললেন, "আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিল, 'তুমি হয়তো এই পৃথিবীর সব কিছু দিতে পারবে না, কিন্তু যতটুকু দেবে, তা যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়। আর আমি কখনো তোমার পাশে থাকতে ভুলব না।' সেই কথাগুলো আমার জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে নতুন করে শক্তি দিয়েছে। সঙ্গীর সাথে সত্যিকারের বোঝাপড়া, সম্মান, ভালোবাসা-এসব দিয়েই সম্পর্ক গড়ে ওঠে।"

বৃদ্ধের দিকে আবারও দৃষ্টি রেখে দোলা এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি কি জীবনে বিশেষ কিছু হারিয়েছেন?"

বৃদ্ধ এবার কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "হ্যাঁ, জীবন থেকে অনেক কিছুই হারিয়েছি। কিন্তু মানুষ যখন কিছু হারায়, তখনই সে তার জীবনের নতুন মানে খুঁজতে পারে। সারা পথে সে বলল, 'আমরা একসাথে বৃদ্ধ হব, তাই না?' আমি হেসে বলেছিলাম, 'আমরা দু'জনেই চিরদিন একসাথে থাকব।' কিন্তু জীবন তো এমন হয় না, দোলা। কিছু প্রতিশ্রুতি কখনোই পূর্ণ হয় না।"

বৃদ্ধের কণ্ঠ ভারি হয়ে এলো। "একদিন সকালে হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম, দিন রাত এক করে পাশে বসে থাকতাম। তার হাসি, তার মুখের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার মাঝে আমি আমার সব আনন্দ পেতাম। কিন্তু সে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। আমার ভেতরটা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। সে চলে গেল, আমাকে একা রেখে। তার চলে যাওয়ার পর প্রতিটি দিন মনে হতো অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দীর্ঘ রাতের মতো।"

দোলা নির্বাক হয়ে শুনছিল। সে বুঝতে পারছিল জীবনের সত্যিকারের ত্যাগ আর সম্পর্কের গভীরতাকে।

বৃদ্ধ বললেন, "জানো, দোলা, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বুঝলাম, কোনো সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তবু সেই সম্পর্কই আমাদের জীবনের অর্থ তৈরি করে। যদি সময় থাকতে সেই সঙ্গীকে ভালোবাসতে না পারো, সময় শেষ হয়ে গেলে কিছুই থাকবে না। আমরা নিজেদের মধ্যে এমন এক দূরত্ব তৈরি করি, যা কখনোই কমানো সম্ভব হয় না।"

দোলার মনে এক অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব হল। তার চোখে জ্বলজ্বল করতে লাগল সেই মধুর স্মৃতিগুলো যা তার ভবিষ্যতের সাথেই সম্পৃক্ত। দোলার মনে হলো, বৃদ্ধের কথায় যেন এক অদৃশ্য বার্তা আছে। বৃদ্ধ যেন তাকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে জীবন হয়তো সবসময় তার প্রত্যাশা মতো হয় না, তবে সে নিজে চাইলে নতুন কিছু খুঁজে পেতে পারে। দোলা নিজের জীবনে দুলালের উপস্থিতির অর্থ খুঁজতে লাগল।..

হঠাৎ পাশ থেকে দুলালের গলা শুনে দোলা চমকে উঠল, কখন যে বৃদ্ধ চলে গেল সে টেরও পায়নি। "চলো, সন্ধ্যা হয়ে এলো, লঞ্চে ফিরতে হবে।" দুলাল অপেক্ষা করছে, তার চোখে ক্লান্তির ছাপ। দোলার মনে আবারো সেই হতাশা ফিরে এল। তার মনের ভেতর একটা কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠল, "এত ঠান্ডা, এত নীরব কেন সে?"

দোলা উঠে দাঁড়াল, কিন্তু বৃদ্ধের কথাগুলো তার মনের ভেতরে গেঁথে রইল। সে একদৃষ্টিতে দুলালের দিকে তাকাল। দুলালের মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট ছিল। সে মনে মনে ভাবল, হয়তো দুলালও কিছু অনুভব করছে, শুধু প্রকাশ করতে পারছে না।

এবার দুলাল কিছুটা কাছাকাছি হলো, সে বলতে শুরু করল "দোলা, আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসার মতোই চেয়েছিলে, কিন্তু আমি হয়তো তেমনটা হতে পারিনি। আমি আসলেই এমন নির্লিপ্ত নই, শুধু আমি কীভাবে অনুভূতি প্রকাশ করতে হয় তা জানি না।"

দোলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "জানো দুলাল, আজ আমি এক বৃদ্ধের কথা শুনেছি। তার গল্পটা আমার কাছে অনেক কিছু নতুন করে বোঝার উপলব্ধি দিয়েছে। সম্পর্ক হয়তো নিখুঁত হয় না, তবে সময় থাকতে তার অর্থ খুঁজে নিতে হয়। না হলে শেষ পর্যন্ত শুধু আফসোসই থেকে যায়।"

দুলালও ভাবল, হয়তো সে নিজেও কিছুটা চেষ্টা করতে পারে। একটু ভালোবাসা, একটু যত্ন-এগুলো দিয়েই তো সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখা যায়। সে ধীরে ধীরে দোলার হাত ধরল।

চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। প্রথমে দোলা ভেবেছিল নদীর পাড়টি বুঝি কৃত্রিম আলোয় সজ্জিত। কিন্তু না। কাছে যেতেই বুঝতে পারলো জোনাকি মিটিমিটি করে আলো বিকিয়ে যাচ্ছে। আরেকটু সামনে চোখ পড়তেই দেখলো বেশ কয়েকটি তাঁবু। দোলার গা শিউরে উঠলো। সে ঠিক করে ফেললো জোনাকির মিটিমিটি আলোয়, এই তাঁবুতেই হবে তাদের প্রথম রোমাঞ্চ। পূর্ণতা পাবে হানিমুন।

হঠাৎ দুলাল দাঁড়িয়ে পড়ল। দোলার হাতে আলতো চাপ দিয়ে চোখে চোখ রেখে বললো- জানো দোলা ঐ বৃদ্ধ গত বাইশটি বছর ধরে প্রত্যেকজন নবদম্পতির জন্য এই সুন্দর সুযোগ করে দিচ্ছেন আর অপ্রিয় হলেও সত্য কথাটি হলো ঐ বৃদ্ধই আমার জন্মদাতা পিতা।

LAMB – Employment Opportunity
(Re-advertisement)

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There are vacancies for the following regular position based at LAMB head office, Parbatipur, Dinajpur.

Position: Head of Security **Post: 1(Male/ Female)**

Job Summary: The Head of Security is responsible for the overall security of the LAMB campus and Basundhara campus. Supervises general and hospital security guards and CCTV surveillance work. Responsible for developing effective security system and ensuring safety and security of the persons, materials and machines of LAMB, including control of Mob violence. Maintains effective security management system by following and keeping proper documents with policy and procedure. Identifies security risks and contribute to plans to mitigate them. Keeps liaison with different LAMB departments, police, local elites and reports to supervisor/management. Monitor & manage movement of employees during entry and exit along with visitor movement management, within the restrictions set by management. During emergencies, might be required to work beyond normal working hours.

Essential Requirements: HSC pass from any field, BA pass will be given preference. At least 5 years of professional experience in a similar role. Ex-defence service holder will be given preference. Good physical health is essential. Thorough knowledge on security services. Computer knowledge and technical skill, supervisory skill and training capacity required.

Salary: Around Tk. 30,000 per month gross but higher salary can be considered for experienced candidates. Other benefits include medical care at LAMB, provident fund, and festival allowance once per year.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Position: Maintenance In-charge/Officer **Post: 1(Male/ Female)**

Job Summary: The Maintenance In-charge/head of maintenance oversees the day-to-day operations of the maintenance department through organizing and managing the schedules and work of maintenance technicians, while advising and assisting in the repairs of electrical, plumbing, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC), carpentry, painting, and other building systems. Give technical advice to management proactively and when asked. During emergencies, might be required to work beyond normal working hours.

Essential Requirements: The candidate should have Diploma in Civil/ Electrical/ Mechanical Engineering from a Regular College. Extensive knowledge of building systems such plumbing, electrical, and HVAC is required. Excellent management and supervisory skills and five years hands on technical experience in building/facility maintenance and maintenance management and excellent analytical and problem-solving skills are required. Ability to identify issues and determine repairs that are needed. Ability to plan preventive maintenance schedules for building systems. Must be able to physically lift 12 KG. Proficient with Microsoft Office Suite or similar software. At least moderate English speaking/ reading/ writing ability.

Age: Below 55 years

Salary: Around Tk. 30,000 per month gross but higher salary can be considered for experienced candidates. Other benefits include medical care at LAMB, provident fund, and festival allowance once per year.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Qualified Candidates are requested to apply with a cover letter along with updated CV (mentioning two references name) and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 15 January 2025.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified. LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

"ধ্যানে-জ্ঞানে ছিলো গান, ছিলো আরো সুর;-
আনন্দ-পরিবার খুশিতে ভরপুর,
কে জানিতো হৃদয়ে দুঃখ আচিনপুর!
না বলে চলেই গেলে আজ বহুদূর?
শ্রোতার হৃদয় কোনে তোমারই গান,
গানের ভুবনে তুমি জেগে থাকা প্রাণ।।"

তুমি নেই, দুই বছর দিবস চলে গেল, তুমি নেই। নেই তোমার হাসিমাখা কথা, নাতি-নাতনিদের সাথে খুঁনসুটি। খাবারের টেবিলে নেই তোমার সরব উপস্থিতি। তুমি হীনা ছোট্ট নিবাসে আজ শূন্যতার বসবাস। এখন দেয়ালের তোমার প্রতিটি ছবি স্মৃতি হয়ে গেছে। গাড়ির চাকা গেছে থেমে। দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনি প্রতিক্ষণ শুধু স্তব্ধ হয়ে গেছে তোমার জীবন ঘড়ি। অবুঝ নাতি-নাতনির চোখে তোমাকে না দেখার শূন্যতা দেয়ালের ছবিতে আটকে থাকে। বড় অসময়ে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে পিতার কোলে।

জীবনে তোমার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রার্থনা, নিয়মানুবর্তিতা ও আদর্শ ছিল আমাদের দিক নির্দেশনা। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখেছি সব সময়। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে একাকিত্বের মাঝেও তুমি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে আমাদের রেখেছিলে সুখী করে। তোমার জীবনের সকল কষ্ট আমাদের দিয়েছে সফলতার সোনালী সূর্য।

আমাদের বিশ্বাস আজ তুমি আছো ঈশ্বরের বাগানের ফুল হয়ে। ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন বলেই তোমাকে বেছে নিয়েছেন তোমার চরণে ঠাঁই দেবার তরে। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ প্রতি পালন করতে পারি। প্রার্থনা করি তোমার সকল পাপ যেন ঈশ্বর ক্ষমা করেন।

ওপারে তুমি অনেক অনেক ভালো থেকো।

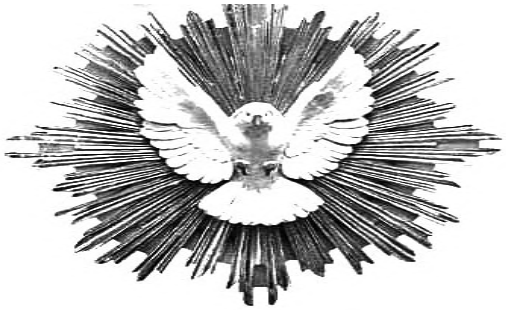

স্বর্গীয় ওয়াল্টার রোজারিও

পিতা: স্বর্গীয় রোডল্ফ রোজারিও
মাতা: স্বর্গীয়া আগ্নেস রোজারিও
জন্ম: ২৯ জুলাই, ১৯৪২ (কলকাতা)
মৃত্যু: ০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
(সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, আমেরিকা)
গ্রাম: নাগরী (জোয়া মিস্ত্রী বাড়ী)
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

শোকার্ত তোমার প্রিয়জন-

রেবেকা রোজারিও (স্ত্রী)
সিজার রোজারিও (ছেলে)
ডিনা রোজারিও (ছেলে বৌ)
উমা রোজারিও (মেয়ে)
গ্রেগরী শীতল পেরেরা (মেয়ে জামাই)
শার্লি, স্টেফি, ক্লেয়ার ও কার্ল (আদরের নাতনি ও নাতি)
সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, ইউএসএ

বড়দিনের উপহার

জেসিকা লরেটো ডি'রোজারিও

"কিছু উপহার বড় হয়, কিছু হয় ছোট। কিন্তু যে উপহার অন্তর থেকে দেয়া হয় তা হলো সেরা।"- টিংকু রোজারিও

সান্টাক্লজ

ডেভিড একজন সেলসম্যান। তার নিজের একটা ছোট-খাটো ব্যবসা ছিলো। কিন্তু করোনা মহামারিতে তার ব্যবসার লোকসান হতে হতে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। অপারগ হয়ে এখন তিনি একটা ছোট ওষুধের কোম্পানিতে সেলসম্যান এর চাকরি করছেন। তার পরিবারের আরও দুই জন সদস্য হলো স্ত্রী মার্থা এবং তাদের একমাত্র ছেলে হেনরি। সামনে বড়দিন কিন্তু এইদিকে তার তেমন বেঁচা কেনা নেই। বছরে একটা দিন তাও এইবার বোধহয় কিছুই দিতে পারবেন না, স্ত্রী এবং ছেলেকে। ভাবতেই চোখ দু'টো জলে ভিজে ওঠে তার। আকাশের দিকে তাঁকিয়ে বলে ওঠেন, "হায় ঈশ্বর তুমিই আমাকে সাহায্য করো।" ডেভিড তার পরিবারের সামনে সবসময় বেশ রাশভারি আচরণ করেন। কিন্তু আজ তার এই অপারগতায় তিনি প্রচণ্ড অপরাধবোধে ভুগছেন। আর ভাবছেন আর মাত্র তিন দিন বাকি বড়দিনের কিভাবে কি.....। পার্কে বেঞ্চে বসে এসব ভাবতে ভাবতে তিনি দেখেন বৃদ্ধ মত একজন ভিক্ষুক তার কাছে এসে খাবারের জন্য টাকা চাইছেন। চোখ মুছে তিনি পকেটে হাত দিয়ে দেখেন তার কাছে সর্বসাকুল্যে ৭০ টাকাই আছে। তিনি সেখান থেকে ৫০ টাকা সেই ভিক্ষুককে দেন খাবারের জন্য। ভিক্ষুকটি তাকে জিজ্ঞেস করে সে কাঁদছে কেনো? উত্তরে সে তার অবস্থা জানায়। সব শুনে ভিক্ষুকটি তাকে বলে এত কিছুর পরও সে তার অবশিষ্ট ৫০ টাকা তাকে দিয়েছে খাওয়ার জন্য? তখন ডেভিড বলেন, আমার মা বলতেন -

"কাউকে কিছু দিলে কখনোই নিজের জন্য কম হয় না, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবেন।"

এসব শুনে বৃদ্ধ লোকটি মুচকি হেসে তার ব্যাগ থেকে একটা টাকার বান্ডিল বের করে ডেভিড এর হাতে দিতেই তিনি চমকে ওঠেন।

-আরে আরে সে কি? আপনি ভিক্ষুক নন? আমি আপনার টাকা নিতে পারবো না!

বৃদ্ধ লোকটি বললেন, একটু আগে তিনিই তো বললেন ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবেন, ঈশ্বরই তাকে সাহায্য করেছেন আসলে তার মাধ্যমে।

তখন ডেভিড বললেন, কিন্তু আপনি কে?

বৃদ্ধ একগাল হেসে উত্তর দিলেন - ধরে নিন আমি সে ইচ্ছে পূরণ করা সান্টাক্লজ!

বলেই সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি চলে গেলেন। আর এইদিকে খুশিতে ডেভিড এর চোখে পানি চলে আসে এবং সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন সত্যি তিনি সর্বশক্তিমান, তার অসাধ্য কিছুই নেই।

অরফান

"লিটল কেয়ার" নামে একটা অরফানেজে থাকে ডেমিয়েন। জন্মগতভাবে তার বা পা কিছুটা খোঁড়া। হাঁটতে তেমন একটা অসুবিধা না হলেও ডেমিয়েন দৌড়াতে পারে না। তার বয়স এখন নয় বছর। তার সমবয়সী অনেক ছেলে-মেয়েই তাদের পরিবার পেয়েছে, বাবা-মা পেয়েছে। কিন্তু খোড়া হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তাকে কেউ দত্তক নেয়নি। হাসি খুশি প্রাণোচ্ছল ডেমিয়েন তার এই দুরাবস্থা কাউকেই বুঝতে দেয়না। কিন্তু রোজ সে প্রার্থনায় কেঁদে কেঁদে একটা পরিবার চায়, বাবা-মা, ভাই-বোন চায়, পরিবারের সকলের আদর, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা চায়। কিন্তু এই নয় বছরে তার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ডেমিয়েন এর জন্ম ২৪ ডিসেম্বর। বড়দিনের ঠিক আগের দিন। এইবার ডেমিয়েন খুব বেশি করে প্রার্থনা করছে একটা পরিবারের জন্য। বড়দিন উপলক্ষে তাদের হোমে অনেক গিফট, খাবার, কাপড়, ডোনেশন এনেছে কুপার দম্পতি। তাই সবাই খুব খুশি কিন্তু ডেমিয়েন খুশি হতে পারছে না কারণ সে এসব কিছুই চায় না। সে একটা পরিবার চায়। চ্যাপেলে বসে সে হাতজোড় করে কেবল এই একটাই প্রার্থনা করছিলো। এমন সময় কুপার দম্পতি ডেমিয়েনকে প্রার্থনারত অবস্থায় দেখে সিস্টারকে ডেমিয়েন এর কথা জিজ্ঞেস করেন। তখন সিস্টার তাদের সব খুলে বলেন। ২৪ তারিখ সকালে ডেমিয়েন চোখ খুলে দেখে অরফানেজ এর সবাই তার রুমে সাথে সিস্টার এবং কুপার দম্পতিও দাঁড়িয়ে হাতে কেক, বেলুন এবং আরও অনেক উপহার নিয়ে। তখন সিস্টার মেরি এগিয়ে এসে ডেমিয়েনকে বলে, "লক্ষ্মী ছেলে ডেমিয়েন দেখো ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। কুপার দম্পতি তোমাকে দত্তক নিয়েছেন। আজ থেকে উনারা তোমার বাবা এবং মা।" আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডেমিয়েন কান্না করে দেয়, পরম স্নেহে মিসেস কুপার ডেমিয়েনকে জড়িয়ে ধরে আর বলেন কাঁদে না বাবা, এই দেখো মা। মিস্টার কুপার এসে ডেমিয়েনকে জড়িয়ে ধরে বলেন বাবাও আছে।" মনে মনে ডেমিয়েন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় তার এই সুন্দর পরিবারের জন্য।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

রায়ের দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
অরিন রোজারিও
শ্রেণি: ৭ম

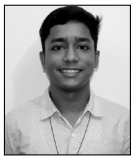

হাসপাতালের মর্গে এক রাত

অন্নয় খ্রীষ্টফার কস্তা

মিথান্স আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্লাস সেভেনের একজন ছাত্র। গত নভেম্বরে ওদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে তাই দেড়মাসের জন্য স্কুল ছুটি দেওয়া হলো। তাই সে ঠিক করলো যে এই ছুটিতে তার বাবা-মার সাথে কুয়াকাটা বেড়াতে যাবে। কুয়াকাটা যাবার কথা বাবাকে বলতেই বাবা রাজি হয়ে গেল। মিথান্সের আপন মামা খ্রীষ্টফার। মামার কুয়াকাটা পোষ্টিং হয়েছে। মামা ও তার একমাত্র ছেলে বর্ণিলকে নিয়ে তাদের পরিবার। মিথান্স ও বর্ণিল প্রায় সমবয়সী। তাই সব আত্মীয়দের মধ্যে তিনি মিথান্সকে সবচেয়ে বেশি আদর করেন। বর্ণিল ও মিথান্স আপন ভাইয়ের মতোই, এমনকি তারা বন্ধুও। তাই বাবা বলায় মিথান্স রাজি হয়ে গেল। দু'দিন পরেই ওরা কুয়াকাটায় যাওয়ার জন্য রওনা হল। যেদিন রওনা হল সেদিন রাতেই ওরা খ্রীষ্টফার মামার বাসায় পৌঁছে গেল। পৌঁছানোর পর তাদের মধ্যে উষ্ণ আলাপ শেষে, খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গেল। পরদিন সকালে উঠে মিথান্স আর বর্ণিল সমুদ্রে স্নান করতে গেল। স্নান করে আসতেই মিথান্স শুনলো যে মামা এখানকার একটা নামকরা হাসপাতালে কাজ করে। তাই খ্রীষ্টফার মামা তার ছেলে ও ভাগ্নেকে হাসপাতাল দেখাতে নিয়ে গেল। বলা যায়, এখান থেকেই গল্পের শুরু। ওখানে ঢুকেই একটি মৃত লাশ দেখে মিথান্স ভয় পেল। আর তাই দেখে মামা একটু হাসলেন। তারপর যে লোকটার সাথে মামা কাজ ছিল সেই লোকটি এখনো আসেনি। দুপুর নাগাদ আসবে। তাই মামা ওদের নিয়ে ঘুরাঘুরি করে বাইরে দুপুরের খাবার খেল। তারপর হাসপাতালে গিয়ে দেখেন লোকটা তখনও আসেনি। অনেকক্ষণ পর যখন লোকটি আসল তখন প্রায় বিকেল। কাজ সেরে মামা বললেন, "চল, তোর ভয় কাটিয়ে আনি।" শুনেই মিথান্স উৎসাহিত হয়ে মামার সাথে চললো। এরপর মামা ওদের হাসপাতালের মর্গে নিয়ে গেল। মর্গে ঢুকেই এবার মিথান্স আর বর্ণিল দু'জনেই চমকে উঠল। মর্গে সারি সারি মৃতদেহ সাজানো ছিল। এর মধ্যে মিথান্স হাসপাতালে ঢোকার সময় যে মৃতদেহটি দেখেছিল সেটি আবার দেখতে পেল। এভাবে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত হয়ে গেল। রাত হওয়ার কারণে মামা তড়িঘড়ি করতে লাগল। তাড়াতাড়িতে কেউ খেয়ালই করল না মিথান্স ভেতরে রয়ে গেছে। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে মিথান্স দৌড়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সবাই চলে গেছে। এবার মিথান্স অনেক ভয় পেল। ভাবল, এতগুলো মৃত দেহের মধ্যে সে একা, কিছু যদি হয়। সব ভৌতিক সিনেমার কথা মনে পড়তে লাগল। কিন্তু সে নিজেকে নিজে সাহস দিতে লাগল। কিন্তু অনেক ভেবেও কোন উপায় বের করতে পারল না। এদিকে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল দশটা বাজে। তখন ও বলল, "তার চেয়ে ঘুমিয়ে রাতটা পার করে দেই। সকালে নিশ্চয়ই ওরা দরজা খুলবে।" প্রায় ঘুমিয়ে গেল কিন্তু তখনই অনুভব করল, ওর ঠিক ডানপাশের মৃতদেহটি যেন একটু নড়ে উঠল। আর সাথে সাথে ঘরের মধ্যে কাদের যেন ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুরু হয়ে গেল। এখন মিথান্স অনেক ভয় পেতে লাগল, কিন্তু তারপর কিছুটা সাহস ছিল। এবার ঘড়িতে দেখল, রাত চারটা বাজে। ভাবল, বাহ্! সময়তো বেশ উড়ে উড়ে যাচ্ছে দেখি। এভাবে চললে তো খুব শিগগিরই ভোর হবে। অন্যদিকে খ্রীষ্টফার ও মিথান্সের বাবা মিথান্সকে খুঁজছে। তখন বর্ণিল তাদের বললো, মিথান্স মর্গে রয়ে গেছে কারণ ও আমাদের সাথে বের হয় নি। এই শুনে সঙ্গে সঙ্গে ওরা মর্গে চলল। এদিকে মিথান্স আবার ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করছে ঠিক তখনই লক্ষ্য করল যে, ওর সামনের মৃতদেহটা উঠে বসেছে। তখন সাহস সঞ্চয় করে মনে মনে বলল, এ নিশ্চয়ই মানুষ, ভূত নয়। কোন কুমতলব নিয়ে ঢুকেছে। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল একটা লাঠি। ভাবল, এটা দিয়েই আক্রমণ করা যাক। যেই ভাবা সেই কাজ। সাথে সাথে লাঠিটি দিয়ে লোকটার মাথায় একটা বাড়ি দিল। লোকটা তখনই চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, এদিকে মিথান্সেরও একই অবস্থা হলো। কিছুক্ষণ পরে চাচার এসে দেখল দু'জন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। একজন হল মিথান্স, অন্যজন হল রাতে মর্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক লোক। পরে যখন জ্ঞান ফিরে মিথান্স সব জানল, তখন মনে মনে বলল, "যাক বাবা! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি।"

বিজয়-স্মরণে

আরমান খোকন কাম্পু

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নয় মাস যুদ্ধের পর
পেলাম তোমাকে বিজয়
লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে,
হাজারো মায়ের কোলশুন্য করে
তুমি এলে বিজয়
হাজারো বোনের চোখের জলে
হাজারো পুড়ে যাওয়া ঘরের বিনিময়ে,
রক্ত ভেজা পথের উপর দিয়ে
পেলাম তোমাকে বিজয়।
তাইতো তোমায় গ্রহণ করেছি জীবনে
স্বত্তার মননে
১৬ ডিসেম্বর মহাবিজয় স্মরণে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

সেন্ট ফ্রান্সিস গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ
প্রমা নিবেদিতা রিবেরু
শ্রেণি: ১০ম

অহি মারিয়া রোজারিও
শ্রেণি: ৭ম

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের এশিয়া মহাদেশ সফর

পোপ ফ্রান্সিসের বর্তমান বয়স ৮৮। এই বয়সেও তিনি আশার বাণী নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন প্রান্তিকজনদের সাথে একাত্ম হতে। তার পোপীয় শাসনামলের শুরু থেকেই আমরা এ ধারা দেখতে পাই। পোপ ফ্রান্সিসের এশিয়া মহাদেশে সফর তার পোপীয় শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে তিনি শান্তি, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, মানবাধিকার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বার্তা দেন। পোপ ফ্রান্সিস এশিয়া সফরের সময় সাধারণত ধর্মীয় ঐক্য, সংলাপ এবং শান্তির কথা প্রচার করে থাকেন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে তিনি বিভিন্ন সময় সফর করে বিশ্বজনীন মণ্ডলী ও স্থানীয় মণ্ডলীর সংযুক্ততা প্রকাশ করেন।

পোপ ফ্রান্সিসের এশিয়া সফরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

১) জর্ডান সফর (২০১৪): পোপ ফ্রান্সিস মে মাসের ২৪-২৫, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এশিয়া সফর শুরু করেন ইতিহাসখ্যাত ও বাইবেলে বর্ণিত বিখ্যাত জর্ডান সফর করার মধ্যদিয়ে। জর্ডানে পোপ ফ্রান্সিস ইসলাম, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সহাবস্থানের আহ্বান জানান।

২) প্যালেস্টাইন ও ইস্রায়েল সফর (২০১৪): জর্ডানের পার্শ্ববর্তী দেশ প্যালেস্টাইনে ২৫-২৬ মে এবং ইসরাইলে ২৬-২৭ মে সফর করেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। যেখানে তিনি দুই জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করেন এবং প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য সমর্থন প্রদান করেন।

৩) দক্ষিণ কোরিয়া (২০১৪): ১৩-১৯ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ৬ষ্ঠ এশীয় যুব দিবস পালনের উদ্দেশ্যে পোপ ফ্রান্সিস পূর্ব এশিয়ার দেশ দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন। যেখানে পোপ হাজার হাজার যুবকের সাথে মিলিত হন এবং তাদেরকে বিশ্বাস, আশা এবং ভালোবাসার বার্তা দেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি এবং দুই দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানান। তিনি উভয় দেশের সরকারের প্রতি শান্তির পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

৪) শ্রীলঙ্কা (২০১৫): পোপ ফ্রান্সিস ১৩ জানুয়ারি তাঁর ১৩তম প্রৈরিতিক সফরে যান শ্রীলংকায়। তিনি বিশেষত শ্রীলঙ্কার খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বার্তা দেন। তার সফরের সময় শ্রীলঙ্কা দীর্ঘদিন ধরে চলমান গৃহযুদ্ধ এবং জাতিগত সহিংসতা থেকে পুনর্গঠন করছিল। তিনি শ্রীলঙ্কার কলম্বো শহরে একটি মর্মস্পর্শী প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং জাতিগত শান্তি এবং পুনর্মিলনের ওপর গুরুত্ব দেন।

৫) ফিলিপাইন (২০১৫): পোপ ফ্রান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫-১৯ জানুয়ারি ফিলিপাইন সফর করেন। এটি ছিল তার প্রথম ফিলিপাইন সফর। ফিলিপাইন সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মানবাধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। তিনি তাকলোবান শহর সফর করেন, যা ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সুপার টাইফুন হাইয়ানের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি ম্যানিলায় কাথলিক যুবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাসের ওপর গুরুত্ব দেন।

৬) মায়ানমার (২০১৭): ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে পোপ ফ্রান্সিস মায়ানমার সফর করেন। এটি ছিল মায়ানমারে পোপ ফ্রান্সিসের প্রথম কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফর। কারণ মায়ানমারে সেই সময় রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি চলমান সহিংসতা ও নির্যাতন নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ছিল। পোপ ফ্রান্সিসের সফরের সময় তিনি বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা এবং মায়ানমারের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করেন।

৭. বাংলাদেশ (২০১৭): ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বরে, পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি ঢাকা শহরে পৌঁছে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের জনগণের সাথে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। বাংলাদেশে তার সফর ছিল আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং মণ্ডলীর সদস্যদের প্রতি সহানুভূতির বার্তা প্রদান। তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং খ্রিস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং ধর্মীয় সংহতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেন।

৮) আরব আমিরাত সফর (২০১৯): ৩-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস আরব আমিরাত সফর করেন যেখানে তিনি ইসলামিক নেতা শেখ আহমদ আল-তায়েবের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক আন্তঃধর্মীয় বৈঠক ও মানব ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক দলিলে স্বাক্ষর করেন।

৯) থাইল্যাণ্ড (২০১৯): পোপ ফ্রান্সিস ২০-২৩ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যাণ্ড সফর করেন। থাইল্যাণ্ডে তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং শান্তির জন্য কাজ করা। থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সংলাপ এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

১০) জাপান (২০১৯): পোপ ফ্রান্সিস ২৩-২৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে জাপান সফর করেন। তিনি জাপানের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জানান। বিশেষভাবে, তিনি হিরোশিমা এবং নাগাসাকি সফর করেন, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল।

১১) ইরাক সফর (২০২১): পোপ ফ্রান্সিস ইরাক সফর করেন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। ইরাকের খ্রিস্টান সম্প্রদায় বহু বছর ধরে সহিংসতা এবং ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার। পোপ এখানে খ্রিস্টানদের প্রতি সমর্থন জানান এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে কথা বলেন।

১২) মঙ্গোলিয়া: পোপ ফ্রান্সিসের ঐতিহাসিক মঙ্গোলিয়া সফর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গোলিয়া, প্রথাগতভাবে বৌদ্ধ ধর্মপ্রধান দেশ, সেখানে খ্রিস্টান জনগণের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কিন্তু পোপের সফরটি তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল।

১৩) ইন্দোনেশিয়া: পোপ ফ্রান্সিস তৃতীয় পোপ যিনি ইন্দোনেশিয়া সফর করেছেন গত ৩-৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে। তার সফরের মূলভাব ছিল: "বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব এবং সহানুভূতি"। এ সফরের সময় তিনি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম মসজিদ ইসতিয়াক পরিদর্শন করেন। বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশে তিনি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করতে আহ্বান রেখে ভিন্নতার মাঝে একতা সৃষ্টির অনুরোধ করেন।

১৪) সিঙ্গাপুর: ১১-১৩ সেপ্টেম্বর পোপ ফ্রান্সিস সিঙ্গাপুর সিটি পরিদর্শনে যান। প্রায় ৬ মিলিয়ন মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪ লাখ হলো কাথলিক। পোপ মহোদয়ের এই সফর সকলের মধ্যে আশা জাগিয়েছে।

এশিয়া মহাদেশে পোপ ফ্রান্সিসের সফরগুলি ধর্মীয়, রাজনৈতিক, এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে একত্রিত করার জন্য তার উদ্যোগগুলো প্রশংসিত হয়েছে।

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ
মঠবাড়ী, উলুখোলা, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, বাংলাদেশ
ফোন ঃ- ০৯৬৭৮৭৭১২৭০। ই-মেইল ঃ- info@divinemercyhosptial.com

ডিভাইন মার্সি হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়া ইজারা চুক্তির জন্য দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিমিটেড, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সমবায়ী উদ্যোগে নবনির্মিত একটি ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট সুবিশাল ও অত্যাধুনিক হাসপাতাল যা ০৭ তলা বিশিষ্ট এবং এর মোট আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গফুট। সমবায় উদ্যোগে গঠিত এটি দেশের একটি বৃহৎ হাসপাতাল যা গাজীপুর জেলার, কালিগঞ্জ থানার, মঠবাড়ী এলাকায় অবস্থিত। হাসপাতালে আগত রোগী, তাদের আত্মীয়-স্বজন, স্টাফ এবং দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য উত্তর দিকে হাসপাতালের মূল প্রবেশ গেটের নিকটস্থ আবাসিক ভবনের নিচতলায় অবস্থিত মনোরম, সুসজ্জিত ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ২,২৭৮ বর্গফুট আয়তনের ক্যাফেটেরিয়াটি ইজারা প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকৃত, অভিজ্ঞ ও আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে দরপত্র আহবান করা হচ্ছে।

১. প্রাথমিকভাবে ইজারা চুক্তির মেয়াদ হবে ৫ (পাঁচ) বছর।
২. চুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অগ্রীম বাবদ টাঃ ৬,০০,০০০/-(ছয় লক্ষ টাকা) চুক্তি সম্পাদনের সাত কর্মদিবসের মধ্যে এককালীন প্রদান করতে হবে। মাসিক ভাড়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ দর প্রস্তাবের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।
৩. বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে যে ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল ক্যাফেটেরিয়াতে বর্তমানে ব্যবহারের জন্য কোন রান্নাঘর নেই। ক্যাফেটেরিয়া সংলগ্ন রান্নাঘর নির্মাণের কাজ সংযুক্ত নকশা ও প্ল্যান অনুযায়ী শীঘ্রই শুরু হবে এবং কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চুক্তির মেয়াদকাল গণনা শুরু হবে।
৪. আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ এর সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্ট হতে নির্ধারিত দরপত্র সংগ্রহ করে অথবা নিম্নোক্ত লিংক থেকে দরপত্র ডাউনলোড করে বর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করতঃ জানুয়ারী ০৫, ২০২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দরপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৫. দরপত্র জমাদানের সময় অবশ্যই প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্তি হিসাবে প্রদান করতে হবে (দরপত্রের ১৯ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখিত)।
৬. বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ (শুধু অফিস চলাকালীন সময়)ঃ ০৯৬৭৮৭৭৭৮৯৫ (এক্সটেনশন-৭২০)

SL NO	Item Name	Link
01	Lease Agreement of Cafeteria of Divine Mercy Hospital Limited	https://cccul.com/dmhl/RFQ_for_Cafetaria.pdf

ইগ্নাসিউস হেমন্ত কোড়াইয়া
চেয়ারম্যান

ডাঃ আহ্মেদ শফিকুল হায়দার
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

নোটঃ যদি কোন ব্যক্তি, দরদাতা হিসেবে বিজয়ী হোন, তাহলে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে তার মালিকানায় প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড লাইসেন্স করে ডিভাইন মার্সি হাসপাতালে জমা দিতে হবে। চুক্তিটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে সম্পাদিত হবে।

JOB OPPORTUNITY

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2024-2025/ Date: 10 December, 2024

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for young, energetic, dynamic and self-motivated experienced **'Transport Officer'** who will be able to run and assure smooth operations to support Transport Operations transparently and effectively of the transportation department by supervising drivers

Key Job Responsibilities

- Oversee day-to-day operations of transportation across the organization.
- To keep all vehicle's related documents up to date and maintain and log book, fuel consumption etc. should have extensive records.
- To ensure proper management of transport and duties of drivers.
- To maintain transportation schedule.
- Daily monitor and keep record of transport movement and controlled.
- Analyze the effectiveness of Transport Operation Management.
- To ensure proper maintenance of transports.
- To maintain GPS tracking system and keep records.
- Complying with BRTA and Transport laws and regulations of Country.
- The process of taking petrol/diesel approved by the authorities should be strictly followed
- You should always keep a record of drivers' movements and accidents
- Arrange for daily fuel payments by maintaining proper procedures
- Transport routes and schedules shall be planned and coordinated as per the daily requirement of transportation
- Including issuing tax token, obtaining route permit, fitness certification etc. must have knowledge of vehicle management documentation including service logs, insurance and registration details.
- Implication by understanding of policies and procedures governing the management of motorized assets and the contracting of transportation services
- Any other work related to transportation as assigned by the authority.

Educational Requirements:

- Masters/M.Sc. preferably in any discipline related Automobile/Mechanical Engineering.
- Batchelor/Diploma in Automobile/Mechanical Engineering.
- Candidates having professional certifications related transport will get preferences.

Experience Requirements:

- Minimum 03 years' experience managing a transport department in any reputed financial institution/Multifunctional organization.
- Minimum 02 years of experience in leadership role in any reputed multifunctional financial organization in a transport department.

Additional Requirements:

- Recognized ability to work as part of a team
- Valid driver's license and clean driving record
- Strong negotiating skills
- Demonstrated rational and logical thinking, ability to creatively and quickly end solutions to problems
- Proven ability to manage personnel, delegate and follow-up; must be able to multitask
- Experience managing inventories (e.g., asset and spare part stock management)
- Computer experience: Windows systems, MS Word and MS Excel
- Conciseness with excellent sense of judgment
- Self-motivated & confident for taking independent initiatives to achieve organizational goals
- Strong analytical and financial reporting expertise
- Strong knowledge of administrative work and best practice.
- Ability to assess, critically evaluate and interpret complex information and to identify key operational & HR risk drivers
- Expert in oral/written communication with necessary interpersonal skills including information technology literacy
- Fluency (writing, reading, speaking) in Bangla & English
- Logical thinking with capability to problem solve and to act decisively
- Strong leadership abilities to lead and guide a team of drivers and the capability to motivate them

Salary: As per organization policy
Time of Deployment: Immediate
Employment Category: As per organization policy
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by 31st December, 2024. ---------- Michael John Gomes Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka	Acting Chief Executive Officer The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

May the new born Christ bless us all with peace, love, and laughter in this Christmas & New Year!!!

Talitha Kum Bangladesh is working to prevent human trafficking throughout the whole country!

STOP HUMAN TRAFFICKING

SALE

For more information:

Contact: +8801741003867 (Sr. Josephine Rozario, SSMI - Coordinator, TKB),
+8801859453424 (Sr. Suporna Rozario, SMSM - Secretary, TKB)
+8801796172853 (Arpon Adrian Gomes, Youth Ambassador, TKB)

TALITHA KUM BANGLADESH

SCAN ME

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবার থেকে সকলকে

MERRY Christmas
And
Happy New Year

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
পরিচালক ও সম্পাদক

হিসাব বিভাগ

ডগলাস ডি, রোজারিও
প্রধান হিসাব রক্ষক

অমিত রোজারিও
সহকারী হিসাব রক্ষক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সজল মেলকম বালা
সম্পাদনা সহযোগী

জেভিয়ার রোজারিও
সম্পাদনা সহযোগী

বিশাল এভারিশ পেরেরা
সম্পাদনা সহযোগী

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সার্কুলেশন ইনচার্জ

প্রান্ত গমেজ
সার্কুলেশন সহযোগী

প্রতিবেশী প্রকাশনী

পরেশ রোজারিও
সেলস্ ইনচার্জ

বিনয় কস্তা
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

টমাস কোড়াইয়া
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

জ্যোতি কম্যুনিকেশন

সুনীল পেরেরা
সহযোগী,
পরিচালক ও সম্পাদক

বাণীদীপ্তি

ফাদার নিখিল গমেজ
কো-অর্ডিনেটর, আরভিএ

সিস্টার লাইলী আরএনডিএম
কো-অর্ডিনেটর বাণীদিপ্তী

রিপন অব্রাহাম টলেন্টিনু
প্রোগ্রাম প্রযোজক,আরভিএ

এন্থনী তপন গমেজ
প্রধান শব্দগ্রাহক

জেমস্ গনছালভেস্
প্রোগ্রাম সহযোগী

জেরী প্রিন্টিং

অজয় পিউস কস্তা
ব্যবস্থাপক

দীপক সাংমা
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

পিতর হেম্ব্রম
কম্পিউটার অপারেটর

সাম্য টলেন্টিনু
কম্পিউটার অপারেটর ও গ্রাফিক্স

লিটন
সহযোগী, জেরী প্রিন্টিং

মো: হেমায়েত উদ্দীন
মেশিনম্যান

ফারুক মিয়া
মেশিনম্যান

মানিক রোজারিও
মেশিনম্যান

সেন্টু রোজারিও
মেশিনম্যান

আব্দুল খালেক
বাইন্ডার

সুশীল মারাক
বাবুর্চি

পরিমল টুডু
সিকিউরিটি গার্ড

পলিনুস কেরকেটা
সিকিউরিটি গার্ড

লিপি আক্তার
(আয়া)

WCIS
ESTD: 2008

William Carey International School

CAMBRIDGE International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School) Govt. Reg. No.23/English (EIIN: 903421)

ADMISSION OPEN

January-2025

Playgroup to STD-IX

WHY CHOOSE US?

- Innovative teaching methods
- Dedicated Educators
- Extracurricular opportunities
- Inclusive Community
- CCTV Secured Premises

OUR FACILITIES

- Digital Class Room
- Spacious Playground
- Dedicated Areas for Creative Learning
- Reliable Standby power supply
- Air-Conditioned Classrooms
- Transportation
- Health & Wellness program
- Clubs (Science, Debating, Environmental, Cultural)

ABOUT SCHOOL

Join our Cambridge-registered, English medium school for a balanced education that excels in academics and character building. With top-notch facilities and dedicated educators, we ensure every child thrives. Enroll now for a brighter future!

REGISTER NOW
www.wcischool.org

YMCA International Building, B-2 Jaleswar,
Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka-1343
Mobile: 01709091205, 01709127850

SAVAR CAMPUS

January-2025

Our Facilities

- Spacious Playground
- Reliable Standby Power Supply
- Air-Conditioned Classrooms
- Innovative Teaching Methods
- Modern Teaching Methodologies
- Health and Wellness Programs
- Dedicated Areas For Creative Learning
- Extra-Curricular Activities to Foster Skills
- Clubs (Science, Debating, Environmental, Cultural)

ADMISSION OPEN

Playgroup to O' Level

REGISTER NOW
www.wcischool.org

Advanced Computer & Multimedia Resources

Using advanced technology in the curriculum equips students with essential digital skills, enhances interactive learning, and prepares them for future academic and career challenges.

CCTV Secured Premises

Our campus is fully secured with CCTV Surveillance, ensuring a safe learning environment for students and peace of mind for parents.

INDIVIDUAL DEVELOPMENT

This approach ensures each student gets personalized attention through modern educational technologies, boosting engagement and academic success.

Bangladesh Baptist Church, 70-D/1, Indira Road,
(West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Phone: +88 02 222246708, Mob: 01989283257

DHAKA CAMPUS

"Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it."- Proverbs 22:6

বাবা/দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালোবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)

গ্রাম: কুচিলাবাড়ি

মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে-দেখতে চার বছর চলে গেল, ফিরে এলো শুভ বড়দিন ও আরেকটি নতুন বছর। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে- সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি, আর কোনদিন ফিরে আসবে না, এই নশ্বর পৃথিবীতে। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা আজও খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো – সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" - জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" শৈশবে মাকে হারিয়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে সীমাহীন অনাদরে, মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি - ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায়, তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারীমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারীমালা প্রার্থনা করতে নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগ শুনতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবন পথে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু-কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সবার প্রতি রইলো শুভ বড়দিন ও নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য –
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা ও নাতিন জামাই –
ঐশী ও ইভান্স, যাকোব, অর্থী, অন্তী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অথৈ, অবনী, রাহেল, মার্সিয়া ও স্যাম।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.wklypratibeshi.org, Face Book: Weekly Pratibeshi